কলিকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি-বার্ষিক স্নাতক (সাধারণ)
পাঠক্রম অনুসারে লিখিত পাঠ্যপুস্তক।

ভারতবর্ষের ইতিহাস

[১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত]

তীয় পত্র

ডঃ গৌতম নিয়োগী, এম. এ., পি-এইচ.ডি.,
রীডার, ইতিহাস বিভাগ, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া, হুগলি;
প্রাক্তন অধ্যাপক, খড়্গপুর কলেজ, মেদিনীপুর এবং দার্জিলিং
সরকারি কলেজ; আজীবন সদস্য, ভারতীয় ইতিহাস
কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো,
কলিকাতা— ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৫৯

এই লেখকদ্বয়ের রচিত পুস্তকসমূহ

উচ্চ-মাধ্যমিক ইতিহাস— (আধুনিক ভারত)
উচ্চ-মাধ্যমিক ইতিহাস— (ইয়োরোপ ও বিশ্ব)
ভারতবর্ষের ইতিহাস— (প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ষোড়শ শতাব্দী)
আধুনিক ইয়োরোপ— (১৭৮৯-১৯৩৯ খ্রিঃ)

ডি.টি.পি. প্রিন্ট :
ইউনিক লেজার সিস্টেম
৪, কুমুদ ঘোষাল রোড
কলিকাতা-৫৭

অফসেট প্রিন্ট :
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব

চতুর্থ পর্ব

পঞ্চম পর্ব

ষষ্ঠ পর্ব

সপ্তম পর্ব

অষ্টম পর্ব

প্রথম পর্ব

অধ্যায় ১

দিল্লি সুলতানির পতন ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

Syllabus : Disintegration of the Sultanate and foundation of the Mughal Empire.

১। মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের সমগ্র রাজনৈতিক ভূখণ্ড মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা— (১) দিল্লি সুলতানির অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড, (২) উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজপুত ও দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর ইত্যাদি কয়েকটি স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র এবং (৩) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি স্বাধীন তুর্ক-আফগান সুলতান শাসিত স্বাধীন রাষ্ট্র। রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত তিনটি অংশের প্রত্যেকটির মধ্যে যেমন ছিল দ্বন্দ্ব, হিংসা-দ্বেষ, সংঘাত তেমনি ছিল এদের মধ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব। বরং পারস্পরিক শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে বহিঃশত্রুকে আহ্বান করার তৎপরতা অনেকেরই মধ্যে ছিল।

দিল্লির অবস্থা : দিল্লিতে ছিল তখন ইব্রাহিম লোদীর শাসন। তাঁর সুলতানি শাসনের সীমা ছিল দিল্লি এবং তার চারপাশের কিছু অংশে। ইব্রাহিম লোদীর ঔদ্ধত্য ও অপরিণামদর্শী শাসন সুলতানি শাসনকে প্রায় শেষ সীমায় নিয়ে এসেছিল। ক্ষমতালোভী আফগানআমীর ওমরাহদের ক্ষমতালিপ্সা কেন্দ্রীয় শাসনকে তোয়াক্কা করত না, বরং তারা আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতেন। করদরাজ্যগুলি তাদের দেয় কর প্রদান বন্ধ করেছিল। জায়গিরদারগণ মৌখিকভাবে বশ্যতা স্বীকার করতেন। ইব্রাহিম লোদী যখন এসব ভূখণ্ডকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেন তখন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের আগুন চারিদিকেজ্বলে উঠল।

রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিধানের চেষ্টার অভাব : আফগান জাতির গোষ্ঠীয় মনোভাব, স্বাতন্ত্র্য বিলাস, হিংস্র স্বভাব, ব্যক্তিগত ঈর্ষা ছিল অত্যন্ত প্রবল। এর উপর তারা ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও উপজাতীয় মনোভাবাপন্ন। অতীতে তারা এক-একটি রাজবংশকে পঙ্কিল করে রেখেছিল। এদের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিধান করা সম্ভব ছিল না। ঐক্যবিধানের জন্য প্রয়োজন কূটনৈতিক কৌশল। ইব্রাহিম লোদী নিজে এদের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন— এই

চেষ্টাকে ঐক্য বিধানের চেষ্টা বলা যায় না। তাই পানিপথের যুদ্ধজয়ী বাবর তাঁর আত্ম জীবনীতে লিখেছেন— ইব্রাহিম লোদী কূটকৌশলী ছিলেন না। ভারতের দ্বার দেশে শত্রুর উপস্থিতি জেনেও তিনি আভ্যন্তরীণ ঐক্য বিধানের চেষ্টা করেন নি।

লোদী বংশীয় নেতাদের দিল্লির সিংহাসনের প্রতি প্রলোভন ছিল খুব বেশি। তারা মনে করতেন যে আমীরদের প্রত্যেকেই সুলতানের সমতুল্য আসনে বসার উপযোগী। তাই ইব্রাহিম লোদী যখন বিশেষ দরবারী আদবকায়দা পালনের নির্দেশ জারি করলেন তখন আমীরদের একাংশ বিদ্রোহ করলেন। ফলে রাজধানীতে নররক্তের প্রবাহ বয়ে গেল। ইব্রাহিম লোদী পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদীর স্বাধীন আচরণেও হস্তক্ষেপ করলেন। তখন দৌলত খাঁ ইব্রাহিম লোদীর খুল্লতাত আলম খাঁ লোদীর সঙ্গে যোগ দিয়ে কাবুলের আমীর বাবরকে হিন্দুস্থান আক্রমণের আহ্বান জানালেন।

ষোড়শ শতকের প্রথমাংশে দিল্লি সুলতানির বাইরে কতকগুলি স্বাধীন স্বয়ং-শাসিত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলি হলো, মেবার ও অন্যান্য রাজপুত রাজ্য, পাঞ্জাব সরহিন্দে আফগান রাজ্য, গুজরাটে শাহী বংশের রাজত্ব, কাশ্মীরে মীর্জা বংশ, পূর্ব ভারতে জৌনপুরের আফগান রাজ্য, বঙ্গদেশে কররাণী বংশ, উড়িষ্যার গঙ্গ বংশ, আসামে অহম বংশ, কোচবিহারে কোচ বংশ ইত্যাদি সকলেই শক্তি সঞ্চয় করে সুসংবদ্ধ হয়েছিল। মোগল আক্রমণের ঠিক পূর্বে আফগান শক্তি ছিল দুর্বল, এদের কোনও সুসংহত কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। সমসাময়িক কালে দক্ষিণ ভারতে ছিল বাহমণীর মুসলিম রাজত্ব ও বিজয়নগরের হিন্দু রাজত্ব— এরা ছিল সুসংহত শক্তির অধিকারী।

বাবরের ভারত আক্রমণকে অনেকেই মোঙ্গল আক্রমণের সমতুল্য বলে মনে করেছিলেন। ইতোপূর্বে মোঙ্গলরা ভারতে স্থায়ী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেনি — লুণ্ঠনই ছিল তাদের আক্রমণের উদ্দেশ্য। পাঞ্জাবের দৌলত খাঁ লোদী ও আলম খাঁ লোদী বাবরের আক্রমণের সুযোগে দিল্লির মসনদ অধিকারের আশা পোষণ করে হতাশ হলেন। গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিৎ তাঁর বিশাল রাজপুত বাহিনী নিয়ে ইব্রাহিম লোদীকে সাহায্য করলেন। কিন্তু মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহ নিরপেক্ষ রইলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে বাবর পূর্বগামী মোঙ্গলদের ন্যায় বিজিত অঞ্চল লুণ্ঠন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। তখন দিল্লি অধিকার করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু বাবর যখন দিল্লির সিংহাসন দখল করলেন তখন তার আশা হতাশায় পরিণত হলো।

২। মোগলদের আদি পরিচয়

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশ মোগলবংশ নামে অভিহিত। 'মোগল' কথাটি এসেছে 'মোঙ্গল' শব্দ থেকে। চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বর্তমান মোঙ্গলিয়া ছিল মোঙ্গল জাতির আদি বাসভূমি। তারা প্রথমদিকে ছিল যাযাবর, পশুপালক ও পশুশিকারী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে এই জাতি ভিন্ন ভিন্ন নেতার নেতৃত্বে

বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নেতাদের মধ্যে শক্তিশালী নেতা ছিলেন চেঙ্গিজ খাঁ। তিনি দুর্ধর্ষ অভিযান প্রেরণ করে এশিয়া ও ইয়োরোপে চরম ভীতির সঞ্চার করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিস চেঙ্গিজ খাঁর শত্রু খিবার সুলতান জালালউদ্দিন মাঙ্গাবরণীকে আশ্রয় না দেওয়ায় ভারতবর্ষ মোঙ্গল বিভীষিকা থেকে রক্ষা পায়। কালক্রমে মোঙ্গল জাতির সঙ্গে মধ্য এশিয়ার তুর্কি জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। তুর্ক-মোঙ্গল সংমিশ্রণে জাত তৈমুরলঙ দিল্লি লুণ্ঠন করে (১৩৯৮ খ্রিঃ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আরও পরবর্তীকালে তুর্ক-মোঙ্গল গোষ্ঠীর বীর সমরকুশলী সৈনিক জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রিঃ) সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন।

বাবরের ধমণীতে ছিল মধ্য এশিয়ার দুই দুর্ধর্ষ বীরের রক্তধারা। তার পিতা ওমর শেখ মির্জা ছিলেন সমরখন্দের চাঘতাই তুর্কবীর তৈমুরের পঞ্চম বংশধর এবং মাতা কতলুঘ-নিগার খানুন ছিলেন খাঁটি মোঙ্গলবীর চেঙ্গিজ খাঁর চতুর্দশ বংশধর। মোঙ্গল ও তুর্কি রক্তের সংমিশ্রণ থাকলেও বাবর নিজে 'মোগল' শব্দটাই পছন্দ করতেন। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশ মোগল বা নামে অভিহিত।

জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর ঃ ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর মধ্য এশিয়ার ফরগণা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওমর শেখ মির্জা ছিলেন ফরগণা রাজ্যের আমীর। পিতা ওমর শেখ পুত্রের শিক্ষার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। তুর্কি ছিল তার মাতৃভাষা, আর ফার্সি ছিল তাঁর অধীত ভাষা। বাল্যে তিনি পিতার নানা রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মে সাহায্য করতেন। তাই বাল্যেই তিনি নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর (১৪৯৪ খ্রিঃ) মাত্র এগার বছর বয়সে বাবর ফরগণার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রথমে পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ অধিকারের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। এদিকে আত্মীয় স্বজনদের ষড়যন্ত্রে পিতৃরাজ্য ফরগণা থেকে তিনি বিতাড়িত হলেন। এরূপ চরম দুর্দশার মধ্যেও বাবর হতাশ হননি। তাঁর সঙ্গে ছিল কিছু সংখ্যক বিশ্বস্ত অনুচর। এদেরই সাহায্যে শেষ পর্যন্ত তিনি ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে কাবুল অধিকার করে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি সমগ্র আফগানিস্তানের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করলেন।

ভারত অভিযান ঃ দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বাবর ভারতে প্রবেশের স্বপ্ন দেখতেন। এর পশ্চাতে নানা কারণ ছিল। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে অক্ষু নদীতীরে এক সর্দারের একশ এগারো বছর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতার নিকট বাবর তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরের ভারত-বিজয় কাহিনী শুনেছিলেন। তখন থেকেই ভারতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। সমরখন্দ জয়ে ব্যর্থ হয়েও তিনি ভারতের কথা ভুলতে পারেন নি। তাছাড়া, ভারতের ধন-সম্পদ তাঁকে

বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। আবার, বাবরের স্বপ্নকে সার্থক করার সুযোগ এনে দিয়েছিল সমসাময়িক ভারতীয় সুলতানদের আত্মকলহ, রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা। অবশেষে বলা যায়, বাবরের ভারত অভিযানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল তাঁর নতুন আগ্নেয়াস্ত্র আর দ্রুত গতিশীল অশ্বারোহী বাহিনী। তিনি পারসিকদের নিকট থেকে কামান ও গোলা-বারুদের ব্যবহার শিক্ষা করেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ওস্তাদ আলী এবং মুস্তাফা নামক দুজন তুর্কি গোলন্দাজ সৈনিকের সহায়তায় কামান, বন্দুক ও গোলা-বারুদ নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। এই আগ্নেয়াস্ত্রই বাবরের মনে ভারত অভিযানের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করল।

পানিপথের আগে : পানিপথের যুদ্ধের পূর্বে বাবর ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে পাঁচবার অভিযান প্রেরণ করে দিল্লি অধিকারের পথ পরিস্কার করেন। প্রথম অভিযানে (১৫০৫ খ্রিঃ) কোহাট ও মুলতান, দ্বিতীয় অভিযানে মান্দাবার (১৫০৭ খ্রিঃ), তৃতীয় অভিযানে (১৫১৯ খ্রিঃ) ঝিলামতীরের ভেরা, চতুর্থ অভিযানে (১৫২০ খ্রিঃ) শিয়ালকোটে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতোমধ্যে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী এবং তার খুল্লতাত আলম খাঁ লোদীর বিবাদ হলো। বিবাদ তীব্রতর হতেই দৌলত খাঁ দিল্লি আক্রমণের জন্যে বাবরকে আমন্ত্রণ জানালেন। দিল্লির সুলতান ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে বাবরকে কাজে লাগিয়ে দিল্লির মসনদ অধিকার করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। লক্ষ্য করা যায়, বাবর ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে লাহোর ও দীপালপুর অধিকার করে কাবুলে ফিরে গেলেন। হতাশ হলেন দৌলত খাঁ লোদী ও আলম খাঁ লোদী। তবুও দিল্লির মসনদের আশায় তাঁরা ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁরা পরাজিত হলেন। এই পরাজয়ের সংবাদ কাবুলে পৌঁছাতেই বাবর ভারত আক্রমণের নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নতুন রণকৌশল অবলম্বন করলেন।

৩। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ এবং বাবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন

১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের শীতের প্রারম্ভ। বাবর মাত্র বারো হাজার সৈন্য এবং ওস্তাদ আলী ও মুস্তাফার নেতৃত্বে এক গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। বাদক্শান থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন আর গজনী থেকে খাজা কালান সসৈন্য বাবরের সঙ্গে যোগদান করলেন। দিল্লির অদূরে পানিপথের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে তাঁর শিবির স্থাপিত হলো। শিবিরের চারপাশে বিস্তৃত এক পরিখাও খনন করা হলো। অন্যদিকে ইব্রাহিম লোদী এক লক্ষ সৈনিক, এক হাজার হস্তী এবং গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিতের নেতৃত্বে এক বিশাল রাজপুত বাহিনীসহ পানিপথের অদূরে উপস্থিত হলেন। কয়েকদিন নীরব থেকে উভয় দলই কৌশলগত পরিকল্পনা করল। অবশেষে যখন যুদ্ধ শুরু হলো (১৫২৬ খ্রিঃ) তখন বাবরের কামান-বন্দুক আর উজবেগী অশ্বারোহী বাহিনী সহজেই ইব্রাহিমের বিশাল বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ইব্রাহিম লোদী নিহত হলেন। পনেরো হাজার

আফগান সৈনিকের রক্তে পানিপথ রঞ্জিত হলো। এই যুদ্ধই ছিল ইতিহাস বিখ্যাত পানিপথের প্রথম যুদ্ধ। ঐতিহাসিকদের মতে কামান-বন্দুকই ছিল বাবরের যুদ্ধ জয়ের নিশ্চিত কারণ।

যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ছিল ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে **প্রথমত**, দিল্লি এবং তার চারপাশের সুলতানি শাসনের অবসান হলো। বাবর বহু ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে সেগুলিকে জন সমর্থন আদায় এবং মোগলশক্তি বৃদ্ধির কাজে লাগালেন। **দ্বিতীয়ত**, পরবর্তীকালে মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রিঃ) ছেদচিহ্ন ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী মোগল সাম্রাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। **তৃতীয়ত**, মুসলমান হলেও মোগলরা ছিল সুলতানি আমলের ভারতীয় মুসলিমদের নিকট বিদেশী এবং শত্রু গোষ্ঠীভুক্ত। এই ভারতীয় মুসলিমগণ বিদেশী শত্রুদের রুখবার জন্য ভারতীয় অ-মুসলমানদের মুখাপেক্ষী হলো। যেমন, গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিতের রাজপুত বাহিনী বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরম সহায়ক হয়েছিলেন। সুতরাং এই সময় থেকে হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য দূরীভূত হয়ে একটা জাতিগত সমন্বয়ের পথ পরিস্কার হয়। অবশেষে বলা যায়, উদারপন্থী বাদশাহী শাসনের ফলে ভারতে সমন্বয়ী সংস্কৃতির ধারা গড়ে ওঠে।

দিল্লিতে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই অধিকারটুকু সমগ্র ভারতে মোগল আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। তখন ভারতের অনেকগুলি রাজ্য দিল্লি অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। এদের মধ্যে এক অংশে ছিলেন কয়েকজন প্রাদেশিক সুলতান এবং দ্বিতীয় অংশে ছিলেন রাজপুতনার নরপতিবৃন্দ। তবুও নতুন আগ্নেয় অস্ত্রে সজ্জিত বাবর দিল্লির সুলতান অপেক্ষা মোগল অধিকৃত ভূখণ্ডের সীমা বৃদ্ধিতে তৎপর হলেন। এই পর্যায়ে **প্রথমত** তিনি হুমায়ুনের সাহায্যে গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের ছোট ছোট আফগান নেতাদের পরাজিত ও বন্দি করলেন। হুমায়ুনের নেতৃত্বে জৌনপুর ও গাজীপুর অধিকৃত হলো। সঙ্গে সঙ্গে বাবর নিজেই গোয়ালিয়র অধিকার করলেন। বাবরের নির্দেশ অনুসারে অন্যান্য মোগল সৈন্যাধ্যক্ষরা এটাওয়া, কলপী, ঢোলপুর, কনৌজ প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করলেন। এইভাবে উত্তর প্রদেশের এক বিরাট বিস্তৃত অঞ্চল মোগল-অধিকারে এলো।

দ্বিতীয়ত, পার্শ্ববর্তী চিতোরের রাজপুত শক্তি ছিল পরাক্রান্ত। চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহ বা রাণাসঙ্গ প্রথম থেকেই ভারতে রাজপুত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি আশা করেছিলেন যে বাবর পূর্ববর্তী মোঙ্গলদের মত ভারত লুণ্ঠন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন অথবা তাকে ভারত থেকে বিতাড়িত করাও সহজ হবে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল যে বাবর ভারতে স্থায়ী মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছেন। তিনি সংগ্রাম সিংহের অগোচরে কল্পী ও বায়েনা দখল করেছেন — যা ছিল এতদিন সংগ্রাম সিংহের অধীনস্থ। কাজেই সংগ্রাম সিংহ এবার বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

বাবর ও রাজপুতগণ ঃ প্রথমেই সংগ্রাম সিংহ বাবর কর্তৃক অধিকৃত বায়েনা আক্রমণ করলেন। সংগ্রাম সিংহের বাহিনীর সাহায্যার্থে রায়সেনের সামন্ত সালাউদ্দিন, মেওয়াটের ধর্মান্তরিত আমীর হাসান খান যোগদান করলেন। রাজপুত আফগানদের যৌথ বাহিনী ভরতপুরের নিকট খানুয়ার প্রান্তরে সম্মিলিত হলো। অন্যদিকে বাবর তাঁর অশ্ব ও আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ ঘোষণা করলেন। সংগ্রাম সিংহের বিপুল সংখ্যক বাহিনী তাঁর সৈন্যদলের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারে — এই চিন্তাধারায় তিনি নতুন নীতি অবলম্বন করলেন। **প্রথমত,** ইসলাম বিরোধী কর্ম হিসেবে নিজে সুরাপান বর্জন করলেন। মূল্যবান সুরাপাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিক্ষিপ্ত করলেন। **দ্বিতীয়ত,** সুন্নি-মুসলিমদের মনে প্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র মুসলমানদের উপর থেকে "তামুঘা কর" ***(Stamp Duty)*** রহিত করলেন। তাছাড়া কোরাণ স্পর্শ করে মোগল বাহিনী বাবরের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে অনুপ্রাণিত হলো।

প্রস্তুতি অন্তে খানুয়ার বিস্তৃত প্রান্তরে শুরু হলো মোগল রাজপুত বাহিনীর সংগ্রাম। বাবর এক্ষেত্রেও পানিপথের নতুন রণকৌশল অবলম্বন করলেন। গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ রুমীখান কামানের গোলায় বিশাল রাজপুত বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। মাত্র দশ ঘণ্টার যুদ্ধের পর সংগ্রাম সিংহ আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসারিত হলেন। নিজের দেশে, নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন রণক্ষেত্রে রাজপুতবাহিনী পরাজিত হলো। পরাজয়ের কিছুকাল পরে (১৫২৮ খ্রিঃ) ভগ্নহৃদয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল মাত্র দশ ঘণ্টা হলেও খানুয়ার যুদ্ধের ফলাফল ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাণা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে যে রাজপুত শক্তি ভারতে রাজপুত সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখত সেই স্বপ্ন স্বপ্নেই রয়ে গেল। **দ্বিতীয়ত,** রানা সংগ্রাম সিংহের সহযোগিতা নিয়ে অনেক আফগান নেতা দিল্লি দখলের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং খানুয়ার যুদ্ধে তাঁকে নিষ্ঠার সঙ্গে সাহায্য করেছিলেন। সেই সব আফগান নেতাদের প্রয়াসও ব্যর্থ হলো। **তৃতীয়ত,** পানিপথের প্রথম যুদ্ধ বাবরের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। খানুয়ার যুদ্ধ মোগল শক্তিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হলো। বাবর এবার নিশ্চিত হয়েই কাবুল থেকে রাজধানী ভারতের দিল্লিতে স্থানান্তরিত করলেন।

বাবর সংগ্রাম সিংহের ক্ষমতা খর্ব করার পর তাঁর আত্মীয় মালবের রাজা মেদিনী রাও-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। মেদিনী রাও বিগত কয়েক বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বুন্দেলখণ্ড ও চান্দেরী (ভূপাল) দুর্গ অধিকার করেছিলেন। বাবর ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভেদ্য চান্দেরী দুর্গ অবরোধ করলেন। মেদিনী রাও পরাজিত হলেন। চান্দেরীর শাসনভার প্রাক্তন আমীরের হাতে অর্পিত হলো।

রাজপুত শক্তি খর্ব করেই বাবর তৃতীয় পর্যায়ে আফগান আমীরবর্গের শক্তি খর্ব করতে সচেষ্ট হলেন। ইতোমধ্যে অধিকাংশ আফগান আমীরই বাবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ বিহার, জৌনপুরের আমীরগণ বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের

আশ্রয়ে এসে একত্রে দিল্লি আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বাবর বিহার সীমান্তে ঘর্ঘরা নদীতীরের যুদ্ধে (১৫২৯ খ্রিঃ) এই পরিকল্পনা বানচাল করে দেন। বাংলার নসরৎ শাহ বাবরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন ও বাবরের শত্রুদের আশ্রয় দান না করার প্রতিশ্রুতি দেন। এক্ষেত্রে অবশ্য বাংলার স্বাধীনতা রক্ষিত হলো। ঘর্ঘরার যুদ্ধই ছিল ভারতে বাবরের শেষ যুদ্ধ। এইভাবে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের সীমা আফগানিস্তানের অক্ষু নদী থেকে পূর্বভারতের বঙ্গ-সীমান্ত পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

বাবরের শেষ জীবন ঃ ঘর্ঘরার যুদ্ধের পর বাবর আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ করেন। এইসময় তার সামনে আর বিশেষ কোনও সমস্যা ছিল না; কিন্তু বিগত দিনের কঠিন পরিশ্রমের ফলে তিনি শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লেন। এদিকে তাঁর পুত্র হুমায়ুনও সম্ভল নামক জায়গিরে অবস্থানকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুত্রের অসুস্থতায় তিনি আরও উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে নৌকাযোগে আগ্রায় আনয়ন করেন। কথিত আছে যে, হুমায়ুনের চিকিৎসার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে বাবর নিজের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট হুমায়ুনের জীবন প্রার্থনা করেন। ছ'মাসের মধ্যে হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন এবং হুমায়ুনের ব্যাধি বাবরের দেহে সংক্রামিত হয়। বাবর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বেই বাবর হুমায়ুনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। বাবরের শেষ উপদেশ ছিল— হুমায়ুন যেন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের রাজ্যাংশ থেকে বঞ্চিত না করেন। যাই হোক্ মৃত্যুর পর বাবরের মৃতদেহ প্রথমে আগ্রায় নিয়ে আসা হয় ও পরে (তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে) কাবুলের মনোরম উদ্যানে সমাধিস্থ করা হয়।

বাবরের শাসন-ব্যবস্থা ঃ সারা জীবন যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাবর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার উপর একাধিপত্য স্থাপন করতে পারেন নি। তবে তিনি রাজক্ষমতাকে অপ্রতিহত রেখেছিলেন। পানিপথ বিজয়ের পরই বাবর পারিবারিক 'মীর্জা' উপাধি বর্জন করে 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। সুসংহত করার জন্য তিনি রাজধানীকে কাবুল থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে সংহত করেন। বিজিত ভূখণ্ড শাসনের ক্ষেত্রে তিনি সামরিক নীতি প্রয়োগ করেন। কামান-বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্রর মৌলিক অংশটিকে তিনি রেখেছিলেন নিজের নিয়ন্ত্রণে। সমগ্র রাজ্যখণ্ডকে বিভক্ত করে তিনি আমীর ও কর্মচারিবর্গের দায়িত্বে অর্পণ করলেন। শাসকগণ নিজ নিজ ভূখণ্ড অংশত স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। ভূখণ্ডের শান্তিরক্ষা, বিচার-নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল শাসকদের উপর অর্পিত। বাদশাহ ছিলেন সকলের উর্ধে এবং তাঁর মাধ্যমে রাজ্যখণ্ডগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আরসকিন *(Erskine)* এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে বাবরের সাম্রাজ্য ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তের অধীন খণ্ডরাজ্যের সমষ্টি — একজন শাসকের অধীনে

৫। মোগল-আফগান দ্বন্দ্ব

সূচনা ঃ মোগল সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বাবর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে (১৫৩০ খ্রিঃ) বিজিত অংশের জন্য সুশাসন ও স্থায়িত্বের ব্যবস্থা করে যেতে পারেন নি। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লিকেন্দ্রিক আফগান শক্তির পরাজয় ঘটেছিল। খানুয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাজপুতদের শক্তি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল, ঠিকই। কিন্তু ভারতে মোগলদের প্রবল শত্রু ছিল দিল্লিসহ ভারতের অন্যান্য অংশের আফগানরা। আফগানদের নিকট মোগলগণ ছিলেন বিদেশী শত্রু। স্বাধীনচেতা আফগানরা মোগলদের মেনে নিতে পারেন নি। আবার ঠিক বাবরের মৃত্যুর সময় আফগানদের পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়ার মত ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল। অচিরে বিহারের পাঠান সুলতান শেরশাহ্ সেই শূন্যস্থান পূরণ করলেন। ফলে মোগল-আফগান সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৪০ এবং ১৫৫৫-৫৬) সিংহাসন লাভের পূর্বেকার বিড়ম্বনাঃ বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ 'ভাগ্যবান'। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল নিতান্ত বিড়ম্বিত। স্নেহ বৎসল পিতা বাবরই তার বাল্যে শিক্ষাব্যবস্থা করেছিলেন। পিতার সঙ্গে থেকেই তিনি কৈশোরে সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পিতার নির্দেশ অনুসারে তিনি বিশ বছর বয়সে বাদকশানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু পিতার অনুমতি না নিয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। এই ঘটনায় পিতা ক্ষুব্ধ হলেন, কিন্তু হুমায়ুনের অসুস্থতায় বাবর আল্লাহর নিকট পুত্রের ব্যাধিমুক্তির প্রার্থনা করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি হুমায়ুনকেই বিজিত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বাবরের সর্বশেষ নির্দেশ ছিল যেন তিনি ভ্রাতাদের রাজ্যাংশ প্রদান করেন।

রাজ্য লাভের পরবর্তী বিড়ম্বনা ঃ স্নেহবৎসল পিতার নির্দেশ মত হুমায়ুন প্রথমেই তাঁর ভ্রাতা কামরান, আসকারী এবং হিন্দলকে রাজ্যের কিছু কিছু অংশে বণ্টন করে দিলেন। ফলে বিনাযুদ্ধে রাজ্যলাভ করলেও নব প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট হলো। ভ্রাতারা খুশি না হয়ে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করলেন। তাঁরা সকলেই দিল্লির সিংহাসন লাভের আশা পোষণ করতেন। হুমায়ুনের আত্মীয় মহম্মদ জামান মির্জা, মির্জা মহম্মদ সুলতান, মির্জা মাহাদী খাজা প্রমুখ অনেকেই সিংহাসনের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। সুতরাং হুমায়ুনের শত্রু ছিলেন তাঁর জ্ঞাতিবর্গ মির্জাগোষ্ঠী। এদিকে, বিহারের শেরশাহ এবং গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ দ্রুত আফগান শক্তিকে সংহত করে দিল্লির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। যে আলম খান বাবরকে ভারত আক্রমণের আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে গুজরাটের বাহাদুর শাহের আশ্রয় নেন ও তাঁর শক্তিবৃদ্ধি করেন। তাছাড়া, হুমায়ুন নিজে ছিলেন নিজের শত্রু। বিশাল সাম্রাজ্যের বহুমুখী সমস্যা সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। শত্রুবেষ্টিত রাষ্ট্র পরিচালনার মত দূরদর্শিতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব ছিল হুমায়ুনের মধ্যে খুব বেশি। আবার, বাবরের সেনাবাহিনী তুর্কি, পার্সি, উজবেগি, আফগান ইত্যাদি নানা জাতির লোক

নিয়ে গঠিত ছিল। এদেরকে জায়গির, লুণ্ঠিত সামগ্রীর অংশ ইত্যাদি দিয়ে বাবর তাঁদের অনুগত করে তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময় রাজভাণ্ডার ছিল এক প্রকার শূন্য। সেনাবাহিনীকে সংহত রাখা ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে যথেষ্ট অর্থ হুমায়ুনের হাতে ছিল না। তাই হুমায়ুনের ব্যর্থতায় বাবরের দায়িত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রাসব্রুক উইলিয়ামস্ বলেছেন, "বাবর তার পুত্রের জন্য এমন একটি রাজ্য রেখে গিয়েছিলেন, যা কেবলমাত্র নিরন্তর যুদ্ধের দ্বারা সংরক্ষণ করাই সম্ভব ছিল। যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যের কোনও অস্তিত্বই ছিল না।"[১]

এসব বিড়ম্বনা ও সঙ্কট সত্ত্বেও হুমায়ুন রাজ্যজয়ের প্রয়াস থেকে বিরত হননি। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে প্রচুর অর্থ আদায় করলেন ও রাজাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলেন। পরের বছর (১৫৩২ খ্রিঃ) তিনি বিহারের মামুদ লোদীকে জৌনপুর থেকে বিতাড়িত করলেন এবং ঐ বছর (১৫৩২ খ্রিঃ) শের খাঁর বিরুদ্ধে চুনার দুর্গ অবরোধ করে শের খাঁকে মৌখিক বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলেন। পরের বছর (১৫৩৩ খ্রিঃ) তিনি গুজরাটের বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে মালব ও গুজরাট জয় করলেন। কিন্তু দিল্লির বিরুদ্ধে ভ্রাতা আসকারী এবং গুজরাটের বাহাদুর শাহ মিলিত হওয়ায় সঙ্কট সৃষ্টি হলো। গুজরাটে প্রতিপত্তি বিস্তারের পূর্ব মুহূর্তে হুমায়ুন শুনলেন যে, শের খাঁ পূর্বাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার শুরু করেছেন। অগত্যা হুমায়ুন মালব ও গুজরাটের আশা ত্যাগ করে বাংলার দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন।

চুনার অবরোধ ও চৌসার যুদ্ধ ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন শের খাঁর বিরুদ্ধে চুনার দুর্গ অবরোধ করেন এবং শের খার মৌখিক বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোমধ্যে শের খাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও তিনি বিহার ও বাংলার মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে বিহারের সুলতান পদ লাভ করেন। বাংলা ও বিহারের উপর শের খাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সংবাদ পেয়েই হুমায়ুন বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে (১৫৩৭ খ্রিঃ) চুনার দুর্গ অবরোধ করলেন। প্রায় ছয় মাস তিনি এই অবরোধ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে শের খাঁ গৌড় এবং রোটাস দুর্গ জয় করে প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করলেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই হুমায়ুন গৌড় অধিকার করেন। শের খাঁ তাঁকে সরাসরি বাধা না দিয়ে অন্যপথে বারানসী, জৌনপুর প্রভৃতি জয় করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। হুমায়ুন এই অবস্থার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এবার দিল্লির দিকে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ খ্রিঃ) শের খাঁ হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। হুমায়ুন কোনক্রমে চৌসা থেকে গঙ্গা পার হয়ে আগ্রায় পালিয়ে বেঁচে যান। বাংলা, বিহার, জৌনপুর, কনৌজ তখন শের খাঁর দখলে আসে। ফলে পূর্ব ভারত মোগলদের হস্তচ্যুত হলো।

১। রাসব্রুক উইলিয়ামস, *'অ্যান এম্পায়ার বিলডার অফ দা সিক্সটিনথ সেঞ্চুরি'*, পৃ. ১৪৫

কনৌজের যুদ্ধ ঃ পরের বছর (১৫৪০ খ্রিঃ) হুমায়ুন উক্ত পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। বিলগ্রাম বা কনৌজের প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ হলো (১৫৪০ খ্রিঃ)। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর যে কৌশল গ্রহণ করেন, বিলগ্রামের যুদ্ধে শের খাঁ ঠিক একই কৌশল অবলম্বন করলেন। ফলে হুমায়ুন যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। মোগল বাহিনী সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল। শের খাঁ সেই পলায়নরত বাহিনীর পশ্চাৎভাগ অনুসরণ করে দিল্লি পৌঁছে গেলেন। বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল প্রতিপত্তি আপাতত দিল্লি থেকে লুপ্ত হলো। শেরশাহ উপাধি নিয়ে শের খাঁ দিল্লির সিংহাসনে পুনরায় আফগান প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

শেরশাহের হাতে হুমায়ুনের পরাজয়ের নানা কারণ ছিল। তবে উল্লেখযোগ্য কারণগুলির মধ্যে—

প্রথমত, বলা যায়, মাত্র চার বছরের শাসনকালের মধ্যে বাবর ভারতের আফগান শক্তিকে পঙ্গু করেছিলেন, কিন্তু নিশ্চিহ্ন করতে পারেননি। বাবর কর্তৃক বিজিত ভূখণ্ডের পূর্ব সীমায় ছিল বাংলার নসরৎ শাহের রাজত্ব এবং পশ্চিম সীমায় ছিল গুজরাটের বাহাদুর শাহের রাজত্ব। এই দুই শক্তি মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল। আর হুমায়ুন সরাসরি এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। এক্ষেত্রেও তিনি গুজরাটের বাহাদুর শাহকে সম্পূর্ণ পঙ্গু না করে পূর্বাঞ্চলে শের খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করলেন। এরূপ দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে তিনি কোনও শক্তির বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ মোগলশক্তি প্রয়োগ করতে পারেননি।

দ্বিতীয়তঃ, কূটনৈতিক কৌশল ও সেনা-পরিচালনায় হুমায়ুন অপেক্ষা শের খাঁ ছিলেন অনেক বেশি প্রতিভাবান। তাই চৌসার যুদ্ধে পরাজয়ের পর কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজয় বরণ করতে হলো।

তৃতীয়তঃ, পিতার অনুমতিক্রমে হুমায়ুন তাঁর ভ্রাতৃবর্গের হাতে রাজ্যাংশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রত্যেক ভ্রাতা দিল্লির মসনদের উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন ; তাঁরা কেউ প্রাপ্ত রাজ্য খণ্ড নিয়ে খুশি হতে পারেননি। তাই হুমায়ুনের সঙ্গে ভ্রাতৃবর্গের সদ্ভাব ছিল না। ফলে মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট হয়েছিল। শের খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের সময় কোনও ভ্রাতাই মোগল সাম্রাজ্যের মর্যাদা রক্ষার জন্যে হুমায়ুনের পাশে এসে দাঁড়াননি।

চতুর্থতঃ, হুমায়ুন নিজের কাছে ছিলেন নিজের শত্রু। চুনার দুর্গ অবরোধ ও বাংলার রাজধানী গৌড়ে ছ'মাস অকারণে অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময় তিনি বিলাস-বিশ্রামে সময় কাটিয়েছিলেন। ভারতীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে তিনি সতর্কতার সঙ্গে সামরিক বাহিনী পরিচালনা করেননি। হুমায়ুনের চারিত্রিক শিথিলতা, ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, সামরিক কলাকৌশলের জন্য সতর্কতার অভাবই ছিল তাঁর পরাজয়ের বিশেষ কারণ।

পলাতক অবস্থায় হুমায়ুন ঃ ভাগ্য-বিপর্যয়ে হুমায়ুন পরিবার-পরিজন ও কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ লাহোরে তাঁর ভ্রাতা কামরানের আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করলেন। সেখানে ব্যর্থ চেষ্টার পর তিনি সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন। সিন্ধুর সুলতান শাহ্ হুসেন তাঁর বিরোধিতা করলেন। এই সময় হুমায়ুন তাঁর ভ্রাতা হিন্দালের সূফিগুরু পীরমীর্জার কন্যা হামিদাবানুকে বিবাহ করেন। কিন্তু পীরমীর্জার সঙ্গে হুমায়ুনের মনোমালিন্য হলো। তাই তিনি পারস্যের পথে যাত্রা করলেন এবং অমর কোটের রাণা বীরশালের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানেই হুমায়ুনের পুত্র আকবর ভূমিষ্ঠ হলেন (২০ শে নভেম্বর, ১৫৪২ খ্রিঃ)। কিন্তু বীরশালের সঙ্গে হুমায়ুনের মতভেদ হলো। তখন সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে হুমায়ুন কান্দাহারে ভ্রাতা আসকারীর সাহায্য পাওয়ার আশায় সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়ে হুমায়ুন পারস্যের সুলতান শাহ্ তাহমাস্পের আশ্রয় নেন। শাহ্ তাহমাস্প হুমায়ুনকে চৌদ্দ হাজার সৈন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। শর্ত রইল যে, হুমায়ুন শিয়াধর্ম গ্রহণ করবেন এবং কান্দাহার জয় করে ভূখন্ডটি পারস্য সুলতানের হাতে প্রত্যার্পণ করবেন। তাছাড়া পারস্যের শাহের নামে খুৎবা পাঠ করতে হবে।

শেরশাহ্ ঃ ভাগ্যের বিড়ম্বনা ও শিক্ষা ঃ শের শাহ্ ছিলেন 'শূর' বংশীয় পাঠান। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল ফরিদ খাঁ। তিনি ছিলেন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গিরদার হাসান খাঁ শূরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আনুমানিক ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। শিক্ষায় তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার জন্যে পিতা হাসান তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু বিমাতার চক্রান্তে শৈশবেই তাকে পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বিমাতার তিক্ত ব্যবহারে ফরিদ সাসারাম ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি জৌনপুরের শাসনকর্তা জামাল খাঁ লোহানীর সামরিক বিভাগে চাকরি নেন। এই সময় সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ফরিদ খাঁ ইসলামের ইতিহাস, আরবি ও ফারসি ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। বিখ্যাত ফারসি কবি সাদীর রচিত গুলিস্তান ও বুলিস্তান তার কণ্ঠস্থ ছিল। ফরিদের প্রতিভায় মুগ্ধ জামাল খাঁর মধ্যস্থতায় ফরিদ খাঁর সঙ্গে তাঁর পিতার মনোমালিণ্য দূর হয় এবং ফরিদ খাঁ পিতার জায়গির পরিচালনার দায়িত্ব পান। প্রায় ২১ বছর (১৪৯৭-১৫১৮ খ্রিঃ) যাবৎ এই জায়গির পরিচালনার সময় তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন সেই অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার উৎস-শক্তি।

ফরিদ খাঁর বুদ্ধি ও ব্যবহারে সাসারামের প্রজাবর্গ প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। এর ফলে বিমাতার হিংসা আরও বৃদ্ধি পেল। তাই তাঁকে দ্বিতীয়বার গৃহত্যাগ (১৫১৮ খ্রিঃ) করতে হলো। এবার তিনি দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীর স্মরণাপন্ন হলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর পিতা হাসান মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম লোদী সাসারামের জায়গির ফরিদ খাঁর হস্তে অর্পণ করলেন। কিন্তু ফরিদ খাঁ অন্যান্য ভ্রাতাদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে বিহারের শাসনকর্তা বাহার খাঁ লোহানীর অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। এই সময় নিজ হাতে একটা বাঘ শিকার করে 'শের খাঁ' নামে পরিচিতি লাভ করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে লোহানীর আফগান আমীরদের প্ররোচনায় সে চাকরি ছেড়ে দেন।

চুনারদুর্গ অধিকার ঃ এই সময় মোগল সম্রাট বাবর পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধের পর পূর্বাঞ্চলে রাজ্য বিস্তারে (১৫২৭ খ্রিঃ) মনোযোগ দিলেন। এই সুযোগে শের খাঁ বাবরকে সামরিক সাহায্য দিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ পিতার সাসারামের জায়গির লাভ করলেন। ইতিমধ্যে তিনি মোগলদের সামরিক কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। তবে মোগল শিবিরে অবস্থান কালে শের খাঁ লক্ষ্য করলেন যে মোগল সহকর্মীরা গর্বিত এবং আফগানদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাই শের খাঁ দক্ষিণ বিহারের আফগান সুলতান বাহার খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। আবার ঠিক এই সময় বাহার খাঁ লোহানীর মৃত্যু হওয়ায় শের খাঁ তাঁর শিশুপুত্র জালাল খাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হলেন। এই সুযোগে শের খাঁ দক্ষিণ বিহারের সমস্ত রাজক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেন। ক্ষমতা হাতে পেয়েই শের খাঁ চুনার দুর্গ আক্রমণ করেন ও দুর্গের অধিপতি তাজ খাঁকে নিহত করে তার বিধবা পত্নী লাদমালিকাকে বিবাহ করেন। চুনার দুর্গের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি এবার শের খার হস্তে ন্যস্ত হলো। এই সময় তার উপাধি হল 'হজরত-ই-আলা'।

শের খাঁর শক্তি বৃদ্ধিতে হুমায়ুন আতঙ্কিত হয়ে চুনার দুর্গ অবরোধ (১৫৩১ খ্রিঃ) করলেন। এবার শের খাঁ হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করে আত্মরক্ষা করেন। হুমায়ুনও এই সময় গুজরাটের বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে বিহার ও বঙ্গের আত্মীয়গণ জালাল খানের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হলেন। শের খাঁ সুরজগড়ের যুদ্ধে (১৫৩৪ খ্রিঃ) বাংলা বিহারের মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করলেন। বিহারে এবার শের খাঁ হলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক। এই সুরজগড়ের যুদ্ধ ছিল শের খাঁর জীবনের একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধই সাসারামের জায়গিরদারকে হিন্দুস্থানের অধিপতি করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচ্য।

১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন, শের খাঁর বিরুদ্ধে চুনার দুর্গ অবরোধ করেন এবং শের খাঁর মৌখিক বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আগ্রা প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোমধ্যে শের খাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কারণ তিনি সুরজগড়ের যুদ্ধে (১৫৩৪ খ্রিঃ) বাংলা-বিহারের মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে বিহারের সুলতান পদ লাভ করেন। ঠিক এই সময় হুমায়ুন গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি শের খাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে গুজরাটের যুদ্ধ শেষ না করেই বাংলার দিকে অগ্রসর হন (১৫৩৭ খ্রিঃ) এবং পুনরায় চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। প্রায় ছয়মাস তিনি এই অবরোধ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

ইতোমধ্যে শের খাঁ গৌড় এবং রোটাস দুর্গ জয় করে প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করলেন। এই সংবাদ পেয়ে হুমায়ুন গৌড় অধিকার করেন। শের খাঁ তাকে সরাসরি বাধা না দিয়ে অন্যপথে বারানসী, জৌনপুর প্রভৃতি জয় করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। হুমায়ুন এবার দিল্লির দিকে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ খ্রিঃ) শের খাঁ হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। হুমায়ুন কোনক্রমে পালিয়ে বেঁচে যান। পরের বছর হুমায়ুন পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। কনৌজের প্রান্তরে তুমুল

যুদ্ধ হল (১৫৪০ খ্রিঃ); কিন্তু হুমায়ুন এবারও শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। বহু মোগল সেনা এই যুদ্ধে নিহত হলো। হুমায়ুনের কামান-বন্দুক, গোলাবারুদ শের খাঁর হস্তগত হলো। পুনরায় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি না নিয়ে হুমায়ুন লাহোরের দিকে অগ্রসর হলেন। শের খাঁ দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করলেন। হিন্দুস্থানের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার এলো শের শাহের হাতে। সাময়িকভাবে ভারতে মোগল আধিপত্যে ছেদ পড়ল।

সুলতান শেরশাহ (১৫৪০-৪৫ খ্রিঃ) ঃ কনৌজের যুদ্ধের পর শের খাঁ শেরশাহ উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লির মসনদটিকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেই শেরশাহ বিপাশা নদী অতিক্রম করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করলেন। ইতোমধ্যে হুমায়ুন ও তাঁর ভ্রাতা কামরান কাবুলের দিকে পালিয়ে গেলেন। শেরশাহ এই সময় মোগলদের অনুগত দুর্ধর্ষ গক্কার জাতিকে পরাজিত ক'রে ঝিলাম নদীতীরে নতুন রহতাস বা রোটাস দুর্গটি নির্মাণ করেন। ঠিক এই সময় বাংলার শাসনকর্তা খিজির খাঁ বিদ্রোহ করেন। এই সংবাদ পেয়েই শেরশাহ দ্রুত বাংলায় এসে খিজির খাঁকে পরাজিত ও বন্দী করলেন। এবার বাংলায় তিনি আর কোনও নতুন শাসক নিযুক্ত না করে সমগ্র বাংলাকে কয়েকটি 'সরকারে' বিভক্ত করেন ও পৃথক পৃথক শিকদারের উপর প্রত্যেকটি সরকারের শাসনভার ন্যাস্ত করেন। শিকদারদের উপরে ছিলেন কাজী ফজিলত। তার কর্তব্য ছিল সরকারের শাসন-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ, দিল্লিতে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ ও রাজ্যমধ্যে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ দমন। ফলে বাংলায় প্রবর্তিত হলো প্রত্যক্ষ কেন্দ্রীয় শাসন।

এরপর শেরশাহ মুলতান ও সিন্ধুদেশ অধিকার করে সেখানে ইসমাইল খাঁ নামে একজন সর্দ্দারকে শাসক নিযুক্ত করলেন। খানুয়ার যুদ্ধের পর যদিও রাজপুত শক্তি কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল তবু তাঁরা ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। কাজেই শের শাহ এবার রাজপুত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। একে একে তিনি মালব (১৫৪২ খ্রিঃ), মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ও রণথম্ভর (১৫৪৩ খ্রিঃ) অধিকার করে গোয়ালিয়র জয় করেন। মধ্যভারতের রায়সেন দুর্গটিও তাঁর হস্তগত হয়। এইভাবে শেরশাহ আজমীর থেকে আবু পর্যন্ত ভূভাগ অধিকার করলেন।

রাজস্থান অভিযান শেষ করে শের শাহ মধ্যভারতের কালিঞ্জর আক্রমণ করেন (১৫৪৪ খ্রিঃ); কিন্তু একবছর চেষ্টা করেও দুর্গটি জয় করতে পারেননি। অবশেষে কামানের গোলায় দুর্গটিকে ধ্বংস করার সময় বারুদের বিস্ফোরণের আগুনে শেরশাহ মৃত্যু বরণ করেন (১৫৪৫ খ্রিঃ)। শের শাহের মরদেহ তার কৈশোর-যৌবনের লীলাভূমি সাসারামে সমাধিস্থ করা হলো।

৬। শেরশাহের শাসনব্যবস্থা

শের শাহ মাত্র পাঁচ বছর (১৫৪০-৪৫ খ্রিঃ) দিল্লির সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। এই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি যে শাসনদক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, সম্রাট আকবরের পূর্বে কোনও

সুলতানই তেমনটি দেখাতে সক্ষম হননি। আফগান শাসকদের মধ্যে তিনি যে প্রশাসনিক ও সামরিক প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। শাসন প্রসঙ্গে শের শাহের কতকগুলি মৌলিক নীতি ছিল — যা সমকালীন শাসকদের থেকে শেরশাহকে উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, যেমন, (ক), সমসাময়িক শাসকদের মত শের শাহ ছিলেন স্বৈরশাসক। কিন্তু তাঁর স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে যোগ হয়েছিল দক্ষতা ও জনকল্যাণমূলক শাসন পরিচালনার আগ্রহ। তিনি নিজেকে জনগণের 'অভিভাবক' বা 'পালক' (guardian of the people) হিসেবে মনে করতেন। জনগণের ইচ্ছাকে তিনি মর্যাদা দিতেন। এ জন্যে তিনি দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করতেন। (খ), হিন্দু-মুসলমান প্রজাবর্গের প্রতি সমদৃষ্টি ছিল শের শাহের শাসননীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সামরিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি কোথাও কোথাও জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। যেমন, মেবার ও রায়সেন দুর্গ অধিকারের সময় এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু নিত্যকার শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি হিন্দুদের প্রতি সহনশীল নীতি অনুসরণ করতেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বহাল থাকলেও তিনি হিন্দুদের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উলেমাদের প্রভাবাধীন হননি। বরং তার আমলে জিজিয়া কর ছিল অকৃষি কর হিসেবে গণ্য। তিনি নিজে সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম হয়েও ব্রহ্মাজিৎ গৌড়কে প্রধান সেনাপতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মোট কথা, শেরশাহ ছিলেন মধ্যপন্থী ও ধর্মসহিষ্ণু। ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁকে উদার পথ অনুসরণ করতে প্রেরণা জাগিয়েছিল। তাঁর শাসনতন্ত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির স্থান পায়নি।

কেন্দ্রীয় শাসন ঃ শের শাহের রাজতন্ত্র ছিল সার্বভৌমিক ক্ষমতাভিত্তিক কেন্দ্রীয় শাসনতান্ত্রিক রাজ্য। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম হিন্দু-মুসলিম প্রজাবর্গের প্রতি সমদৃষ্টি রেখে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করেন। যার শাসনে উলেমা ও অভিজাতদের সমক্ষমতার দাবি ছিল না। তিনি ছিলেন একাধারে প্রধান শাসক, প্রধান বিচারক এবং প্রধান সেনানায়ক। কঠোর পরিশ্রমী হিসেবে শের শাহ — শাসনব্যবস্থার প্রতিটি বিষয় প্রায় নিজেই দেখতেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তবুও নিজের কাজের সুবিধার্থে একাধিক প্রধান মন্ত্রী বা উজীর নিযুক্ত করেন, যেমন— (১) দেওয়ান-ই-গুজারাত (রাজস্ব মন্ত্রী), (২) দেওয়ান-ই আরিজ (সামরিক বিভাগীয় মন্ত্রী), (৩) দেওয়ান-ই রিসালাত (পররাষ্ট্রীয় মন্ত্রী), (৪) দেওয়ান-ই-ইনসা (লিখন ও দলিল বিভাগীয় মন্ত্রী), (৫) খান-ই-সামান (তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রী), (৬) দেওয়ান-ই-কাজা (প্রধান কাজী), (৭) বারিদ-ই-মুমালিক (গুপ্তচর বিভাগের প্রধান) প্রভৃতি। প্রত্যেক মন্ত্রীই শের শাহের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য ছিল। শাসনতন্ত্রের এই কেন্দ্রীয় কাঠামোই ছিল সকল বিভাগের শীর্ষে।

প্রদেশ বা সরকার, পরগণা ও গ্রামীণ শাসন ঃ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে শের শাহ অন্যান্য অংশের শাসনের সুবিধার্থে সমগ্র সাম্রাজ্যটিকে ৪৭টি সরকার বা প্রদেশে, প্রতিটি প্রদেশ কতকগুলি পরগণায় এবং পরগণাগুলি আবার গ্রামে বিভক্ত করেন। শের শাহের পরগণা ছিল শাসনব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। 'সরকার' বা প্রদেশের শাসনকর্তারা ছিলেন কেন্দ্রের সঙ্গে

পরগণার যোগাযোগ রক্ষাকারী তত্ত্বাবধায়ক। প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন সিকদার-ই-সিকদারান এবং একজন মুন্সেফ-ই-মুন্সেফান। তারা পরগণার যাবতীয় কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রতিটি পরগণায় একজন আমিন, একজন সিকদার, একজন খাজাঞ্চি (Treasurer) এবং দু'জন (একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান) হিসাব লেখক থাকতেন। আমিন এবং সিকদার ছিলেন যথাক্রমে বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারী। পরগণার রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় দেখাশুনা করতেন আমিন আর পরগণার মধ্যে সুলতানি নির্দেশ বলবৎ করার ব্যবস্থা করতেন সিকদার।

কর্মচারী ও বদলি নীতি ঃ উক্ত কর্মচারী ছাড়াও পরগণাগুলিতে জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র হিসেবে প্রত্যেক পরগণায় পাটওয়ারী, চৌধুরী এবং মোকাদ্দম নামে কর্তাব্যক্তিরা থাকতেন। এক জায়গায় বহুদিন থেকে কর্মচারীরা যাতে স্থানীয় জনসাধারণের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে কারণে শেরশাহ্ কর্মচারীদের বদলি-প্রথা প্রবর্তন করেন। শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে শের শাহ্ গুপ্তচর নিয়োগ করেন।

রাজস্বব্যবস্থা ঃ অনেক ঐতিহাসিকের মতে শের শাহের রাজস্বব্যবস্থা ছিল বিজ্ঞানসম্মত। তিনি প্রথমে প্রজাদের জমি জরিপ করে তার সীমানা নির্দিষ্ট করে দেন এবং পরে উর্বরতার ভিত্তিতে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ ছিল রাজস্বের পরিমাণ। এই রাজস্ব সামগ্রী অথবা অর্থের মাধ্যমে প্রদান করা যেত। রাজস্ব আদায়ের জন্যে আমিন, মোকাদ্দম, কানুনগো, পাটওয়ারী প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করা হত। খাজনা আদায়ের সময় নিয়মের ব্যতিক্রম যাতে না হয় এবং খাজনা নির্ধারণের সময় উদারতা অবলম্বন করার জন্য শেরশাহ্ কর্মচারীদের নির্দেশ দিতেন। শেরশাহ জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রদানের রীতি চালু করেছিলেন। এই রীতি অনুসারে জমির সীমানা সত্ব প্রভৃতি উল্লেখ করে সরকার প্রজাকে পাট্টা নামক একটি দলিল প্রদান করতেন এবং প্রজারা তাদের কর্তব্য, সত্ব ও খাজনার পরিমাণ উল্লেখ করে কবুলিয়ত নামক দলিল সরকারকে প্রদান করত। শেরশাহ্ জায়গির প্রথার পরিবর্তে নগদ বেতন প্রদানের প্রথা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। জায়গির প্রথার মধ্যে ছিল বিশেষ বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। তাই তিনি এটিকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে এ বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ করতে পারেননি।

পুলিশী ব্যবস্থা ঃ শের শাহের শান্তিরক্ষা-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলা যায়, বাস্তবক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার জন্য তিনি পৃথক কোনও পুলিশী ব্যবস্থা করেননি। শান্তিরক্ষার মৌলিক দায়িত্ব ছিল সেনাবিভাগের উপর। সরকার বা পরগণায় সিকদার, অঞ্চলে মোকদ্দাম, নগর বা দুর্গে দস্যু, তস্কর, খুনী বা অপরাধীদের দমন করতেন কোতোয়াল। যাদের উপর অপরাধ দমনের বা দস্যু তস্কর ধরার দায়িত্ব দেওয়া থাকত তারা তাদের কর্মে অবহেলা করলে বা অক্ষম হলে কর্মচারিকেই শাস্তি দেওয়া হত। এ ব্যবস্থা অনেকখানি আদিম পন্থী (Primitive) হলেও শেরশাহ এই ব্যবস্থায় দক্ষতা আরোপ করেছিলেন। তাই তাঁর রাজত্বে আশ্চর্যজনকভাবে

অপরাধ নির্ধারিত হয়। শান্তিরক্ষা ও অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি কোনও ভেদাভেদ ছিল না।

বিচারব্যবস্থা ঃ বিচারের ক্ষেত্রেও শের শাহ্ নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। এক্ষেত্রেও ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না। পরগণায় দেওয়ানি বিচার পরিচালনায় ছিলেন আমিন এবং ফৌজদারী বিচার পরিচালনায় কাজি ও মির-ই-আদাক নামক কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। তবে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরগণার দেওয়ানি বিচারের উচ্চতম বিচারক ছিলেন মুন্সেফ-ই-মুন্সেফান। রাজধানীর বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রধান কাজি ও সদর। কিন্তু বিচারব্যবস্থায় সর্বোচ্চে ছিলেন শেরশাহ্ স্বয়ং। প্রতি শুক্রবার নামাজের পর তিনি স্বয়ং মসনদে বসে বিচার করতেন। বিচার বিষয়ক শেষ কথা বলার, শেষ নির্দেশ দানের একমাত্র অধিকার ছিল সুলতানের। তবে শেরশাহ্ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ বিচারক।

সামরিক সংস্কার ঃ সমর বিজয়ী শেরশাহ্ সামরিক বিভাগের সংস্কার সাধন করেন। সামরিক নীতি হিসেবে তিনি আলাউদ্দিন খলজীর অনুগামী ছিলেন। শের শাহ্ ভুলে যাননি যে তাঁর যুগে রাজশক্তির উৎস ছিল সামরিক শক্তি। তাই তিনি রাজকীয় বাহিনীকে সুসংগঠিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। দেড়লক্ষ অশ্বারোহী, পঁয়ত্রিশ হাজার পদাতিক এবং তিনশো হস্তী নিয়ে শেরশাহের রাজকীয় বাহিনী সংগঠিত ছিল। তিনি সামরিক বিভাগে কঠোর শৃঙ্খলা বিধান করেন। সৈন্য নিয়োগের সময় তিনি যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগের চেষ্টা করতেন। রাজকীয় অশ্বগুলিকে মোহরাঙ্কিত করা, সৈনিকদের নাম-ঠিকানা ও পিতৃপরিচয়ের তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাদের স্থায়ী চিহ্নের বিবরণও নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজকীয় বাহিনী ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে শেরশাহ্ সেখানে স্থায়ী সৈন্য রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। সৈন্যবাহিনী যাতে বেসামরিক জনগণের জীবনযাত্রায় কোনও ক্ষতি না করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

জনহিতকর কার্যাবলী ঃ শেরশাহের জনহিতকর কার্যাবলী ছিল শাসনপদ্ধতির উল্লেখযোগ্য অংশ। সামরিক প্রয়োজন এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে শেরশাহ যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির উপর গুরুত্ব দেন। তিনি যাতায়াতের সুবিধার্থে পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁ থেকে পশ্চিমে সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মাইল দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে এটি গ্রান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। এছাড়া আগ্রা থেকে যোধপুর, আগ্রা থেকে বুরহানপুর, যোধপুর থেকে চিতোর এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত আরও কয়েকটি রাজপথ নির্মাণ করেন। তিনি এইসব রাজপথের দুধারে বৃক্ষরোপণ এবং হিন্দু ও মুসলমানের উদ্দেশ্যে পৃথক বিশ্রামাগার স্থাপন করেন—এগুলিকে বলা হত সরাইখানা। সরাইখানা শুধু পথিকদের বিশ্রামের সুযোগ সৃষ্টি করত তা নয়, সরাইখানা ছিল সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্থল। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য শেরশাহ ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করেন। ডাকবাহী অশ্বারোহীরা এই সরাইখানায় ডাক

বিনিময় করত। কালক্রমে সরাইখানাগুলির নিকট বাজার গড়ে ওঠে এবং এগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। শেরশাহ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ণ প্রসঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠিয়ে দেন। এসবের ফলে সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সরাইখানাগুলি নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল।

শেরশাহের কৃতিত্ব ঃ প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার ঃ জীবন সায়াহ্নে আটষট্টি বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে বসে সামান্য জায়গিরদারের পুত্র শেরশাহ সাম্রাজ্য বিস্তার ও রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে এক অসাধ্য সাধন করেছেন। সমর বিজয়ী বীর ও যোদ্ধা, বিচক্ষণ শাসক ও হৃদয়বান ব্যক্তি হিসেবে শেরশাহ শুধু সাধারণ মানুষ নয়, তাঁর পরমশত্রু মোগল শাসকগণের নিকট থেকেও অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন। তিনি ছিলেন ভারতীয়, কিন্তু অভিজাত রক্তের সঙ্গে সম্পর্কবাহী। ভারতীয় মুসলিম সুলতানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম যিনি রাজক্ষমতাকে স্বেচ্ছাচার এবং বিলাসীজীবনের উপায় হিসাবে ব্যবহার না করে রাজকর্তব্য সম্পাদনকে ক্ষমতা-ব্যবহারের মূলনীতি বলে গ্রহণ করেছিলেন। শেরশাহের ইতিহাস রচয়িতা আব্বাস শেরোয়ানীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সপ্তাহের দিনগুলি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকু সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মের ছকে বাঁধা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন এই ছকের কোনও পরিবর্তন ঘটত না।

ধর্মীয় ঔদার্য ঃ ব্যক্তিগত জীবনে শেরশাহ ছিলেন সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান। এই ধর্মের দ্বারা তিনি আবেগবশত প্রভাবিত হননি। শেরশাহের উপর উলেমাদের প্রভাব ছিল না। তবে বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শেরশাহ ধর্মকে কখনও কখনও কূটনৈতিক অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন। যেমন, রায়সেনের হিন্দুরাজা পূরন্তমলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তিনি 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করে সুন্নি সৈনিকদের মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন। বাস্তবতাবোধ এবং উচ্চাকাঙ্খা কখনও কখনও তাঁকে ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণে উৎসাহিত করত। অবশ্য সামগ্রিকভাবে বিচার করলে সমকালীন আফগানদের তুলনায় শেরশাহ ছিলেন ধর্ম-প্রসঙ্গে যথেষ্ট উদার। তাঁর সৈন্য বিভাগে বহু হিন্দু নিযুক্ত ছিল, হিন্দুর প্রজাস্বত্ত্ব আইন তাঁর শাসনে ছিল স্বীকৃত। মুদ্রায় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হত তাঁর নাম। ধর্মের কুপ্রভাব থেকে রাজনীতিকে ও শাসনব্যবস্থাকে তিনি মুক্ত রাখতে সক্ষম হন। আধুনিক চিন্তাধারায় বলা যায়, শেরশাহ ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপাতী এবং ধর্মচিন্তায় তিনি ছিলেন সমকালীন সুলতান বাদশাহদের থেকে অনেক উদার।

চরিত্র ঃ শের শাহের চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গে বাস্তবতাবোধের সমন্বয় ঘটেছিল। সামরিক প্রতিভা, অনলস অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্য সাধনে তন্ময়তা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জীবনে যে লক্ষ্য তিনি নির্ধারণ করতেন তাকে সার্থক না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হতেন না। যেমন, বিচ্ছিন্ন আফগান শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে ঐ শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে তিনি পিতা ও বিমাতার সঙ্গে বিবাদ করেছেন, একাধিক বার তিনি গৃহত্যাগ করে আবার তিনি ফিরে

এসেছেন, প্রভু- পুত্র জালাল খান লোহানীকে বিতাড়িত করেছেন, হুমায়ুনের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, রায়সেন নরপতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ইত্যাদি। উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে তিনি যে-কোন পথ অবলম্বন করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। স্বার্থসিদ্ধির উপায় নির্বাচনে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন।

প্রজাহিতৈষণা ঃ শেরশাহের শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সাম্যনীতি ও প্রজামঙ্গল। কোন সাম্রাজ্যকে স্থায়ী করতে হলে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বিক্ষুব্ধ করে রাখা চলে না— এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতবর্ষ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশ। তাই শেরশাহের জনকল্যাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। প্রজার কল্যাণ বলতে ফিরুজ শাহ তুঘলকের মত তিনি বিজয়ী মুসলিম জনতার কল্যাণকে চিন্তা করেননি। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মঙ্গলই ছিল শেরশাহের মঙ্গলধর্মী কর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যেমন, তাঁর লঙ্গরখানা ছিল সকল সম্প্রদায়ের গরীবদের জন্যে উন্মুক্ত, তাঁর রাজপথ, পথের ধারে রোপিত বৃক্ষের ছায়া ও ফল ছিল সকলের জন্যে ; হিন্দু ও মুসলমানের জন্যে ছিল পৃথক সরাইখানা, বিচারের ক্ষেত্রে কোরান ও মুসলিম আইন বলবত থাকলেও হিন্দুদের বিচার তাদের শাস্ত্রানুযায়ী পরিচালিত হত। গ্রাম পঞ্চায়েতে ছিল হিন্দুদের প্রাধান্য। সামরিক বিভাগে হিন্দু নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি। যুদ্ধের সময় কখনও কখনও তিনি নির্মমতার পরিচয় দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব বিচারের সেটাই বড়ো কথা নয়। বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রকৃত প্রতিভাবান এই নরপতির গুণাবলী এত সূক্ষ্ম যে, সামান্য দোষ তাতে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে।

শের শাহের আমলে জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা ইত্যাদি আধুনিক ধারণার বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু শেরশাহের আদর্শ, কর্মধারা, বিশেষ করে শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে এসব বাঞ্ছনীয় নীতির আভাস পাওয়া যায়। তাই তার পরম শত্রু মোগলরাও শেরশাহের বহু সংস্কার গ্রহণ করেছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে মহান সম্রাট আকবরও তাঁর বহু সংস্কারের জন্যে শেরশাহের নিকট ঋণী ছিলেন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম আরস্কাইন লিখেছেন "আকবরের পূর্বে আইন-প্রণেতা ও প্রজাদের অভিভাবকরূপে শেরশাহ ছিলেন যে-কোন শাসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ ঐতিহাসিক 'কীন'-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : "কোন শাসক এমনকি ইংরেজরা পর্যন্ত এই পাঠানের ন্যায় বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে পারেননি।" ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেছেন, "শেরশাহকে বাদ দিলে ভারতের ইতিহাসে মহান মোগলদের আবির্ভাব সম্ভব হত না।" আধুনিক যুগের অন্যতম ভারতীয় ঐতিহাসিক ডঃ কালিকিংকর দত্ত মন্তব্য করেছেন : "প্রকৃতপক্ষে তাঁর (শেরশাহের) রাজত্বের নিহিত তাৎপর্য এই ছিল যে, ভারতবর্ষে একটি জাতীয় শাসনব্যবস্থা রচনার জন্যে যে সকল গুণাবলীর প্রয়োজন তার সবগুলিই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং একাধিক দিক দিয়ে তিনি আকবরের গৌরবময় শাসনকালের পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন।"

অবশেষে বলা যায়, শেরশাহের পরিকল্পিত রাজস্বব্যবস্থা, কবুলিয়ত-পাট্টা, ডাক-ব্যবস্থা, দাগ ও হুলিয়া প্রথা, ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে জনকল্যাণকর শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি মোগলসম্রাট আকবরের যুগে পরিপূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সম্রাট আকবরের পূর্বসূরী হিসেবে শেরশাহের কৃতিত্ব ও অবদানকে কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না।[১]

৭। শেরশাহের উত্তরাধিকারীগণ

শেষ বয়সে শেরশাহ্ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমীরগণ শেরশাহের কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খানকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তখন থেকে জালাল খান 'ইসলাম শাহ' নামে পরিচিতি লাভ করেন। অবশ্য জালাল খান অর্থাৎ ইসলাম শাহ্ অতীতে পিতা শেরশাহের সঙ্গে প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে সহযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ যোদ্ধা।

সিংহাসারোহণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শেরশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খানের সঙ্গে কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খান তথা ইসলাম শাহের বিরোধ ঘনীভূত হলো। অভিজাতদের একটি অংশ আদিল খানের সমর্থক ছিলেন। তা সত্ত্বেও আদিল খান কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইসলাম শাহের সঙ্গে সন্ধি করেন। এর ফলে আমীরদের সঙ্গে ইসলাম শাহের প্রকাশ্য বিবাদ শুরু হলো। ইসলাম শাহ্ বিদ্রোহী আমীরদের অনেককেই হত্যা করলেন। অনেকে ক্ষমা ভিক্ষা করে জীবিত রইলেন। এরপর ইসলাম শাহ্ অনুগত অভিজাতদের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন।

ইসলাম শাহের আমলে শেরশাহের শাসন-পদ্ধতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। যে-সব নতুন ব্যবস্থা ও নির্দেশ প্রবর্তিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(ক), আমীরদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাদের হস্তী পোষা, স্বগৃহে নর্তকী পোষা, লালবর্ণের পতাকা ব্যবহার নিষিদ্ধ হলো। (খ), প্রতি শুক্রবার প্রত্যেক সরকারে বা প্রদেশে অনুষ্ঠিত দরবারে সকল কর্মচারীর উপস্থিতি এবং সুলতানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হলো। (গ), ইসলাম শাহ্ তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে নিয়ে দশমিকের ভিত্তিতে ইউনিট গঠন করেন। প্রত্যেক সৈন্যদলে ৫০, ৫০০, ৫০০০, ১০,০০০ এমনকি ২০,০০০ পর্যন্ত সৈন্য থাকত। প্রতিটি ইউনিট উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হলো। পরবর্তীকালে সম্রাট আকবর সম্ভবত এরূপ ইউনিটের উপর ভিত্তি করেই মনসবদারি প্রথা প্রবর্তন করেন।

ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম শাহ্ ছিলেন ভদ্র ও মার্জিতরুচিসম্পন্ন। তিনি জ্ঞানীগুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হিন্দুদের প্রতিও তিনি উদার ছিলেন। তিনি শেরশাহের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে মোটামুটি সমর্থ হন। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর বার বছর বয়স্ক পুত্র ফিরুজ সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনদিন পর শের শাহের ভ্রাতা নিজামখানের পুত্র মুবারিজ খান এই শিশু-সুলতানকে হত্যা

১। শেরশাহের কৃতিত্ব সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য কালিকারঞ্জন কানুনগো-র 'শেরশাহ' এবং আর পি ত্রিপাঠী, 'সাম অ্যাসপেক্টস্ অফ মুসলিম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' দ্রষ্টব্য।

করে সিংহাসন লাভ করেন। এই সময় মুবারিজ খানের নাম হল "মহম্মদ আদিল শাহ"। তিনি ছিলেন বিলাসপ্রিয়, হীনচরিত্র ও অকর্মণ্য। ফলে অল্পদিনের মধ্যে ষড়যন্ত্র ও সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত শের শাহের সাম্রাজ্য পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে পাঁচটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হল এবং এদের প্রত্যেকেই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘাতে লিপ্ত হলো। এই সুযোগে হুমায়ুন পারসিক সম্রাটের সাহায্য নিয়ে কাবুল থেকে ভারতে আসেন ও ভারতে পুনরায় মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

৮। হুমায়ুন কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার

পারস্যের সম্রাট শাহ তাহমাস্প-এর সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর হুমায়ুন ভারতে তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হন। ভুললে চলবে না, পারস্যরাজ সৈন্য এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। প্রথমেই হুমায়ুন কাবুল এবং কান্দাহার জয় করেন (১৫৫৪ খিঃ)। পারস্য সম্রাটের সঙ্গে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কান্দাহার তিনি পারস্যের শাহকে অর্পণ করেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে শাহ তাহমাস্প-এর মৃত্যু হলে হুমায়ুন কান্দাহার আবার দখল করে নেন।

কাবুল কান্দাহার জয় করবার সময় হুমায়ুন রাজনৈতিক শত্রুবিনাশ করতে কঠোরতা অবলম্বন করেন। পরাজিত ভ্রাতা কামরানের চক্ষু উৎপাটন করে তাকে মক্কায় পাঠানো হয়। আর এক ভাই আসকারীকেও মক্কায় প্রেরণ করা হয়। অপর ভাই হিন্দাল এক অতর্কিত আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন। এইভাবে হুমায়ুন ভ্রাতৃকণ্টক থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। ইতোমধ্যে সুলতান শের শাহের মৃত্যুর ফলে (১৫৪৫ খ্রিঃ) দিল্লিতে তার অকর্মণ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে শূর বংশের দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করল। পাঠানদের (আফগান) মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগ নিয়ে হুমায়ুন প্রথমে লাহোর জয় করে নেন (১৫৫৫ খ্রিঃ)। শেষপর্যন্ত শূর বংশীয় আফগান শাসক সিকন্দর শূরকে পরাজিত করে হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্য (পাঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রা সমেত) পুনরুদ্ধার করলেন (১৫৫৫ খ্রিঃ)। এভাবে হৃত মোগল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ পুনরায় উদ্ধার করে ভারতে মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠা হুমায়ুনের কৃতিত্ব। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ঘটনার দশ মাস পরেই হুমায়ুন দিল্লির দুর্গ বর্তমান পুরানাকিল্লার পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে অকস্মাৎ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন (১৫৫৬ খ্রিঃ)।[১]

হুমায়ুনের কৃতিত্ব বিচার ঃ সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিচারে হুমায়ুন ছিলেন অনন্য। পিতা, মাতা, গুরুজনদের তিনি যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা জানাতেন। জীবনের প্রথম থেকে শেষাবধি তিনি পিতার নির্দেশ পালন করেছিলেন। একমাত্র বাদকশান থেকে তিনি পিতার অনুমতি না নিয়েই ভারতে ফিরে এসেছিলেন। এই জন্য অবশ্য তিনি নিজে দুঃখও পেয়েছিলেন। পিতার অনুমতিক্রমে তিনি ভ্রাতা কামরান, আসকারী ও হিন্দালকে রাজ্যখণ্ড প্রদান করেন। জ্ঞাতিভাই কয়েকজন অভিজাত মির্জাকে ক্ষমা করে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ

১। হুমায়ুন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ ও অধ্যাপক সুকুমার রায়ের হুমায়ুন বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ।

করেন। বাবরের ন্যায় হুমায়ুনও সৈনিক, কর্মচারী ও অনুচরবর্গের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুপ্রীতি ছিল হুমায়ুনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ধর্মে সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও হুমায়ুনের কোনও গোঁড়ামি ছিল না। দরবেশ-ফকিরদের সঙ্গে তিনি ধর্মালোচনা করতে ভালবাসতেন। অপরিচ্ছন্ন পোষাকে তিনি কখনো আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতেন না। তাঁর পিতা সুন্নি হলেও তাঁর পত্নী হামিদাবানু, বন্ধু ও ভগ্নীপতি বৈরাম খাঁ, আশ্রয়দাতা পারস্যের সুলতান ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। কখনও কখনও তিনি শিয়াদের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। তিনি কখনই হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। তবে তাদের উপর অতীতের ধার্য কর (তীর্থকর, জিজিয়াকর) তিনি আদায় করতেন। ভারতে পারস্যে শিয়া সম্প্রদায়দের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন।

শাসক হিসেবে হুমায়ুন মোটেই কৃতকার্য হতে পারেননি। ১৫৩০-১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছর এবং জীবনের শেষ পর্বে ১৫৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র দশ মাস ভারতের বিজিত অংশ শাসন করেন। এই বছরগুলিতে হুমায়ুন সর্বদা যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পান নি। সমকালীন শেরশাহের মত তিনি মোটেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, উৎসাহী ও বুদ্ধিমান শাসক ছিলেন না। শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছরে এমন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন যে সেই শাসন কাঠামো এক অনুকরণযোগ্য আদর্শস্থানীয় শাসনব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়।

পিতার ন্যায় হুমায়ুনও ছিলেন বিদ্বান-বিদ্যোৎসাহী ও জ্ঞানীগুণীদের পৃষ্ঠপোষক। মুসলিম দর্শন, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর এত বিশ্বাস ছিল যে, সপ্তাহের সাত দিন তিনি গ্রহ-নক্ষত্র অনুসারে সাত রঙের বস্ত্র পরিধান করতেন। রক্তবর্ণ ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় রং। শুক্রগ্রহের জন্যে তিনি শুক্রবার রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিধান করতেন। তাঁর পাঠাগারে থাকত নানা প্রকারের ও নানা বিষয়ের গ্রন্থ। ঐ পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে হুমায়ুনের বদান্যতা, ভ্রাতৃবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি অহিফেনভক্ত হুমায়ুনের বিলাস-ব্যসন, অস্থিরমতিত্ব, ধৈর্য ও নিষ্ঠার অভাব ছিল অত্যধিক। যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলা যায়, তিনি মাঝে মাঝে সঠিক কর্তব্য নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি বিফলকাম হতেন। তাই ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুলের মতে, জীবনে বহুবার তাঁর পদস্খলন হয়েছিল, আর জীবনের শেষ দিনের পদস্খলনেই, তার মৃত্যু হলো। তবুও তিনি ছিলেন ভাগ্যবান— যা 'হুমায়ুন' শব্দের প্রকৃতঅর্থ। কারণ তিনি ছিলেন বাবরের পুত্র এবং মহান আকবরের পিতা।

অধ্যায় ২

আকবর এবং মোগল সাম্রাজ্যের বিকাশ

***Syllabus :** Akbar and the consolidation of the Mughal Empire.*

১। আকবরের সিংহাসন লাভ

আকবরের প্রথম জীবন ঃ কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রিঃ) পরাজিত হুমায়ুন রাজ্যহীন, সহায়-সম্বলহীন, দারুণ দুর্দশার মধ্যে প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করেন সিন্ধুদেশের অমরকোটে রাণা বীরশালের গৃহে। তখন হুমায়ুনের পত্নী হামিদাবাণু বেগম আসন্নপ্রসবা ছিলেন। অমরকোটেই হিন্দুর গৃহে ভূমিষ্ঠ হলেন আকবর (১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর)। দুগ্ধপোষ্য শিশু আকবরকে রক্ষা করতে হুমায়ুনকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। অমরকোটের বীরশালের সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায় হুমায়ুন সিন্ধু ত্যাগ করে কান্দাহারে ভাই আসকারীর নিকট সাহায্যার্থে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আসকারী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন জেনেই হুমায়ুন তাঁর স্ত্রী হামিদাবাণুকে নিয়ে পারস্যের সুলতান শাহ তাহমাস্প-এর নিকট উপস্থিত হলেন। এই সময় শিশু আকবরকে লালন-পালন করলেন ভ্রাতা আসকারীর পত্নী। অন্যদিকে পারস্যের সামরিক সাহায্য নিয়ে হুমায়ুন ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহার দখল করেন ও পুত্র আকবরকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন। কান্দাহারের পর হুমায়ুন কামরাণকে পরাজিত করে কাবুল অধিকার করেন। তখন আকবরের বয়স তিন বছর।

আকবরের বাল্য শিক্ষা ঃ এরপর হুমায়ুন মাহাম আনাগা নাম্নী এক বুদ্ধিমতী নারীকে আকবরের ধাত্রী নিয়োগ করলেন। চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে তার 'মক্তব' বা শিক্ষারম্ভ হলো। অবিলম্বে আকবরের শিক্ষার জন্য পীর মহম্মদকে নিয়োগ করা হলো। তবে গতানুগতিক শিক্ষা অপেক্ষা মধ্য এশিয়ার রীতি অনুসারে অশ্বচালনা, শিকার, তীর-ধনুক চালনা, খেলাধূলা ইত্যাদিতে তাঁর মনোযোগ ছিল বেশি। তাছাড়া তাঁর হস্তলিপি ছিল খুবই সুন্দর।

আকবরের বয়স যখন নয় বছর তখন অকস্মাৎ হুমায়ুনের ভ্রাতা হিন্দালের মৃত্যু হয় (১৫৫১ খ্রিঃ)। সঙ্গে সঙ্গে নাবালক আকবরকেই দেওয়া হলো গজনীর শাসনভার। তিন বছর কাল যাবত তিনি গজনীর শাসনকর্তা ছিলেন। সরহিন্দের যুদ্ধ জয়ের (১৫৫৫ খ্রিঃ) পর নাবালক আকবরকেই লাহোরের শাসনভার দেওয়া হলো। বৈরাম খাঁ নিযুক্ত হলেন তাঁর অভিভাবক।

আকবরের সমস্যা : দিল্লি-আগ্রা অধিকারের পর হুমায়ুন যখন পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান (১৫৫৫ খ্রিঃ, ২৭শে জানুয়ারী), তখন আকবরের বয়স মাত্র তেরো বছর। এসময় পরিবারবর্গের সঙ্গে তিনি ছিলেন গুরুদাসপুরের অন্তর্গত কালনৌর দুর্গে। হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাম খাঁ আকবরকেই দিল্লির সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন এবং বৈরাম খাঁ নিজেই তাঁর অভিভাবক হিসেবে সাম্রাজ্য পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু তার সামনে এলো একাধিক জটিল সমস্যা। সংক্ষেপে সমস্যাগুলি হলো : (ক) শেরশাহের পরবর্তী দুর্বল ও অকর্মণ্য শাসকগণের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম এবং সমকালীন দুর্ভিক্ষ জনগণকে চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলেছিল। (খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আকবরের বৈমাত্র ভ্রাতা মির্জা মহম্মদ কাবুলে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। (গ) উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই শূরবংশীয় আফগান নেতাদের অধিকারভুক্ত ছিল। (ঘ) হুমায়ুনের সমকালীন মোগল আমীর ও সৈন্যধ্যক্ষগণ সবাই ছিলেন আকবরের বয়োজ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী। তাই তারা আকবরের আদেশ পালনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। (ঙ) ঠিক এই সময় দিল্লির মোগল শাসক তাড়দি বেগ সংবাদ পাঠালেন যে শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র চুনারের অধিপতি আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি (পূর্ব নাম হেমচন্দ্র) দিল্লি আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

হিমুর শক্তিবৃদ্ধি : বুদ্ধিমান হিমু ছিলেন চুনারের অধিপতি আদিল শাহের সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি আদিল শাহের শত্রু ইব্রাহিম শূর এবং বাংলার সুলতান মহম্মদ শাহকে পরাজিত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরই তিনি গোয়ালিয়র ও আগ্রা অধিকার করে দিল্লির দিকে অগ্রসর হলেন।

দিল্লির মোগল শাসনকর্তা তাড়দি বেগ হিমুর বিরুদ্ধে সামান্য যুদ্ধের পর সরহিন্দের দিকে পলায়ন করলেন। দিল্লি হিমুর অধিকারভুক্ত হলো। ঠিক এই সময় হিমুরপ্রভু আদিল শাহ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করায় তার বিরুদ্ধে আফগান নেতারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে হিমু বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

২। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬)

হিমুর পরাজয় : হিমু অর্থাৎ 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য' যখন দিল্লির সিংহাসনে, আকবর তখন ছিল বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে দিল্লি থেকে কিছু দূরে গুরুদাসপুরে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে বৈরাম খাঁ প্রথমে দিল্লি থেকে পলাতক তাড়দি বেগকে হত্যা করলেন। দ্বিতীয় স্তরে বিচ্ছিন্ন মোগল বাহিনীকে সংহত ও উৎসাহিত করে বৈরাম খাঁ ও আকবর হিমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। পানিপথের প্রান্তরে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হলো। বিক্রমাদিত্যের বাহিনীর জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে হঠাৎ একটি তীর বিক্রমাদিত্যের (হিমুর) চক্ষু বিদ্ধ করল— তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন, তাঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আহত বিক্রমাদিত্য বন্দী হলেন। আবুল ফজলের উক্তি অনুসারে বলা যায়, আকবর

মৃতপ্রায় শত্রুকে হত্যা করতে অস্বীকার করায় বৈরাম খাঁ সহস্তে বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করেন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব : পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস তথা ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অবিস্মরণীয় ঘটনা। প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবর যে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা' পনেরো বছর (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রিঃ) যাবৎ বিলুপ্ত প্রায় অবস্থায় পরিণত হয়। এই সময় আফগান শক্তি ভারতে বিস্তার লাভ করে। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের ফলে সেই আফগান শক্তি নির্মূল হলো। ভারতে পুনরায় মোগল শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ মুক্ত হলো। অবশেষে বলা যায়, নাবালক আকবরের মনে আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর দু'বছরের মধ্যে আফগান নেতাদের অনেকেই নিহত হলেন, অনেকই মৃত্যু বরণ করলেন, আবার অনেকেই বশ্যতা স্বীকার করে মোগল শক্তির পৃষ্ঠপোষক হলেন।

বৈরাম খাঁর নেতৃত্বাধীনে আকবর : নাবালক আকবর দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেও প্রকৃত শাসন পরিচালনার দায়িত্বে রইলেন তাঁর অভিভাবক বৈরাম খাঁ। বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বের আমলে (১৫৫৫-৬০ খ্রিঃ) গোয়ালিয়র, জৌনপুর, সম্বল, আজমীর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রাজনৈতিক বা অন্য কোনও ব্যাপারে সম্রাট আকবরের স্বাধীনতা ছিল না। বৈরাম খাঁ শক্তির স্বাদ পেয়ে ক্রমশঃ স্বৈরাচারী ও উদ্ধত হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আকবরের যে মানসিক রূপান্তর ঘটছে সে-সম্পর্কে বৈরাম খাঁ বিশেষ কিছু চিন্তা করেন নি। রাজশক্তি কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত শত্রু ছাড়াও আকবরের প্রতি অনুগত অনেককে তিনি কারারুদ্ধ করলেন, কাউকে বেত্রাঘাত করলেন, কাউকে পদচ্যুত করে রাজ্যময় ত্রাসের সঞ্চার সৃষ্টি করলেন। বাধ্য হয়ে আকবর বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করে মক্কা যাত্রার নির্দেশ দিলেন। বৈরাম খাঁ সেই আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পথিমধ্যে বৈরাম খাঁ এক আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন।

বৈরাম খাঁর নেতৃত্বাধীন অধীনতা ছিন্ন করেও আকবর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। বৈরাম খাঁর পতনের পর (১৫৬০ খ্রিঃ) মোগল দরবারের অধিকাংশ কাজ আকবরের ধাত্রীমাতা মাহাম আনাগা ও তাঁর পুত্র আদম খাঁর নির্দেশে পরিচালিত হত (১৫৬০-৬২ খ্রিঃ)। তাদের দু'বছরের শাসনকে ঐতিহাসিক স্মিথ তথাকথিত অন্দর মহলের বা অন্তঃপুরিকার শাসন (Peticoat Government) বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় আদম খাঁ এবং পীরমহম্মদ মালব জয় করেন। আর এর জন্যে তারা আকবরের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন মনে করেননি। মাহাম আনাগা ছিলেন পুত্রের ক্ষমতালাভের জন্যেই ব্যাকুল। একথা আকবর অনুধাবন করেছিলেন। তবে আধুনিক গবেষকরা এ কথা বিশ্বাস করেন না যে, আকবর অন্তঃপুরের উপর শাসনভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। বরং আকবর ধাত্রীমাতার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তার এবং তাঁর পুত্রের কর্মে প্রথম দিকে বাধা দিতেন না। বাস্তবত আকবর সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষমতা

নিজের হাতে রেখেছিলেন। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, **প্রথমত,** জৌনপুরের শাসনকর্তা খান জামান বিদ্রোহ করলে তিনি অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজেই সেই বিদ্রোহ দমন করেন (১৫৬১ খ্রিঃ)। **দ্বিতীয়ত,** ঐ বছরেই কাবুল থেকে আগত আমীর শামসউদ্দিনকে আকবর প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করলেন। এই শামসউদ্দিনের পত্নী জিজি আনাগা ছিলেন আকবরের অন্যতমা ধাত্রীমাতা। **তৃতীয়ত,** ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে আজমীরের বিখ্যাত সুফী পীর মঈনউদ্দিন চিশতির দরগায় যাওয়ার পথে আকবরের সঙ্গে অম্বররাজ বিহারীমলের সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হল মৈত্রীবন্ধন। বিহারীমলের কন্যা যোধাবাঈ-এর পাণিগ্রহণ করে আকবর উক্ত মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ় করলেন। **চতুর্থতঃ,** ঐ বছরেই (১৫৬২ খ্রিঃ) আকবর মাড়ওয়ারের দুর্ভেদ্য মার্থাদুর্গ জয় করেন। কিন্তু পরাজিত শত্রু ও বন্দীদের তিনি মুক্তি দিলেন। যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করাই ছিল মুসলিম বিধান। এক্ষেত্রে আকবর তাদের মুক্তি দিয়ে নতুন নজির স্থাপন করলেন।

সম্রাট আকবরের উপরোক্ত কার্যাবলী প্রমাণ করে যে, তিনি মাহাম আনাগা ও তাঁর পুত্র আদম খাঁর হাতে প্রশাসনিক সকল দায়িত্ব অর্পণ করেননি। তবে এইসব কার্যাবলী মাহাম আনাগা এবং আদম খাঁকে উত্তেজিত করেছিল। স্বল্পকাল মধ্যে আদম খাঁ আকবরের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শামসউদ্দিনকে হত্যা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকবর আদম খাঁর মৃত্যুদণ্ড দেন এবং পুত্রশোকে মাহাম আনাগা কিছু দিনের মধ্যে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। দিল্লির কুতবমিনারের অদূরে মাতাপুত্রের সমাধি সৌধ নির্মিত হলো। ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দেই আকবর স্বহস্তে যাবতীয় শাসনভার গ্রহণ করলেন। তখন আকবরের বয়স কুড়ি বছর।

৩। আকবরের রাজ্য বিস্তার

আকবরের ক্ষমতা লাভের পূর্বে রাজ্যসীমা ঃ যোদ্ধবংশের সন্তান আকবর জীবনের প্রথম থেকেই যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। বাল্যকালে তাঁর শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল সমরবিদ্যা। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর পরাজয়ে আকবর অধিকার করেছিলেন দিল্লি ও আগ্রার সামান্য ভূখণ্ড। এরপরই আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ গোয়ালিয়র ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করেন। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জৌনপুর ও সম্বল অধিকৃত হয়। বৈরাম খানের মৃত্যুর পর আদম খান মালব জয় করেন (১৫৬১-৬২ খ্রিঃ)। এছাড়া চুনার দুর্গ ও মাড়ওয়ারের মার্থা দুর্গও বিজিত হয়। আকবর নিজ হস্তে শাসনভার তুলে নেওয়ার পূর্বে এই ছিল মোগল সাম্রাজ্যের সীমা।

গণ্ডোয়ানা ও রাণী দুর্গাবতী ঃ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেই স্বাভাবিকভাবে আকবর রাজ্যজয়ে মনোযোগ দিলেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ গণ্ডোয়ানা (বর্তমান জব্বলপুর) আক্রমণ করলেন। সেখানকার রাজা বীর নারায়ণ ছিলেন নাবালক। তাই রাণীমাতা দুর্গাবতী তাঁর সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। মোগল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হলে দুর্গাবতী আত্মহত্যা করেন। বীরনারায়ণও ধৃত ও নিহত হন।

গণ্ডোয়ানার রাজপুত নারীগণ জহরব্রত উদ্‌যাপন করে সম্মান রক্ষা করেন। গণ্ডোয়ানার বৃহত্তম অংশ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করল।

সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে আকবর দুটি নীতি অবলম্বন করেন— একটি হলো যুদ্ধনীতি এবং অন্যটি মিত্রতার নীতি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন রাজপুতরা ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশ। এদেশে শক্তিশালী ও স্থায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে হিন্দু তথা রাজপুত শক্তির আনুগত্য একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি শক্তিশালী রাজপুতদের ক্ষেত্রে মিত্রতার নীতি অবলম্বন করতেন। এই সূত্র অনুসারে ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অম্বরের অধিপতি বিহারীমলের সঙ্গে যেমন রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন করেন তেমনি বিহারীমলের কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করে আকবর সেই মৈত্রীবন্ধনকে সুদৃঢ় করেন। বিহারীমলের পুত্র ভগবানদাস ও পৌত্র মানসিংহ আকবরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী পদে নিযুক্ত হন। এর পর অম্বরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রাজপুতানার অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

চিতোর আক্রমণের কারণ ও ফলাফল ঃ মোগলদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের বিরুদ্ধে ছিলেন মেবারের রাণা উদয়সিংহ। মেবারের শিশোদিয়া বংশীয় রাজাদের যেমন ছিল বংশগৌরব তেমনি ছিল দুর্জয় স্বাধীনতা-স্পৃহা। বাবর খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেছিলেন কিন্তু চিতোর অধিকার করতে সাহস করেন নি। আকবর সেই চিতোর আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কারণ, **প্রথমত**, ১৫৬৭-৬৮ খ্রিঃ মালব আক্রমণের সময় মালবরাজ বাজ বাহাদুর মেবারের রাণা উদয় সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। **দ্বিতীয়ত**, মেবার ছিল সমকালীন অন্যান্য হিন্দু রাজাদের ভরসা স্থল। যে-কোন সময় ভারতের অন্যান্য স্বাধীন রাজারা মেবারকে কেন্দ্র করেই আকবরের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হতে পারতেন। **তৃতীয়ত**, মেবারের অবস্থান ছিল আমেদাবাদ ও দিল্লির মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তাই এটি ছিল দক্ষিণ অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **চতুর্থত**, আকবরের মৈত্রী-প্রস্তাব উদয় সিংহ সগর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মানসিংহ বিশেষভাবে এই প্রসঙ্গে অপমানিত হন। সুতরাং আকবর ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কামান-বন্দুকের সাহায্যে চিতোর অবরোধ করলেন। রাজপুত সেনাপতি জয়মল ভীষণভাবে আহত হলেন। ফলে রাজপুত সৈনিকরা বিভ্রান্ত হলো, নারীরা জহরব্রতের অনুষ্ঠান করে অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিলেন। ইতোমধ্যে রাজপুত সৈনিকরা নিরাপত্তার জন্যে রাণা উদয় সিংহকে আরাবল্লীর দুর্গম দুর্গে প্রেরণ করলেন। অচিরে জয়মল নিহত হলেন। সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শিশোদিয় যুবক পত্তা সিংহ। পত্তাও যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হলেন। অধিক সংখ্যক মোগল সৈন্যের সামনে রাজপুত বাহিনী প্রাণ দিয়ে পরাজয় বরণ করল। পরদিন প্রভাতে দুর্গদ্বারে মোগল সৈন্যের শবদেহের সংখ্যা দেখে আকবর দারুণ ক্রুদ্ধ হন ও ৩০ হাজার রাজপুত হত্যা করে ক্রোধ সম্বরণ করেন। ঐতিহাসিক স্মিথ এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে আগ্রার দুর্গদ্বারেই জয়মল ও পুত্তার হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট মর্মর মূর্তি

প্রতিষ্ঠা করেন। ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী বলেন, এটাই হলো সম্রাট আকবরের ভারতীয় রূপ। মেবারের পরাজয় ঘটলেও আকবর ঐ রাষ্ট্র সম্পূর্ণ মোগল শাসনাধীনে আনতে পারেননি।

রাজপুতদের বশ্যতা স্বীকার ঃ চিতোরের পরাজয়ের অন্যান্য রাজপুত রাজারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পরপর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। যেমন, রণথম্ভর ছিল মেবারের সামন্তরাজ্য। সেখানকার রাজা সুরজন রায় ভগবান দাসের মধ্যস্থতায় আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন (১৫৬৮ খ্রিঃ)। এরপর কালিঞ্জরের রাজা রামচাঁদ আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। মাড়ওয়ারের রাজা চন্দ্রসেন, বিকানীর রাজা কল্যাণমল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন (১৫৭০ খ্রিঃ)। এইভাবে প্রায় সমগ্র রাজস্থানের উপর আকবরের প্রভাব বিস্তৃত হলো। বাকি রইল মেবার ও তার বশংবদ দু-একটি রাজ্য।

গুজরাট আক্রমণের কারণ ঃ অধিকাংশ রাজপুত রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারের পর সম্রাট আকবরের মনোবল বৃদ্ধি পেল। এবার তিনি সমুদ্র তীরবর্তী গুজরাটের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করলেন। এর পশ্চাতেও অনেকগুলি কারণ ছিল, যথা— **প্রথমত,** গুজরাট ছিল সেযুগের অন্যতম শস্যভাণ্ডার— কৃষি উৎপাদন কেন্দ্র। **দ্বিতীয়ত,** গুজরাট ছিল অন্যতম বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র। তুরস্ক, পারস্য, সিরিয়া ও ইয়োরোপীয় বণিকরা এই কেন্দ্রের মাধ্যমে সামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করত। **তৃতীয়ত,** তখনকার দিনে সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে পর্তুগীজ নাবিকরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। মুসলিম হজযাত্রীদের তারা যিশু-মাতা মেরীর চিত্রাঙ্কিত টিকিট ক্রয় করতে বাধ্য করত। ফলে আকবর গুজরাট অধিকারের প্রয়োজন অনুভব করতেন। **চতুর্থত,** গুজরাটের সুলতান তৃতীয় মুজাফ্ফর খান ছিলেন দুর্বল, অকর্মণ্য ও অপদার্থ শাসক। তাঁর আমলে ক্ষমতালোভী অভিজাতরা আত্মকলহে লিপ্ত ছিলেন। গুজরাটের আমীর ইতমদ খাঁ রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে দিল্লির বাদশাহকে আমন্ত্রণ করেন। *অবশেষে বলা যায়,* হুমায়ুন এক সময় গুজরাটের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সুতরাং গুজরাট ছিল পৈতৃক সাম্রাজ্যের একটি অংশ। এর পুনরুদ্ধার ছিল সম্রাটের একান্ত কাম্য।

গুজরাট অভিযান ঃ ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে আকবর স্বয়ং গুজরাট জয়ে অগ্রসর হন। যুদ্ধে তৃতীয় মুজাফ্ফর খান পরাজিত ও বন্দী হন। আকবর তার ধাত্রীমাতার পুত্র মির্জা আজিজ কোকাকে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় বাণিজ্যকেন্দ্র সুরাট বন্দরও বিজিত হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে আকবরের নিকট সংবাদ এল যে, গুজরাটের স্বার্থপর আমীরগণ মির্জা আজিজ কোকাকে আক্রমণ করেছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্রই অতি দ্রুতগতিতে আকবর গুজরাটে পৌঁছে শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করেন। এই সময় পর্তুগীজদের সঙ্গে আকবরের সাক্ষাৎ হয় এবং আকবরের অনুরোধক্রমে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা মোগল দরবারে আসতে থাকেন। এই ঘটনার ফলশ্রুতি ছিল সুদূর প্রসারী।

মেবার জয়ের আকাঙক্ষা ঃ ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে চিতোরের পতন হলেও আকবর সমগ্র মেবার অধিকার করতে পারেননি। চিতোর ছিল মেবারের পূর্বাংশে, তাই সমগ্র পশ্চিমাংশে উদয় সিংহের আধিপত্য ছিল। উদয় সিংহের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ পুনরায় মেবারের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। অভিষেকের সময় তিনি ঘোষণা করলেন— যতদিন না তিনি চিতোর উদ্ধার করতে পারবেন ততদিন তিনি তৃণশয্যায় শয়ন করবেন, বৃক্ষপত্রে আহার করবেন। এরূপ কঠিন প্রতিশ্রুতির বার্তা আকবরের কর্ণগোচর হলো।

হলদিঘাটের যুদ্ধ ঃ আকবর বঙ্গবিজয়ের (১৫৭৬ খ্রিঃ) এক মাসের মধ্যে সেনাপতি আসফ খাঁ এবং মানসিংহকে মেবার আক্রমণের উদ্দেশ্যে মোগল বাহিনী সহ প্রেরণ করলেন। তাঁরা বানাস নদীতীরে হলদিঘাটের প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করলেন। রাণা প্রতাপ সিংহ হঠাৎ পশ্চাত দিক থেকে আক্রমণ করে মোগল বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করলেন। কিন্তু আকবরের আগমন সংবাদে মোগলবাহিনী উৎসাহিত হয়ে প্রতাপ সিংহকে বেষ্টন করে বিপন্ন করল। এই সময় রাজপুত বীর ঝালাপতি মান্না প্রতাপের মস্তক থেকে রাজমুকুট নিজের মস্তকে ধারণ করলেন। রাণা প্রতাপ সিংহ মনে করে মোগল বাহিনী ঝালাপতিকে আক্রমণ করল। বীর ঝালাপতি যুদ্ধরত অবস্থায় প্রাণবিসর্জন দিলেন। রাজপুত বাহিনীর পরাজয়ে মেবারের বহুলাংশে মোগল অধিকার বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে রাণা প্রতাপ আরাবল্লীর গভীর অরণ্যে রাজপরিবার ও বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। মোগল বাহিনীর দ্বারা তাড়িত হয়ে বন-বনান্তরে ঘুরেছেন, তৃণশয্যায় শয়ন করেছেন; কিন্তু ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র অমর সিংহ পিতার প্রতিশ্রুতি স্মরণ রেখেছিলেন। বাস্তবত আকবর মেবার বিজয় সম্পন্ন করতে পারেন নি।

৪। বাংলা ও দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যের প্রসার

বাংলা জয় ঃ গুজরাট জয়ের পর আকবর তার স্মারক চিহ্নরূপে ফতেপুর সিক্রিতে যেমন তৈরি করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত 'বুলন্দ দরওয়াজা', তেমনি সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টি পড়ল পূর্ব ভারতের দিকে। পূর্বাঞ্চলে, শূর বংশের পতনের পর, বিহারের আফগান (পাঠান) শাসনকর্তা সুলেমান করনানী বাংলা ও উড়িষ্যা জয় করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আকবরের কাছে মৌখিক বশ্যতা স্বীকার করে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর (১৫৭২) তাঁর পুত্র দাউদ খাঁ করনানী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মোগল বশ্যতা অস্বীকার করেন। তাই গুজরাট জয়ের ঠিক পরের বছর (১৫৭৪ খ্রিঃ) আকবর স্বয়ং হাজিপুর ও পাটনার যুদ্ধে দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করেন। দায়ুদ খাঁ ঐ সময় উড়িষ্যায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন ও বাংলা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়াসী হন। কিন্তু রাজমহলের যুদ্ধে তিনি মোগল বাহিনীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন (১৫৭৬ খ্রিঃ)। তখন থেকে বাংলায় স্থায়ীভাবে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলার বারো ভুঁইয়া ঃ রাজমহলের যুদ্ধে আকবর এবং তার সেনাপতি মুনিম খাঁর দ্বারা বাংলার একাংশ অধিকৃত হলেও সমগ্র বঙ্গদেশ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দেও মোগলদের অধিকারে চলে যায়নি। ঐ সময় বাংলার পূর্বাঞ্চলে বারোজন সামন্ত-প্রভু তাদের নিজের নিজের এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন। এরা নিজেদের এলাকায় রাজস্ব আদায় করতেন। এই বারোজন সামন্তপ্রভু সাধারণত ইতিহাসে 'বারো ভুঁইয়া' নামে পরিচিত। এদের মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খান, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদাররায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, বাখরগঞ্জের কন্দর্প নারায়ণ প্রমুখ বিখ্যাত। মোগল সেনাপতি ও মনসবদারগণের বিরুদ্ধে এরা দীর্ঘকাল প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু আঞ্চলিকস্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি— ক্রমে ক্রমে সমগ্র বাংলাই মোগল অধিকারে চলে যায়। বাংলা হললো অন্যতম মোগল প্রদেশ বা সুবা। অবশ্যই এই সুবার মধ্যে বর্তমান বিহার ও উড়িষ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দাক্ষিণাত্য অভিযানের কারণ ঃ উত্তর ভারত বিজয়ের পর আকবর দক্ষিণ ভারতের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করলেন। আকবরের দক্ষিণ ভারত অভিযানের পশ্চাতে ছিল একাধিক কারণ। **প্রথমত** আকবর ছিলেন সাম্রাজ্যবিলাসী। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তারের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই পোষণ করতেন। অতীতের মৌর্য, গুপ্ত, খলজী, তুঘলক বংশীয় শক্তিশালী নরপতিরা উত্তর ভারত বিজয়ের পরই দক্ষিণ ভারত বিজয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। ঠিক একই কারণে আকবর উত্তর ভারত বিজয়ের পরই দাক্ষিণাত্য জয়ের নীতি গ্রহণ করলেন। **দ্বিতীয়ত** তুর্ক আফগান যুগের শেষভাগে দক্ষিণ ভারতের বিশাল বাহমনী রাজ্য ভেঙে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয় এবং এদের মধ্যে চারটি অংশ জোটবদ্ধ হয়ে তালিকোটার যুদ্ধে (১৫৬৫ খ্রিঃ) হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর ধ্বংস করে। এই সময় আকবর রাজপুতনা জয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তালিকোটার যুদ্ধের পর দক্ষিণ ভারতের শিয়া-সুন্নি বিবাদ চরম অরাজকতার সৃষ্টি করে। এরফলে দক্ষিণ ভারতের শক্তিসাম্য বিধ্বংস হয়। মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ করার কোনও ক্ষমতা তাদের ছিলনা। সুতরাং সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আকবরকে দক্ষিণ ভারত বিজয়ে উদ্বুদ্ধ করল। **তৃতীয়ত** এই সময় দক্ষিণ ভারতে বিদেশী পর্তুগীজদের অত্যাচার চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তারা একদিকে যেমন ভারতের সম্পদ আত্মসাৎ করত তেমনি মক্কায় হজ্জযাত্রীদের উপর অত্যাচার করত। তাছাড়া তারা ক্রমশ দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এ ঘটনা মোটেই আকবরের অভিপ্রেত ছিল না। এইসব কারণে আকবর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সংকল্প গ্রহণ করলেন।

অভিযানের সমকালে দাক্ষিণাত্যে উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল খান্দেশ, আহমদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা। দিল্লির বাদশাহ আকবর তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকারের দাবি করে দূত প্রেরণ করলেন। খান্দেশের সুলতান রাজা আলি খান আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন। কিন্তু অন্যেরা তাঁর দাবি অস্বীকার করলেন। তাই আকবর ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে

বৈরাম খাঁর পুত্র আবদার রহিম ও স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের অধিনায়কত্বে প্রেরিত মোগল বাহিনী আহমদনগর অবরোধ করলেন। তখন আহমদনগরের রাজা মুজাফফর শাহের নাবালকত্বে রাষ্ট্র শাসন করতেন রাণীমাতা চাঁদবিবি। তিনি ছিলেন ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের মধ্যে অন্যতমা। তিনি যুদ্ধের দ্বারা আহমদনগর রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করে মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। সন্ধির শর্ত হলো— (১) আহমদনগর বশ্যতা স্বীকার করবে, (২) বেরার রাজ্যাংশ মোগলদের হস্তে অর্পণ করা হবে, (৩) দিল্লিতে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠানো হবে। অল্পকাল পরে আহম্মদনগরের স্বাধীনচেতা বীরগণ মোগল আধিপত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহ করলেন। কিন্তু চাঁদ সুলতানা বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ দিলেন অথবা বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করেন। আবুল ফজলের নেতৃত্বে মোগলবাহিনী ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আহমদনগর জয় করেন। তবে আমীরদের অভ্যুত্থান স্তব্ধ হয়নি। বহুকাল আমীরগণ মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন।

আহমদনগরের ঘটনার পরই বিজাপুরের সুলতান মোগল বাহিনীর ভয়ে ভীত হয়ে আকবরের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করেন। খান্দেশের সুলতান রাজা আলি খাঁ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন (১৫৯১ খ্রিঃ) এবং আহমদনগরের বিরুদ্ধে মোগল পক্ষে যুদ্ধ করে তিনি প্রাণত্যাগ করেন (১৫৯৯ খ্রিঃ)। কিন্তু তাঁর পুত্র মীরণ বাহাদুর শাহ পিতার সিংহাসন পেয়েই মোগলদের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করেন। কাজেই এবার আকবর নিজেই খান্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর অধিকৃত হলো (১৬০১ খ্রিঃ)। কিন্তু আসিরগড় দুর্গে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। তাই এই ঘটনার ঠিক পরেই আকবর ভারতের সর্বাধিকসুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য আসিরগড় অবরোধ করলেন। এই সময় দুর্গ মধ্যে ব্যাপক মহামারী দেখা দিল। প্রায় পঁচিশ হাজার নরনারী মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ল। ঠিক এই সময় আকবরের পুত্র সেলিম বিদ্রোহ করায় আকবর যতদূর সম্ভব দ্রুত আসিরগড়ে পতন ঘটাতে তৎপর হলেন। তিনি বাহাদুর শাহকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কৌশলে বন্দী করলেন, উৎকোচ দিয়ে দুর্গের সেনাপতিকে স্ববশে আনালেন। আসিরগড় দুর্গ তার অধিকারে এল। ঐতিহাসিক স্মিথ এই ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। যাই হোক, আসিরগড় বিজয়ের পর আকবর আর কোনও রাজ্য জয় করেন নি। তিনি দাক্ষিণাত্যের আহমদনগর, বেরার ও খান্দেশকে নিয়ে একটি সুবা গঠন করেন এবং শাহজাদা দানিয়েলকে সুবাদার নিযুক্ত করেন।

৫। আকবরের শাসন সংগঠন

সম্রাট বাবর মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে মাত্র চার বছর জীবিত ছিলেন। হুমায়ুন সেই সাম্রাজ্য হারিয়ে শেষ বয়সে সামান্য অংশ উদ্ধার করতে সক্ষম হন, কিন্তু উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা প্রচলন করতে পারেন নি। এই মহান দায়িত্ব পড়েছিল সম্রাট আকবরের উপর। সম্রাট আকবর প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন, সম্প্রসারণ ও উপযুক্ত শাসন

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেন। সম্রাট আকবর যে শাসননীতির প্রচলন করেন তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মোগল শাসনের বৈশিষ্ট্য : (ক) আকবর প্রবর্তিত মোগল শাসনব্যবস্থায় নীতির সঙ্গে স্থিতির সামঞ্জস্য ছিল। তাই আকবরের শাসননীতি সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী অকর্মণ্য সম্রাটগণও স্থিতিশীল রেখেছিলেন। অতীতে এরূপ স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থার অভাব ছিল। (খ) তাঁর শাসনব্যবস্থার মূলমন্ত্র ছিল জনসাধারণের আনুগত্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা লাভ। দূরদর্শী আকবর অনুধাবন করেছিলেন যে, বাহুবলে রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু তাকে স্থিতিশীল করতে হলে শাসক-শাসিতের সম্প্রীতি ও সদ্ভাব একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি মুসলিম-অমুসলিম সকলকে সংঘবদ্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষ উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। এই নীতিতে তাঁর শাসনে শাসক শাসিতের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়েছিল। (গ) আকবর প্রবর্তিত মোগল শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুন নয়। মুসলিম বিজিত দেশগুলিতে এরূপ প্রশাসনিক পরিকাঠামো বজায় ছিল। সুলতানি শাসনের শেষ দিক থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের সুর ধ্বনিত হতে থাকে। সেই সমন্বয় আকবরের আমল থেকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ এই সময় থেকে ভারতীয় পরিবেশে আরব-পারসিক রীতি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। তাই যদুনাথ সরকার এই ধারাকে বলেছেন "Perso-Arabic System in Indian Setting"।

শাসক-শাসিতের সুসম্পর্ক ছাড়াও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল প্রজার মঙ্গলার্থে আকবরের শাসনব্যবস্থা প্রকল্পিত ও পরিচালিত হয়েছিল। আকবরের শাসনে প্রজাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদা, গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসননীতি বিঘ্নিত হয়নি। বলা যায়, উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই ছিল মোগল শাসনের দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভের মৌলিক কারণ।

মোগল শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন বাদশাহ স্বয়ং। শেষ কথাটি বলবার, শোনবার ও শেষ নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা ছিল সম্রাটের। তিনি শাসন, বিচার, আইন ও সামরিক বিভাগের চরম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অবশ্য মধ্যযুগের অন্যান্য শাসকবর্গের ন্যায় আকবরও ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। কিন্তু তার স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রিত হত তাঁর ব্যক্তিগত দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান ও জনমঙ্গলের একান্ত ইচ্ছার দ্বারা। তিনি বলতেন, সকল ব্যক্তির পক্ষে, বিশেষত রাজা বা বিশ্বপতির স্বৈরাচারী হওয়া ও প্রজাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা অত্যন্ত অন্যায়। সমকালীন মোল্লাতন্ত্র তাঁর উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সুপরামর্শ তিনি যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বাভাবিক আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করত। ফলে তাঁর শাসন হয়েছিল সুন্দর ও জনকল্যাণকর।

মোগল শাসনব্যবস্থা প্রধানত দুটি স্তরে বিভক্ত ছিল। যথা— কেন্দ্রীয় শাসন ও প্রাদেশিক শাসন।

কেন্দ্রীয় শাসন : কেন্দ্রীয় শাসনের সুবিধার্থে সম্রাট আকবর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে একটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রণাসভা গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রণাসভার সর্বোচ্চে অবস্থান করতেন ভকিল (Vakil)। সম্রাটের পরেই ছিল ভকিলের স্থান। প্রথম স্তরে আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ ছিলেন এই পদের অধিকারী। বৈরাম খার পতনের পর যারা এই পদের অধিকারী হন তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা হ্রাস পায়। সম্রাট নিজেই এই পদের দায়িত্ব পালন করতেন। শাহজাহানের সময় পর্যন্ত ভকিল পদের অস্তিত্ব বজায় ছিল।

ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ : আকবরের শাসন-ব্যবস্থায় ছটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছ'জন মন্ত্রী পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হত। যথা : (১) রাজস্ব বিভাগ— এই বিভাগের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন দেওয়ান। ইনি ছিলেন রাজস্ব ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিভাগের অধ্যক্ষ। সম্রাটের অনুমতিক্রমে তিনি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যবস্থা করতেন। রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখার দায়িত্বও ছিল এই বিভাগের। অন্যান্য কর্মচারীদের ন্যায় তিনিও একজন মনসবদার ছিলেন এবং অংশত তাকে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। (২) পারিবারিক বিভাগ— এই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন খান-ই-সামান। সম্রাটের গার্হস্থ্য বিভাগ ও ব্যক্তিগত সর্ব ব্যাপারের দায়িত্ব তাকে পালন করতে হত। যুদ্ধের সময়ও সম্রাটের যাবতীয় প্রয়োজন তাকেই মেটাতে হত। সুতরাং সম্রাটের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের এই পদে নিয়োগ করা হত। (৩) সামরিক আয়-ব্যয় ও হিসাব-রক্ষা বিভাগ— মীর বকসী ছিলেন এই বিভাগের অধ্যক্ষ। মনসবদারগণ আর্থিক হিসাব নিকাশ ও অশ্বগুলিকে যথাযথ সংরক্ষণের জন্যে তার উপর নির্ভর করতেন। নতুন সৈনিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তার হাত ছিল। (৪) বিচার বিভাগ— কাজী-উল-উজ্জারাত ছিলেন এই বিভাগের অধ্যক্ষ। বিচারক হিসেবে সম্রাটের পরেই ছিল কাজীর স্থান। তিনি ইসলামীয় বিধান অনুসারে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। (৫) নৈতিকতা বিভাগ— এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন মুহতাসিব। তিনি প্রজাদের জীবন ও ধন-সম্পত্তি বিষয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। সুলতানি আমলেও এই পদের অস্তিত্ব ছিল। তবে সে-যুগে মুসলিম প্রজাদের নিরাপত্তা রক্ষাই ছিল তাদের কর্তব্য। সম্রাট আকবরের আমল থেকে মুহতাসিব সর্বস্তরের প্রজার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। তবে মুসলমানরা কোরাণ ও শরিয়তের নীতি পালন করছে কিনা সেদিকে তারা বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। (৬) ধর্ম ও দাতব্য বিভাগ— সদর-ইস-সুদুর ছিলেন এই বিভাগের অধ্যক্ষ। এই বিভাগ ধর্মাধিষ্ঠানগুলির তদারক ও ধর্মের নামে দান করা সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করত।

অন্যান্য বিভাগ : উক্ত ছ'টি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছাড়াও কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় সচিব পর্যায়ের কর্মচারী নিয়োগ করা হত। যেমন, গোলন্দাজ বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন মীর আতিস বা দারোগা-ই-তোপখানা;

ডাক বিভাগ ও রাজকীয় সংবাদ আদান-প্রদানের দায়িত্বে ছিলেন দারোগা-ই-ডাকচৌকি; সম্রাটের সচিবের কাজ করতেন দারোগা-ই-গুসালখানা; প্রধান হিসাব রক্ষক হিসেবে ছিলেন মুস্তাফি। তাছাড়া মীরখাল, মীরবাহারী, মীর আরজ, মীর মঞ্জিল, ওয়াকিয়া নবিশ প্রমুখ কর্মচারিবৃন্দ বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন।

প্রাদেশিক শাসন ঃ প্রাদেশিক শাসনের সুবিধার্থে আকবর মোগল সাম্রাজ্যকে মোট ১৫টি সুবায় বিভক্ত করেন। সুবাগুলি হলো ঃ কাবুল, লাহোর, মুলতান, দিল্লি, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমীর, আহমেদাবাদ, মালব, বিহার, বাংলা এবং দক্ষিণ ভারতের তিনটি সুবা, যথা— আহম্মদনগর, খান্দেশ ও বেরার। প্রত্যেক সুবায় সাধারণ শাসক হিসেবে থাকতেন একজন সুবাদার-নায়েব-নাজিম। সুবাদারই ছিলেন প্রাদেশিক শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী। নিজ নিজ সুবার শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে সুবাদার সম্রাটের নিকট দায়ী থাকতেন।

সুবাদার ও দেওয়ান ঃ সুবাদাররা ছিলেন বাস্তবতঃ বাদশাহের প্রতিনিধি। সুবাদার বা নায়েব-নাজিম ভিন্ন প্রত্যেক সুবায় সম মর্যাদাসম্পন্ন একজন দেওয়ান থাকতেন। তিনি রাজস্ব এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আকবর একই ব্যক্তির হাতে অর্থ ও শাসনের দায়িত্ব দেওয়ার বিপদ অনুধাবন করেছিলেন। দেওয়ান ও সুবাদার যাতে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হন সেই ব্যবস্থা করাই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। আকবর জানতেন যে উক্ত দু'জনের মধ্যে একজনের আনুগত্য বজায় থাকলে প্রদেশ কখনও সাম্রাজ্য-বিরোধী কর্মে লিপ্ত হতে পারবে না। তবে উভয়ের বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আকবর নিজেই।

সুবা ও জেলার অন্যান্য কর্মচারী ঃ সুবা-শাসনের সুবিধার্থে আকবর প্রতিটি সুবাকে কয়েকটি সরকার বা জেলায় বিভক্ত করেন। জেলার শাসনকর্তা ছিলেন ফৌজদার। তিনি সুবাদারকে যেমন শাসনকার্যে সহায়তা করতেন তেমনি সামরিক কর্মচারী হিসেবে প্রাদেশিক সেনাবাহিনীও দেখাশুনা করতেন। সুবার সঙ্গে জেলা শাসন ছিল বিশেষভাবে অন্বিত। নগরগুলির শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্বে ছিলেন কোতোয়াল। দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচারের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে মীর আদাল ও কাজী। এছাড়া সুবার অন্যানা গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের মধ্যে ধর্ম ও দান বিভাগের সদর, রাজস্ব আদায়কারী, আমিল, হিসাব রক্ষক বিতিক্‌চি ও পোদ্দার, সংবাদ লেখক ওয়াকিয়া নবিশ এবং গুপ্তচরবিভাগীয় কর্মচারী কুকিয়া নবিশের নাম পাওয়া যায়।

শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে আকবর জেলাগুলিকে পরগণায় এবং পরগণাগুলি গ্রামে বিভক্ত করেন। পরগণার দায়িত্বে থাকতেন কানুনগো। আর গ্রামের দায়িত্বে থাকতেন মুকদ্দম ও পাটোয়ারী। এইসব কর্মচারী গ্রামের শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করতেন।

রাজস্ব-ব্যবস্থা ঃ সম্রাট আকবরের শাসন-সংস্কারের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার। সাম্রাজ্যের আয় বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি ও কেন্দ্রবিরোধী ষড়যন্ত্র দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি জায়গিরদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন। আবার এ-ব্যাপারে তিনি অনেকাংশে শেরশাহের রাজস্ব নীতি অনুসরণ করেছিলেন। সম্রাটকে এই কর্মে সর্বাধিক সাহায্য করেছিলেন বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ রাজা টোডরমল। সম্রাট তাঁর হস্তেই রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ভূমির উর্ব্বরতা অনুসারে টোডরমল জমি জরিপ ক'রে নিম্নরূপ চারটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন, যথা— (১) পোলজ— প্রতি বছর যে জমি চাষ করা হয়, (২) পরৌতি— যে জমি কিছুদিন পতিত রেখে আবার চাষ করা হয়, (৩) চাচর— যে জমি তিন-চার বছর পতিত রেখে চাষ করা হয় এবং (৪) বান্‌জর— যে জমি পাঁচ বছরের বেশি পতিত রেখে চাষ করা হয়। পোলজ ও পরৌতিকে আবার উত্তম, মধ্যম, অধম— এই তিন ভাগে ভাগ করা হলো। দশ বছরের উৎপাদন এবং সমকালীন দ্রব্যমূল্যের গড় নির্ণয় করে রাজস্ব ধার্য করার আদেশ দিয়েছিলেন আকবর।

উক্ত সূত্র অনুসারে উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ রাজস্বরূপে নির্ধারণ করা হত। শস্য অথবা তার নগদমূল্যে প্রজারা রাজস্ব প্রদান করত। রাজস্ব আদায়েরও বিশেষ পদ্ধতি ছিল। ফসল কাটার সময় প্রথমে উৎপন্ন শস্যের তালিকা প্রস্তুত করা হত। এই তালিকার উপর নির্ভর করে বিতিক্‌চি নামক কর্মচারী প্রত্যেক প্রজার রাজস্বের হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করতেন। এই পদ্ধতির নাম 'জাবতি'। এছাড়া 'গাল্লা বক্‌স' এবং 'নকস্' নামে আরও দুটি পদ্ধতি ছিল। ভারতীয় প্রাচীন পদ্ধতি গাল্লাবক্‌স নামে পরিচিত। কাশ্মীর, কাবুল, থাট্টাতে এই ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। 'নক্‌স' ছিল রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে 'জাবতি' ব্যবস্থার চলন ছিল। রাজস্ব ধার্য ও আদায় প্রসঙ্গে স্থানীয় নীতি বা প্রথাকে অবহেলা করা হত না। ফলে এ-ব্যাপারে একাধিক নীতি ও পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়।

রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে সুবাগুলিকে জেলায়, জেলাকে (বা সরকার) পরগণায় ও পরগণাকে গ্রামে বিভক্ত করা হয়। রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত কর্মচারীগণ হলেন— বিতিক্‌চি, পোদ্দার, কানুনগো, পাটওয়ারী এবং মুকদ্দম। দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাজস্ব মুকুব করা হত। আকবরের আমলে কৃষকের জমি হস্তচ্যুত হত না। ঐতিহাসিকদের মতে এযুগে প্রজাবর্গের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, কৃষকরা সুখে শান্তিতে বসবাস করত।

বিচার ব্যবস্থা ঃ শেরশাহের মত মোগল সম্রাট আকবরও ব্যক্তিনিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর আমলে যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট আইন, দণ্ডবিধি ও পৃথক আদালত কক্ষ ছিল না, তবুও তিনি নিজেই দরবার কক্ষে দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচার পরিচালনা করতেন। প্রজাবর্গের বিশেষ অভিযোগ, অধস্তন আদালত বা সুবা ও জেলান্তর থেকে প্রেরিত অভিযোগ তিনি শুনতেন ও রায় দিতেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বা কঠোর শাস্তিদানের সময় সম্রাটের অনুমোদন নিতে হত।

সম্রাটের পরেই ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান কর্মচারী সদর-ই-সুদুর। তিনি ছিলেন এই বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। বিচার বিভাগ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যক্ষ কাজী-উল-উজ্জারত। তিনি প্রধান কাজী বা প্রধান বিচারক হিসেবেও পরিগণিত হতেন। সুবা ও জেলান্তরের বিচারকদের তিনিই নিয়োগ করতেন। বিচার বিভাগের অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন কাজী, মুফতি ও মীর আদল। মুফতি কাজীকে আইনের ব্যাখ্যা দিতেন। মীর আদল বিচারের রায় লিখতেন ও প্রকাশ করতেন।

কাজীর সততার উপর সকলেই বিশ্বাস স্থাপন করতেন। তবে বিচারের নামে অনেক সময় অবিচার হত। তাই স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, মোগল যুগে 'কাজীর বিচার' নামে যা প্রচলিত ছিল তা অনেক সময় 'কাজীদের অযোগ্যতার পরিচয় বহন করত'।

প্রদেশ বা সুবার শাসনকর্তাগণ বাদশাহের অনুকরণে ফৌজদারী ও দেওয়ানি মামলার বিচার করতেন। নগরের শান্তি রক্ষার জন্যে নিযুক্ত কোতোয়াল বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের পঞ্চায়েত প্রথা বিদ্যমান ছিল। সামরিক বিভাগে বিচারের জন্য ছিলেন কাজী-উল-আসকারী নামক বিচারক।

মোগল যুগের দণ্ডবিধি ছিল কঠোর। অঙ্গচ্ছেদ ও প্রাণদণ্ডও দেওয়া হত। তবে তার জন্যে সম্রাটের অনুমোদন দরকার হত। পৃথক কারাকক্ষ না থাকলেও দীর্ঘদিনের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দুর্গে বন্দী করে রাখা হত। সাধারণ বিচারে অর্থদণ্ড বেশি দেওয়া হত। বাদী ও প্রতিবাদী মুসলিম হলে বা হিন্দু ও মুসলিম হলে কোরাণ ও হাদিসের বিধান অনুসরণ করা হত। আর বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই হিন্দু হলে হিন্দুরীতি অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে কাজী হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করতেন।[১]

৬। আকবরের রাজপুত নীতি

ভারতে মোগলদের আগমনের পূর্বেই রাজপুত শক্তির উত্থান ঘটে। খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭ খ্রিঃ) রাণা সংগ্রাম সিংহের পরাজয়ের পর যেমন রাজপুত শক্তি বিধ্বস্ত হয়নি তেমনি দক্ষিণ ভারতে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয় নগরের পরাজয়ের (১৫৬৫ খ্রিঃ) পর হিন্দুশক্তি বিনষ্ট হয়নি। আকবর লক্ষ্য করেছিলেন যে, রাজপুতরা পরাজিত হয়েও নতি স্বীকার করে না। তাছাড়া ভারত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরই দেশ। এদেশে শক্তিশালী ও স্থায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজপুত তথা হিন্দুদের আনুগত্য ও সমর্থন সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাই আকবর রাজপুতদের সম্পর্কে যুদ্ধ-নীতির পরিবর্তে মৈত্রী-নীতি অবলম্বন করলেন। দ্বিতীয়ত আকবর লক্ষ্য করেছিলেন সম্রাটের অনুচরবর্গের অধিকাংশই ছিলেন ভাগ্যান্বেষী, লোভী ও স্বার্থপর। ওমরাহ্ ও মোল্লারা ছিলেন ধর্মান্ধ ও হিন্দু-বিদ্বেষী। এরা সুযোগ পেলে তুর্কি সুলতানির ন্যায় মোগল বা বাদশাহী শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে কুণ্ঠিত হতেন

১। আকবরের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য অনিরুদ্ধ রায়, *সাম আসপেক্টস্ অফ মোগল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন*', ইক্তিয়াক কুরেশী, '*অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দা মোগলস্*' এবং আশীর্বাদিলাল শ্রীবাস্তব, '*আকবর*'। আরও দ্র. রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ এবং সতীশচন্দ্র '*মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়া*'।

না। সমকালীন রাজনীতিতে ধর্মান্ধতার পরিবর্তে উদারতার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। সম্রাট আকবরের বিশ্বাস ছিল যে, রাজপুত ও হিন্দুমৈত্রী মুসলিম অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আকবর রাজপুত ও হিন্দুমৈত্রীর মধ্যে সঠিক নিরাপত্তার সন্ধান পেয়েছিলেন।

তাই আকবর নানাভাবে হিন্দু তথা রাজপুতদের সহানুভূতি অর্জনে তৎপর হলেন। **প্রথমত**, ছিল বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মিত্রতা স্থাপন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেন (১৫৬২ খ্রিঃ)। **দ্বিতীয়ত**, উচ্চপদে নিয়োগের মাধ্যমে তিনি রাজপুতদের সহানুভূতি অর্জন করলেন। ভগবানদাসের পালিত পুত্র মানসিংহ ছিলেন তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি ও বহুযুদ্ধের নায়ক। দীর্ঘকাল তিনি বাংলার সুবাদারও ছিলেন। রাজা টোডরমল ছিলেন আকবরের রাজস্বসচিব এবং প্রথম পাঁচ হাজারী ও পরে সাত হাজারী মনসবদার।

১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে আকবর আজমির শরিফে খাজা মইনউদ্দিন চিশতির দরগায় যাওয়ার পথে অম্বরের (জয়পুর) রাজা বিহারীমল তার বশ্যতা স্বীকার করেন। অম্বররাজ মেওয়াটের শরিফউদ্দিনের আক্রমণে বিব্রত ছিলেন এবং মোগল বন্ধুত্ব কামনা করেছিলেন। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে রাজা বিহারীমল স্বেচ্ছায় আকবরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব দেন। বিহারীমলের এই কন্যার নাম জানা যায় না। অবশ্য তিনি যোধপুরী বেগম নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকগণ এই বৈবাহিক সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদের ভাষায় : "This marriage is an important event in our country's history. It healed strife and bitterness and produced an atmosphere of harmony and good will".[১] এই সৌহার্দ্যের ফল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ বেণী প্রসাদ লিখেছেন, "It symbolised the dawn of a new era in Indian politics ; it gave the country a line of remarkable sovereigns ; it secured to four generations of Mughal emperors the services of some of the greatest chieftains and diplomats that medieval India produced."

মনে রাখা দরকার, বিহারীমলের পুত্র ভগবানদাস এবং পৌত্র মান সিংহ মোগল শাসক শ্রেণীতে উচ্চ পদে আসীন হন। আকবর এবং যোধপুরী বেগমের পুত্রই উত্তরকালের সেলিম বা জাহাঙ্গীর। আবার আকবর জাহাঙ্গীরের সঙ্গেও বিবাহ দিয়েছিলেন রাজা ভগবানদাসের কন্যা ও মানসিংহের ভগিনী যোধাবাঈ-এর। এছাড়া বিকানীরের রাজা কল্যাণমলের পুত্র রাই সিংও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কল্যাণমলের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আকবর বিবাহ করেন। একইভাবে জয়সলমীরের রাজা হররাই তার কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন আকবরের সঙ্গে। যোধপুরের রাজা চন্দ্রসেনও আকবরের বশ্যতা মেনে নেন। বস্তুত মেবার ছাড়া

রাজপুতদের সব রাজ্যই হয় স্বেচ্ছায়, নয়তো ভয়ে বা পরাজিত হয়ে মোগল বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র লিখেছেন যে, "হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় লইয়া গঠিত এক মিশ্র শাসক গোষ্ঠী সংগঠনের লক্ষ্যবস্তুর দিকে এই রাজপুত মৈত্রী একটি সুদূরপ্রসারী ও অর্থবহ পদক্ষেপ।" বস্তুত আকবরের রাজপুত নীতিতে যেমন তাঁর দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়, তেমনি মোগলদের সঙ্গে মৈত্রী রাজপুতদেরও যোগ্যতা প্রমাণ করার ও পদোন্নতির সুযোগ এনে দিয়েছিল; যা অন্যত্র পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। রাজপুতনার বাইরেও রাজপুতগণ ঐ সময় থেকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অধ্যাপক ঈশ্বরীপ্রসাদ লিখেছেন : "Akbar's policy towards the Rajputs originated in ambition but it was more generous and humane than that of other Muslim rulers". রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী মোগল রাজনীতির এক ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে গণ্য করা যায়।

রাজপুত নীতির ফল ঃ রাজপুতদের সঙ্গে এরূপ সৌহার্দ্যের ফলে রাজপুতনার মাড়োয়ার, বিকানীর, জয়সলমীর, বুদি, কোটা প্রভৃতি রাজ্য তাঁর আনুগত্য স্বীকার করল। পরবর্তীকালে মোগল পরিবারে অনেকেই কন্যা সম্প্রদান করে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করলেন। আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারে রাজপুত শক্তি যথার্থই কার্যকরী ভূমিকা পালন করল। গোঁড়া মুসলিমদের মোগল-বিরোধী কার্যকলাপে রাজপুতরাই আকবরের পরম সহায়ক হলো। মেবারের রানা উদয়সিংহ এবং তাঁর পুত্র বীর প্রতাপসিংহের সঙ্গে মোগল সংগ্রামে রাজপুত বাহিনী ছিল পরমসহায়ক। রাজপুত কবিরা রাণা প্রতাপের মোগল বিরোধী সংগ্রামকে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম বলেও অভিহিত করেছেন। বাস্তবত এ সংগ্রাম ছিল কেন্দ্রীয় মোগলশক্তির সঙ্গে আঞ্চলিক মেবার রাজ্যের সংগ্রাম। মেবার যদি কোনও মুসলিম নরপতির নিয়ন্ত্রণাধীন হত তা হলেও এ যুদ্ধ অবশ্যই হত। মালবের বাজবাহাদুর কিংবা বাংলার দাউদ খাঁর বিরুদ্ধে যেমন বল প্রয়োগের নীতি গৃহীত হয়েছিল তেমনি রাণাপ্রতাপের বিরুদ্ধে একই নীতি গৃহীত হয়েছিল। সুতরাং এটিকে সাম্প্রদায়িক সংগ্রামরূপে গণ্য করা যায় না। তাছাড়া যেসব রাজপুত পরিবার আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন আকবর তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুন্ন করেন নি।

হিন্দুনীতির ফল ঃ সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি ছিল মূলত হিন্দু নীতিরই একটা অংশ মাত্র। সহজাত উদারতার গুণে সম্রাট আকবর হিন্দুদের উপর আরোপিত জিজিয়া ও তীর্থকর রহিত করলেন। আকবর কখনই হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন নি, আর নতুন মন্দির নির্মাণে বাধা দেন নি। তাঁর বাদশাহী দরবারে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান ও জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর দরবারে নবরত্নের মধ্যে ছিলেন টোডরমল, বিহারীমল, বীরবল, তানসেন প্রমুখ। বাঙালি নৈয়ায়িক মধুসূদন সরস্বতী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। হিন্দু রাজ্য জয় করার পরে তাঁর বশংবদ করদমিত্র রাজগণ তাঁদের

বংশানুক্রমিক উপাধি ব্যবহার করতে পারতেন। এইসব অনুগত রাজন্যবর্গ বছরের নির্দিষ্ট সময় রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। দরবারী উৎসবে অংশ নিয়ে তাঁরা উপঢৌকন প্রদান করতেন। যুদ্ধে তাঁরা আকবরের পাশে থেকে প্রাণপাত করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

৭। আকবরের ভূমি রাজস্ব ও মনসবদারি পদ্ধতি

মোগল আমলে রাজস্ব ঃ মোগল আমলে সরকারি খরচ মেটানো হত রাজস্ব থেকে। রাজস্বের নানা উৎস ছিল। যেমন টাঁকশাল (তখন কাগজী টাকা ছিল না, ধাতব মুদ্রা হত) থেকে আয়, বাদশাহদের প্রদত্ত উপহার, সরকারি কারখানা থেকে আয়, যুদ্ধের ফলে প্রাপ্ত ধনরত্ন ও লুঠের মাল, শুল্ক, জিজিয়াকর, লবণকর, তীর্থকর ইত্যাদি। তবে সব চাইতে বড়ো আয়ের উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। যাকে 'মাল' বা 'খরাজ' বলা হত। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ইরফান হাবিব লিখেছেন যে, খুঁটিয়ে বিচার করলে কথাটি ভূমি রাজস্ব বলা হলেও মোগল আমলে 'মাল' বলতে ঠিক জমি থেকে আয় বা জমির উপর কর বোঝাত না, ভূমি রাজস্বের অর্থ জমিতে উৎপন্ন শস্যের উপর থেকে রাজস্ব, রাষ্ট্রের অংশ বাবদ যা প্রাপ্য।[১]

বিভিন্ন ধরনের জমি ঃ অধ্যাপক ইরফান হাবিব তাঁর সুবিখ্যাত গবেষণা 'Agrarian System of Mughal India'-তে দেখিয়েছেন যে, মোগলযুগে যে সব ইয়োরোপীয় পর্যটক ভারতে এসেছিলেন তাদের মতে ভারতে সমস্ত জমির মালিক ছিলেন বাদশা স্বয়ং।[২] উত্তরকালে ব্রিটিশ আমলে জমির উপর কর বা প্রকৃত ভূমি রাজস্ব যেমন সৃষ্টি, তেমনি জমির ব্যক্তিগত মালিকানাও। মোগল আমলে সমস্ত জমিই ছিল রাষ্ট্রের। রাজস্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তা তিনভাগে বিভক্ত। এগুলি যথাক্রমে— (ক) খালিসা বা রাষ্ট্রায়ত্ত জমি, যা থেকে সরাসরি ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করা হত, (খ) বরাতী জমি, যেগুলি জায়গিরদার বা মনসবদারদের বরাত দেওয়া হত। এখান থেকে শাসকশ্রেণীর পদস্থ ব্যক্তিরা রাজস্ব আদায় করতেন এবং (গ) সায়ুরগল বা মদদ-ই-মাস্ জমি, যেগুলি ধর্মীয় বা দেবত্রস্থানে দান করা হত। সেখান থেকে ঐ দানপ্রাপ্তরা রাজস্ব আদায় করতেন। অবশ্য প্রধান আয় হত খালিসা জমি থেকে।

ভূমি রাজস্ব পদ্ধতি ঃ মোগল আমলের বহু শতাব্দী আগে থেকেই উৎপন্ন ফসলের এক নির্দিষ্ট অংশ কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব হিসেবে রাষ্ট্র আদায় করতেন। সুলতানি আমলেও জমির মাপ করে রাজস্ব নির্ধারিত হত। আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে রাজস্ব সংক্রান্ত বহুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা টোডরমল তার রাজস্ব সংস্কার প্রবর্তন করেন। ফলে মোটামুটিভাবে তিন প্রকার রাজস্বব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। টোডরমলের রাজস্বনীতির উদ্দেশ্য ছিল তিনটি।

যথাক্রমে— (ক) আবাদী জমির নির্ভুল জরিপ করা, (খ) প্রত্যেক বিঘার উৎপন্ন শস্যের গড় নির্ণয় করা এবং (গ) প্রত্যেক বিঘার রাজস্বের হার নির্ণয় করা। আকবরের আগে শেরশাহ প্রথম জরিপ ব্যবস্থার উপর জোর দেন এবং কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেন। উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ তখন রাজস্ব হিসেবে ধার্য হয়। রাষ্ট্র কৃষকদের 'পাটা' দিত জমির, বিনিময়ে কৃষক জমির পরিমাণ, শস্যের পরিমাণ এবং রাষ্ট্রকে দেয় রাজস্ব সম্বলিত 'কবুলিয়ত' দিত। সিকদার, মুকদ্দম, আমিন প্রভৃতি কর্মচারী রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত থাকতেন।

আকবর সিংহাসনে বসার পরে এই ব্যবস্থাই চলে আসছিল। সাম্রাজ্য তখন ছিল সীমিত। পরে সাম্রাজ্য বিস্তারিত হতে থাকে। ১৫৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে মুজাফফর খান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন কিন্তু রাজস্ব বাড়েনি। প্রত্যেক পরগণার কানুনগোকে শস্য উৎপাদনের গড় তথ্য এবং তার দাম জানতে বলা হয়। তার সমমানের অর্থ ধরে তার এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব হবে। অবশ্য এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে সমস্ত জমি রাষ্ট্রের ঘোষণা করা হয়। এক্ষেত্রে খাজা মনসুরও চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শেষপর্যন্ত রাজা টোডরমল রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে (১৫৮১) নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তিনি ফতাউল্লা সিরাজীকে সহায়ক হিসেবে পেয়েছিলেন। তারা রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতি দূর করেছিলেন। এ সময় ফৌজদারি শাসনের থেকে রাজস্ব আদায়কারী শাসন বা দেওয়ানি আলাদা করা হয়।

নতুন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো চাষযোগ্য জমিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা। যথা — 'পোলাজ', 'পরাউতি', 'চাচর' এবং 'বানজার'। এই ভাগ হত জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে। পোলাজ জমিতে প্রতি বছর চাষ হত এবং সারা বছর চাষ হত ; পরাউতি জমিতে বছরের কিছু সময় চাষ হত, কিছু সময় হত না। চাচর জমি অনেক সময় তিন-চার বছর পতিত ফেলে রাখা হত এবং বানজার জমি চার-পাঁচ বছর বা তারওবেশি ফেলে রাখা হত। উৎপাদন অনুসারে প্রথম তিন শ্রেণীর জমিকে ভালো, মাঝারি, খারাপ— এই শ্রেণীতে বিভক্ত করে উৎপন্নের আনুমানিক গড়পড়তা হিসাব নির্ণয় করে শস্যের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য হত।

এই হিসেব করার সময় বিগত দশ বছরের উৎপন্ন ফসলের কথা মাথায় রাখা হত। প্রত্যেক পরগণাকে এক একটি ইউনিট ধরা হত। মূল্যের একককে বলা হত দস্তুর। রাজস্ব নগদ অথবা ফসলে দেওয়া যেত। মোরল্যান্ড লিখেছেন, "The basis of the state's claim on the peasant was still 1/3 of the produce, but the actual demand was made in the form of a sum or money, varying with the locality and with the crop in each unit of area sown in each season."[১] টোডরমলের আমল থেকে জমি জরিপের কাজে লোহার রিংযুক্ত বাঁশের ব্যবহার শুরু হয় ; আগেকার দড়ি পদ্ধতি বাতিল হয়।

বিভিন্ন ধরনের ভূমি রাজস্বব্যবস্থা ঃ জমি জরিপ ক'রে তার উৎপন্ন ফসল নির্দিষ্ট ক'রে এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নেওয়ার পদ্ধতিকে বলা হত জাবৎ। এই জাবৎ ব্যবস্থা ছাড়াও আর দুধরনের বন্দোবস্ত ছিল, যথাক্রমে— গাল্লাবকসী এবং নকসী। তবে রাজস্ব নির্ধারণের মধ্যে প্রধান ছিল জাবতী বন্দোবস্ত।

'জাবৎ' বন্দোবস্ত কার্যকর ছিল বিহার, এলাহাবাদ, মুলতান, অযোধ্যা, আগ্রা, মালব, দিল্লি, লাহোর এবং গুজরাট ও রাজপুতনার কিছু অংশে। এই ব্যবস্থা অনুসারে শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকা রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা হত। শস্যের প্রকৃতি অনুসারে রাজস্বের পরিমান ও সম-পরিমান অর্থ নির্দিষ্ট করতেন রাজ কর্মচারি বৃন্দ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ,জমি ছিল চার শ্রেণীর, তার মধ্যে 'পোলাজ', 'পরাউতি' এবং 'চাচর' জমির উৎপাদন অনুসারে ভাগ ছিল এবং উৎপন্ন শস্যের গড়পড়তা হিসেব নির্ণয় করে শস্যের এক তৃতীয়াংশ মোগল সম্রাট নিতেন। জমির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব ক্রম বর্ধিত হবে, এরূপ ঠিক করা হয়। তবে নগদের পরিবর্তে ফসলেও রাজস্ব দেওয়া যেত।

গাল্লাবকস্ পদ্ধতি অনুসারে শস্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব অনুসারে গৃহীত হত। সিন্ধু, কাশ্মীর, কাবুলের একাংশে এই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। নকস্ ব্যবস্থা ছিল অনেকটা রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত,জাবৎ ব্যবস্থাও তাই। এই ব্যবস্থায় সরকারের সঙ্গে রায়ত বা কৃষকদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হত। নকস্ ব্যবস্থায় কোনও মধ্যবর্তী রাজস্ব আদায়কারী ছিল না। বাংলায় এই ব্যবস্থা ছিল। জমি জরিপ করে তার উৎপাদনী শক্তি অনুসারে মোটামুটি অনুমানের ভিত্তিতে প্রজারা রাজস্ব দিতেন। এই তিন ধরনের বন্দোবস্ত ছাড়াও স্থানীয় নানা পদ্ধতিও চালু ছিল। তবে সরকারের নানাবিধ রাজস্বের মধ্যে যেমন ভূমি রাজস্ব ছিল প্রধান, তেমনি ভূমি রাজস্বের নানা বন্দোবস্তের মধ্যে জাবতী ব্যবস্থা ছিল প্রধান। সমস্ত প্রকার বন্দোবস্তই ছিল খালিসা জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে খালিসা বা রাষ্ট্রায়ত্ত জমি ছাড়াও, জাগির দেওয়া বা বরাতী জমি ছিল। এগুলি থেকে জায়গিরদারগণ রাজস্ব আদায় করতেন। সেই আদায়ীকৃত রাজস্ব থেকে একাংশ নিজেদের বেতন বাবদ রেখে বাকি নির্দিষ্ট অংশ তারা মোগল কোষাগারে জমা দিতেন। তবে জাগির প্রাপ্ত অঞ্চলে জমির উপর শাসক শ্রেণীর মালিকানা স্বীকৃত হত না। তেমনি মদদ-ই-মাস বা সায়ুরগল জমিগুলি যা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে দান করা হত, সেখানে চাষাবাদ হত। তবে তার থেকে রাজস্ব আদায় করতেন দান প্রাপ্ত ব্যক্তি বা সংস্থা। এই কাজ রাজস্ব বিভাগ দেখাশোনা করত না, এর জন্য সরকারের সদর-ই-সুদুর নামে আলাদা বিভাগ ছিল। সমসাময়িক বদায়ুনী লিখেছেন ঐ বিভাগেও দুর্নীতি কম ছিল না।

রাজস্ব বিভাগের কর্মচারিগণ ঃ ভূমি রাজস্বব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণ যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা আদায়ও ততখানি গুরুত্বপূর্ণ। আকবরের আমলে এ ব্যাপারেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। বাদশাহ রাজধানীতে একজন প্রধান দেওয়ান এবং প্রত্যেক প্রদেশ বা সুবায় একজন

করে দেওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন। এরা ছিলেন রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান। সুবাগুলিকে সরকারে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক সরকারে একজন 'আমিন' থাকতেন। এই আমিনকে সাহায্য করতেন বিতিক্চি, পোদ্দার, কানুনগো, মুকাদ্দম এবং পাটোয়ারীগণ। আমিনকে নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হত। যেমন বিদ্রোহী কৃষকদের মোকাবিলা করা, কৃষি জমির উৎকর্ষতার মানের দিকে লক্ষ্য রাখা, নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কৃষকরা যাতে কোনও রকম উৎপীড়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি পাটোয়ারী, মুকদ্দম, কারকুন প্রভৃতি কর্মচারীদের হিসেবপত্র পরীক্ষা করতেন। নিজ নিজ অঞ্চলে কৃষি সংক্রান্ত কোনও ঝামেলা হলে তা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানোর দায়িত্ব ছিল আমিনের।

আমিনের প্রায় সম মর্যাদাপূর্ণ আর এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন বিতিক্চি। তাদের দায়িত্ব ছিল কানুনগোদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করা। তারা আইনকানুন সম্পর্কে অবহিত থাকতেন। তিনি কৃষকদের সঙ্গে সরকারের বন্দোবস্ত সম্পর্কিত কাগজপত্র রক্ষণ করতেন। কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন পোদ্দার, কানুনগো, মুকাদ্দম, পাটোয়ারী প্রমুখ।

রাজস্বনীতির ফল ঃ আকবরের রাজস্বনীতি মোগল শাসনের পক্ষে সহায়ক ছিল। কৃষককুলের পক্ষে অবশ্য তা প্রতিকূল ছিল না। রাজস্ব সুনির্দিষ্ট হওয়ায় তা অন্যায়ভাবে আদায়ের কোনও সুযোগ ছিল না। জমি থেকে কৃষকদের উৎখাত করারও প্রশ্ন ওঠেনি। কৃষির উন্নতির ফলে দ্রব্য মূল্য হ্রাস পায়। ভিনসেন্ট স্মিথ থেকে আচার্য যদুনাথ সরকার পর্যন্ত সকলেই আকবরের রাজস্বনীতির প্রশংসা করেছেন।

মনসবদারি প্রথা ও আকবরের সামরিক ব্যবস্থা ঃ সম্রাট আকবরের পূর্বাবধি সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গির দেওয়া হত। জায়গিরদারগণ প্রয়োজন অনুসারে সম্রাটকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। এর ফলে জায়গিরদারদের আর্থিক ও আঞ্চলিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেত। অন্যদিকে সাম্রাজ্যের আর্থিক ক্ষতি হত। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হলে উক্ত জায়গিরদাররাই স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতেন। তাই আকবর এই ব্যবস্থার পরিবর্তে পারস্যের অনুকরণে 'মনসবদারি প্রথা' প্রবর্তন করলেন।

'মনসব' কথাটি পদমর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। ঐতিহাসিক আরভিন এর মতে পদমর্যাদা ও বেতনক্রম অনুসারে সামরিক কর্মচারীদের শ্রেণীবিভক্ত করাকেই মনসবদারি প্রথা বলা হয়।[১] আকবর মনসবদারগণকে জায়গিরের পরিবর্তে নগদ বেতন দানের প্রথা প্রবর্তন করেন। মনসবদারগণ ৩৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। পদমর্যাদা ও বেতনক্রম অনুসারে এক এক জন মনসবদারের অধীনে ১০ জন থেকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার সৈন্য থাকত। মোগল পরিবারের সন্তানরা সাধারণত সাতহাজারী থেকে দশ হাজারী স্তরের মনসবদার হতেন। অবশ্য টোডরমল, মানসিং ও কুলিচ খাঁর ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল।

১। মনসবদারি প্রথার উদ্ভব এবং তার বিবর্তন প্রসঙ্গে এই সূত্রে বিশেষভাবেদ্র. পৃ ৭২-৭৫

জাট ও সওয়ার ঃ মনসবদার পদের সঙ্গে জাট ও সওয়ার নামক দুটি পৃথক পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষোক্ত দুটি পদের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। তবে অনেক ঐতিহাসিকের মতে 'জাট' কথাটি পদমর্যাদাসূচক এবং 'সওয়ার' কথাটি মনসবদারদের অধীনস্থ সেনার সংখ্যা সূচক। যখন কোনও মনসবদারকে তাঁর নির্দিষ্ট সৈন্যসংখ্যার উপরে অধিক সংখ্যক সৈন্য রাখার অধিকার দেওয়া হত তখনই তাকে জাট বলা হত এবং ঐ অতিরিক্ত সৈন্য রাখার জন্য যখন তাকে অতিরিক্ত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা হত তখনই তাকে সওয়ার শ্রেণীর মনসবদার রূপে গণ্য করা হত।

মনসবদারি প্রথার বৈশিষ্ট্য ঃ মনসবদারদের বেতনক্রমের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন মোরল্যাণ্ডের মতানুসারে 'পাঁচ-হাজারী' মনসবদারদের বেতন ছিল ১৮,০০০ টাকা, 'এক-হাজারী' মনসবদারদের বেতন ছিল ৫,০০০ টাকা, 'একশতী' মনসবদারদের বেতন ছিল মাসিক ৭০০ টাকা। এমনি করে মনসবদারদের সৈনিকের সংখ্যা ভিত্তিক পদমর্যাদা অনুসারে বেতনক্রম নির্দিষ্ট করা হত। তবে মনসবদারদের শ্রেণীবিভক্তকরণ ও বেতন দানের প্রথা যে জটিল ছিল সে-বিষয়ে 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় দুই-শতী মনসবদার থেকে পাঁচ-হাজারী মনসবদারদের সংখ্যা ছিল ৪১২ জন এবং দেড় হাজারী থেকে নিম্নতন মনসবদারের সংখ্যা ছিল ১,৩৮৮ জন। পরবর্তী সম্রাটদের আমলে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সম্রাট আকবরের সময় মনসবদারি প্রথা প্রসঙ্গে কতকগুলি বিধিবিধান প্রবর্তিত হয়। তাঁর আমলে **প্রথমত,** মনসবদারদের নগদ বেতন অথবা জায়গির দেওয়া হত। সুতরাং জায়গিরদার প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়নি। সমকালীন বাজার দরের তুলনায় মনসবদারদের বেতন ছিল বেশি। এই বেতন থেকে মনসবদারদের নিজস্ব খরচ এবং ঘোড়া ও ভারবাহী পশু পালনের খরচ বহন করতে হত। জায়গিরপ্রাপ্ত মনসবদারদের খরচ ঐ জায়গিরের আয় থেকে সরবরাহ করতে হত। **দ্বিতীয়ত,** মনসবদারী পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। মনসবদারের পুত্র তার পিতার পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেত না। মনসবদারের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি রাজ্য সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হত। **তৃতীয়ত,** আকবর মনসবদারদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার উদ্দেশ্যে নিয়মিত কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মনসবদাররা যাতে নিয়মিত অশ্ব ও অশ্বারোহী মোতায়েন রাখতে বাধ্য হন তার জন্যে তিনি 'দাগ ও হুলিয়া' প্রথা চালু করেন। ঘোড়ার গায়ের চামড়া পুড়িয়ে নম্বরের ছাপ দেওয়ার নাম দাগ (branding) প্রথা। তাছাড়া ছিল সেনাদের নাম ঠিকানাসহ দৈনিক কার্যবিবরণীর তালিকা (descriptive roll) প্রস্তুত করা হত। অবশ্য এ প্রথা নতুন নয় ; অতীতে আলাউদ্দিন খলজী ও শেরশাহও এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। আকবর সেই ব্যবস্থাকে আরো সুন্দরভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন।

মনসবদারি প্রথার ভাল ও মন্দ দুটি দিকই ছিল। **প্রথমত,** এই পদ বংশানুক্রমিক না হওয়ায় যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করার সুযোগ ছিল। **দ্বিতীয়ত,** উক্ত একই কারণে সে-যুগে

সামন্ত প্রথার উদ্ভব ঘটেনি। তৃতীয়ত, এই প্রথার মাধ্যমে ভাগ্যান্বেষী মধ্যএশীয়দের জাতিগত প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। শক্তিসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাজপুত বাহিনী কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। চতুর্থত, মনসবদারি প্রথাই মোগল শক্তিকে ভারতীয় শক্তিরূপে মর্যাদাদানে সক্ষম হয়।

তবে মনসবদারি প্রথার দুর্বলতাও কম ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মনসবদারি প্রথা ছিল একটি জটিল প্রক্রিয়া। তাই প্রথম স্তরে কিছুকাল সুস্থ অবস্থায় চালু থাকার পর ক্রমশ ব্যবস্থাপনার মধ্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা অনুপ্রবেশ করে। দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার সুবিধা ভোগ করার পর মনসবদাররা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতারণা করতেন। ঐতিহাসিক আরভিন এর মতে বলেন, মনসবদাররা নিজ নিজ সৈন্য সংখ্যায় কারচুপি করে সদ্য নিয়োজিত অশিক্ষিত সৈন্যকে পরিদর্শনকালে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করে অধিক অর্থ আদায়ের চেষ্টা করতেন। দাগ ও হুলিয়া প্রথা চালু করে এই দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা করে আকবর অনেকখানি সফলকাম হন। পরবর্তীকালে এই প্রয়াসের মধ্যেও দুর্নীতি প্রবেশ করে।

সামরিক সংগঠন ঃ সম্রাট আকবর শুধু সাম্রাজ্য জয় করেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তিনি সেই বিজিত অংশকে সুরক্ষার প্রয়োজনে সামরিক বিভাগটিকে সুসংহত ও সুদৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সেনাবাহিনী পদাতিক, গোলন্দাজ, অশ্বারোহী, নৌ-বাহিনী ও হস্তিবাহিনীতে বিভক্ত ছিল।

বন্দুকচি (বন্দুকধারী যোদ্ধা), সামসেরবাজ (তরবারি যোদ্ধা), কাহার (পাল্কীবাহক), দারবান (যুদ্ধের উপকরণ বাহক) ও পালোয়ান (কুস্তিগির) প্রভৃতিকে নিয়ে পদাতিক বাহিনী গঠিত ছিল। এই বিভাগটিই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সম্রাট সর্বাধিনায়ক হলেও পদাতিক বাহিনীর জন্যে পৃথক অধিনায়ক ছিলেন।

মোগল সামরিক বাহিনীর উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছিল গোলন্দাজ বাহিনী। এর অধিনায়ক ছিলেন 'দারোগা-ই-তোপখানা' বা মীর আতীশ। গোলা-বারুদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রুমের মুসলিম (কনস্ট্যান্টিনোপলের অধিবাসী) এবং ফিরিঙ্গি পর্তুগীজদের অধিক প্রাধান্য ছিল। কামান, বন্দুক ইত্যাদি তৈরির জন্যে আকবর সরকারি নিয়ন্ত্রণে কারখানা স্থাপন করেছিলেন।

মোগল সেনাবাহিনীর প্রধান অঙ্গ ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। মূলত এটি ছিল মনসবদারি প্রথার অঙ্গীভূত বিষয়। মনসবদারি প্রথা, দাগ ও হুলিয়া ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অশ্বারোহী বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হত। এই বাহিনীতে যথাযথ পরিদর্শন ও কুচকাওয়াজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। মনসবদাররা নগদ বেতন অথবা জায়গিরদারি নিয়ে সম্রাটের নির্দেশ পালন করতেন। সৈনিকদের বেতন মনসবদারগণই প্রদান করতেন।

সম্রাট আকবরের পূর্বে মোগলদের নৌবাহিনী বলে কিছু ছিল না। মধ্য এশিয়া থেকে আগত মোগলদের সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় ছিল কম। কিন্তু মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচারে

বিরক্ত হয়ে আকবর নৌ-বাহিনী গঠন করেন। নদীবহুল ভারতে সামরিক বাহিনীর নদী পারাপারের জন্য এই বাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করত। সম্রাট আকবর জাহাজ নির্মাণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। লাহোর, এলাহাবাদ, কাশ্মীর, ঢাকায় বাণিজ্য পোত তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়া সম্রাট আকবরের একটি হস্তিবাহিনী ছিল। সম্রাটের ব্যক্তিগত হস্তিদলকে 'খাসা' (Khasah অর্থাৎ Special) বলা হত। এছাড়া ১০, ২০, ৩০ টি হাতি নিয়ে এক একটি দল গঠন করা হত। এদেরকে বলা হত হাল্কা (*Halqah*)। কোনও কোনও মনসবদার অশ্বের সঙ্গে কয়েকটি হস্তি রাখার অধিকার পেত।

সম্রাট আকবরের সৈন্যসংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিক মতভেদ প্রকট। যেমন ব্লখম্যানের মতে উক্ত সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার; আবুল ফজলের মতে ৩,৮৪,৭৫৮ জন অশ্বারোহী ও ৩৮৭,৭৫৫৭ জন পদাতিক; ভন নোয়ারের (*Von Noer*) মতে অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার ইত্যাদি। মোগল বাহিনীর প্রধান প্রধান যুদ্ধাস্ত্র গোলা-বারুদসহ কামান-বন্দুক, তীর, ধনুক, বর্শা, গদা, তরবারি, গুপ্তি, ছুরিকা, শিরস্ত্রাণ, কোমরবন্ধ ও ঢাল। নৌ-বাহিনীর কেন্দ্র ছিল পূর্ববঙ্গ, সিন্ধু, গুজরাট ও লাহোর।

মোগল সামরিক বাহিনীর ত্রুটি ছিল বহু ; যেমন— মোগল নৌ-বাহিনী ছিল দুর্বল, তাই সমুদ্রের উপর পর্তুগীজদের প্রভাব ছিল প্রবল। তাছাড়া যুদ্ধের সময় একাধিক সেনাপতির উপর দায়িত্বভার অর্পিত হত। ফলে প্রত্যেকের মধ্যে দায়িত্ব পালনের নিষ্ঠা হ্রাস পেত। আবার মোগল ও রাজপুতদের মধ্যে যুদ্ধ কৌশলের তারতম্য ছিল। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে ঐক্যের অভাব আত্মপ্রকাশ করত। এছাড়া মোগল সৈন্য ও শিবির ছিল এক একটি চলমান নগর। শিবিরের সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী, নৃত্য-গীতি ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজার, রাজপরিবারের বেগম, বাঁদী, দাসদাসী ও অনুচরবর্গ অনুগমন করত। ফলে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় ক্ষিপ্রতার অভাব ছিল। শেষ পর্যন্ত এ সব ত্রুটি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৮। ধর্মনীতির বিবর্তন

আকবরের ধর্মনীতির নানা পর্যায় : সম্রাট আকবর মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন। তাঁর সমগ্র রাজত্বকালের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে ঔদার্য ও সহনশীলতা এই শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুত তাঁর ধর্মনীতির মূলকথা ছিল 'সুলহ্-ই-কুল্' বা সার্বজনীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। তবে আকবরের ধর্মমত এবং সম্রাট হিসেবে ধর্মনীতি বরাবর একরকম সরলরেখা ধরে চলেছিল ভাবলে ভুল হবে। তাঁর রাজত্বকালে ধর্মনীতির বিবর্তন প্রসঙ্গে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম পর্ব বলা যেতে পারে তাঁর সিংহাসনে আরোহণকাল থেকে ১৫৭৯ পর্যন্ত যখন তিনি নিজে একজন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান ছিলেন, যদিও উগ্র ধর্মান্ধ তিনি কখনোই ছিলেন

না। কতকগুলি উপাদান তাঁর ধর্মীয় মানস প্রকৃতি গঠন করেছিল। ফতেপুর সিক্রিতে ধর্মীয় আলোচনা গৃহে (ইবাদৎ খানা) ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ, বিশেষত উলেমাদের মধ্যে বিবাদ, তাকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'অভ্রান্ত কর্তৃত্বের ঘোষণা' জারি করা থেকে তার ধর্মজীবন তথা ধর্মনীতির **দ্বিতীয় পর্যায়** বলা যায়। এই সময় থেকে মৌলবাদী ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁর শিথিল হয়। শুধু রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, ধর্মীয় ব্যাপারেও বাদশাই চূড়ান্ত রায়দানের অধিকারী হন। এই ঘোষণা পত্রটি রচনা করেছিলেন শেখ মোবারক। আকবরের ধর্মনীতির **তৃতীয় পর্যায়** ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে 'দীন-ই ইলাহি' ঘোষণা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। ঐ সময় আকবর নানা ধর্মের সার সত্য নিয়ে নতুন মত প্রবর্তন করেন যদিও তিনি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেননি।

আকবরের মানসিকতা ঃ সুলতানি শাসনাধীন ভারতে রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের প্রভাব চরমভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কেবলমাত্র শেরশাহই রাজ্য শাসনে সাম্যনীতি অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী, প্রতিভাবান, ধী-শক্তিসম্পন্ন অথচ সমরবিজয়ী আকবর সহজে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সম্রাট শুধুমাত্র মুসলমানদের নেতা নন—তাঁকে হতে হবে ভারতবাসীর (হিন্দু-মুসলমান সকলের) নেতা। এক্ষেত্রে সংকীর্ণতার কোনও স্থান নেই। তাই ধর্মের বিচারে আকবর নিজেকে উদার, পরমতসহিষ্ণু, সার্বজনীনরূপে গড়ে তুললেন। ধর্মের প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের ক্ষেত্রে আকবরের উপর নানা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। (১) মধ্য এশিয়ার চেঙ্গিজ ও তৈমুরের একহাতে ছিল বিধাতার কশা, অন্য হাতে ছিল সাহিত্য, শিল্প, ধর্মানুরাগ। স্বাভাবিকভাবে সে প্রভাব আকবরের উপর পড়েছিল। (২) আকবরের মাতামহ বিখ্যাত পারসিক পণ্ডিতের উদার প্রভাব মাতা হামিদাবানুর মাধ্যমে আকবরের ভেতর দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও বাল্য শিক্ষক আবদুল লতিফের প্রভাব পড়েছিল তাঁর উপর। (৩) কাবুলে অবস্থানকালে আকবর ভক্তিবাদী সুফী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন। ফতেপুর সিক্রিতে সেলিম চিশতির সঙ্গে সাক্ষাতের (১৫৬৯ খ্রি:) পর থেকে সুফী অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। (৪) চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ভারতে আবির্ভূত চৈতন্য, নানক, কবীর, দাদু, মীরাবাঈ প্রমুখ ধর্মগুরুদের উদার মতবাদের প্রভাব থেকে আকবর দূরে থাকতে পারেননি। (৫) অমর কোটের হিন্দু আলয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এরপর রাজপুত রমনীকে বিবাহ করে তিনি হিন্দুধর্মের উদারতার পরিচয় পান। অবশেষে বলা যায়, শেখ মোবারক ও তাঁর দুই পুত্র ফৈজী ও আবুলফজল প্রমুখ যুক্তিবাদী পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসায় সম্রাট আকবর ক্রমশ ধর্ম বিষয়ে যুক্তিবাদী হয়ে উঠলেন। ধর্মের সারকথা জানবার জন্যে তিনি ফতেপুর সিক্রিতে 'ইবাদৎ খানা' নামে একটি প্রার্থনা গৃহ নির্মাণ করলেন (১৫৭৫)। এখানে তিনি প্রথম প্রথম মুসলিম উলেমাদের কথা শুনতেন। তাদের পারস্পরিক মতভেদ সম্রাটের জানবার আকাঙ্খাকে আরও তীব্র করে তুলল। পরে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের আহ্বান করলেন। এই

ঘটনায় মোল্লারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আকবর তাদের ধর্মান্ধতার নিকট নতি স্বীকার করেন নি। সকল ধর্মগুরুদের আলোচনা থেকে তিনি সর্বধর্মের সারকথা অবগত হলেন। সেই সারকথা নিয়েই তিনি 'দীন-ই-ইলাহী' নামে এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করলেন (১৫৮২ খ্রিঃ)। এই ধর্মমত যারা গ্রহণ করতেন তারা 'ইলাহীয়া' নামে পরিচিতি লাভ করতেন। সম্রাট আকবরকে তারা 'আল্লাহু আকবর' বলেই অভিনন্দন জানাতেন। কিন্তু এই ধর্ম প্রচারের জন্যে আকবর কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। ফলে জনসাধারণের মধ্যে এই ধর্ম প্রসার লাভ করতে পরেনি।

অন্যদিকে উলেমারা আকবরের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলেন। ১৫৭৯ খ্রি: বিখ্যাত 'অভ্রান্ত আদেশনামা' (Infalliable Decree) ঘোষণা করে আকবর ইসলাম ধর্মবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিলেন। বদায়ুনী ও জেসুইট ধর্ম যাজকগণ লিখেছেন যে, শেষ বয়সে আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আকবর কোরাণের নির্দেশকে কখনই অবমাননা করেননি। মূলত দীন-ই-ইলাহী (দিব্যধর্ম) কোনও নতুন ধর্ম নয় বা কোরান বিরোধী কোনও মত নয়। 'দীন-ই-ইলাহীর দশটি নির্দেশের মধ্যে নটিই ছিল কোরাণ অনুমোদিত।' — এ মন্তব্য করেছেন ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী। হজযাত্রীদের জন্যে তিনি যেমন পৃথক জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন তেমনি মুক্তহস্তে তাদের অর্থ সাহায্য করতেন। বাস্তবত ভারতবর্ষে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে একটা ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্য গঠন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল না হলেও তাঁর প্রয়াস সর্বযুগে সর্বজনকাম্য— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দীন-ই-ইলাহীর চরিত্র নিয়ে মতভেদ আছে। আকবর বিদ্বেষী বদায়ুনী কিংবা সমসাময়িক জেসুইট ধর্মযাজকদের মতবাদের উপর নির্ভর করাকে ভিনসেন্ট স্মিথ একে 'আকবরের নির্বুদ্ধিতার চরম নিদর্শন' বলেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক শ্রীরাম শর্মা আকবরের ধর্মনীতি সাফল্য লাভ করেনি বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দীন-ই-ইলাহীর রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। *Von Noer* তাই যথার্থই লিখেছেন, আকবরের মহত্ব এর মধ্যে প্রতিফলিত। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আতহার আলি বিচার করে দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সার্বজনীনতা (সুলহ্-ই-কুল) ছিল আকবরের আদর্শ, যা মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রসারিত করেছিল।

আকবরের ধর্মনীতির ফল ঃ 'দীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তন (১৫৮১) এবং তা প্রচার (১৫৮২) আকবরের ধর্মনৈতিক জীবনের চরম পরিণতি। একথা সত্য যে, ধর্ম হিসেবে এই ধর্ম বিশেষ ব্যপ্তি লাভ করেনি—হিন্দু বা মুসলমানসমাজ কেউই নিজধর্ম পরিত্যাগ করে এই উদার মতামত গ্রহণ করেনি। কিন্তু 'দীন-ই-ইলাহী' গ্রহণযোগ্যতা বা বাস্তবে তা গ্রহণ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, আকবরের ধর্মনীতি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ঔদার্য যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আকবরের ধর্মনীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধন করা। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঐক্যসাধন করে তিনি সন্তুষ্ট না থেকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধন করে সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। ফলে 'দীন ই ইলাহী'কে রাজনৈতিক দলিল বলা যেতে পারে। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, 'Its basis was rational, it upheld no dogma, recognised no God or Prophets'। বস্তুত ১৫৭৯ খিস্টাব্দে বিখ্যাত 'মজহর' বা ঘোষণার মধ্যে দিয়েই আকবরের ঐক্যবোধ প্রতিফলিত। ইতিহাসবিদ মাখনলাল রায়চৌধুরী যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "The introduction of the 'Mujahar' would always remain a brilliant testimony to the great political wisdom of the monarch"। দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তনের পর সাধারণ মানুষজন সম্রাটকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ও প্রজাহিতৈষী বলে গ্রহণ করেছিল। সাম্রাজ্যে ধর্মান্ধ উলেমাদের প্রভাব অনেক কমে যায়। হিন্দু-মুসলমান সমেত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষজন পরস্পরের কাছে আসতে শুরু করে। ফলত জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক ইকতিহার আলম খান তাই আকবরের ধর্মনীতির পশ্চাতে বোদ্ধিক বা উদারনৈতিক মনোভাবের চেয়ে রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের দিকেই জোর দিয়েছেন বেশি। তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, আকবর যখন 'সুলহ্-ই কুল' এর উপর জোর দিয়েছেন, সারা বিশ্বে মধ্যযুগে সার্বজনীনতা ও সর্বমত সহিষ্ণুতা ছিল না। সেদিক থেকে তিনি বিশ্বে 'মহান' হিসেবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। ডাচ ঐতিহাসিক *Von Noer* এর এই মন্তব্য তাই যথার্থ ঃ "One of his creations will assure to him for all time a pre-eminent place among the benefactors of humanity, greatness and universal tolerance in matters of religion !" আকবরের রাজপুতনীতি তথা হিন্দুনীতি এই ঔদার্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ। এই নীতির ফলেই সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৯। আকবরের শেষ জীবন, চরিত্র ও কৃতিত্ব

আকবরের শেষ জীবন সুখের হয়নি। দিল্লিশ্বর আকবর মারা যান ৬৩ বছর বয়সে। পুত্রদের জন্য তার চিন্তা ও দুঃখের অন্ত ছিল না। অতিরিক্ত মদ্য পান করে দুই পুত্র মুরাদ ও ড্যানিয়েল আকবরের আগেই মারা গিয়েছিলেন, একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিম,যাকে তিনি লাভ করেছিলেন অনেক সাধ্য সাধনার পর, সে-ও বৃদ্ধ পিতার দুঃখের কারণ হয়েছিলেন। সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এই সেলিমের প্ররোচনাতেই আকবরের প্রিয় সুহৃদ আবুল ফজলকে হত্যা করা হয়েছিল। সেলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন রাজা মানসিংহও। এই দুশ্চিন্তায় তার মন ভরে ওঠে। শেষপর্যন্ত অবশ্য সেলিমকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সেলিম পরে জাহাঙ্গীর উপাধি নিয়ে সম্রাট হন। তবে আকবর প্রাণ ত্যাগ করেন ভগ্ন হৃদয়ে। আগ্রার কাছে সেকেন্দ্রাতে তার অনাড়ম্বর সমাধিক্ষেত্র আজও বিরাজমান।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সম্রাটবর্গের মধ্যে মোগল সম্রাট আকবরের সাংস্কৃতিক জীবনধারা ও সাংগঠনিক কার্যাবলী ছিল এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাই ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাস নয়, বিশ্ব-ইতিহাসে আকবর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।" সমকালীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি থেকেও তাঁর সেই বিশেষ চরিত্র, কৃতিত্ব ও গুণাবলীর কথা জানতে পারা যায়।

জীবনধারার ব্যক্তিগত ভিত্তি ঃ বংশধারার বিচারে তাঁর দেহে প্রবাহিত ছিল এশিয়ার দুই দুর্ধর্ষ বীর তৈমুর ও চেঙ্গিজের রক্তধারা। তাঁর দেহ ছিল পেশীবহুল নাতিদীর্ঘ বলিষ্ঠ ও রাজবংশীয় আভিজাত্যে পূর্ণ। তাঁর কেশ ছিল ঘন কৃষ্ণবর্ণের, বাহু ছিল আজানুলম্বিত, ললাট ছিল প্রশস্ত, চক্ষু ছিল আয়ত উজ্জ্বল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় তিনি ছিলেন সমান কর্মক্ষম, ক্লান্তিবোধ তাঁর মুখমণ্ডলে কখনই আত্মপ্রকাশ করত না। নীরোগ, সুস্থ, কর্মক্ষম জীবন ছিল তাঁর পরম সম্পদ। তিনি ছিলেন মিতাহারী, প্রথম জীবনে মাংসাহার করলেও শেষ জীবনে নিরামিষ আহার করতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর অথচ মধুর, আর স্বভাব ছিল শান্ত। মানসিক শক্তি তাঁর এত প্রখর ও উৎকর্ষ ছিল যে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি নির্ভুল বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন।

সাম্য, মৈত্রী, শান্তির জীবনধারা ঃ সম্রাট আকবর তাঁর বিশেষ ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে ভারতের বুকে যে সাম্রাজ্য ও তার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা ছিল একান্ত ভারতীয়। এখানে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ, ধর্মীয় উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা ইত্যাদির কোনও স্থান ছিল না। ফলে তাঁর আমলে যে সাংস্কৃতিক জীবনধারার প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে ছিল উদারতা, সাম্য ইত্যাদি। ভারতের বুকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বাদ দিয়ে শুধু মুসলমান সমাজকে নিয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না— এ সত্য মহান ও উদার সম্রাট আকবর অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, হিন্দু তথা রাজপুত জাতির সাহায্য ও সহানুভূতি ছাড়া মোগল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব তাই তিনি তাদের সঙ্গে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির নীতি অথচ প্রয়োজনবোধে রণনীতিও অবলম্বন করেন। তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিভাকে মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানে নিয়োজিত করলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থায় হিন্দু, পারসিক ও আরবীয় নীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, আকবরের শাসনব্যবস্থা ছিল 'Perso-Arabic system in Indian setting.'। দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে অমুসলমানকে উচ্চপদে নিয়োগ করে আকবর বিগত দিনের অনমনীয় শত্রুকে চিরদিনের মত বিশ্বস্ত মিত্রে পরিণত করেন। তিনি হিন্দুতীর্থকর, দাসরীতি, জিজিয়াকর ইত্যাদি হিন্দু-বিদ্বেষমুলক ব্যবস্থাদি উঠিয়ে দিয়ে সাম্য নীতি প্রয়োগ করেন। হিন্দুদের মন্দির নির্মাণে অনুমতি দিয়ে প্রজাবর্গকে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতায়

আকবর যেমন জাতীয় সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেন, তেমনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে একটা জাতীয় ভাবধারার পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

শাসন সংস্কার ঃ সেযুগে সামরিক শক্তি ছিল সাম্রাজ্য রক্ষার প্রধান অবলম্বন। সেক্ষেত্রেও আকবর বংশানুক্রমিক জায়গির প্রথার উচ্ছেদ করে কর্মকালীন মনসবদারি প্রথা প্রবর্তন করেন। সামরিক বাহিনী যাতে সরাসরি সম্রাটের নিকট দায়ী থাকে সে-ব্যবস্থাও তিনি করলেন। নিয়োগের ব্যাপারে তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিদের সেনাপতিত্বে বরণ করতেন। এইভাবে তিনি সামরিক বাহিনীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি জমি জরিপ, সীমানা নির্ধারণ ও উর্বরতা অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থার মধ্যেও সাম্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি হিন্দু অর্থনীতিবিদ রাজা টোডরমলের সাহায্য নিয়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র একটা সমন্বয়ী ধারা প্রবর্তনে প্রয়াসী হন। রাজস্ব নির্ধারণেও আঞ্চলিক প্রথা অবহেলিত হয়নি।

সম্রাট আকবর ঃ শুধুমাত্র যুদ্ধ বিজয়ী বীর ও সুশাসক ছিলেন না। সমাজ সংস্কারক হিসেবেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। হিন্দুদের উপর থেকে বৈষম্যমূলক কর উঠিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি তৎকালীন সমাজের সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করারও চেষ্টা করেন। কর্তব্যে অবহেলা হতে পারে এমন ধর্মীয় অনুষ্ঠানও তিনি নিষিদ্ধ করেন। মুসলিম সমাজ ও ধর্মের বহু বিষয়-সংস্কার করে তিনি উলেমাদের বিরাগভাজন হন। তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন বলে অনেকেই তাঁকে দোষারোপ করেন। কিন্তু সংস্কারের মনোবৃত্তি তিনি ত্যাগ করেননি।

সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ঃ সমরবিজয়ী সুদক্ষ শাসক আকবর শিল্প, স্থাপত্য ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই পরিকল্পনা রচনা করে শিল্পকর্মীদের নির্দেশ দিতেন। ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্য শিল্পগুলিতে তাঁর পরিকল্পনাই রূপলাভ করেছে। আকবরের শিল্পরীতিতে হিন্দু, পারসিক ও আরবীয় রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আজও সেকেন্দ্রাবাদে আকবরের নিজস্ব সমাধি, দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধি সম্রাটের শিল্পরীতির নিদর্শন। শিল্পানুরাগী আকবর বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আরবীয়-পারসিক রীতিতে আগে পড়া, পরে লেখা অর্থাৎ পড়ালেখার পরিবর্তে আকবর অনুমোদন দিয়েছিলেন হিন্দুরীতিকে। এই রীতিতে ছিল আগে লেখা পরে পড়া অর্থাৎ লেখাপড়া'র রীতি। তাঁর মতে শেষোক্ত রীতি ছিল অনেক বেশি গতিশীল ও বাস্তবানুগ। মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষার মত তিনি পাঠশালা, টোল-চতুস্পাঠির শিক্ষাকেও উৎসাহিত করতেন। আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বিহারীমল, তানসেন, আব্দুল রহিম, বীরবল, হাকিম হুমায়ুন, মোল্লা দোপিঁয়াজা, প্রমুখ মনীষীবৃন্দ আকবরের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। তাছাড়া তানসেন, বাজবাহাদুর, সুরদাস, তুলসীদাস, বৈজুবাওরা প্রমুখ কণ্ঠশিল্পী, কথাশিল্পী এবং কবিগণ আকবরের আনুকূল্য লাভ করেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থাদি সে-যুগের সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ

করেছিল। ফৈজী ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন ভগবদগীতা ও নলদময়ন্তী কাব্য। সম্রাটের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় সে যুগে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে মনীষার বিকাশ ঘটেছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী ও আকবর নামা, বদায়ুনীর মুন্তাখাব-উৎ-তারিখ, তুলসীদাসের রামচরিত মানস নিঃসন্দেহে আজও অমূল্য গ্রন্থ।

মহামতি কেন? আকবর ছিলেন ষোড়শ শতকের বিশ্ববরেণ্য মহামহিমান্বিত সম্রাট। ভারতের মতো একটা বৈচিত্র্যময় দেশে তিনিই প্রথম জাতীয়ভাবের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন। চারিত্রিক মাধুর্য, ব্যক্তিত্ব ও রাজোচিত আভিজাত্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মনসেরেট এর ভাষায় বলা যায়, "He was in face and feature fit for the dignity of a king"। সম্রাট হিসেবে তিনি জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র প্রজাপুঞ্জের শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি, শুভেচ্ছা অর্জন করেছিলেন। মহতের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল, আর দীনতম প্রজার প্রতি তেমনি ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম সম্রাট— যাঁর শাসন ভারতের বিজিত ভূখণ্ডে আপামর জনগণকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। জাতীয় সম্রাট হিসেবে তিনিই প্রথম ভারতের মাটিতে পরিবেশ রচনা করেছিলেন— নতুন সাংস্কৃতিক জীবনধারার প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বিচক্ষণতার সঙ্গে ভারতের রাজপুত শক্তিকে মোগল শক্তির সমৃদ্ধিতে নিয়োগ ও প্রয়োগ, সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই প্রশাসন, ফারসীর মাধ্যমে, ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, সর্বস্তরের ভারতীয় মনীষার বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল জাতীয়ভাব বিকাশে জাতীয় সম্রাটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

অধ্যায় ৩

আকবরোত্তর ভারতে রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা

Syllabus : Politics and Administration in Post-Akbar India.

১। আকবরোত্তর যুগ— জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান

আকবরোত্তর যুগ বলতে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বোঝায় জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের যুগ। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হলে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম ছত্রিশ বছর বয়সে 'নুরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর' উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খুররম 'শাহজাহান' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন। আকবরের মৃত্যুর আগেই জাহাঙ্গীর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন; পরে ক্ষমা লাভ করেন। তেমনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁর পুত্র খসরু বিদ্রোহ করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁর অন্যতমা বেগম নূরজাহান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন, যদিও জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নূরজাহানের বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্ষমতালাভ করেন শাহজাহান। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অন্যতম পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক শাহজাহান ক্ষমতাচ্যুত এবং বন্দী হন। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন এবং ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে বন্দী অবস্থাতেই শাহজাহানের মৃত্যু হয়। আকবরোত্তর যুগে একদিকে যেমন মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রসারিত হয়, তেমনি সম্রাটের সহযোগী শাসকশ্রেণীর ক্ষমতারও বৃদ্ধি হয়। সম্রাট এবং শাসকদের ক্ষমতার উৎস ছিল সৈন্যবাহিনী এবং সেই সূত্রে মনসবদারি প্রথার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়।

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনলাভ ঃ ফতেপুর সিক্রির সূফী ফকির সেলিম চিশতির আশীর্বাদপুষ্ট এবং অম্বর রাজকন্যা যোধপুরী বেগম-এর গর্ভজাত সন্তান সেলিম ছিলেন সম্রাট আকবরের প্রাণপ্রিয় পুত্র। আকবরের জীবনের প্রথম দিকে তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হোসেনের অকাল মৃত্যু হয়। তাই আকবর ফকিরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। বাস্তবত এক বছরের মধ্যে অম্বর রাজকন্যা যোধপুরী পুত্র সন্তান প্রসব করলেন (৩০ শে আগস্ট, ১৫৬৯ খ্রিঃ)। আশীর্বাদক ফকিরের নামেই আকবর সন্তানের নাম দিলেন 'সেলিম'। সেলিম চিশতির প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আকবর ফতেপুর সিক্রিতে গড়ে তুললেন একটি পরিকল্পিত নগর— যেখানে রয়েছে বেগম মহল, হিরণ মিনার, বীরবল ভবন, ইবাদাৎখানা ও সেলিম চিশতির দরগা। ইসলামিক রীতি অনুসারে সেলিমের চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে পাঠ আরম্ভ হলো। তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন আবদুর রহিম

খান-ই-খানান। ষোলো বছর বয়সে সেলিমের বিবাহ হলো জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের কন্যা মানবাঈ-এর বা যোধাবাঈ-এর সঙ্গে। বিবাহের পর তখন মানবাঈ -এর নাম হলো 'শাহ বেগম'। শাহ বেগমের গর্ভজাত সন্তান ছিলেন খসরু। এছাড়া আরও অনেক বিবাহ করেন জাহাঙ্গীর। অন্যান্য পত্নীদের মধ্যে বেগম নুরজাহানের নাম উল্লেখযোগ্য।

যৌবনের সূচনাতে সেলিম কু-প্রভাবে পড়ে সুরাসক্ত হয়ে উঠলেন। আকবর শত চেষ্টা করেও তাঁকে সৎপথে আনতে পারেননি। পিতৃবন্ধু আবুল ফজল এই প্রসঙ্গে তাঁকে কটাক্ষ করতেন। ইতোমধ্যে কিছু অনুচরের কুপরামর্শে সেলিম পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। এলাহবাদে উপস্থিত হয়ে সেলিম নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণা করলেন (১৬০০ খ্রিঃ) এবং সেখানে একটি পৃথক দরবারও প্রতিষ্ঠিত হলো। নিরুপায় হয়ে আকবর সুপরামর্শের জন্যে বন্ধু আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য থেকে ডেকে পাঠান। আগ্রায় আসার সময় আবুল ফজল সেলিমের প্ররোচনায় বুন্দেলখন্ডের রাজা বীরসিংহ বুন্দেলা কর্তৃক নিহত হন (১৬০২ খ্রিঃ)। বন্ধুর মৃত্যুতে আকবর মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। মোগল বিরোধী শত্রুদের দমনের জন্য আকবর মনস্থির করলেন। ঠিক সেই সময় সেলিমা বেগমের চেষ্টায় যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহী মনোভাব ত্যাগ করেন। হারেমের বেগমরা একত্রে সেলিমকে তিরস্কার করলেন। শেষে (১৬০৪ খ্রিঃ) তিনি পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় আকবর পুত্রকে ক্ষমা করলেন।

ঠিক এই সময় আকবর স্বয়ং দৈহিক অসুস্থতা ও আত্মীয় বিয়োগে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। আকবরের মৃত্যু যখন আসন্ন (১৬০৫ খ্রিঃ) তখন সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠল। মানসিংহ এবং মীর্জা আজিজ কোকা সেলিমকে বঞ্চিত করে তাঁর পুত্র খসরুকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্যে ষড়যন্ত্র করলেন। খসরু ছিলেন সেলিমের রাজপুত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। আকবর তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মৃত্যুর পূর্বেই (১৬০৫ খ্রি:) আকবর সেলিমের শিরে রাজমুকুট ও হস্তে হুমায়ুনের তরবারি অর্পণ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম "নুরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী" উপাধি নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা ঃ সম্রাট আকবরের তিরোধানের পরই (১৬০৫ খ্রিঃ) আগ্রা দুর্গে সেলিমের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলো। এই সময় তিনি কতকগুলি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কথা ঘোষণা করলেন। **প্রথমত**, যে সকল অভিজাত ব্যক্তি তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন তিনি তাদেরক ক্ষমা করলেন। এই সময় বহুবন্দী মুক্তি পেল। **দ্বিতীয়ত**, তিনি নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করলেন। সবচেয়ে মূল্যবান মুদ্রার নাম ছিল 'নুর-ই-জালানী'। **তৃতীয়ত**, জাহাঙ্গীর আগ্রা দুর্গের শাহবুরুজ থেকে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত তিরিশ গজ লম্বা একটা সোনার শিকলকে এমনভাবে টাঙ্গিয়ে দিলেন যে শিকল টানলেই দুর্গের ঘণ্টা

বেজে ওঠে। ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিতরাই এই শিকল টেনে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। চতুর্থত, এই সময় জাহাঙ্গীর ১২টি আইন বা 'দস্তুর-উল-আমল'' জারি করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হলো : (১) আকবর ও জাহাঙ্গীরের জন্মদিনে যথাক্রমে রবিবার ও বৃহস্পতিবার পশুহত্যা নিষিদ্ধ হলো। (২) পথিপার্শ্বে সরাই খানা স্থাপন, কূপ-খনন, মসজিদ ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হলো। (৩) শাস্তিদান হিসেবে নাসাকর্ণ ছেদন নিষিদ্ধ হলো। (৪) সরকারি অনুমতি ভিন্ন সুরা ও সুরাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন নিষিদ্ধ হলো। (৫) 'তামাখা', 'মীর বাহরী' ইত্যাদি কয়েকটি অতিরিক্ত কর নিষিদ্ধ হলো। (৬) বণিকদের অনুমতি ছাড়া তাদের মালপত্র সরকারি কর্মচারীগণ কর্তৃক উন্মুক্ত করার প্রথা নিষিদ্ধ হলো। (৭) মৃতব্যক্তির সম্পত্তি যাতে উত্তরাধিকারীরা পায় এবং উত্তরাধিকারীর অভাবে সেই সম্পত্তি যাতে রাজ্য সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়, সেই ঘোষণা করা হলো। (৮) আকবরের আমলের সকল কর্মচারী নিজ নিজ পদে যাতে বহাল থাকেন সেরূপ ঘোষণাও করা হলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, অভিষেকের দিনই জাহাঙ্গীর আবুল ফজলের পুত্র আবদুর রহমানকে দু-হাজারী মনসবদারী দিয়েছিলেন। অন্যদিকে আবুল ফজলের হত্যাকারী বীরসিংহ বুন্দেলাকেও শাস্তি না দিয়ে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। নূরজাহানের পিতা মীর্জা গিয়াস বেগকে দেওয়ান পদে উন্নীত করা হলো। এইভাবে তিনি পূর্বতন রাজনৈতিক পরিবেশটিকে নিজের অনুগত করার চেষ্টা করলেন ।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব : বিবিধ চরিত্রের মানুষ জাহাঙ্গীর ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলিম নরপতি সম্রাট আকবরের পুত্র।[১] তাঁর মাতা ছিলেন ধর্মশীলা রাজপুত রমণী। সুতরাং জাহাঙ্গীরের মধ্যে এশিয়ার চাঘতাই বংশ ও ভারতের রাজপুত বংশের রক্তের ধারা প্রবাহিত ছিল। তাছাড়া জাহাঙ্গীর ছিলেন ফতেপুর সিক্রির বিখ্যাত ফকির সেলিম চিশ্‌তির আশীর্বাদ ধন্য সন্তান। প্রথম জীবনে জাহাঙ্গীর যেমন পিতা আকবরের 'ইবাদাৎ খানার' ধর্মালোচনা শুনতেন তেমনি আবার বাদশাহী দরবারের সংশ্লিষ্ট পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণীদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

এরূপ পটভূমিতে জাহাঙ্গীর শাসকরূপে পিতা সম্রাট আকবরের নীতি ও শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি প্রয়োজন অনুসারে আকবর প্রবর্তিত একাধিক আইন-বিধি সংশোধন করেন। যেমন, প্রথমত রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানেই তিনি বারো দফা বিধি ঘোষণা করেন। সকল স্তরেব বিচারপ্রার্থী যাতে ব্যক্তিগত ভাবে সম্রাটের ন্যায়-বিচার পায় তার জন্যে ঘণ্টাযুক্ত 'ন্যায় শৃঙ্খল' নির্মাণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, রাজ্যজয়, বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে তিনি বহুলাংশে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মৈত্রীবন্ধন ও যুদ্ধনীতি দুটিই ছিল তাঁর পন্থা। বাংলা, মেবার, আহমদনগর ও কাংড়া দুর্গ জয়ের ক্ষেত্রে তাঁর অভিযান সার্থক

হলেও কান্দাহারে তাঁর পরাজয় মোগল পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটা দারুণ আঘাত বলেই পরিগণিত হলো। সম্রাট আকবরের সময় পারস্যের সঙ্গে যে সৌহার্দ্য ছিল সেটি আর রইল না। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে স্থলপথে যে বাণিজ্য চলত সেটিও আঘাতপ্রাপ্ত হলো। অবশ্য এরূপ ব্যর্থতার জন্যে ক্ষমতাপিপাসু নূরজাহানের দায়িত্ব মোটেই কম ছিল না। তৃতীয়ত, জাহাঙ্গীরের আমলে ইয়োরোপীয় বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করে এদেশে যথেষ্ট অর্থাগম হতে থাকে। অন্যদিকে আবার পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারেননি। তবে তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে পর্তুগীজ চার্চ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি ইংরেজদের বাণিজ্যের 'ফরমান' দিয়ে অদূরদর্শিতার কাজ করেছিলেন। কারণ এই ফরমানে ইংরেজদের মালের উপর সুরাটে আমদানি শুল্ক লোপ করা হয় এবং ইংরেজ অপরাধীদের ইংল্যান্ডের আইনে বিচার করার প্রতিশ্রুতি ছিল সেই আদেশপত্রে।

জাহাঙ্গীরের চরিত্রে নানা বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ ঘটেছিল। একদিকে তিনি ছিলেন কমনীয় অন্যদিকে কঠোর, বর্বর অথচ ভদ্র। শুভবুদ্ধি যেমন ছিল তেমনি ছিল তাঁর খামখেয়ালীপনা। মদ্যপান, বিলাসপ্রিয়তা শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্ত্রী নূরজাহানের হাতের পুতুল করেছিল। উপরোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন, **প্রথমত**, জাহাঙ্গীর তাঁর পিতা আকবরকে 'ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত' ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি পিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বদাউনী রচিত ইতিহাসে আকবর সম্পর্কে কটূক্তি থাকায় তিনি তার পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করেন এবং রচয়িতার পুত্রকে কারারুদ্ধ করেন। অন্যদিকে তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, পিতার বন্ধু আবুল ফজলকে হত্যা করেছেন। কিন্তু অভিষেকের সময় তিনি সেই আবুল ফজলের পুত্রকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

দ্বিতীয়ত, জীবে দয়া ছিল জাহাঙ্গীরের অন্যতম গুণ। রাজহস্তীকে শীতার্থ দেখে তিনি হাতীর মাহুতকে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন। শিকারের সময় পাল্কী বাহকের ভুলে হরিণ পালিয়ে যাওয়ায় তিনি ক্রোধে পাল্কী বাহকের পা কেটে দেওয়ার আদেশ দেন। এরূপ খামখেয়ালীপনা ও নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তৃতীয়ত, পিতা হিসেবে নিজের বিদ্রোহী পুত্রদের সঙ্গে ব্যবহারেও তাঁর স্নেহশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। খসরুর চক্ষু উৎপাটন ও হত্যার জন্যে তাঁকে দায়ী করা যায় না। বিদ্রোহী হলেও খসরুকে তিনি অত্যধিক ভালবাসতেন। তাই তাঁকে ক্ষমা করা সহজ হলো।

চতুর্থত, পিতার 'দীন-ই-ইলাহী' মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান। তবে তিনি বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা শুনতেন, তাছাড়া, হিন্দু ও অন্যান্য মতবাদে বিশ্বাসী সাধু-সন্তদের শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ক্রোধবশত দেবমূর্তি ভাঙতে ও নতুন মন্দিরের নির্মাণ সমাপ্ত না করার আদেশ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। এসব ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও তিনি ধর্ম-বিষয়ে অনুদার ছিলেন তা বলা যায় না। হিন্দুদের বহু উৎসবে তিনি যোগদান করেছেন।

বিবিধ চরিত্রের মানুষ হলেও ব্যক্তিগত জীবনে জাহাঙ্গীর ছিলেন সংগীতপ্রিয়, চিত্রে পারদর্শী এবং সাহিত্যপ্রিয়। স্বরচিত 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' অপূর্ব ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গুণী-জনের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন নি। হিন্দু কবি ও সাহিত্যরসিকদের তিনি 'কবিরায়' 'মহামাত্র' ইত্যাদি উপাধি প্রদান করতেন। তিনি ছিলেন সুচারু শিল্পবোধের অধিকারী। তাঁর আমলে চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। তিনি নিজেও চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। আগ্রা দরবারের দেওয়ালচিত্রের মধ্যে অনেকগুলি তাঁর নিজের হাতেই আঁকা। মনসুর, ফারুক বেগ, কেশব, মনোহর প্রমুখ চিত্রশিল্পীরা দরবারী সমাদর লাভ করেন।

সুরাসক্তি-ই তাঁর জীবনের প্রধান অভিশাপ। মদ আর আফিমের নেশায় মেতে তিনি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। শেষ জীবনে নিজের হাতে সুরার পাত্র তুলে ধরার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। রাজকার্যে এসেছিল অবহেলা, নূরজাহান সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। নূরজাহানের চক্রান্ত ও সহায়তা একত্রে জাহাঙ্গীরকে দিশাহারা করে তুলেছিল। ক্রমেক্রমে তাঁর চরিত্রের বিপরীত ধর্মিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ নীতি এবং সীমান্তের প্রসার আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব। তাঁর রাজত্বকালের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী নূরজাহানের নাম। কারণ জাহাঙ্গীরের জীবনে তথা মোগল ইতিহাসে নূরজাহান এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। নূরজাহানের পূর্ব নাম ছিল মেহেরুন্নিসা এবং তার পিতা মির্জা গিয়াস বেগ ভাগ্যান্বেষণে পারস্য থেকে ভারতে এসে মোগল রাজকর্ম লাভ করেন। মেহেরুন্নিসার বিবাহ হয় আলিকুলি বেগ নামে এক ইরানী মুসলমানের সঙ্গে, যিনি বাংলাদেশের বর্ধমানে জায়গির পেয়েছিলেন এবং শের আফগান নামে পরিচিত হন। শের আফগান উদ্ধত ও বিদ্রোহী হওয়ায় বাংলার মোগল শাসনকর্তা কুতুবউদ্দিন কোকা তাকে বন্দী করতে চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত শের আফগান নিহত হন। এরপর বন্দিনী মেহেরুন্নিসাকে দিল্লি পাঠানো হয় এবং পরে ১৬১১ খ্রিঃ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তখন তার নাম হয় নূরজাহান। অনেক আগেই মেহেরুন্নিসার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন জাহাঙ্গীর এবং মেহেরুন্নিসাকে লাভ করার জন্যেই তাঁর স্বামী শের আফগানকে লোক মারফৎ হত্যা করিয়েছিলেন—এমন একটি মত কোনও কোনও লেখক অনুমান করলেও ডঃ বেণীপ্রসাদ জাহাঙ্গীরকে নির্দোষ বলেছেন। এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণাভাবে কিছু বলা মুশকিল।

তবে রূপবতী শুধু নয়, নূরজাহান ছিলেন বিদূষী। তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্রমেক্রমে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পিতা গিয়াসবেগ (পরে নাম হয় ইতিমাদউদ্দৌল্লা) এবং ভ্রাতা আসফ খান সহ অনুগত অভিজাতদের নিয়ে যে গোষ্ঠীতন্ত্রের সূচনা করেন তা সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছিল। প্রবীণ আমীর মহাব্বত খান নূরজাহানের চক্রান্তেই সম্রাটের বিরোধী হন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরেও শাহজাহানের বদলে নিজ জামাতা (প্রথম

বিবাহজাতকন্যার স্বামী এবং জাহাঙ্গীরের পুত্র) শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল নূরজাহান বেঁচে ছিলেন (১৬৪৫ খ্রিঃ মৃত্যু) এবং লাহোরে জাহাঙ্গীরের কবরের পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়।

শাহজাহানের সিংহাসনলাভ ঃ শাহজাহানের বাল্য নাম ছিল খুররম। তিনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র এবং রাজপুত পত্নী জগৎ গোসাঁই-এর গর্ভজাত সন্তান। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে পৌষ মাসের এক পূর্ণিমা তিথিতে লাহোরে তাঁর জন্ম হয়। তাই তার নাম রাখা হয় খুররম- অর্থ পূর্ণচন্দ্র। সম্রাট আকবর তাকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনিই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও দায়িত্ব পালনের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা লক্ষ্য করে পিতা জাহাঙ্গীর তাঁকে উচ্চপদে নিয়োগ করেন। প্রথমে (১৬০৭ খ্রিঃ) তাকে দশ হাজারী মনসবদারি পদে নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া তিনি পনেরো বছর বয়সে হিসার-ই-ফিরুজের জায়গিরও লাভ করেন (১৬০৭ খ্রিঃ)। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিমাতা নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খানের কন্যা মমতাজকে বিবাহ করেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। জাহাঙ্গীরের চার পুত্রের মধ্যে খসরু এবং পরভেজ মৃত। বর্তমান ছিলেন খুররম বা শাহজাহান এবং শাহরিয়ার। শাহজাহান ছিলেন নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খানের জামাতা, আর শাহরিয়ার ছিলেন নূরজাহানের জামাতা। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী নূরজাহান ছিলেন সর্বেসর্বা। নূরজাহান তাঁর জামাতা শাহরিয়ারকে উত্তরাধিকার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন। অন্যদিকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকালে শাহজাহান ছিলেন দূরে দাক্ষিণাত্যে। তাই তাঁর শ্বশুর আসফ খান দিল্লিতে ফিরে আসার জন্যে শাহজাহানকে জরুরি নির্দেশ দিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আসফ খান খসরুর পুত্র দারবক্সকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। অন্যদিকে শাহরিয়ার লাহোরে নিজেকে দিল্লির বাদশাহরূপে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসফ খান সসৈন্যে লাহোর অবরোধ করে শাহরিয়ারকে পরাজিত করলেন ও তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিলেন। জামাই খুররমের নির্দেশ মত আসফখান বাদশাহী মসনদের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্রমেক্রমে হত্যা করলেন। অনেকের মতে দারবক্স পারস্যে পলায়ন করেন। নূরজাহানও রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে অতি সাদাসিধে জীবনযাপনে তৎপর হলেন। সিংহাসনটিকে নিষ্কণ্টক করে খুররম 'শাহজাহান' উপাধি নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন (ফেব্রুয়ারী, ১৬২৮খ্রিঃ)। পাঁচ মাস পরে আগ্রায় মহাসমারোহে তাঁর অভিষেক ক্রিয়াসম্পন্ন হয়। কিন্তু সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হত্যার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেন নিজের জীবনের শেষাংশে পুত্রদের রক্তক্ষয়ী উত্তরাধিকার যুদ্ধের মাধ্যমে তা পরিশোধ করতে হয়েছিল। মোগল ইতিহাসে বিষয়টি নিতান্ত কলঙ্কজনক।

নানা বিদ্রোহ ঃ রাজত্বের গোড়ায় শাহজাহান একাধিক বিদ্রোহ ও বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্তা খান জাহান লোদী

ছিলেন শাহজাহানের বিরোধী। শাহজাহানের অভিষেকের পর তিনি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এই সময় শাহজাহান তাঁর পরিবর্তে মহব্বত খানকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে খান জাহান লোদী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও আহমদনগরের নিজামশাহী সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা করে মোগল সাম্রাজ্যের স্বার্থ-বিরোধী কর্মে লিপ্ত হন। খান জাহান লোদী প্রায় তিন বছর (১৬২৮-১৬৩১ খ্রিঃ) যাবৎ শাহজাহানকে বিব্রত করেন। শেষে শাহজাহান নিজে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়ে তাকে পরাজিত (১৬৩১ খ্রিঃ) ও নিহত করেন।

উপরোক্ত বিদ্রোহের সময় বুন্দেলখণ্ডের ঝুঝর সিংহ বুন্দেলার বিদ্রোহ (১৬২৮-২৯ খ্রিঃ) শাহজাহানকে আরও বিব্রত করেছিল। স্মরণ করা যায় যে, জাহাঙ্গীরের প্ররোচনায় বুন্দেলা-রাজ বীর সিংহ পিতৃবন্ধু আবুল ফজলকে হত্যা করেছিলেন। তাই জাহাঙ্গীর বীর সিংহকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার বীর সিংহের পুত্র ঝুঝর সিংহ শাহজাহানের রাজসভায় সম্মানিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঝুঝর সিংহের বিরুদ্ধে ছিল অনেক অভিযোগ। শাহজাহান তাঁর কাছে রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব দাখিলের নির্দেশ দেন। ঝুঝর সিংহ অপমানিত বোধ করেন ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শাহজাহান বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করলে (১৬২৯ খ্রি:) ঝুঝরসিংহ বশ্যতা স্বীকার করেন। পাঁচ বছর কাল ঝুঝর সিংহ নীরব ছিলেন। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় বিদ্রোহ করলে রাজপুত্র আওরঙ্গজেবের হাতে পরাজিত হন। যুদ্ধে ঝুঝর সিংহ এবং তাঁর পুত্র বিক্রমজিৎ নিহত হন।

শাহজাহানের অভিষেকের পর তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে (১৬৩০-৩২ খ্রি:) গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের পর এসেছিল মড়ক ও ব্যাপক মহামারী। পিটার মণ্ডি নামক এক ইংরেজ বণিক সুরাট থেকে আগ্রা ও পাটনা যাতায়াতের বিবরণে দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন। এছাড়া মোগল দরবারের ঘটনাপঞ্জী লেখক আব্দুল হামিদ লাহোরীর রচনা থেকেও এই মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের বর্ণনা পাওয়া যায়। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যে অমানুষে পরিণত হয়, মানুষ মানুষের মাংস, পিতা তার সন্তানের মাংস ভক্ষণ করতেও দ্বিধা করে নি।

বিলাসপ্রিয় শাহজাহান দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্যে প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য হলেও **প্রথমত** লঙ্গখানা খুলে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করেন, **দ্বিতীয়ত**, কোন্ কোন্ স্থানে দৈনিক পাঁচ হাজার পরিমাণ অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করেন, **তৃতীয়ত**, মনসবদ্রারদেরকেও সেবামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন, **চতুর্থত**, সাত লক্ষ টাকার রাজস্ব মুকুব করার নির্দেশ দেন। ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, এই দুর্ভিক্ষ ছিল শাহজাহানের রাজত্বের প্রথমাংশের একটা বিশেষ বিপত্তি।

পর্তুগীজ দমন ঃ মোগল সাম্রাজ্য স্থিতিশীল হওয়ার পূর্বেই পশ্চিমে গোয়া-দমন-দিউ থেকে পূর্বে হুগলি পর্যন্ত ভারতের সমগ্র উপকূলভাগে পর্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠী ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট আকবরের আমলে ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটের এক 'ফরমান'

অনুসারে তারা হুগলি নদীতীরে সপ্তগ্রাম উপনিবেশ স্থাপন করে। সেখান থেকে তারা হুগলি নামক স্থানে এগিয়ে যায় ও প্রাচীর বেষ্টিত একটি দুর্গ-নির্মাণ করে। চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুরা এসে এদের সঙ্গে মিলিত হয়। ব্যবসায়ের নামে তারা নানা ধরণের অত্যাচার করত। দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে এরা শুল্ক আদায় করত, গ্রাম-গঞ্জে প্রবেশ করে লুটতরাজ করত। শিশু, বালক-বালিকাদের ধরে নিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করত, জোর করে খ্রিস্টান করে নিত। এক কথায়, পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার সহ্যের মাত্রা অতিক্রম করে। জাহাঙ্গীর অনেক চেষ্টা করেও এদেরকে দমন করতে পারেননি। সম্রাট শাহজাহানের আমলে পর্তুগীজ দস্যুদের সাহস অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। জানা যায়, বেগম মমতাজ মহলের দুই বাঁদীকে তারা ধরে নিয়ে যায়। তাছাড়া, শাহজাহানের অভিষেকের সময় পর্তুগীজরা কোনও সম্মান সূচক বাণী বা উপহার প্রেরণ করেনি। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে শাহাজাহান ক্রুদ্ধ হয়ে এদের দমন করার জন্যে সুবাদার কাসিম আলি খানকে প্রেরণ করেন। তিন মাস অবরোধের পর হুগলি মোগলদের অধিকারে আসে। পর্তুগীজদের ধনসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়, চার হাজার পর্তুগীজ বন্দীকে আগ্রায় পাঠান হয় এবং তারা শাস্তি পায়। আর হুগলির প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গে যে দশ হাজার স্থানীয় লোকজনকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তারা মুক্তি পায়। এরপর বিদেশী বণিকবেশী দস্যুদের স্পর্ধা আপাতত স্তব্ধ হয়।

শাহজাহানের রাজত্বকাল ঃ ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক বন্দী হওয়া পর্যন্ত তিরিশ বছর শাহজাহান ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। এর মধ্যে প্রাথমিক সমস্যাদি কাটিয়ে উঠে তিনি রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করেছিলেন। (পরে যথাস্থানে তা আলোচনা করা হবে।) বুন্দেলা সর্দার জুঝর সিং এর বিদ্রোহ দমন, দাক্ষিণাত্যে মোগল শাসক খানজাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, বাংলায় পর্তুগীজ দমন ইত্যাদির পাশাপাশি দাক্ষিণাত্যের সীমানা প্রসার যেমন তিনি করেছিলেন, তেমনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং মধ্য এশিয়ার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। এই সবের পাশাপাশি শিল্প-স্থাপত্যের অনুরাগী হিসেবে নিজের পরিচয় রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য সৃষ্টি 'তাজমহল', যা তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন পত্নী মমতাজমহলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। মমতাজের আসল নাম আরজুমান্দ বানু বেগম। জন্ম ১৫৯৪ খ্রিঃ। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ কানের কন্যা আরজুমান্দের সঙ্গে শাহজাহানের বিবাহ হয় ১৬১২ খ্রিঃ আর ১৬৩১ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু ঘটে। তার পুত্রদের মধ্যে দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদ এবং দুই কন্যা জাহানারা ও রোশেনারা-র কথা আমরা জানি। আবদুল হামিদ লাহোরীর সাক্ষ্য অনুসারে মমতাজের মৃত্যুতে শাহজাহান বিশেষ ভেঙে পড়েছিলেন এবং পরে প্রিয় পত্নীর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখতেই বিপুল ব্যয়ে তাজমহল নির্মাণ করান।

শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব : শাহজাহানের যুগে কি মোগল সাম্রাজ্য গৌরব শীর্ষে আরোহণ করেছিল? : ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরী প্রদত্ত তথ্য অনুসারে শাহজাহানের রাজ্যসীমা উত্তরে আফগানিস্তান থেকে দাক্ষিণাত্যের আউস এবং পশ্চিমে সিন্ধুদেশ থেকে পূর্বে আসামের শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। একমাত্র কান্দাহার ও মধ্য-এশিয়ার পিতৃপুরুষের অধিকৃত ভূখণ্ড ছাড়া অন্য সর্বত্রই তিনি সামরিক কৌশল ও কূটনীতির পরিচয় দিয়েছেন। দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তিনি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। (১) দক্ষিণ ভারতে শিবাজীর অভ্যুত্থান সম্পর্কে তিনি কল্পনা করতে পারেননি। (২) বৈদেশিক, প্রধানত ইয়োরোপীয় বণিকদের ক্ষেত্রে তিনি যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করতে পারেননি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শাহজাহান সাধারণভাবে আকবরের শাসনব্যবস্থাকেই অনুসরণ করেছিলেন। তবে রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোনও কোনও ক্ষেত্রে শাসন প্রক্রিয়ার কিছু কিছু পরিবর্তন করাই ছিল স্বাভাবিক।

কারও কারও মতে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের চরম বিকাশ ঘটেছিল।[১] এ প্রসঙ্গে যেসব যুক্তি দেখানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ (ক) তাঁর রাজত্বকালে কোনও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হয়নি। (খ) শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম স্তরে দু-একটি ঘটনা ভিন্ন কোন বড় ধরনের বিদ্রোহ হয়নি। (গ) ইয়োরোপীয় বণিকদের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির পথ সহজতর হয়েছিল। (ঘ)দক্ষিণভারতে মোগল কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হওয়ায় সুরাটসহ অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্র মোগলদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। (ঙ) কোনও কোনও ঐতিহাসিক এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, নতুন নতুন খাল খননের ফলে এ যুগে কৃষির উন্নয়ন ঘটেছিল। (চ) শাহজাহানের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র শিল্পের উন্নয়ন যে-কোনও দর্শককে মুগ্ধ করে। তাই অনেকেই শাহজাহানের রাজত্বকালকে 'সুবর্ণ যুগ' হিসেবে অভিহিত করার পক্ষপাতী। (ছ) শাহজাহানের শাসনের প্রশংসা অনেকেই করেছেন। যেমন কাফি খাঁ লিখেছেন, যদিও আকবর ছিলেন বিজেতা ও আইন-প্রণেতা তবুও সাম্রাজ্যের শান্তি ও শাসনদক্ষতার বিচারে শাহজাহানের রাজত্বকাল ছিল অনেক উন্নত। ইতালির পর্যটক মানুচি *(Manucci)* শাহজাহানকে নিরপেক্ষ সুবিচারক ও সুশাসক হিসেবে প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ শাহজাহানের রাজত্বের বহুবিধ সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেছেন। যেমন, (ক) সম্রাটের জাঁকজমকতা, বিলাস-ব্যসন ; সৌধ নির্মাণ ইত্যাদির জন্যে মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করা হত। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্যে শাহজাহান **প্রথমত**, উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশের পরিবর্তে অর্ধাংশ ধার্য করলেন। **দ্বিতীয়ত**, খাসজমির দশ ভাগের সাত ভাগ তিনি নগদ অর্থের বিনিময়ে বিলি করে দিলেন। **তৃতীয়ত**, পূর্বে কর্ষিত জমির উপর রাজস্ব ধার্য করা হত। শাহজাহান অকর্ষিত জমির উপর রাজস্ব ধার্য করলেন।

এছাড়া অন্যান্য কর নানা কৌশলে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ফলে শাহজাহানের রাজত্বে জনসাধারণ করভারে প্রপীড়িত ছিল। শ্রমিকরা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য পারিশ্রমিকে তাঁর স্মৃতিসৌধ তৈরির কাজে শ্রম দিতে বাধ্য ছিল। সুতরাং বলা যায়, শাহজাহানের রাজত্বে বহির্বিভাগীয় আলোর তলায় অন্ধকার ঘনীভূত হতে আরম্ভ করে।

(খ) শাহজাহানের রাজত্বে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু পর্যটক পিটার মাণ্ডি বলেন, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্যে রাজকোষ থেকে যথাযথ অর্থ ব্যয় করা হয়নি। তাছাড়া দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রবের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। (গ) ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজ্য জয় ও বিদ্রোহ দমনে শাহজাহানের কৃতিত্ব থাকলেও কান্দাহার ও মধ্য এশিয়ায় সামরিক অভিযানের ব্যর্থতা মোগল শক্তির মর্যাদা হানি করেছে , অর্থ ও সৈন্য ক্ষয় করেছে। (ঘ) শাহজাহানের ধর্মনীতির মধ্যে ছিল অসহিষ্ণুতা। হিন্দু, খ্রিস্টান, শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি শাহজাহানের আচরণ ছিল বৈষম্যমূলক। তাঁর সেই বৈষম্যমূলক আচরণই পরবর্তী সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ধর্মান্ধতায় আত্মপ্রকাশ করে এবং তা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা শাহজাহানের রাজত্বকালকে 'সুবর্ণযুগ' হিসেবে আখ্যায়িত করতে নারাজ। বরং অনেকেই শাহজাহানের রাজত্বের উন্নতির সঙ্গে বিপ্লব-পূর্ব ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বের তুলনা করেছেন। উভয়ের রাজত্বই ছিল অন্তঃসার শূন্যতার যুগ। টমাস রো, বার্ণিয়ে প্রমুখ পর্যটকরা তাকে একজন আরামপ্রিয় ও দয়া-মায়াহীন ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। মোট কথা, সমৃদ্ধির উচ্চ শিখায় তুলে শাহজাহান মোগল সাম্রাজ্যের আর চতুর্দশ লুই ফ্রান্সের যে আসন্ন পতন প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন তাকে প্রতিরোধ করা পরবর্তী কোনও সম্রাটের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ভিনসেন্ট স্মিথ শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগলযুগের গৌরবশীর্ষ বললেও তা সমর্থনীয় নয়। পর্তুগীজ প্রভাব দমন বা দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার যেমন তার কৃতিত্বের পরিচায়ক, তেমনি অন্যদিকে তার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি বা মধ্য-এশিয়া নীতি ব্যর্থ। সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার ফলে উন্নতমানের শিল্প-স্থাপত্য যেমন অসাধারণ, তেমনি অন্যদিকে অমিতব্যয় রাজ্যের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধ্বংস করে। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও শাহজাহান আকবরের মতন উদার ছিলেন না। সর্বোপরি দেশের সাধারণ মানুষদের অবস্থা বিচার করলে কোনও মতেই এই যুগকে সুবর্ণযুগ বলা যায় না। অধ্যাপক ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন যে, কৃষিক্ষেত্রেও শাহজাহান তেমন সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। ডঃ বানারসী প্রসাদ সাক্সেনার মতানুযায়ী শাহজাহান বিখ্যাত শাসক কিন্তু মহামতি নন।

২। সীমান্তের প্রসার

মোগল সম্রাট আকবর যে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার পুত্র জাহাঙ্গীর এবং পৌত্র শাহজাহান সেই নীতি অব্যাহত রেখেছিলেন। ফলে মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা

ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হতে থাকে। আকবরোত্তর যুগে দাক্ষিণাত্যে যেমন সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয়, তেমনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও বিস্তৃতি ঘটে। আমরা জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে রাজ্যবিস্তার একে একে আলোচনা করতে পারি।

জাহাঙ্গীরের আমলে সাম্রাজ্যের প্রসার ঃ বাংলায় বাদশাহী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা— (১৬১৩ খ্রিঃ) সম্রাট আকবর কর্তৃক বিজিত সাম্রাজ্যের কোনও কোনও অংশের যুদ্ধ অসমাপ্ত ছিল। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে জাহাঙ্গীরকেই সেইসব যুদ্ধ পরিচালনা করতে হলো। সম্রাট আকবর পূর্বাঞ্চলের দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ জয় করেছিলেন। কিন্তু বাংলার আফগান আমীরদের সঙ্গে বারো ভূঁইয়ারা (জমিদারগণ) সম্পূর্ণ দিল্লির অধীনতা স্বীকার করতেন না। আফগান আমীরদের নেতৃত্বে ছিলেন ওসমান খান। বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য, ঈসা খান প্রমুখ দিল্লির আধিপত্য অস্বীকার করতেন। তাঁরা সুদক্ষ পর্তুগীজ নৌসেনাদের সাহায্য নিয়ে অনেকবার বাদশাহী সেনাদের পরাজিত করেছেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহী সুবাদার নিযুক্ত হলেন ইসলাম খান। তিনি ছিলেন ধর্মগুরু সেলিম চিস্তির পুত্র এবং জাহাঙ্গীরের অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি। ১৬০৮ থেকে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইসলাম খান একে একে সকল বিদ্রোহীকে দমন করে বাংলায় মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলাম খানের শাসনকালে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। নতুন নগরীর নাম হল জাহাঙ্গীর নগর।

মেবারের সঙ্গে সংগ্রাম ঃ সম্রাট আকবরের আমলে সমগ্র রাজপুতনায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। রানা প্রতাপ সিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেননি। প্রতাপ সিংহের পর তাঁর পুত্র অমর সিংহও মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেননি। তাই জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরে (১৬০৫ খ্রিঃ) দ্বিতীয় পুত্র পরভেজের নেতৃত্বে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। এরপর সেনাপতি মহব্বৎ খান ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মেবার আক্রমণ করেন পুনরায় ব্যর্থ হলেন। শেষে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ খুররমকে এক বিশাল বাহিনীসহ পাঠানো হলো। বাদশাহী সেনাদল সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়াও মাসের পর মাস লুটপাট ও অত্যাচার করল। মেবারে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিল। শেষে বাধ্য হয়ে অমর সিংহ ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মোগলের আনুগত্য স্বীকার করলেন ও উভয়ের মধ্যে সম্মানজনক শর্তে সন্ধি হলো। সন্ধির শর্ত হলো ঃ (১) মেবারের রাজধানী চিতোর থাকবে রাণা অমর সিংহের হস্তে; (২) বাদশাহের দরবারে হাজির হওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকবে না, (৩) বাদশাহের পরিবারে কন্যা সমর্পণ করতে হবে না, এছাড়া (৪) বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ জাহাঙ্গীর রাণা অমরসিংহ এবং তার পুত্র কর্ণসিংহের মর্মর মূর্তি নির্মাণ করিয়ে আগ্রার রাজোদ্যানে স্থাপন করলেন।

সম্রাট আকবর আহমদ নগরের উত্তরাংশ জয় করেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণাংশ স্বাধীন ছিল। এই দক্ষিণাংশের শাসক ছিলেন মালিক অম্বর নামক এক বিচক্ষণ হাবসী খোজা। তিনি ছিলেন নিজামশাহী বংশের রাজপুত নরপতি দ্বিতীয় মুর্তাজার মন্ত্রী। তিনি জমি

বন্দোবস্ত দেওয়া ও রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন করে রাষ্ট্রের আয় ও প্রজার সন্তুষ্টি বিধান করেন। **দ্বিতীয়ত,** মুসলিম সৈনিকদের পরিবর্তে মারাঠাদের নিয়ে ক্ষিপ্রগতিময় 'গেরিলা' বাহিনী গঠন করেন। এদের হাতে মোগল বাহিনী বারবার বিধ্বস্ত হলো। বহু চেষ্টা করেও শাহজাদা পরভেজ ব্যর্থ হয়। শেষে শাহজাদা খুররম রাজধানীসহ কয়েকটি নগর জয় করায় (১৬১৬ খ্রিঃ) জাহাঙ্গীর খুশি হয়ে খুররমকে 'শাহজাহান'' (পৃথিবীরপতি) উপাধি প্রদান করে তিরিশ হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করেন।

মোগলদের সঙ্গে আহমদনগরের সন্ধি : কিন্তু শাহজাহানের এই বিজয় বেশি দিন স্থায়ী হলো না। মালিক অম্বর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে মিত্রতা করে পুনরায় মোগল বিরোধী আচরণ শুরু করলেন। বাধ্য হয়ে জাহাঙ্গীর পুত্র শাহজাহানকে বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। তখন বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহম্মদনগর মোগলদের মোটা অঙ্কের নজরানা প্রদান করতে বাধ্য হয় (১৬১৭ খ্রিঃ)। ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে আহমদ নগর মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করে।

কাংড়া দুর্গ জয় (১৬২০ খ্রিঃ) : সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাভি ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী নগরকোট বা কাংড়া দুর্গ ছিল সাম্রাজ্যের বহির্ভূত অংশ। অতীতে এই দুর্গটি সুলতান মামুদ (১০০৯ খ্রিঃ) এবং ফিরুজ তুঘলক (১৩৬০ খ্রিঃ) লুণ্ঠন করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময় শাহজাদা খুররম চৌদ্দমাস অবরোধের পর ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গটি জয় করেন। পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ভেদ্য কাংড়া দুর্গ জাহাঙ্গীরের হস্তগত হলো।

কান্দাহার হস্তচ্যুত : কান্দাহার হাত ছাড়া হওয়াটাই ছিল জাহাঙ্গীরের জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কান্দাহার ছিল মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সীমা। পারস্যের সুলতান শাহ আব্বাস সীমান্তের এই এলাকাটির জন্যে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। তিনি অর্থ ও উপঢৌকন দিয়ে মোগল শাসকদের বশীভূত করার চেষ্টা করতেন। অন্যদিকে মোগল দরবারে উপঢৌকন পাঠিয়ে সৌহার্দ্য স্থাপন করতেন। তিনি সুযোগ বুঝে ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহার অবরোধ করেন। পরের বছর (১৬২২ খ্রি:) জুন মাসে কান্দাহার তাঁর দখলে আসে। এই সময় মোগল দরবার ও পরিবারের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জন্যে কান্দাহার পুনরাধিকার করা আর সম্ভব হয়নি।

আসলে সম্রাট আকবর কান্দাহার জয় করে তা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। তার আগে এই সমৃদ্ধ বাণিজ্য এলাকাটি বাবর জয় করেছিলেন; তার মৃত্যুর পর তা পেয়েছিলেন তৎপুত্র কামরান; পরে হুমায়ুন তা ছিনিয়ে নেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর পারস্য সম্রাট কান্দাহার দখল করেন (১৫৫৮ খ্রিঃ)। তখন থেকে কান্দাহার নিয়ে পারস্যের সঙ্গে মোগলদের দীর্ঘকালীন বিবাদ শুরু হয়। কান্দাহারে নিযুক্ত পারসিক শাসক মুজফফর হোসেনের কাছ থেকে আকবর এই অঞ্চল অধিকার করেন। আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত কান্দাহার ভারতের অংশ ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে ১৬২২ খ্রিঃ পর্যন্ত তাই ছিল। বস্তুত পারস্যের শাফাভি বংশীয় সম্রাট শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯

খ্রিঃ) সিংহাসনে থাকাকালীন কান্দাহার পুনরুদ্ধার করতে যত্নবান হন। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কান্দাহার আক্রমণ করেও তা জয় করতে পারেননি। এরপর উপরে উপরে জাহাঙ্গীরকে উপঢৌকন পাঠিয়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখা এবং তলায় তলায় কান্দাহার জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যান। ফলে জাহাঙ্গীর কান্দাহার সুরক্ষিত করার ব্যাপারে একটু শৈথিল্য দেখাতেই ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে শাহ আব্বাস কান্দাহার দুর্গ আক্রমণ ক'রে, এবং অবরোধ ক'রে, শেষ পর্যন্ত দখল করে নেন। জাহাঙ্গীর এবং নূরজাহান তখন কাশ্মীরে। তারা যুবরাজ খুররম (শাহজাহান) এর নেতৃত্বে বিশাল মোগল বাহিনী পাঠাতে চাইলে খুররম যেতে অস্বীকার করেন। আসলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, তার অনুপস্থিতিতে নূরজাহান, আসফ খাঁ প্রমুখ ষড়যন্ত্র করে শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসাবেন। শাহজাহানের বিদ্রোহ এবং নূরজাহানের স্বার্থপরতার ডামাডোলে কান্দাহার মোগলদের হস্তচ্যুত হয়।

শাহজাহানের আমলে সীমান্তের প্রসার ঃ সম্রাট আকবর ভারতীয় ভূখণ্ডে মোগল সাম্রাজ্যের যেটুকু বিস্তার ঘটিয়ে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর পরবর্তী বংশধরদের আমলে তা অনেকাংশে বিস্তৃত হয়। জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিঃ) উত্তরে নগরকোট ও কাংড়া অধীকৃত হয় কিন্তু ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের আক্রমণে পশ্চিমে কান্দাহার হস্তচ্যুত হয়। জাহাঙ্গীর কান্দাহার উদ্ধারের চেষ্টা করেন কিন্তু স্থায়ীভাবে ঐ অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া জাহাঙ্গীর দক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন; কিন্তু আহমদনগরের মালিক অম্বরের বিরোধিতায় তার সে-প্রচেষ্টা সফল হয়নি। শাহজাহান পূর্ববর্তীদের মত রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঃ জাহাঙ্গীরের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কান্দাহার হস্তচ্যুত হয়। অথচ কান্দাহারের ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখানে যেমন ছিল সেনানিবাস, তেমনি এখান থেকেই বহির্ভারত থেকে সেনা সংগ্রহ ও বহির্বাণিজ্যের সুযোগ নেওয়া সহজ ছিল। আবার এই কান্দাহার নিয়ে পারস্যের সঙ্গে বংশানুক্রমিক বিবাদ ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে পারস্যরাজ শাহ আব্বাস মোগল বাহিনীকে পরাজিত করে কান্দাহার দখল করেন। কিন্তু কান্দাহার পুনরাধিকারের জন্যে জাহাঙ্গীর কোনও মোগলবাহিনী প্রেরণ করতে পারেননি। শাহজাহানের আমলে কান্দাহারের পারসিক শাসনকর্তা আলিমর্দান খান অর্থ ও সম্মানের লোভে কান্দাহার দুর্গটিকে মোগলদের হাতে ছেড়ে দেন। পরিবর্তে শাহজাহান উক্ত বিশ্বাসঘাতককে কাবুল ও কাশ্মীরের শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু এইঘটনার এগারো বছর পর পারস্য সম্রাট কান্দাহার পুনরাধিকার করেন (১৬৪৯ খ্রিঃ)। শাহজাহান ক্রমান্বয়ে তিনটি অভিযান প্রেরণ করেও কান্দাহার দখল করতে পারেননি। মোগল সম্রাটের বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সৈন্য ক্ষয় হলো। তাছাড়া এই ঘটনায় মোগল সম্রাটের সম্মানও ক্ষুন্ন হল।

মধ্য-এশিয়া সংক্রান্ত নীতি ঃ বাবর, হুমায়ুন থেকে সকল বাদশাহই তাঁদের পূর্বপুরুষের মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত রাজ্যের পুনরুদ্ধারের কথা কল্পনা করতেন। সিংহাসন লাভের পর

শাহজাহান বালখ, বাদাকশান, সমরখন্দ ইত্যাদি জয়ের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে বুখারার রাজা নরজ মহম্মদ খান যখন তাঁর পুত্র আব্দুল আজিজের সঙ্গে গৃহ বিবাদ শুরু করলেন তখন শাহজাহান সুযোগ উপস্থিত মনে করে যুবরাজ মুরাদকে আলিমর্দান খানের সঙ্গে এক সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পাঠালেন। বালখ এবং বাদাকশান সহজেই দখল করা সম্ভব হলো। নরজ মহম্মদ পারস্যে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু এইসব অঞ্চলকে শাসনাধীনে রাখা ও শাসনব্যবস্থা সুসংহত করা সম্ভব হলো না। বালখ অঞ্চলের আবহাওয়া মুরাদের সহ্য হলো না। তিনি পিতা শাহজাহানের মতামত না নিয়ে ভারতে ফিরে এলেন। বাধ্য হয়ে শাহজাহান পুত্র আওরঙ্গজেবকে এক বিশাল বাহিনীসহ বালখে প্রেরণ করলেন। ইতোমধ্যে উজবেগগণ জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করল। দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত উজবেগদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেব কোনও কিছু করতে পারলেন না। তিনিও ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। শাহজাহানের মধ্য এশিয়া জয় করার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। অথচ এই অবাস্তব পরিকল্পনার রূপায়ন করতে গিয়ে শাহজাহান দু'বছরের যুদ্ধে অন্ততঃ চার কোটি টাকা নষ্ট করলেন। অর্থ ক্ষয়, সৈন্যক্ষয়, মর্যাদাহানি ভিন্ন অন্য কোনও ফলশ্রুতি এই অভিযানে ছিল না।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মধ্য এশিয়া অভিযান থেকে ভারতের দুর্বলতা প্রকাশিত হওয়ার পরই পারস্যের শাহ্ দ্বিতীয় আব্বাস কান্দাহার দখলের প্রস্তুতি শুরু করলেন (১৬৪৮ খ্রিঃ) শাহজাহান তিনটি অভিযান প্রেরণ করেও কান্দাহার উদ্ধার করতে পারেননি। মোগল শাসনকে অপরিমিত রাজ্যলিপ্সার মূল্য দিতে হলো।

দাক্ষিণাত্যে মোগল শক্তির প্রসার ঃ মধ্য এশিয়া ও কান্দাহারে রাজ্য বিস্তারে ব্যর্থ হলেও শাহজাহান দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে অনেকখানি সফল হলেন। জাহাঙ্গীরের সময় আহমদনগর রাজ্যের কিছু অংশ মোগলদের অধিকারে আসে। সিংহাসন লাভের পূর্বেই শাহজাহান দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। তাই সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সেখানকার সুলতান নিজাম-উল-মুলকের মন্ত্রী মালিক অম্বরের সদ্ভাব ছিল। মালিক অম্বরের মৃত্যুর পর (১৬১৯ খ্রিঃ) তাঁর পুত্র ফতে খান আহমদনগরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু ফতে খানের সঙ্গে সুলতানের বিবাদ হওয়ায় আহমদনগরের আভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্ট হলো। ফতে খান গোপনে গোপনে মোগলদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। শাহজাহানের নির্দেশ মত ফতে খান সুলতান নিজাম-উল-মুলককে হত্যা করে তাঁর নাবালক পুত্র হুসেন শাহকে আহমদনগরের সিংহাসনে স্থাপন করেন। আহমদনগরের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা তখন ফতেখানের হাতে এলো। অল্পকালের মধ্যে তিনিও মোগলদের বিরোধিতা শুরু করলেন। মোগল সৈন্যগণ এরপর যখন দৌলতাবাদ দুর্গ আক্রমণ করল তখন ফতে খান মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন (১৬৩১ খ্রিঃ)। কিন্তু মোগলদের নিকট থেকে দশ লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ নিয়ে ফতে খান দুর্গটিকে মোগলদের হাতে অর্পণ করলেন। ফতে খানের বিশ্বাসঘাতকতায় দৌলতাবাদ

দুর্গটি মোগলদের অধীনে এলো। এর পর ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র আহ্‌মদনগর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সুলতান হুসেন শাহকে গোয়ালিয়র দুর্গে চিরকালের মত বন্দী জীবন যাপন করতে হলো। সেই সঙ্গে নিজাম শাহী বংশের অবসান ঘটল। তবে শিবাজীর পিতা শাহজী নিজামশাহী বংশের এক বালককে শাসনে রেখে ঐ বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হয়ে মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এদিকে ফতে খান তার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ মোগল দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার উপর দৃষ্টি ঃ আহ্‌মদনগর জয়ের পরই শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। এই উদ্দেশ্যে শাহ্‌জাহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। গোলকুণ্ডার সুলতান বিনা যুদ্ধে শাহ্‌জাহানের বশ্যতা স্বীকার করেন ও বার্ষিক আট লক্ষ টাকা কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন (১৬৩৬ খ্রি:)। বিজাপুরের সুলতান যুদ্ধে পরাজিত হন ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ কুড়ি লক্ষ টাকা দিয়ে সন্ধি স্থাপন করেন। বিজাপুর সুলতানের বশ্যতার বিনিময়ে তাঁকে আহ্‌মদনগর রাজ্যের কিছু অংশ দেওয়া হয় (১৬৩৬ খ্রিঃ)। আহ্‌মদনগরের বাকি অংশে মোগল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দাক্ষিণাত্যের সুবাদার আওরঙ্গজেব ঃ শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যের বিজিত অংশকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করেন, যথা—খান্দেশ, বেরার, তেলেঙ্গনা ও দৌলতাবাদ। তিনি তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবকে উক্ত প্রদেশগুলির সুবাদার (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করেন। আওরঙ্গজেব মোট আট বছর (১৬৩৬ - ৪৪ খ্রিঃ) দক্ষতার সঙ্গে ঐ অঞ্চলে শাসন করেন। ইতোমধ্যে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি নাসিকের নিকট বাগনালা নামক প্রদেশটি অধিকার করে সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বিজিত প্রদেশগুলিতে মোগল শাসন সুদৃঢ় করে আওরঙ্গজেব দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন (১৬৪৪ খ্রিঃ)।

আওরঙ্গজেব দ্বিতীয়বার সুবাদার পদলাভ ঃ ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবকে দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করা হলো। এখানকার শাসন ও সামরিক বাহিনীর ব্যয়ের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের আয় ছিল নিতান্ত কম। তাই আওরঙ্গজেব রাজস্বের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। তাঁর এই কাজে সাহায্য করলেন মুর্শিদকুলি খান নামক এক পারস্যদেশীয় কর্মচারী। কৃষককে ঋণ দিয়ে কৃষিজাত সামগ্রীর উন্নতি করা হলো। জমি জরিপ, রাজস্ব নির্ধারণ ও যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হলো।

গোলকুণ্ডার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও আক্রমণ ঃ এবার আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতের শেষ দুটি স্বাধীনরাজ্য গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর দখলের সংকল্প গ্রহণ করলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান বর্ধিত রাজস্ব দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁর সঙ্গে আওরঙ্গজেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হল। এই সময় গোলকুণ্ডার প্রধান মন্ত্রী মীরজুমলা আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগদান করলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান কুতবশাহ তাঁর প্রধানমন্ত্রী মীরজুমলার হাতে খুব বেশি

ক্ষমতা দিয়েছিলেন। মীরজুমলা ছিলেন একজন পারসিক পর্যটক। এদেশে এসে তিনি পাদুকা-ব্যবসা থেকে মণিমুক্তার ব্যবসা করে প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন। পরিণতিতে তিনি নিজ প্রতিভাবলে গোলকুণ্ডার প্রধান মন্ত্রী পদ লাভ করেন। এই সময় তিনি কর্ণাটকের একাংশ জয় করে নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করেন ও সেখানে একটি নিজস্ব সামরিক বাহিনী গঠন করেন। মীরজুমলার ক্ষমতা হ্রাস করার প্রয়োজনে সুলতান কুতবশাহ্ তার পুত্রকে বন্দী করেন। মীরজুমলা তখন আওরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হন। সুযোগ বুঝে আওরঙ্গজেব ও মীরজুমলা অতর্কিতে রাজধানী হায়দরাবাদ অবরোধ করেন। জয় যখন সুনিশ্চিত তখন দারা ও জাহানারার অনুরোধে শাহ্জাহান আওরঙ্গজেবকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। গোলকুণ্ডার সুলতান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রচুর অর্থ ও রাজ্যের কিছু অংশ মোগল সম্রাটকে প্রদান করে আত্মরক্ষা করলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মীরজুমলা শাহ্জাহানের প্রধান মন্ত্রী বা উজীরপদে নিযুক্ত হন। অন্যদিকে কুতবশাহের কন্যার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের বিবাহ্ দেওয়া হলো এবং ঠিক হলো যে কুতব শাহের অবর্তমানে মহম্মদই হবেন গোলকুণ্ডার অধিপতি।

বিজাপুর আক্রমণ ঃ বিজাপুরের সুলতান আদিলশাহ্ ছিলেন স্বাধীনচেতা বীর। জীবিতকালে তিনি মোগলদের প্রাধান্য স্বীকার করেন নি। তবে তাঁর মৃত্যুর পর (১৬৫৬ খ্রিঃ) বিজাপুরে আভ্যন্তরীণ গোলমাল শুরু হলো। এই সুযোগে আওরঙ্গজেব মীরজুমলার সহায়তায় বিজাপুর আক্রমণ করেন (১৬৫৭ খ্রিঃ)। দীর্ঘকাল অবরোধের পর বিদর, কল্যাণী, পরিন্দ মোগলবাহিনীর হস্তগত হলো। কিন্তু এবারেও যুবরাজ দারার পরামর্শ মত শাহ্জাহান আওরঙ্গজেবকে বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। গোলকুণ্ডার সুলতানের ন্যায় বিজাপুরের সুলতান আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং বিদার, কল্যাণী ও পরিন্দ দুর্গ মোগলদের হাতে অর্পণ করে আত্মরক্ষা করলেন। বিজাপুর-গোলকুণ্ডা জয় করলে আওরঙ্গজেব অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠবেন— হয়ত এরূপ আশঙ্কায় দারা ও জাহানারা শাহ্জাহানের মাধ্যমে আওরঙ্গজেবের অগ্রগতিতে বাধা দান করেছিলেন। যাই হোক অল্পকালের মধ্যে শাহ্জাহান অসুস্থ হয়ে পড়েন ও তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়।

সীমান্ত-প্রসারের ফল ঃ জাহাঙ্গীর এবং শাহ্জাহানের রাজত্বকালে মোগলদের সম্প্রসারণ নীতি অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের সীমানা কী ক'রে প্রসারিত করা যায়, তাই ছিল লক্ষ্য। এর ফলাফলের দিকে তাকালে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। একদিকে, আকবরোত্তর যুগে ১৬০৫ থেকে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে মোগলদের প্রভাব বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মারাঠা, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ইত্যাদি শক্তি শেষ পর্যন্ত যদিও আওরঙ্গজেবের সময় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয় এবং মোগল অধিকারে আসে কিন্তু এই সম্প্রসারণের ভিত্তি তৈরি হয় মেবার থেকে আহ্মদনগর পর্যন্ত জয়ের মধ্যে দিয়ে এবং বিজাপুর-গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের মধ্যে দিয়ে। অপর পক্ষে, উত্তর-পশ্চিম

সীমান্তে কিংবা মধ্য এশিয়াতে মোগল নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভ্রান্ত নীতির ফলে শুধু কান্দাহার হস্তচ্যুত হয়েছে এমন নয়, অর্থ ও সৈন্যের প্রভূত ক্ষতি হয়। মধ্য এশিয়াতেও বাল্‌খ দখলে রাখতে গিয়ে মোগলদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু রাজনৈতিক লাভ তেমন হয়নি।

৩। শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি

মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা থেকে পতন পর্যন্ত ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই সাম্রাজ্য ছিল মূলত সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন বাদশাহ স্বয়ং এবং সাম্রাজ্যের সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ তিনি দেখতেন। কিন্তু তার একার পক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্য—যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল—শাসন করা সম্ভব ছিল না। তাকে নির্ভর করতে হত বিভিন্ন সেনাপতি, পদস্থ কর্মচারী, প্রভাবশালী আমীর ওমরাহ্ এবং ভূস্বামীদের উপর। এই সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে গঠিত ছিল মোগল শাসকশ্রেণী। সুতরাং শাসক শ্রেণী বলতে শুধু সম্রাট নন, সমগ্র শাসক সম্প্রদায়ের অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীর লোকজনদেরই বোঝায়।

অধ্যাপক আতহার আলি লিখেছেন, "নীতির দিক হইতে সম্রাট ছিলেন সর্বময় কর্তা, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার কর্মচারী—ওমরাহ্ ও মনসবদারগণের সাহায্যেই শাসন পরিচালনা করিতেন। সুতরাং কর্মচারীদের মাধ্যমে সম্রাটের নীতি প্রবর্তিত হওয়ায়, কার্যক্ষেত্রে তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থ ও নীতির একটি ভূমিকা ছিল। অবশ্য অমাত্যবর্গের স্বার্থ ও নীতি সর্বদা একরূপ হইত না, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রায়ই মতভেদ দেখা দিত। মোগল অভিজাত শ্রেণী জাতি ও ধর্মগত ভিত্তিতে গঠিত হওয়ায় দলীয় সংঘাত সৃষ্টির সুযোগ ছিল যথেষ্ট"।[১]

বস্তুতপক্ষে মোগল শাসক শ্রেণীকে সংগঠিত প্রথম করেছিলেন আকবর। ডঃ সতীশ চন্দ্রের মতে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে মোগল অভিজাত সম্প্রদায় একটি অনন্য সাধারণ সংস্থায় পরিণত হয়েছিল সন্দেহ নেই। নানা অঞ্চল, নানা ভাষা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা কঠিন কাজ। সে কাজে আকবর সফল হন। শাসকশ্রেণীর মধ্যে অভিন্ন আদর্শ ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্যবোধের সঞ্চার, তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পোষকতা, কর্মতৎপরতা এবং সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা সব ব্যাপারেই তিনি সার্থক। এই শাসক সম্প্রদায়ের গঠন প্রক্রিয়ায় সহায়ক হয়েছিল সেনাবাহিনীর সংগঠনের পদ্ধতি যা 'মনসবদারি' প্রথা নামে পরিচিত। এই মনসবদারদের

সঙ্গে যুক্ত ছিল জায়গিরদারি প্রথা। শাসক শ্রেণীর মানুষজন প্রভাবশালী হলেও সম্রাটের অনুগত ছিল। আকবরোত্তর যুগে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

মোগল সাম্রাজ্যের শাসক শ্রেণীকে একটি মিশ্র সমস্বত্ব গোষ্ঠীতে পরিণত করেছিলেন আকবর। অধ্যাপক ইকতিদার আলম খান দেখিয়েছেন যে এই কাজ আকবর করেছিলেন ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মোগল সাম্রাজ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিতে ও কার্যাবলীতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে। রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। আকবরের আগে বাবর এবং হুমায়ুনের সময় অভিজাত সম্প্রদায়ের বা শাসক শ্রেণীর কোনও সঠিক সংগঠন ছিল না। বাবরের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সৈন্য ভারতে এলেও তাদের মধ্যে যারা নেতা ছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল কম। তবু তাদের অধিকাংশই ছিলেন 'তুরানী' বা মধ্য এশিয়া থেকে আগত, তাদের অধিকাংশই জাতিতে তুর্কি। বাবরের এবং হুমায়ুনের রাজত্বকালে এরা সংগঠিত হতে পারেনি। ডঃ আতহার আলি ঠিকই লিখেছেন যে, মোগল অভিজাত সম্প্রদায় ছিল নীতিগতভাবে সম্রাটের সৃষ্টি।

আকবর অভিজাতবর্গ সৃষ্টি করেছিলেন দু'ধরনের মানুষ দিয়ে। **প্রথমত**, আমলা শ্রেণী অর্থাৎ যারা শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং **দ্বিতীয়ত**, সামরিক পদস্থ ব্যক্তি অর্থাৎ যারা মনসবদার। অভিজাত কথাটি বোঝাতে আরবি এবং ফারসি শব্দ 'আমীর' ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এই শব্দটিরই বহুবচন 'ওমরাহ'। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আকবর যখন 'মনসব' সৃষ্টি করলেন, পদ এবং মর্যাদা বোঝাতে, তখন প্রায় সর্বাংশে আমলারা নিজেদের অধীনে সৈন্য রাখতেন। ফলে এক মিশ্র শাসক শ্রেণী (Composite ruling Class) তৈরি হলো। আকবরোত্তর কালে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও সম্রাটের ক্ষমতা কমে যায়নি। কেন এবং কীভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি হলো সে কথা বলার আগে আরও দু-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

প্রথমতঃ, শাসক শ্রেণী গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন ধর্মীয় এবং জাতিগত সম্প্রদায়ের মানুষজনকে নিয়ে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তুরানী (মধ্য এশিয়াবাসী), ইরানী (পারসিকগণ), আফগান, হিন্দুস্থানী বা শেখজাদা, রাজপুত প্রভৃতি। সতেরো শতকে দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করলে বিজাপুরী, হায়দ্রাবাদী ও মারাঠাগণের সমাগম ঘটে। শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষ দিকে চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ তাঁর 'গুলদস্তায়' যে অভিজাত সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মুসলিম ও হিন্দু বহু ভাষাভাষী মানুষ ছাড়াও বহু সম্প্রদায়ের নাম আছে। সুতরাং এই ভিন্নতা দূর করে একশিলা শাসকশ্রেণী গঠন ছিল কঠিন কাজ। আকবর অনেকাংশে সফল হন, তবুও নানা গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। আকবরোত্তর যুগে সেই দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়।

আতহার আলি লিখেছেন "মোগল শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতির সমাবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল হইলেও অংশতঃ এটি ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

প্রণোদিত (বিশেষ ভাবে রাজপুতগণ)। সম্ভবতঃ আকবরের নীতি ছিল রাজকার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন; একারণেই তিনি মাত্র একজন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অধীনে বিভিন্ন দলভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রতিটি দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখা হইত।"

সুতরাং শাসক শ্রেণী গঠিত হয়েছিল বহিরাগত এবং ভারতীয় উভয়শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে। এর মধ্যে যেমন মুসলমান, হিন্দু প্রমুখ ধর্মীয় ভিন্নতা ছিল, তেমনি মুসলমান, হিন্দুদের মধ্যেও জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য ছিল। তুরানীদের অধিকাংশই ছিল তুর্কি তবে ক্রমশ মোগল শাসনে নানা গোষ্ঠীরই আধিপত্য দেখা যায়। তবে তুরানী-ইরানী বিবাদ বরাবরই ছিল। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান ছিলেন অধিকাংশই ইরানী। তাছাড়া আফগান এবং ভারতীয় মুসলমান (শেখজাদা) যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি রাজপুতরাও, এমনকি আওরঙ্গজেবের রাজত্বে হিন্দু মনসবদার কম ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্ন হলো ভাষাগত, জাতিগত বা ধর্মগত ভিন্নতা ছাড়াও যাদের নিয়ে শাসক শ্রেণী গঠিত হত, তারা কারা? প্রথমত, বাদশাহ নিজের পরিবারের লোকদের নিতেন। তাছাড়া মনসব নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা হত উচ্চ বংশ বা আভিজাত্য। বংশগত গুণাবলীতে মনসবদারদের পুত্র বা বংশধরদেব, যাদের বলা হত 'খানাজাদ'—তাদের দাবি ছিল সর্বাধিক। কেউকেউ অবশ্য জ্ঞানের পুরস্কারস্বরূপ পদ পেতেন, যেমন আকবরের রাজত্বকালে আবুল ফজল বা শাহজাহানের রাজত্বকালে সাদউল্লাহ্ খান। এছাড়া ছিলেন স্থানীয় রাজা এবং জমিদারগণ এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত অভিজ্ঞ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। আতহার আলির সাম্প্রতিক গবেষণায় শাসক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিবর্তনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।[১]

বাবরের সময় তুর্কি (তুরানী) অভিজাতদের প্রাধান্য ছিল। যদিও আফগান এবং উজবেগ এবং ইরানীরাও ক্রমে শাসকশ্রেণীতে স্থান লাভ করে। হুমায়ুন অভিজাতদের একটি ব্যাপক শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন, সভাসদদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন এবং প্রতিটি শ্রেণীকে বারোটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। ডঃ সতীশ চন্দ্রের মতে, "এইভাবে প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে একটি অগ্রাধিকারের ক্রম নির্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অগ্রাধিকারের ক্রম কতটা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে অনুসৃত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন ক্রমের সঙ্গে বিশেষ মর্যাদা জড়িত ছিল কিনা তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না।"[২] তবে হুমায়ুনের রেখে যাওয়া অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও তুরানী প্রাধান্য ছিল। ইরানীদের মধ্যে বলা যেতে পারে বৈরাম খান, নিজাত এবং মির্জা হাসান এর নাম। আকবরে সময় রাজপুত মান সিংহ যেমন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হন, তেমনি আবদুল রহিম, মুনিম খান, আজিজ কোকা প্রমুখও ছিল।

মনসবদার প্রথা প্রবর্তন করে তিনি শাসকশ্রেণীকে সংগঠিত করেছিলেন। সতীশচন্দ্রের মতে, "আকবরের প্রগাঢ় মানবতাবোধ ও মহানুভবতা, উচ্চ আদর্শ এবং ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি এবং সর্বোপরি যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অব্যর্থ সাফল্য ক্রমে ক্রমে অভিজাতশ্রেণীর অনুরাগ ও আনুগত্য অর্জন করেছিল এবং একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিল"।[১]

কিন্তু এই ঐতিহ্য আকবরের পরবর্তী যুগে সর্বদা রক্ষিত হয়নি। তখন ওমরাহগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে এবং অভিজাত শ্রেণীও নিজস্বার্থে পারস্পরিক দলাদলিতে মত্ত হয়। এই দলাদলি সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে বেশি করে দেখা যায়। তার আগেই জায়গির তথা নিজেদের স্বার্থ এবং রাজস্ব বা উদ্বৃত্ত নিয়ে কাড়াকাড়ি নিয়ে শাসকশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল থেকে শাসকশ্রেণীর অভিজাতবর্গ নিজেদের পছন্দ মতন ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর আগেই জাহাঙ্গীরের বদলে তার পুত্র খসরুকে সিংহাসনে চেষ্টা করেছিলেন মানসিংহ, আজিজ কোকা প্রমুখ। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নূরজাহানের পিতা গিয়াস বেগ (পরে খেতাব পান 'ইতিমাদউদ্‌দৌল্লা'), তার পুত্র আসফ খান, মহাব্বত খান, বীর সিংবুন্দেলা প্রমুখ ক্ষমতাবান ছিলেন। আবার ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে খুররম বিদ্রোহ করেছিলেন কিছু অভিজাত ব্যক্তির সহায়তায়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর অনেকে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসাতে চেয়ে ছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালেও অভিজাত শ্রেণী সর্বদাই নিজেদের স্বার্থে চলতেন। পিতার বিরুদ্ধাচরণ শুধু আওরঙ্গজেবের নয়, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানও করেন এবং সেই সময় একশ্রেণীর ওমরাহের সাহায্য পান।

বস্তুত আকবরোত্তর যুগে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ প্রধানত তিনটি। এক, আকবরের মতন সকল শ্রেণীর শাসক ও কর্মচারীদের সম-দৃষ্টি নিয়ে দেখা জাহাঙ্গীর শাহজাহান বা আওরঙ্গজেবের ছিল না। অপরপক্ষে, রাষ্ট্র বা সম্রাটের প্রতি আনুগত্যও কমে যায়। দুই, শাসকশ্রেণীর মনসবদারগণ নিজেদের সামরিক ক্ষমতা বাড়াতে সচেষ্ট হন। নিজেদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধির ফলে তাদের ক্ষমতা বাড়ে। তিন, এই শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিদের অনেকেই বেতনের পরিবর্তে জাগির প্রাপ্ত ভূমি থেকে রাজস্ব আদায়ের দ্বারা উদ্বৃত্ত সম্পদ আত্মসাৎ করতেন। এই তিনটি কারণের সঙ্গে বলা দরকার যে, গোষ্ঠী, ভাষা ও জাতিগত ভিন্নতা, দলাদলি এবং নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ শাসকশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। সুতরাং শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাবৃদ্ধি সাম্রাজ্যের পক্ষেসর্বদা শুভকর হয়নি।

৪। মনসব পদ্ধতির পুনর্গঠন

আকবরের আগে মোগল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সংগঠিত করবার কোনও প্রচেষ্টা হয়নি। অথচ মোগল প্রশাসনিক সংগঠন ছিল প্রধানত সামরিক প্রকৃতির এবং

তার মূল ভিত্তি ছিল বাদশাহের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। আকবরই প্রথম মনসবদারি প্রথা প্রবর্তন করে আভিজাত শ্রেণী তথা রাজকর্মচারীদের সুষ্ঠভাবে সংগঠিত করেন। আমরা আকবর সম্পর্কিত অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। 'মনসব' কথাটি ছিল পদমর্যাদা সূচক। উইলিয়াম আরভিন-এর মতে এই প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল বেতন অনুসারে কর্মচারীদের পদমর্যাদা স্থির করা। সকল কর্মচারীকে সামরিক পদমর্যাদা দেওয়া হলেও সামরিক দায়িত্ব পালন যে বাধ্যতামূলক ছিল এমন নয়। বস্তুত এটি ছিল 'মনসব' প্রাপ্ত মনসবদারদের পদমর্যাদার প্রতীক।[১] পোষণীয় অশ্বারোহীর সংখ্যার ভিত্তিতে মর্যাদা বা পদ যেমন নির্ধারিত হত, তেমনি প্রতিটি মনসবের এবং প্রতি সংখ্যক সেনার একটি নির্দিষ্ট বেতন নির্ধারিত হত। আবুলফজল তার 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ৬৬ ধরনের 'মনসব' ছিল—দশ অশ্বারোহীর মনসবদার থেকে দশ হাজারী মনসবদার। বাবর হিন্দুস্থান জয় করার পর সেখানে নানা অঞ্চলে স্থায়ী আমলা বা শাসক নিয়োগ করতেন না বলে সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে।[২] হুমায়ুন তাঁর আমলে রাষ্ট্রের রাজকর্মচারীদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন—'অহলই দৌলত', যার অন্তর্গত ছিল ওমরা (আত্মীয় এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ) এবং ওয়াজির (মন্ত্রী); 'অহলই সাদাৎ', যার। অন্তর্গত ছিলেন সাধুসন্ত, পণ্ডিতবর্গ এবং কাজী (বিচারক) এবং 'অহলই মুরাদ', যারঅন্তর্গত ছিলেন সাধারণ মানুষ[৩] আকবরই তার রাজত্বকালে 'জাট' এবং 'সওয়ার' এই দ্বৈতপদ সুনির্দিষ্ট করে পদমর্যাদার প্রথাকে এক সুনির্দিষ্টরূপ দেন। শাসনকাঠামোর স্তর বিন্যাসে নির্দিষ্ট স্থান বোঝাতো 'জাট' দ্বারা। এর দ্বারা বেতনও নির্ধারিত হত এবং 'সওয়ার' শব্দ দ্বারা তার অধীনস্থ সৈন্যসংখ্যা বোঝাতো।[৪]

কোন্ সময়ে মনসবদারি প্রথার প্রর্বতন? একদা মোরল্যান্ড লিখেছিলেন, সাম্রাজ্যের দ্বাদশ বৎসরে; কিন্তু আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসান জান কাইজার এক প্রবন্ধে এই মত খন্ডন করে লেখেন যে, দ্বৈত পদ সৃষ্টি হয়েছিল আকবরের রাজত্বকালের

বিংশতি বৎসর অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু আরও পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইরফান হাবিব[৫] এবং অধ্যাপিকা শিরিন মুসভির গবেষণার[৬] ফলে আরও বিস্তারিত তথ্য জানা গেছে। এখন বলা যেতেপারে যে, আকবরের রাজত্বকালে মনসবদারি প্রথার কতকগুলি ক্রমপর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিবর্তন হয়েছিল। তেমনি অধ্যাপক আতহার আলির বিস্তারিত গবেষণা থেকে প্রমাণিত যে আকবরের পরেও মনসব পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল।[১]

আকবরের সিংহাসনে আরোহণের পর প্রথম দশ বছর রাজকর্মচারীদের বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট সামরিক দায়-দায়িত্ব ছিল না এবং কর্মচারীদের বেতন যথেচ্ছভাবে নির্ধারণ করা হত। এগারো বছরে (১৫৬৬-৬৭) আকবর রাজকর্মচারীদের উপর কিছু নির্দিষ্ট সামরিক দায়িত্ব ন্যস্ত করতে প্রয়াসী হন এবং জায়গিরের রাজস্বের অনুপাত অনুসারে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েনের জন্য তাদের বাধ্য করা হয়। আঠারো বছরে (১৫৭৩-৭৪) মনসবদারি প্রথা প্রবর্তন করা হয়। একটি মাত্র সংখ্যাসূচক পদ ধার্য করা হয়। এই সংখ্যা শাসক বা অভিজাতদের বেতন এবং অধীনস্থ প্রাণী (অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি) বোঝাতো। অশ্বকে পরীক্ষা করে দাগ দেওয়া হত; মনসবদারগণ সরকারের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থও পেতেন। বাস্তবে অনেক রাজকর্মচারীই সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন না। ফলে রাজত্বকালের চল্লিশতম বছরে (১৫৯৫-৯৬) আকবর মনসবদারদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে পদ অনুযায়ী সওয়ারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেন। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'জাট' ও 'সওয়ার' এই দ্বৈতপদ সৃষ্টি হয়। জাট পদের দ্বারা পদমর্যাদা এবং বেতন, সওয়ার পদের দ্বারা সৈন্য, অশ্ব এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি অর্থের পরিমাণ বোঝাতো। মনসবদারগণ কেউ কেউ বেতন নগদে (মদসবদারই নগদি), কেউ বা জায়গির প্রাপ্ত জমি পেয়ে তা থেকে রাজস্ব আদায় মারফৎ অর্থ পেতেন (তনখা জায়গির)।

মনসবদারদের নিযুক্ত করতেন বাদশা স্বয়ং। মনসবদারদের অধীনে অশ্ব প্রকৃত পক্ষে ঠিক রাখার জন্য আকবর 'দাগ' বা চিহ্নিতকরণ (branding) এবং 'চেহ্‌রা' বা বিবরণাত্মক তালিকা (descriptive roll) প্রথা চালু করেন। দশ হাজারী থেকে পাঁচ হাজারী মনসবদার পর্যন্ত সাধারণত রাজকুমারদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত ; দু-একটি ব্যতিক্রম ছিল। সাদারণ মনসবদার ছিলেন দশ থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত সৈন্যের নেতা।

মনসবদার ছাড়া 'দাখিলী' এবং 'আহ্‌দী' নামে অন্য দুই প্রকার সৈন্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দাখিলী' সেনাবাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব মনসবদারদের হাতে দেওয়া হত। তারা রাজকোষ থেকে বেতন পেতেন। 'আহ্‌দী'দের পরিচালনার দায়িত্ব আমীরদের হাতে দেওয়া হত। তারা উচ্চ হারে বেতন পেতেন। দশ থেকে একশো জন সৈন্যের মনসবদারকে বলা হত 'ইয়ুজবাশিস', ১০০ থেকে ৪০০ জন সৈন্যের মনসবদারকে বলা হত 'মনসবদার', ৫০০ থেকে ২৫০০ জনের পদাধিকারীকে বলা হত 'আমীর' এবং

১। এম আতহার আলি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ দুটি দ্রষ্টব্য

হত 'মনসবদার', ৫০০ থেকে ২৫০০ জনের পদাধিকারীকে বলা হত 'আমীর' এবং হাজারী মনসবদারকে বলা হত 'আমীরই আজম'। অশ্ব ছাড়াও হাতি, উট ইত্যাদি রাখা হত। শকট রাখাও বাধ্যতামূলক ছিল। সওয়ার পদ ছিল 'এক-আসপা' অর্থাৎ এক ঘোড়ার সওয়ারি।

প্রথম দিকে মনসবদারি পদ্ধতি মোগল রাজতন্ত্র তথা রাষ্ট্রশক্তিকে সমৃদ্ধ এবং দৃঢ় করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। পদোন্নতি ও পুরস্কারের জন্য প্রত্যেক মনসবদার বাদশাহের অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। তবে মনসবদারি প্রথার অনেক ত্রুটিও ছিল। ইস্তিয়াক হুসেন কুরেশীর মতে, প্রশাসনিক সকল বিভাগকে একক কেন্দ্রীয় যন্ত্রে পরিণত করার ফলে সামরিক সংগঠনের দক্ষতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।[১] অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ের মতে সামরিকবাহিনীতে আমলাতান্ত্রিকতা প্রবেশ করেছিল।

আকবর প্রত্যেক সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহীদের দ্বিগুণ অশ্ব পোষণ করার নিয়ম চালু করেছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমল থেকে মনসবদারি পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। জাহাঙ্গীরের আমলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে সেনাবাহিনীর উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কমে আসতে থাকে। জাহাঙ্গীর ঘোড়সওয়ারদের ভরণপোষণের খাতে অর্থ হ্রাস করে ২০০ টাকা করেন।

দ্বিতীয়ত, জাহাঙ্গীরের আমল থেকে 'দু-আসপা' বা দুই ঘোড়ার সওয়ারি এবং 'শি-আসপা' বা তিন ঘোড়ার সওয়ারি প্রথার প্রবর্তন হয়। এই প্রথার উদাহরণ মহাবত খা জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের দশম বছরে এরকম পদ পেয়েছিলেন। শাহ্জাহানের আমলে এই পরিবর্তন আরও বৃদ্ধি পায়। আসলে এটি ছিল একধরনের অনুগ্রহ বিতরণ। এর অর্থ ডবল বেতন, দ্বৈত দায়িত্বের বিনিময়ে। আতহার আলি আওরঙ্গজেবের সময়ে মোগল অভিজাতশ্রেণীর বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, মোট ৪৮৬ জন মনসবদারের মধ্যে ৬৮ জন দু-আসপা, শি-আসপা পদ পেয়েছিলেন। পরে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

আরভিন মন্তব্য করেছেন যে, মনসবদারগণ তাদের নিজ নিজ সৈনিকদের সংখ্যার কারচুপি করতেন বলে মোগলবাহিনীর ভিত্তি বরাবরই দুর্বল ছিল। শাহ্জাহানের সময় একশত সওয়ার পদের মনসবদারদের পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ অশ্বারোহী ও সমসংখ্যক অশ্বপোষণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। শাহ্জাহানের রাজত্বকালের ২১তম বছরে ঠিক হয় যে, মনসবদারদের পক্ষে এক তৃতীয়াংশের বদলে এক-পঞ্চমাংশ অশ্বারোহী এবং সমসংখ্যক অশ্ব পোষণ করা বাধ্যতামূলক। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও তাই চালু ছিল। 'দাগ' ও 'চিহ্নিতকরণ' পদ্ধতিও আওরঙ্গজেবের সময় আরও সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে করা হত। মনসবদারি পদ্ধতির ফলে রাষ্ট্রে উদ্বৃত্ত সম্পদ শাসকশ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হয়।

অধ্যায় ৪

অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি

Syllabus : Economy, Society and Culture

১। মোগল যুগে সমাজ ও অর্থনীতি

মোগল যুগের অর্থনীতির পরিচয় অল্প কথায়প্রকাশ করা কঠিন। অতীত ও বর্তমান কালের মতো মোগল যুগেও ভারতবর্ষ ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। শত'করা পচাত্তর ভাগের বেশি লোকই গ্রামে বাস করত এবং কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটিই ছিল প্রধান জীবিকা এবং কৃষি উৎপাদন থেকে গৃহীত রাজস্ব ছিল সরকারের প্রধান আয়। আবার কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি হস্ত শিল্প বা কুটির শিল্প ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কৃষি ও শিল্প ছাড়া ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বাণিজ্যের বিকাশ।

আর্থ সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে নগরায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা। প্রাক্ পুঁজিবাদী সমাজের অসম সামাজিক বিকাশের পাশাপাশি ছিল সামাজিক স্তর বিন্যাস। সামাজিক কাঠামোতে শ্রেণী বিভেদ ছিল। ছিল অর্থনৈতিক চাপ, কর ভার থেকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী—আর্থিক ব্যবস্থায় ভাঙন। অন্যদিকে সমাজে ছিল ধর্মীয় পার্থক্য, জাতিগত বিভেদ, ভাষাগত ভিন্নতা এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য। তবু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী চিন্তা ও কর্ম ধারা রূপ পেয়েছিল নানা মাধ্যমে। বিশেষত শিল্প স্থাপত্যে মোগল যুগ ইতিহাসে স্মরণীয়।

আমরা বর্তমান অধ্যায়ে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাণিজ্যের বিস্তার, সমন্বয়বাদী ভাবনা এবং শিল্প স্থাপত্যের উপর বিশদ আলোচনা করলেও, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি দেব; নতুবা বিবরণের অঙ্গহানি ঘটবে।

মোগল যুগের অর্থনীতি একদা ইতিহাস চর্চায় উপেক্ষা করা হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া'-র চতুর্থ খণ্ডে মোগলযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর কোনও অধ্যায় নেই। রাজস্ব বিভাগের উপর একটি মাত্র অধ্যায় আছে, তাও প্রশাসনিক ইতিহাসের অন্তর্গত। এ বিষয়ে প্রথম পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন মোরল্যান্ড। তবে তার রচনায় তথ্যের বিকৃতি ছিল ; সাম্রাজ্যবাদী লেখক সুকৌশলে ব্রিটিশ শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তবু তার গ্রন্থগুলি মূল্যবান।[১]

পরবর্তীকালে ব্রিজনারায়ণ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মোগল অর্থনীতি নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন।[১] অধ্যাপক ইরফান হাবিবের কালজয়ী গ্রন্থ 'মোগল ভারতের কৃষি পদ্ধতি' কৃষি অর্থনীতির বিষয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।[২] মোগল ভূমিরাজস্বের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নোমান আহমদ সিদ্দিকী।[৩] বাংলা ভাষাতেও মোগলযুগের কৃষি অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তেমনি অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য নিয়ে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে আমাদের ইতিহাস বিষয়ক ধারণা প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সব লেখকদের মধ্যে সি. আর. বক্সার,কে গ্লামন, কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী, তপন রায় চৌধুরী, অশীন দাশগুপ্ত, এ. আই. চিচেরভ, বালকৃষ্ণ, সুশীল চৌধুরী, সুরেন্দ্র গোপাল, এম কুলশ্রেষ্ঠ, শিরীন মুস্‌ভি প্রমুখের নাম করা যায়।[৪] অধ্যাপক জগদীশ নারায়ণ সরকারের মোগল অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছে।[৫] মোগল ভারতের অর্থনৈতিক চিত্র জানার পক্ষে অবশ্য এখন সবচাইতে সহায়ক অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী এবং অধ্যাপক ইরফান হাবিব সম্পাদিত কেম্‌ব্রিজ অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড।[৬] এই সব গ্রন্থের সহায়তায় মোগল যুগের অর্থনৈতিক চিত্র উপস্থাপন করা যেতে পারে।

কৃষি ঃ মোগল আমলে কৃষি ও কৃষিজ উৎপাদনের দিকে প্রথমে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। মোগল শাসনব্যবস্থায় দুটি বিপরীতমুখী ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে কৃষকদের উৎসাহিত করে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমান বৃদ্ধির চেষ্টা, অন্যদিকে কৃষিজীবীদের উপর শোষণ ও পীড়ন। তবু মোরল্যান্ড থেকে ইরফান হাবিব পর্যন্ত অনেকেই দেখিয়েছেন যে, মোগল আমলে চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কৃষকদের অবস্থা সর্বদা স্বচ্ছল ছিল না। কেন? গৌতম ভদ্র লিখেছেন, "কৃষকদের শ্রমই ছিল মুঘল যুগের শোষক শ্রেণীর বিপুল ঐশ্বর্যের উৎস। এই শ্রমজাত উদ্বৃত্ত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আইনানুগ রাজস্বের মাধ্যমেই সংগৃহীত হতো না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের 'আবওয়াব' বা বেআইনি কর।"[৭] এই রাজস্ব ও বেআইনি করের বোঝার ফলেই কৃষকদের দুরবস্থা। ফলে তারা বহুবার বিদ্রোহ করেছে। ফলে রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয়েছে 'কৃষি সংকট'।[৮]

আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, মাটি, রায়তিস্বত্ব পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, সেচব্যবস্থা, বীজ, গৃহপালিত পশু, পরিবহন ব্যবস্থা, শান্তিশৃঙ্খলা, বিদেশী হামলা থেকে অব্যাহতি, রাষ্ট্রীয় পীড়ন থেকে মুক্তি ইত্যাদির উপর কৃষিজাত পণ্যের মান ও পরিমাণ নির্ভর করে।[১] মোগল আমলে কৃষির যন্ত্রপাতি সে-যুগের তুলনায় অনুন্নত ছিল না। সেচ ও সার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কৃষিজ কাঁচা মাল ছিল ছয় প্রকার ঃ খাদ্যশস্য, কার্পাস, নীল, আখ, মশলা এবং ভেষজ। খাদ্য শস্যের মধ্যে ছিল চাল, ডাল, বার্লি, তৈলবীজ ইত্যাদি। কার্পাস সহ শিল্পের কাঁচামালের মধ্যে ছিল সুতি, রেশম, শন, পাট, ঘাস এবং নীল ; ইক্ষু মশলা এবং ভেষজ জাতীয় কৃষিজ যেমন আফিং চাষ হত। বাদশাহ থেকে ধনী কৃষক সকলেই উদ্যান সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। ফলে উদ্ভিজ উৎপাদন হত, কৃষি কাজের সহায়ক পশুপালনও হত।

কৃষিক্ষেত্রে পণ্যের বাণিজ্যকরণ তখনও হয়নি। ডঃ হাবিব লিখেছেন, "The connections of the rural population with the market did not yet create a commodity—production system." সম্রাট এবং শাসক শ্রেণী রাজস্ব হিসেবে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বা সামাজিক সম্পদের অংশ ভোগ করতেন। জমির মালিকানার ক্ষেত্রে কৃষকদের ব্যক্তিগত অধিকারের স্বীকৃতি ছিল। রাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ মালিকানা ছিল না। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলাদের বর্ণিত গ্রামীণ সমাজের ধারণা মোগল যুগে সর্বদা মেলে না। ঔপনিবেশিক যুগে ভূমিরাজস্ব আদায় করা হত রাষ্ট্র বা জমিদারের পক্ষ থেকে জমির কর হিসেবে, কিন্তু মোগলযুগে তা ঠিক এক নয়। তখন রাজস্ব নেওয়া হত উৎপন্ন ফসলের কর হিসেবে। অর্থাৎ মোগল আমলের রাজস্ব ফসল কর, ব্রিটিশযুগে তা ভূমি কর। এজন্য রায়তের অধিকার কোম্পানির আমল থেকে খর্ব করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে দূরবর্তী বাজার ও নগরের ব্যাপক সংযোগ ছিল।

মোগল আমলের গ্রামীণ সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথাক্রমে 'দেহাৎ-ই-তালুক' এবং 'দেহাৎ-ই-রায়তি'। এগুলির চরিত্র নিয়ে কিছু মত পার্থক্য আছে। গৌতম ভদ্রের সংজ্ঞানুযায়ী, "দেহাৎ ই তালুক হচ্ছে সেই গ্রাম, যা বড় জমিদারের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে রাজস্ব দেয়। অন্যদিকে দেহাৎ ই রায়তির কৃষকরা সরাসরি রাষ্ট্রীয় আমলা বা গ্রাম প্রধানের মাধ্যমে রাজস্ব দেয়।"[২] জমিদার বা শাসক শ্রেণীর মানুষজন (মনসবদার) যেমন ছিল, তেমনি নানা শ্রেণীর কৃষকও ছিল। যেমন, কৃষকদের মধ্যে 'খুদ কশ্থ', 'পাহি কশ্থ', 'মুজারিয়ান', নানা নামের ভূমিহীন চাষী ইত্যাদি। আঞ্চলিকভাবে রাজস্ব আদায়ের চাপ ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। সর্বদা নির্ধারিত রাজস্ব (জমা) আদায়ীকৃত রাজস্বের (হাসিল) সঙ্গে মিলত না— জমিও ছিল নানা ধরনের। এর উপর ভূমি রাজস্ব নির্ভর করত। ভূমিরাজস্ব দাবির পরিমাণ, তা নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি, বিভিন্ন অঞ্চলে রাজার নির্ধারণের

পদ্ধতি, রাজস্ব দাখিলের মাধ্যম, ভূমি রাজস্ব আদায়, অন্যান্য গ্রামীণ কর ও জবরদস্তি আদায় ও তার ফলাফল যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

শিল্প ঃ কৃষি উৎপাদনের পর কৃষি-নির্ভর শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। কুটির শিল্পের মধ্যে চিনি, তেল, পোস্ত, তামাক, কফি, নীল, আফিম ইত্যাদির কৃষি নির্ভর কুটির শিল্প ছিল। অন্যদিকে কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন শিল্পও ছিল। সম্রাট, অভিজাত, ধনী ব্যবসায়ী এবং বিদেশীদের বর্ধিত চাহিদা হস্ত শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন যথা— গার্হস্থ্য দ্রব্য, আসবাবপত্র, সূচি শিল্প, গন্ধ দ্রব্য, চামড়ার জিনিস, অলঙ্কার, মৃৎপাত্র, কাঁচ নির্মিত জিনিস, সাবান ইত্যাদির কথা বলা যায়। তাছাড়া জাহাজ নির্মাণ, সেই সঙ্গে পরিবহন শিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, খনিজ শিল্প ইত্যাদি ছিল। বয়ন শিল্পের মধ্যে সূতি, পশম, রেশম, মিশ্র বস্ত্র সবই ছিল। ধাতুর ও খনিজের মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, ইস্পাত, হীরক, লবণ, শোরা ইত্যাদি উল্লেখ্য।

জগদীশ নারায়ণ সরকার লিখেছেন, "শিল্পের ক্ষেত্রে যে সকল সামাজিক শ্রেণী বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তারা আসলে কৃষক সম্প্রদায় থেকেই আগত। কারিগর সম্প্রদায়কে কৃষক সম্প্রদায় তাদের স্বার্থেই গ্রামে নিষ্কর ভূমি অথবা নগদ অর্থের বিনিময়ে কাজ দিয়ে প্রতিপালিত করত। এইভাবেই গ্রামীণ অর্থনীতি পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে টিকে ছিল।"

মোগল আমলে শিল্প সরকারি এবং বেসরকারি দু-ধরনের উদ্যোগেই পরিচালিত হত। সরকারি 'কারখানা' গুলিতে বিলাস দ্রব্য থেকে অস্ত্র সবই তৈরি হত। রাজ পরিবার এবং অভিজাত বর্গ ছিলেন এগুলির মালিক। ফরাসি পর্যটক বার্ণিয়ে ভারতের নানা স্থানে সরকারি কারখানার উল্লেখ করেছেন। ঐ কারখানাগুলিতে সূচির কাজ, সোনার কাজ, রেশমের কাজও হত। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায় বাদশা আকবর শিল্পে উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আবুল ফজল রেশম ও তুলাজাত পণ্য সামগ্রীর এক তালিকা দিয়েছেন। তুলার চাষ ও বস্ত্র শিল্প প্রসঙ্গে জানা যায় যে বারানসী, আগ্রা, জৌনপুর, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, মালব ও বাংলাদেশ ছিল সূতী শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ঢাকার মসলিন ছিল বিশ্ববিখ্যাত। বার্নিয়ের লেখা থেকেই জানা যায় যে, বাংলায় বিভিন্ন রকমের সুতো ছাড়াও রেশমেরও কেন্দ্র ছিল। এই রেশম ইয়োরোপেও রপ্তানি হত। সূতি শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্ররঞ্জন অর্থাৎ কাপড় রঙ করার শিল্পেরও বিশেষ প্রসার ছিল। আর একজন ইংরেজ পর্যটক এডওয়ার্ড টেরি ভারতের রঞ্জনশিল্পের নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জরির কাজ হত প্রধানত খান্দেশ এবং ফৈজাবাদে। লাহোর ও কাশ্মীর শাল ও গালিচার জন্য খ্যাত ছিল। জাহাঙ্গীর অমৃতসরে পশম গালিচা ও শাল শিল্প স্থাপন করেছিলেন। নূরজাহান শিল্প ও বাণিজ্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন বলে সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে। চিনি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ। আবার ছাপা সূতিবস্ত্রের মূলকেন্দ্র ছিল বেরার, বুরহানপুর, আহমেদাবাদ ও আগ্রায়। বিহারে প্রচুর পরিমাণ শোরা *(Salt Petre)* উৎপন্ন হত ; ইয়োরোপীয় বণিকদের কাছে এর প্রভূত চাহিদা ছিল।

২। বাণিজ্যের বিস্তার

মোগল আমলে বাণিজ্যের বিস্তার এক স্বীকৃত ঘটনা।[১] ঐ যুগে ইয়োরোপ ও এশিয়ার নানাদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। বস্তুত সমুদ্র বাণিজ্য ও স্থলপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রাচুর্য মোগলযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তেমনি দেশের অভ্যন্তরের দেশীয় বাণিজ্য বা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দিকেও ঐতিহাসিকগণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাণিজ্যের বিস্তার আলোচনার আগে সংক্ষেপে বাণিজ্যের সংগঠন ও কার্যক্রম আলোচনা করা যেতে পারে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ভারতে বাণিজ্য সংগঠনের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল ,আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য। দেশের উৎপাদিত পণ্য আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাত এবং তা আবার অন্তর্দেশীয় ও উপকূল বাণিজ্যের কাজেও লাগত। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্য তুলনায় কম কিন্তু ইয়োরোপীয় সূত্রাদি থেকে বহির্বাণিজ্যের প্রভূত তথ্য পাওয়া যায়। দেশীয় বাণিজ্য সম্পর্কে জানতে হলে আগে যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং তারপর বাজার সংগঠন সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলেই শিল্প সংগঠন, নগরায়ণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি, বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। ট্যাভারনিয়ের বর্ণনা অনুসারে ভারতের যানবাহন ও যোগাযোগ ফ্রান্স বা ইতালির চেয়ে উন্নত ছিল। পরিবহনের মধ্যে জল পরিবহন উন্নত ছিল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে। সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ইত্যাদি নদীতে জলযান চলত। সমুদ্রে চলত জাহাজ, জাহাজ নির্মাণ শিল্পেও বিশেষ জোর দেওয়া হত ; এগুলি গড়ে উঠেছিল উপকূলবর্তী এলাকায়। স্থল পরিবহনের মধ্যে পশু বাহিত শকট এবং পশু উভয়ই ব্যবহৃত হত। ষাড়, মহিষ, গাধা, খচ্চর, উট এবং কদাচিৎ হাতি ব্যবহৃত হত। উটের পাল দূর অঞ্চলে পাড়ি দিত। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হত। দীর্ঘ সড়ক পথ ছিল, যেমন—বাংলার সোনার গাঁও থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত, আগ্রা থেকে বুরহানপুর, আগ্রা থেকে যোধপুর ইত্যাদি। সেতু নির্মাণে উন্নতি ঘটানো, বিশ্রামাগার তৈরি বাণিজ্যে সহায়ক হয়েছিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাজার সংগঠনের বিকাশ ঘটেছিল। জে.সি. ভ্যানলিউর, নীল স্টিনসগার্ড প্রমুখ বিদেশী গবেষকের লেখায় তা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। গ্রামীণ বাজার, শহুরে বাজার, বন্দর এবং তাকে ঘিরে বাণিজ্যের পরিচয় দিয়েছেন অশীন দাশগুপ্ত। ব্যবসায়ী, তাদের সংগঠন, দালাল, বাজারের পণ্য, মূল্য মান ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য থেকে জানা যায় যে, শিল্প ও পৌরসংগঠনগুলির অভাবনীয় উন্নতি, সুদূরপ্রসারী বাণিজ্য, বিশেষত বৈদেশিক বাণিজ্য-বাজার সংগঠন গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঃ অন্তর্দেশীয় ও উপকূল বাণিজ্য নিয়ে ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য বলতে আন্তঃআঞ্চলিক, একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন এলাকা, গ্রাম অথবা নগর হতে পারে যেখানে বন্টন ব্যবস্থার পশ্চাতে সামাজিক বাধ্যবাধকতা থাকে। সচরাচর গ্রাম থেকে নগরে পণ্যের প্রবাহ চলত তবে নগর থেকে নগরেও বাণিজ্য চলত। আন্তঃবাণিজ্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো গ্রাম থেকে কাঁচামাল নগরে যেত, পণ্য তৈরি হত, তারপর তা বাজারে যেত বিক্রির জন্য। প্রধান কাঁচামাল ছিল খাদ্যশস্য, কার্পাস এবং পশম। অত্যধিক আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যয় সত্ত্বেও ঐগুলি ছিল প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

বাংলা ছিল খাদ্যশস্যের ব্যাপারে সমৃদ্ধ এলাকা। বাংলা থেকে মালপত্র অনেক এলাকায় সরবরাহ হত। চাল, চিনি,মাখন বাংলা থেকে আগ্রায় যেত। মালব, রাজপুতনা এবং উত্তর ভারত থেকে আগ্রার মাধ্যমে খাদ্য-শস্য আমদানি করত গুজরাট। ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকার লিখেছেন : "আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য-নির্ভরতা ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন গুজরাটের সিল্ক শিল্প বাংলার কাঁচা সিল্কের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। ফলে সপ্তদশ শতকে চীনা রেশম-নির্ভরতা বিলুপ্ত হয়েছিল। অপরদিকে সুরাট বুরহানপুর এলাকার কাঁচা তুলোর উপর বাংলার বস্ত্রশিল্প নির্ভরশীল ছিল। নীল এবং অন্যান্য রঙ করার জিনিস যা বস্ত্র উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য ছিল তা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উৎপাদিত হত। সারা দেশে যেখানে যেখানে কাপড় উৎপাদিত হত, তা ধোয়া এবং রঙ্ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হত আগ্রা, আমেদাবাদ, মাসুলিপত্তম এবং বাংলার কিছু জায়গায়।"[১]

উল্লেখ করা দরকার যে, পণ্য দ্রব্যের মধ্যে ছিল উৎকৃষ্ট মানের চাল, আখ, বস্ত্রাদি, মশলাপাতি, কাশ্মীরি শাল, কাঠের আসবাব, লাক্ষা, আফিম, চিনি ও অন্যান্য জিনিস।

মোগলযুগে 'বণিক' বলতে যারা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত তাদেরই বলা যেতে পারে। এই বণিক শ্রেণীকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, "(ক) ইয়োরোপীয় কোম্পানী ও তার কর্মচারিদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য এবং সেসব ক্রিয়াকলাপে জড়িত এদেশীয় বণিক, (খ) ইয়োরোপীয় বণিক ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক, (গ) স্থল পথে আন্তর্মহাদেশীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক এবং (ঘ) স্থানীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিক।"[২] এই চতুর্থ শ্রেণীর বণিকরাই দেশীয় বা আন্তর্বাণিজ্যের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। স্থলপথে আন্তর্মহাদেশীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে কতকগুলি বণিকগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল। এদের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শিখধর্মী লোহানা ও ক্ষত্রী, তামিলনাড়ুতে চেট্টিয়ার ও মেনন, অন্ধ্রে কোমতি, গুজরাটে খোজা, বোহরা, পূর্বভারতে রাজস্থানি বানিয়া এবং পশ্চিমভারতে গুজরাটি ও পারসি। তাছাড়া ছিল বানজারা নামক গোষ্ঠী এবং শৈব দশনামী গোসাঁইগণ। বণিকরা নানা জিনিসের ব্যবসা

করতেন এবং যেখানেই লাভ তারা সেখানেই যেতেন। কিন্তু কোনও বিশেষ দ্রব্যে বিশেষভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে তার উন্নতি ঘটানোর ব্যাপারে তাদের মন ছিলনা। অশীন দাশগুপ্ত লিখেছেন, ব্যবসার জগৎ থেকে উৎপাদনের জগতে এইসব বণিকদের উত্তরণ হয়নি।[১]

আঞ্চলিক বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু নির্দিষ্ট গঞ্জ ও বাজার গড়ে উঠেছিল এবং বছরের বিশেষ সময়ে বা সারা বছর ক্রয়বিক্রয় চলত। আঞ্চলিক বণিকদের অধিকাংশই ছিল নগরবাসী। তাদের দালালরা গ্রামাঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী যোগাড় করত। তাদের লেনদেনের মাধ্যম ছিল প্রধানত হুণ্ডি।[২] সংখ্যার দিক থেকে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় ছিল যথেষ্ট বড়ো আকারের, যার থেকে মোগল যুগে বাণিজ্য বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিষয়ে আরও কতকগুলি কথা বলা দরকার। যেমন অন্তর্বাণিজ্যের পথ প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আন্তর্জাতিক স্থলপথের সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিল তেমনি বন্দরগুলি ছিল উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। বস্তুত আভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যপথ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে বাণিজ্য পথ কীভাবে যুক্ত ছিল তা কয়েকটি উদাহরণ থেকে বলা যায়। (১) লাহোর থেকে সিন্ধু ও গুজরাট হয়ে মুলতান, সাকার , খাট্টা-লাহরি বন্দর-আমেদাবাদ; (২) আগ্রা থেকে উত্তরে দিল্লি, কার্ণাল, সরহিন্দ লাহোর; (৩) আগ্রা থেকে দক্ষিণে গোয়ালিয়র-হাণ্ডিয়া-বুরহানপুর (৪) আগ্রা থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে আজমির বোগরা, আমেদাবাদ; সেখান থেকে সুরাট বরোদা হয়ে ঔরঙ্গাবাদ ও দাক্ষিণাত্য; (৫) পূর্বদিকে যমুনা পেরিয়ে এলাহাবাদ, তারপর গঙ্গা পেরিয়ে বেনারস ও পাটনা; (৬) বেনারস থেকে পাটনা-জৌনপুর ; আর একটি পথ দক্ষিণপূর্ব দিকে শোন নদী পেরিয়ে সাসারাম ও অতঃপর উত্তরদিকে; (৭) পাটনা থেকে বাংলা, সেখান থেকে মুঙ্গের হয়ে একদিকে রাজমহল, অপরদিকে কাশিমবাজার, হুগলি ও মেদিনীপুর। এরকম পথ দাক্ষিণাত্যেও ছিল অনেক। আবার নদীপথও ছিল।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল নগরে এবং নদীপথের দু'ধারে। আঞ্চলিক বাজার হিসেবে সেখান থেকে নির্দিষ্ট কিছু পণ্য আন্তঃআঞ্চলিক বাজারে প্রেরিত হত। বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে শ্রীপুর, সাতগাঁও, হুগলি, ঢাকা, কলকাতা, পাটনা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লি, মুলতান, লাহোর, কান্দাহার, কাবুল, থাট্টা, আমেদাবাদ, বুরহানপুর, সুরাট, গোলকুন্ডা, মাসুলিপত্তম, গুজরাট, কোঙ্কণ, মালাবার প্রভৃতির নাম করা যায়।

উপকূলীয় বাণিজ্য পথ বন্দরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। উপকূলে বাণিজ্যরত বেশিরভাগ জাহাজের সত্ত্বাধিকারী ছিল মুসলমান আর তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যবসায়ীগণ ছিল হিন্দু। কয়েকটি উপকূলীয় জলপথের বিবরণ এখানে দেওয়া হলো ঃ

(১) সিন্ধুর মোহনা থেকে গুজরাট (২) গুজরাটের বন্দর থেকে পশ্চিম উপকূলীয় বন্দর, পূর্ব উপকূলীয় বন্দর ও বাংলার বন্দর (৩) বাংলার বন্দর থেকে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বিস্তৃত বন্দর ইত্যাদি।

শুধু বাণিজ্য কেন্দ্র নয়, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ব্যাপারেও মোগলযুগে দৃষ্টি দেওয়া হত। মোরল্যান্ড আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অভাব ছিল লিখেছেন, কিন্তু তার মত খন্ডন করেছেন অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী। বস্তুত জীবন ও সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত নিরাপত্তা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয় এবং বিদেশী পরিব্রাজকদের নিরাপত্তা-হীনতার অন্ধকার চিত্র সত্ত্বেও ভারতের পর্যাপ্ত বাণিজ্য বিপরীত চিত্রই তুলে ধরে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ বৈদেশিক বাণিজ্য চলত প্রধানত সমুদ্র পথে তবে স্থলপথও ব্যবহৃত হত। ইয়োরোপীয় বণিকদের আসার পর থেকে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রভূত বিকাশ ঘটে। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, নেপাল, পারস্য, পূর্বভারতীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ (ডাচ) ও ইংরেজ বণিকরা ভারতের পণ্য ইয়োরোপের বাজারে নিয়ে যেত। ভারতবর্ষ থেকে ইয়োরোপে যে-সব পণ্য যেত সেগুলির মধ্যে ছিল—নীল, আফিং, সূতিবস্ত্র, মসলিন, চিনি, শোরা, মোম, নানা রকম মশলা, হাতির দাঁতের দ্রব্য ইত্যাদি; আর যা আমদানি করা হত সেগুলির মধ্যে রূপো, ঘোড়া, চিনেমাটির বাসন, মণিমুক্তো, হাতির দাঁত, ভেলভেট, ব্রোকেড, সুগন্ধি তেল ইত্যাদি। দেশের চাহিদা মিটিয়ে আফ্রিকা, আরব, ব্রহ্মদেশ, মালাক্কা, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমান সূতিবস্ত্র এখান থেকে রপ্তানি করা হত।

বস্তুতপক্ষে ভারতীয় সূতিবস্ত্রের খ্যাতি ছিল সুদূর প্রসারিত। বাংলার মসলিন ছিল এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র যার সমাদর ছিল সর্বত্র। নানা মূল্যের সূতির কাপড়ের ব্যবসা মোগলযুগে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইয়োরোপীয় বণিকরা সোনার বিনিময়ে ভারতীয় সূতিবস্ত্র, কিনতেন এবং সেই সূতিবস্ত্রের বিনিময়ে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (সুমাত্রা, বোর্ণিও, যাভা, মালয়) থেকে মশলা কিনতেন। উড়িষ্যার খাদ্যশস্যও মালাক্কা ও লোহিতসাগরের উপকূলে রপ্তানি হত। ভারতীয় বণিকরাও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। রপ্তানি হত বাংলার সূতিবস্ত্র, চাল, তামাক,গন্ধক ইত্যাদি আর আমদানি হত আরক, গোলমরিচ, বিলাসসামগ্রী। ভারতীয় বন্দরগুলির মধ্যে সুরাট, ক্যাম্বে, ব্রোচ (ভারুচ বা ভৃগুকচ্ছ), কোচিন, কালিকট, মাসুলিপত্তম, হুগলি, সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও, চট্টগ্রাম প্রভৃতির নাম করা যায়। বিদেশী পর্যটক বার্নিয়ের মতে ভারতীয় বণিক ও দালালেরা ছিল সাধারণভাবে দক্ষ ও সুচতুর। অভিজাত ও শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিরাও বাণিজ্যে অংশ নিতেন। এই প্রসঙ্গে মীরজুমলা বা শায়েস্তা খাঁর নাম করা যায়।

মোগলযুগে বহির্বাণিজ্যের চারটি ভাগ করা যেতে পারে ঃ (ক) ভারতীয় স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্য, (খ) পর্তুগীজ বাণিজ্য, (গ) ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশের বাণিজ্য কোম্পানি এবং (ঘ) ইয়োরোপীয় বণিকদের ব্যক্তিগত ও অবৈধ বাণিজ্য। এর মধ্যে প্রথমটি ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলেও অন্যান্যগুলির প্রতিক্রিয়াতে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। বাণিজ্যপথ ছিল সমুদ্রে ও স্থলপথে। ভারতের বিস্তৃত ও লাভজনক বহির্বাণিজ্যের পথের কাঁটা ছিল লুণ্ঠন ও দস্যুদের অত্যাচার।

পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে পর্তুগীজ টোম পাইরেস তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুমা ওরিয়েন্টাল'-এ ভারত মহাসাগরে সামুদ্রিক বণিকদের বিবরণ দিয়েছেন। সেই কাঠামো মোগল যুগেও অক্ষুন্ন ছিল। পশ্চিম উপকূলে সামুদ্রিক বণিকদের অধিকাংশ ছিলেন গুজরাটি। এদের মধ্যে অনেকেই বোহরা মুসলিম। নিজেদের লাভের ব্যাপারে তারা কোনও নীতির ধার ধারতেন না। বণিকদের জীবনযাত্রার মান ছিল উন্নত। অনেক সমৃদ্ধ নগরও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে গড়ে উঠেছিল।

ষোড়শ সপ্তদশ শতকে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রসার ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়। বিদেশেও ভারতীয় বণিকরা বসতি স্থাপন করেছিল। ভারতের সহিত ইয়োরোপে যাতায়াতের পথ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে ষোড়শ শতকের গোড়া থেকে ইয়োরোপীয়রা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে নতুন করে উৎসাহিত হয়। প্রথমে পর্তুগিজ এবং পরে ওলন্দাজ (ডাচ) এবং শেষে ইংরেজ বণিকদের আগমণ ভারতের সুদূরপ্রসারী ফল ফলিয়ে ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলেই ডাচ এবং ইংরেজদের কার্যকলাপ শুরু হয়, যা বৃদ্ধি পায় শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের আমলে। সতেরো শতকে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল ডাচ ও ইংরেজদের জন্যই। আবার আঠারো শতক থেকে সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের স্থলে ইয়োরোপীয় বণিকদের প্রাধান্য দেখা দেয়।

ভারতের বিশাল আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য পরিচালনা করত বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের ব্যবসায়ীগণ। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় বিশেষ বিশেষ এলাকায় শক্তিশালী ছিল। বণিক গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সংঘ প্রতিষ্ঠাও করেছিল। ইয়োরোপীয় বণিকদের দাপট অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে অনুভূত হয় বলে কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী মনে করেন। এই কথা ঠিক যে অন্তত ভারতীয় অর্থনীতি ও সমুদ্র-অধিকারের কথা স্মরণ রাখলে একথা বলা যায়। সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর পর্তুগিজদের একাধিপত্য বিনাশ করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বণিকরা ওলন্দাজ ও ইংরেজদের প্রথমে স্বাগত জানায়। কিন্তু ক্রমে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা, ভারতীয় রাজনৈতিক তথা আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যের যেমন অবনতি হয়, তেমনি ঔপনিবেশিকতার সুযোগে বিদেশীরাই বাণিজ্যে সিংহভাগ দখল করে ফেলে।

মোগল যুগে বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতে বাণিজ্যিক মূলধনের অভাব ছিল না। বড়ো বড়ো বণিক শ্রেণী ছিল কিন্তু সতেরো বা আঠারো শতকে ভারতে

বাণিজ্যিক সংগঠনের উল্লেখযোগ্য একটা পরিবর্তন হয়নি। উৎপাদন প্রক্রিয়াতে কোনও অভিনব রূপান্তর ঘটেনি। উৎপাদন কাঠামো পরিবর্তনে ভারতীয় বণিকদের অনীহা ছিল। গৌতম ভদ্র লিখেছেন, "বিক্রয় বাজারের বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতার অভাব এবং মাল কেনার বাজারে দালাল ও পাইকারদের উপস্থিতি ও মূলধনের বিচ্ছিন্নতা, বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্রাকারে মূলধনের বিনিয়োগই ভারতীয় মূলধনের সামাজিক ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফেরিওয়ালা থেকে জবরদস্ত বণিক সবাই এই উৎপাদন-কাঠামোর অঙ্গীভূত হয়েছে। সেটাকে ভেঙে ফেলবার কোনো উদ্যোগ নেবার প্রয়োজন তারা অনুভব করেনি।"[১]

অষ্টাদশ শতকের সার্বিক সঙ্কটের মধ্যেই ভারতীয় বাণিজ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। তবে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতিতে বাণিজ্যের অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়।

৩। ধর্মীয় সমন্বয়বাদ

মোগল যুগের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে ধর্ম ছিল বহু, ধর্মীয় সংস্কৃতিও ছিল নানান প্রকৃতির। এই ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল? এই প্রশ্নটির উত্তর নিয়ে নানা মত আছে। বিতর্কও আছে। বস্তুতপক্ষে সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকেরা ধর্মীয় পার্থক্য ও বিরোধের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন; এ বিষয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক লেখকদের সঙ্গে মুসলমান সাম্প্রদায়িক লেখকদের আশ্চর্য মিল লক্ষণীয়। অথচ ইতিহাস ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা বা সাম্প্রদায়িক আদর্শের উপর নির্ভরশীল নয়। ইতিহাস বিচারে নিরপেক্ষতা প্রধান শর্ত। নানাবিধ সূত্রাবলী থেকে প্রাপ্ত মালমশলার সাহায্যে তথ্য, সেগুলি যাচাই এবং বিচার বিশ্লেষণের পর সত্য নির্ণয় ইতিহাসের আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই ইতিহাস যুক্তিবাদী, আধুনিক, বিজ্ঞান-সম্মত এবং ধর্মনিরপেক্ষ। তাছাড়া যে-কোনও যুগের মতন মোগল যুগের ইতিহাস বিশ্লেষণেও শুধুমাত্র শাসকশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সমগ্র জনগণের চিন্তাভাবনা, আচরণ-কর্ম সবদিকে দৃষ্টি দিলেই সামাজিক ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে, দিল্লির সুলতানি আমলের মতন, মোগলযুগে ভারতের প্রধান দুই ধর্ম ছিল হিন্দু এবং ইসলাম। এই দুই ধর্মাবলম্বী মানুষজন প্রধানত ছিল রক্ষণশীল এবং গোঁড়া, তারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃত্বের অধীনে ছিল। ধর্মীয়, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ব্যাপারে পার্থক্য বা ভিন্নতা ছিল সত্য; কিন্তু সর্বদা সেই ভিন্নতা সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়নি, যেমন দেখা যায় আধুনিক যুগে ঔপনিবেশিক আমলে। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে।

"বস্তুত ধর্মীয় বিবাদ সাম্প্রদায়িক বিবাদে পরিণত হয় আধুনিক যুগে, যখন ধর্মের সঙ্গে মিলে যায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সম্পদ আহরণের

লড়াই। ....মধ্যযুগের ভারতবর্ষের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ছিল, সংঘর্ষও ছিল—কখনো কখনো, কিন্তু সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না"।[১]

ভারতের মধ্যযুগের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যদি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আধুনিক পদ্ধতিতে এবং নানাবিধ প্রাথমিক আকর-উপাদানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কেও বহু ভুল ধারণার অবসান হবে। আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ (যারা সকলেই মার্ক্সবাদী বা বামপন্থী ঐতিহাসিক নন,) ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে যে চিত্র দেখান তাতে বিরোধ আছে, সম্প্রীতিও আছে এবং পারস্পরিক প্রভাব ও সমন্বয়ও আছে।[২] বস্তুত মোগল যুগে মুসলিম শাসনের দীর্ঘদিনের বিবর্তনে দেখা যায় যে, দুই সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ মানুষজনই চেয়েছে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে, যার ফলে ধর্মীয় ভেদাভেদ ও সামাজিক পার্থক্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। এর কারণ প্রধানত দুটি—একই বস্তুগত পটভূমিকা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস এবং ধর্মীয় চেতনার ও সম্প্রদায়গত চেতনার সাম্প্রদায়িক চেতনায় রূপান্তরিত না হওয়া।[৩] সমন্বয়বাদ (Syncretism) সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তো দেখা গিয়েছিল বটেই, এমনকি ধর্মের ক্ষেত্রেও তা পরিস্ফুট হয়। বাংলায় লৌকিক দেবতা সত্যনারায়ণ (হিন্দুদের) এবং সত্যপীর (মুসলমানদের)-এর উদ্ভব ও তাদের পাঁচালির মধ্যেই পারস্পরিক প্রভাব স্পষ্ট।

মধ্যযুগের সাহিত্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের গবেষক মুহম্মদ আবদুল জলিল লিখেছেন, "বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মোগল আমল বিশেষত্বের গৌরবে উজ্জ্বল। এই অধ্যায়টি ছিল বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের স্বর্ণযুগ। বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-দর্শন, আচার ও বিশ্বাস-সংস্কারে স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও অভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সুমধুর। এমনকি বিদেশী ও বিভাষী মুসলিম শাসকদের সঙ্গেও তাদের তেমন তিক্ত সম্পর্ক ছিল না। দ্বন্দ্ব সংঘাত যা কিছু ঘটবার ঘটেছে শাসক-শোষক শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ; শাসিত-শোষিত শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের জনজীবনে সেই সংঘাতের প্রতিক্রিয়া স্পর্শ করতে পারেনি। তবে শাসক-শাসিতে নিরন্তর শ্রেণী-সংঘাতের যে আদর্শ, মধ্যযুগের বাঙালী সমাজেও তা বর্তমান ছিল। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এই বিচিত্র রূপের প্রতিফলন ঘটেছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে।"[৪] দুর্ভাগ্যবশত এক শ্রেণীর লেখক বিভেদপন্থা অথবা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন

করেছেন এবং অনৈতিহাসিক ঘটনা টেনে এনেছেন। নিরপেক্ষ বিচারে মধ্যযুগে সমন্বয়বাদ অনস্বীকার্য। তাছাড়া, "শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও আপোষ সেযুগের ঐতিহাসিকদের শব্দায়নে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই শাসক শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে সামাজিক স্তরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন যোগ ছিল না"—একথা জোর দিয়ে বলেছেন অধ্যাপক হরবনস্ মুখিয়া।[১] এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এক শ্রেণীর পণ্ডিত বলার চেষ্টা করেছেন যে ভারতে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় বরাবরই 'দুই মেরুর বাসিন্দা'। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও 'আকর্ষণের বদলে বিকর্ষণের নীতির দ্বারা' পরিচালিত। অর্থাৎ সমন্বয় বা পারস্পরিক প্রভাবের প্রশ্নই ওঠে না। এই ধরনের লেখকদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী, হিন্দু সাম্প্রদায়িক, মুসলিম সাম্প্রদায়িক সবধরনের লেখকই আছেন।[২] কিন্তু সমসাময়িক আকর উপাদানের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ইতিহাসচর্চায় মহম্মদ হাবিব, সতীশ চন্দ্র, মেহদী হুসেন, সৈয়দ নুরুল হাসান, ইরফান হাবিব, হরবনস্ মুখিয়া, আনিস জাহান সয়ীদ প্রমুখ পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করে লিখেছেন যে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক পরম বন্ধুত্বেরও নয়, চরম শত্রুতারও নয়।[৩] নিঃসন্দেহে তারা পারস্পরিক প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে এই পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় এক সমন্বয়বাদী উন্নততর মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল।

মোগলযুগে ভারতে, 'সমন্বয়বাদ' অবশ্যই সীমাবদ্ধ ছিল—কিন্তু তাই বলে তা অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার করছেন অনেকেই। যেমন দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। শ্রীরাম শর্মা-র 'The Religious Policy of the Mughal Emperors' (কলকাতা, ১৯৪০) গ্রন্থে মোগল রাষ্ট্রকে বলেছেন ধর্মাশ্রয়ী অথচ তা আদৌ ছিল না। আবার ইস্তিয়াক হুসেন কুরেশী তার "The Muslim Community of the Indo- Pakistan Sub-Continent' গ্রন্থে (হেগ, ১৯৬২) লিখেছেন, রাজপুতদের অত্যাচার থেকে ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কুরেশীর মতে আকবর 'ইসলামের খলনায়ক'। কেননা তিনি গোঁড়ামি মুক্ত হয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চেয়েছিলেন। এই ধরনের মন্তব্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়; সুতরাং অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক।[৪] মুসলিম পন্থী লেখকগণ (এম. জাহিরুদ্দিন ফারুকি, এস.এম. জাফর,

আই এইচ কুরেশী, হাফিজ মালিক, ইজাজ আহমদ প্রমুখ) কিংবা হিন্দুত্ববাদী লেখকগণ (রমেশচন্দ্র মজুমদার, এ. এল শ্রীবাস্তব, জি. এস. ঘুর্যে, শ্রীরাম শর্মা প্রমুখ) উভয়েই ইতিহাসের সত্যপন্থা ও নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে বিচ্যুত।

মধ্যযুগে দিল্লির সুলতানি আমলে ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম প্রভাব স্পষ্ট। ভক্তি নায়কদের দৃষ্টির ঔদার্য ও মানবতাবাদ থেকে ফুটে উঠেছিল, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' (চন্ডীদাস)। গুরুনানকের শিখপন্থার উপর ইসলামের প্রভাব পন্ডিতেরা যেমন স্বীকার করেন, তেমনি শ্রীচৈতন্যের কাছে মুসলমানগণ অচ্ছুত ছিলেন না। 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব' বিষয়ে সবচাইতে প্রামাণিক ও সুপরিচিত গবেষণা করেছেন ডঃ তারাচাঁদ।[১] উত্তরকালে তার উত্তরসূরী অনেকেই হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়-এর উপর জোর দিয়েছেন। এই সব লেখকদের মধ্যে হুমায়ুন কবির, আবিদ হুসেন, ইউসুফ হাসান, মহম্মদ ইয়াসিন, মহম্মদ মুজিব, হারুণ খান শেরওয়ানী, জগদীশনারায়ণ সরকার, অসীম রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[২]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে মধ্যযুগের ভারতে ধর্মান্ধতাই একমাত্র চিত্র নয়, ধর্মসমন্বয়ও লক্ষ্যণীয়। মোগল যুগ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। যদিও সম্রাটের ধর্ম বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমগ্র দেশের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবু মোগল সম্রাটগণও ধর্মীয় উলেমাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দেশ শাসন করতেন না। তবে শাসক শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব যেমন ছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও তেমন ছিল। আজ ভাবাবেগ বা আগ্রহ আতিশয্যে বিরোধ অস্বীকার করা যায় না। আকবরের সাধারণ উদারতা বা আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামি অনস্বীকার্য। হিন্দু-মুসলমান ছিলেন ভাই-ভাই এমন বলা হলে তা ইতিহাসের নিরিখে বাড়াবাড়ি। তবে সমন্বয় একদম হয়নি একথা বলাও অতিশয় উক্তি।

বস্তুতপক্ষে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগে বিরোধ, সম্প্রীতি ও সমন্বয় তিন রকমেরই চিত্র দেখা যায়। প্রথমত, এমনিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মৌলিক— ধর্ম ও দর্শনের, আচার ও আচরণের, নিরাকার ও সাকারের, একেশ্বরবাদ বহুদেবতাবাদের, ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে জাতিভেদের। বিভেদ থেকেই বিরোধ, বিরোধ থেকেই বিদ্বেষ। সমসাময়িক আকর-উপাদানে এই বিদ্বেষের চিত্র আছে। বিশেষত সমাজের উচ্চস্তরে। মনে রাখা দরকার, মোগল যুগে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হলেও শাসক, হিন্দুরা সংখ্যাগুরু হলেও শাসিত। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশ ধর্মান্তরিত, তাই সমাজজীবনে বিশেষত নিম্নবর্ণের মধ্যে দীর্ঘদিনের পারস্পরিক সহাবস্থান, একই

পোষাক, ভাষা, সংগীত, লেনদেন, শ্রেণীস্বার্থ, খেলাধূলা, আমোদ, সামাজিক আদানপ্রদান— অর্থাৎ এককথায়, একই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বস্তুগত পটভূমি উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বাড়িয়েছিল। সমসাময়িক সূত্রে এই সম্প্রীতির চিত্র আছে। তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাবের ফলে এক মিশ্র ও সমন্বয়বাদী রূপ দেখা যায়। ফলে ভাষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সংগীত প্রমুখের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন থেকে অধ্যাপক অসীম রায় পর্যন্ত অনেকের গবেষণায় তা প্রমাণিত।[১] অদ্যাপি স্থাপত্য নিদর্শনের প্রমাণ বিদ্যমান।[২]

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে যে সমন্বয় (Syncretism) ঘটেছিল তা প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষণশীল ধর্মের উপর প্রভাব তেমন না ফেললেও, ভক্তিমার্গীয় ধর্ম, লোকধর্ম, সূফীবাদ প্রভৃতির উপর প্রভাব ফেলেছিল। লৌকিক ধর্মের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাবের চিহ্ন ও প্রমাণ আছে। তবে সমন্বয় ধর্মের চেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় সংস্কৃতিতে। সাহিত্য, ভাষা, সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, শিল্প, ইতিহাসচর্চা, প্রতিটি বিভাগেই ইসলামীয় বা আরবি ফারসি, তুর্কি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পারস্পরিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পোষাক, খাদ্য এবং সামাজিক আচরণেও। বিশেষত নিম্নবর্গীয় সাধারণ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের মধ্যে। শুধু ভারতীয় জীবনে হিন্দুদের জীবনযাত্রায় ইসলাম প্রভাব ফেলেছিল এমন নয়, ইসলামও ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

উচ্চ শাসক শ্রেণীর এমনকি মোগল সম্রাটদের মধ্যেও সমন্বয়বাদ প্রভাব ফেলেছিল। দেওয়ালী, দশেরা, বসন্ত, হোলি, নওরোজ, মহরমে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দিতেন। আকবর যে শুধু উদার হিন্দু নীতি বা রাজপুত নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, নিরক্ষর হয়েও হিন্দু শাস্ত্র অনুবাদ করিয়েছিলেন। চিশতি সূফি গোষ্ঠী (সিলসিলা) সমন্বয়বাদের প্রতীক ছিলেন। আকবরের সার্বজনীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা (সুলহ্-ই কুল) পূর্ণরূপ পেয়েছিল 'দীন-ই-ইলাহীর' মধ্যে।[৩] আকবর ইসলাম ত্যাগ করেননি, তবে মুসলমান হয়ে জন্ম নিয়েও তাঁর মৃত্যু সমন্বয়বাদীরূপে।[৪] দীন-ই-ইলাহীর চরিত্র নিয়ে মতভেদ থাকলেও এর সমন্বয়বাদ নিয়ে দ্বিমত নেই। মোগলযুগে আকবরের ভাবনার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকা স্বাভাবিক তবে সমন্বয়বাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ

পুত্র দারা শুকোহ।[১] তাঁর 'মাজনা উল্ বাহরিন', 'সির ই আকবর' ইত্যাদি পাঠ করলে তা বোঝা যায়। রামায়ণ-মহাভারত উপনিষদ দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। তবে ধর্মের চেয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ছাপ স্পষ্ট।

৪। শিল্প ও স্থাপত্য ঃ

সূচনা ঃ "ধর্ম ও শিল্পকলা দুটি পৃথক সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ। এদের যে-কোনও একটিতে সংস্কৃতির বিবর্তনকে সম্যক অনুধাবন করা যায়। একটি মানবগোষ্ঠীর চিৎশক্তি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত হয়। সম্ভবতঃ শিল্পকলায় সেই পরিবর্তনের আভাস ধর্মের চেয়েও অধিকতর সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কেননা প্রকৃতিতে ধর্ম অধিকতর মনোসাপেক্ষ, আর শিল্পকলা বাস্তবিক রূপসাপেক্ষ।"— এই মন্তব্য করেছেন তারাচাঁদ। বস্তুত শিল্প ও স্থাপত্যের উপর ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও পরোক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য।

সুসংস্কৃত আরব জাতির সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েও সেই যোগসূত্র টিকে থাকেনি। তারপর তুর্ক-আফগান ও মোগল যুগে তুর্কি ও মোগলরা বাগদাদ পারস্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গজনী আফগানিস্তান হয়ে ভারতবর্ষে বহন করে নিয়ে আসে। প্রাচীন যুগ থেকে ত্রয়োদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত ভারতে নানা প্রকার শিল্প ও স্থাপত্যরীতিতে নান্দনিকবোধের যেমন বিকাশ ঘটে, তেমনি শিল্প-উপাদানের মধ্যে ধর্মকেও অস্বীকার করা যায় না। মন্দির, চৈত্য, বিহার যা কিছু স্থাপত্য নিদর্শন প্রাচীন যুগের আছে সবই ধর্মকেন্দ্রিক। স্থান-কাল-পাত্র বুঝে শৈলী ও ঘরানার বদল ঘটে। প্রাচীন যুগে গান্ধার, মথুরা, অমরাবতী বা বেঙ্গি ইত্যাদি শিল্প ঘরানা সুবিদিত। হিন্দু-স্থাপত্যে নকশার বৈচিত্র্য ও অলঙ্করণের সূক্ষ্মতা ও সমৃদ্ধি অসামান্য। ত্রয়োদশ শতক থেকে সুলতানি আমলে ইসলামীয় শিল্পরীতির সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে। যার ফল হয় ইচিবাচক এবং গৌরবজনক।

বাগদাদ পারস্যের ঐতিহ্যে লালিত পরিশীলিত তুর্কিরা ভারতে সাংস্কৃতিক বিকাশের সূচনা করেছিলেন। তারপর মোগলরা ভারতে এসে ভারতীয় উচ্চমানের সাহিত্য, শিল্প-স্থাপত্যের সঙ্গে মোগল শিল্প ও স্থাপত্যের ধারণার সংমিশ্রণে ভারতে এক নতুন শিল্পস্থাপত্য রীতির বিকাশ ঘটায়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে সুলতানি আমলে হিন্দু ও মুসলমান শিল্প ধারার সমন্বয়ে স্থাপত্য শিল্পের যে সূচনা হয়েছিল মোগল যুগে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

বস্তুতপক্ষে মোগল তথা সমগ্র মধ্যযুগে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়। দীর্ঘকাল ধরে একই সঙ্গে বসবাস করার, একই শাসনাধীনে থাকার এবং একই বস্তুগত পরিবেশ ও পটভূমিতে থাকার ফলে হিন্দু ও মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যের সূত্র ও উপাদান গড়ে ওঠে। জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন নানাক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাব থাকলেও সংস্কৃতির নানা মাধ্যমে তা বিশেষ ভাবে দেখা যায়। এই ইন্দো-মুসলিম সংস্কৃতির ফলে নানা দেশীয় ভাষার বিকাশ দ্রুততর হয়,

ভাষায় বহু বিদেশী শব্দের ফলে ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়, ভারতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও সমৃদ্ধি ঘটে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা সাহিত্যেই নতুন নতুন শাখায় বৈচিত্র্য আসে। ইতিহাস চর্চার বিকাশ ঘটে। সেই সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মোগল যুগে বিবর্তনের ফলে শিল্পকলায় (বিশেষত স্থাপত্য শিল্পে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে ততোটা নয়) এবং সংগীতে সুদূরপ্রসারী ফল লাভ হয়।[১]

মোগল যুগের স্থাপত্য

বিশিষ্ট শিল্প ঐতিহাসিক সরসীকুমার সরস্বতী লিখেছেন : "With the advent of the Mughals Indo-Muslim architecture reaches a unity and completeness which make the story of the architectural style that developed under their august patronage particularly fascinating and instructive."[২] ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য মোগল যুগে গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে। কারণ দুটি—একদিকে, মোগল সম্রাটগণ (আওরঙ্গজেব ব্যতিক্রম) ছিলেন শিল্পের গুণগ্রাহী, প্রকৃতির প্রেমিক এবং সৌন্দর্যের পূজারী। অন্যদিকে, হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক প্রভাব তখন পরিণতি লাভ করেছিল। তবে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে না হলেও চিত্রকলার ক্ষেত্রে দেখা যায় দরবারী শিল্পের আওতার বাইরে সাধারণ মানুষদের লোক-চিত্রকলারও উন্নতি ঘটেছে।[৩]

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এবং হুমায়ুন তাদের সময়কালীন অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার কারণে স্থাপত্য শিল্পে মনোযোগী হতে পারেননি। কিন্তু বাবর এবং হুমায়ুন উভয়েরই শিল্প প্রীতির উল্লেখ করেছেন পার্সি ব্রাউন 'কেম্‌ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া'র চতুর্থ খন্ডে তার প্রবন্ধে। বাবরের মধ্যে শুধু এক বীর এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা নয়, এক সৌন্দর্য প্রেমিক শিল্পীমনও ছিল, তার আত্মজীবনীর মধ্যেই তা স্পষ্ট। তিনি শিল্পের সমঝদার ছিলেন। আগ্রায় লোদী দুর্গের অন্তর্গত একটি মসজিদ প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে দেখা যায় যে ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা নেই। আগ্রা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে কিছু নির্মাণ কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। আত্মজীবনী 'তুজুক ই বাবুরী'-তে (ফারসিতে 'বাবরনামা' নামে অনূদিত) বাবর লিখেছেন যে, ৬৮০ জন কর্মী একমাত্র আগ্রাতেই শিল্প-স্থাপত্যের কাজে নিযুক্ত ছিল এবং আগ্রা, সিক্রি, বায়ানা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র এবং কিউল অঞ্চলে পাথর কাটার কাজে প্রত্যহ ১৪৯১ জন শিল্প-শ্রমিক কাজ করত। গোয়ালিয়রে মান সিং এবং বিক্রমজিতের প্রাসাদের তিনি প্রশংসা করলেও সম্ভবত রুচি

অনুসারে নির্মাণ কাজ তিনি শুরু করান যদিও স্বল্পকাল রাজত্বে তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। একসময় প্রাসাদাদি নির্মাণের জন্য তিনি সুদূর আলবেনিয়া থেকে শিল্পী আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর আমলের সৌধের মধ্যে আজও কালের নীরব সাক্ষী হয়ে টিকে আছে পানিপথের কাবুলবাগ মসজিদ ও রোহিলাখন্ডের সম্বলের জামা মসজিদ। অযোধ্যার বাবরি মসজিদ (যা ১৯৯২-তে ভেঙে ফেলা হয়েছে।) আদৌ বাবর নির্মাণ করেছিলেন কিনা প্রমাণ নেই। ভারতীয় স্থাপত্যে বাবরের দান উল্লেখযোগ্য নয়, তবে তাঁর বংশধরদের মধ্যে উচ্চ সুকুমার শিল্পকলার বীজ তিনিই বপন করেছিলেন।

বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন সিংহাসনে বসলেও দশ বছর পর তাকে সিংহাসন হারাতে হয়েছিল। আবার তা পুনরুদ্ধার করে এক বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ভাগ্য বিড়ম্বনায় শিল্প ইতিহাসে স্থায়ী নাম রেখে যেতে পারেননি তিনি। তবু তাঁর আমলে পারসিক রীতি ভারতে বেশি করে প্রবেশ করে। তাঁর আমলে নির্মিত সৌধের মধ্যে হিসারের ফতেহাবাদের মসজিদ এবং আগ্রার মসজিদ দুটি ধ্বংসপ্রায়। তবে বোঝা যায় সেগুলি পারসিক রীতির অনুকরণে নির্মিত। তিনি দিল্লিতে 'দিনপনাহ্' (জগতের আশ্রয়) নামে একখানি নগর পরিকল্পনা করেছিলেন, যার কাজ শুরু হয়েও শেষ হয়নি। খোন্দামীর লিখিত 'হুমায়ুন নামা'তে এই নগরের শুরুর কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত। বাগানঘেরা এক সাত তলা প্রাসাদ এর মধ্যে থাকার কথা ছিল। এছাড়া আগ্রায় 'খানা ই তিলিজম' নামে এক প্রাসাদ তিনি তৈরি করান বলে গুলবদন বেগম জানিয়েছেন।

বাবর-হুমায়ুনের আমলে যে ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যরীতির সূত্রপাত, তার ছাপ দেখি শেরশাহের আমলেও। ঐ শিল্পকলাও মোগল স্থাপত্যের অন্তর্গত। শেরশাহের আমলে ইন্দো-পারসিক রীতির সুষমামন্ডিত নিদর্শন পাই। এই স্থাপত্য প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায় দিল্লিতে শেরশাহ্ নির্মিত 'পুরানা কিল্লা'র মধ্যে যা আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। এইখানে ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। শেরশাহ্ কেল্লাকে ঘিরে শহর গড়তে চেয়েছিলেন। এই কেল্লার মধ্যে 'কুইলা ই কুহ্না' নামে এক অসাধারণ মসজিদ নির্মাণ করান শেরশাহ্, যার সম্বন্ধে পার্সি ব্রাউন মন্তব্য করেছেন, 'a gem of architectural design'। বস্তুত শের শাহের আমলেই আমরা সুলতানি যুগের ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সঙ্গে ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে মোগল স্থাপত্যের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই বলে সরসীকুমার সরস্বতী জানিয়েছেন। পুরানা কিল্লার মসজিদটির শৈলী ও অলংকরণ শিল্প সুষমায় মন্ডিত। তবে শেরশাহের যুগের স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সাসারামে নির্মিত শেরশাহের সমাধি। শিল্প রসিক হ্যাভেলের মতে এই শিল্পে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোগল স্থাপত্যরীতি এবং হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত আকবরের আমলে অনেক বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে আকবরের গভীর আগ্রহ তাঁর নির্মিত প্রাসাদ, দুর্গ, সৌধ, মসজিদ ইত্যাদির পরিকল্পনা ও নির্মাণের মধ্যে দেখা যায়। তেমনি আকবরের ঔদার্য ও সমন্বয়বাদী মনোভাবও তাঁর আমলের স্থাপত্যগুলির মধ্যে

দেখা যায়। লালপাথর তার বিশেষ প্রিয় ছিল। বস্তুত প্রকৃত অর্থে মোগল স্থাপত্য আকবরের হাতেই সূত্রপাত।[১]

আকবরের আমলে মোগল স্থাপত্যের প্রথম নিদর্শন দিল্লিতে নির্মিত হুমায়ুনের সমাধিসৌধ। আকবর অনেকগুলি দুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন যার মধ্যে সবচাইতে খ্যাত আগ্রা দুর্গ। ঐ দুর্গের দিল্লি গেট, জাহাঙ্গীর মহল, আকবরী মহল স্থাপত্য কীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়া আকবর লাহোর দুর্গ, এলাহাবাদ দুর্গ ও আটক দুর্গ নির্মাণ করান। আকবরের আমলের স্থাপত্যের অপর সুপরিচিত নিদর্শন ফতেপুরসিক্রি নগরের প্রাসাদ, বাড়িঘর,মসজিদ ইত্যাদি। এর মধ্যে 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'পঞ্চমহল', 'খাসমহল', 'যোধাবাঈ এর মহল', 'মারিয়মের মহল', বীরবলের বাড়ি, হাতিপোল, জামা মসজিদ, 'বুলন্দ দরওয়াজা' এবং সেলিম চিশ্তির সমাধি এবং ইসলাম খানের সৌধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুমায়ুনের মৃত্যুর আট বছর পর (১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে) হুমায়ুনের সমাধি নির্মাণ শুরু পত্নী হাজি বেগমের তত্ত্বাবধানে, সমাপ্ত হয় ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে। শ্বেতমর্মরে নির্মিত এক অসাধারণ কীর্তি। পারসিক রীতিতে তৈরি এই সৌধ আজও পর্যটকদের বিস্ময়। তেমনি মোগল স্থাপত্যের বিস্ময় আগ্রা ফোর্ট বা ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজা, জামা মসজিদ, 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস' ইত্যাদি। ফারগুসন ফতেপুর সিক্রিকেই 'মহৎপ্রাণের প্রতিবিম্ব' বলে উল্লেখ করেছেন। আকবরের শিল্পরীতি সমসাময়িক রাজপুত প্রাসাদ নির্মাণে এমনকি হিন্দু মন্দির নির্মাণেও গ্রহণ করা হয়েছে।

জাহাঙ্গীর আকবরের ন্যায় স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ অনুগামী ছিলেন না। বরং তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল চিত্রকলার দিকে। তবে মোগল স্থাপত্যের কিছু নিদর্শন তার আমলেও রয়েছে। এ গুলির মধ্যে সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি, লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধি, দিল্লিতে আবদুর রহিম খানখানার সমাধি এবং আগ্রায় নূরজাহানের পিতা ইতিমাদউদ্‌দৌলার সমাধি সৌধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ইতিমাদউদদৌলার সমাধিতে রক্তাভ বেলেপাথরের পরিবর্তে সম্পূর্ণ সাদা মার্বেল পাথরের ব্যবহার মোগল স্থাপত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করে, যে রীতি শাহজাহানের সময় চরম বিকাশ ঘটে। সুতরাং জাহাঙ্গীর, আকবর ও শাহজাহানের যুগের যোগসূত্র ছিলেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সরসীকুমার সরস্বতী।

শিল্প ঐতিহাসিক ডঃ রাম নাথ যথার্থই লিখেছেন যে, মোগল স্থাপত্য গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে শাহজাহানের আমলে। শাহজাহানের আমলের বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে অধ্যাপক বারানসী প্রসাদ সাক্সেনা তাঁর শিল্পানুরাগের কথাও লিখেছেন। পার্সি ব্রাউনের মতে, "With the reign of Shahjahan, the golden era of Mughal domination, was attained a period which found an expression in style of architecture of exceptional splendour and carried to the highest degree of perfection." তাঁর আমলের শুধু নয়, সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি পৃথিবী বিখ্যাত 'তাজমহল'। তাছাড়া

দিল্লির লালকেল্লা তিনিই নির্মাণ করান। দিল্লির জামা মসজিদ বা লাল কেল্লার দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, নৌবত খানা যেমন তাঁর কীর্তি, তেমনি আগ্রা দুর্গেও তিনি মোতি মসজিদ, শিসমহল, নাগিনা মসজিদ, মুসম্মান বুরুজ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। বস্তুত শাহজাহান আগ্রা, দিল্লি, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর প্রভৃতি নানা স্থানেই প্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর নির্মিত স্থাপত্যে আলঙ্কারিক কারুকার্য ও চিত্রাঙ্কনের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়।

শাহজাহানের আমলে নির্মিত অনেক কীর্তির মধ্যেই মোগল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তবে সব কিছুর উপরে তাজমহল, যা শাহজাহান তার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিতে আগ্রায় যমুনার পারে নির্মাণ করিয়েছিলেন। সরসীকুমার সরস্বতীর মতে, "The Taj Mahal at Agra stands as a creation of superb beauty and magnificence, not only in Mughal architecture but in Indian architecture as a whole"। বিদেশী পর্যটক সেবাস্টিয়ান মালরিক এক উদ্ভট মন্তব্য করেছিলেন যে, তাজের গঠন পরিকল্পনা জারোনিমো ভেরোনা নামে এক ভেনিসীয় শিল্পীর মস্তিষ্ক প্রসূত। কিন্তু বার্নিয়ে, ত্যাভারনিয়ে, পিটার মান্ডি প্রমুখ অন্যান্য ইয়োরোপীয় পর্যটকগণ কেউই একথা সমর্থন করেননি, তেমনি আধুনিক ঐতিহাসিকগণও একমত যে হুমায়ুনের সমাধি, আবদুর রহিম খান খানান এবং ইতিমাদউদ্দৌলার সমাধিভবনের রীতিই নবকলেবরে ফসল ফলেছিল তাজমহলের মধ্যে। রলিনসন লিখেছেন, "The Tajmahal is indeed, the miracle of miracles, the final wonder of the word।" ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে ১৬৪৮ খ্রিঃ এটি সমাপ্ত হয়।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালকে মোগল স্থাপত্য রীতির ও শিল্পের অবনতির কাল বলে অভিহত করা যেতে পারে। আওরঙ্গজেবের স্থাপত্য তথা শিল্প প্রীতির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবত যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে এবং গোঁড়া মনোভাবের জন্য তিনি এদিকে মনোনিবেশ করতে পারেননি। তবু আওরঙ্গজেবের আমলের স্থাপত্যকীর্তির সামান্য নিদর্শন আছে। যেগুলির মধ্যে লাহোরের বাদশাহী মসজিদ এবং দিল্লির মোতি মসজিদ উল্লেখযোগ্য। তবে আরও বেশি উল্লেখযোগ্য প্রিয় পত্নী রাবিয়া উদ্ দুরানীর স্মৃতিতে দাক্ষিণাত্যের (মহারাষ্ট্র) আওরঙ্গাবাদে নির্মিত 'বিবি কা মকবরা' (১৬৭১ খ্রিঃ)। অনেক সময় এটিকে দক্ষিণের তাজমহল বলা হয়ে থাকে। তবে এটি আদৌ তাজের সঙ্গে তুলনীয় নয়। আওরঙ্গজেবের পর মোগল সাম্রাজ্যের শুধু পতন নয়, মোগল স্থাপত্যেরও অবনতি লক্ষ্য করা যায়। দিল্লিতে মোগল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত শেষ উল্লেখযোগ্য চিহ্ন হলো সফদর জঙ্গের সমাধি (নির্মাণকাল ১৭৫৪ খ্রিঃ)।

মোগল চিত্রকলা

চিত্রশিল্পে মোগল যুগ এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত। শিল্প ঐতিহাসিক অশোক কুমার দাস লিখেছেন, "The Mughal School of painting represents one of the most significant phases of Indian art।" বস্তুত ভারতীয় চিত্রকলায় মোগল শাসকরা এক

গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। উৎপত্তি, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের দিক থেকে মোগল স্থাপত্য রীতির সঙ্গে মোগল চিত্রকলার মিল আছে। কেননা এখানেও ভারতীয় চিত্র শিল্পরীতির সঙ্গে বিদেশী বিশেষত ইরানীয় বা পারসিক শিল্পরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। তুর্ক-আফগান যুগে স্থাপত্যের বিকাশ হলেও চিত্রকলার অগ্রগতি হয়েছে অল্প। দিল্লির সুলতানগণ এ ব্যাপারে নিস্পৃহ ছিলেন। আমীর খসরু, শামস্-ই-সিরাজ আফিফ,মওলানা দাউদ প্রমুখ দেওয়াল চিত্র ও চিত্রকরদের কথা বললেও তার নিদর্শন নেই।

তবে প্রাক্ মোগলযুগে জৌনপুর, মান্ডু, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের আঞ্চলিক মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষুদ্র চিত্র বা 'মিনিয়েচার' আঁকার চল ছিল। তাছাড়া জৈন চিত্রকারদের আঁকা মিনিয়েচার চিত্রের অনেক নিদর্শন জৈন মন্দির সংলগ্ন পাঠাগারে আছে। রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট এবং মালব এ ব্যাপারে অগ্রণী। এই সব কেন্দ্রের চিত্রশৈলী মোগলদের সংস্পর্শে আসার আগেই জৈন ইসলামিক মিলে ইন্দো-মুসলিম চিত্রকলার জন্ম দেয়। মোগলযুগে পারসিক প্রভাবে তাতে নবজীবনের জোয়ার আসে। প্রাক্ মোগল এবং মোগল যুগেও চিত্রশিল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া যায় নানা গ্রন্থের হস্তলিখিত পান্ডুলিপিগুলিতে। মোগল চিত্রশিল্প ছিল খুবই সমৃদ্ধ এবং পরবর্তীকালে তা দাক্ষিণাত্যে, রাজপুতনা,পাঞ্জাব এবং উত্তরভারতের চিত্রশিল্পে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।[১]

মোগল যুগের চিত্রকলা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকগণ তার কয়েকটি বৈশিষ্ট এবং লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। সেগুলি হলো ঃ

(১) মোগল চিত্রশিল্পে ভারতীয় রীতির সঙ্গে বৌদ্ধ, বহ্লীক,ইরানীয় বা পারসিক এবং চীনা শিল্পরীতির এক সুষম সংমিশ্রণ দেখা যায়।

(২) মোগলদের আগে ভারতীয় চিত্রকলায় বৃহৎ পরিসরে চিত্র অংকন পদ্ধতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্পে ক্ষুদ্র পরিসরে চিত্রাঙ্কন যাকে ইংরেজিতে বলে মিনিয়েচার পেইন্টিং সেই পদ্ধতি অথবা সুপ্রচলিত গ্রন্থের পান্ডুলিপিতে বা ব্যাখ্যা হিসেবে চিত্রাঙ্কণ,যাকে ইংরেজিতে বলে ইলাস্ট্রেশন তা মোগল শিল্পরীতির অভিনব বৈশিষ্ট্য।

(৩) মোগল স্থাপত্যরীতি যেমন পারসিক স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে ইন্দো-পারসিক রীতির সৃষ্টি ক'রে এক কালজয়ী স্থাপত্যরীতিতে পরিণত হয়, তেমনি চিত্রকলার ক্ষেত্রেও ভারতীয় চিত্ররসের সঙ্গে পারসিক চিত্র রসের সমন্বয়ে এক নতুন ও স্বতন্ত্র চিত্রশিল্পের বিকাশ সাধিত হয়।

(৪) পারসিক চিত্রাঙ্কন রীতি ভারতে এসেও, এমনকি শুধু যোগাযোগ স্থাপনের নয়, পারসিক শিল্পীরাও ভারতে এসে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও, ভারতীয় শিল্পীরা পারসিক রীতিব্যবহার করেছেন নিজেদের মতো করে। ভারতীয় চিত্র শিল্পের উদ্দেশ্য, অনুভূতি ও মেজাজ ছিল স্বতন্ত্র, তার উপর পারসিক প্রভাবে নতুনত্ব সৃষ্টি হয়।

(৫) ভারতীয় চিত্রকলার মূল বিষয়বস্তু ছিল প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কল্পনা কিন্তু মোগল চিত্রকলার বিষয়বস্তু ছিল কঠোর বাস্তব। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, যুদ্ধ, শিকার, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল, গাছ, পশু, পাখি, বাদশার বিচার, সভার দৃশ্য, সিংহাসনের ছবি, প্রতিকৃতি ইত্যাদি মোগলযুগে আঁকা হয়।

(৬) বাবর ও হুমায়ুন পারসিক শিল্পরীতির অনুরাগী হলেও মোগল চিত্ররীতি আকবরের সময়েই বিশিষ্টতা লাভ করে। তা চরিত্রে ও মেজাজে সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে যায়।

(৭) জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল চিত্র শিল্পে আঙ্গিক অপেক্ষা বক্তব্যের উপর বেশি জোর লক্ষ্য করা যায়। জাহাঙ্গীরের আমলকেই মোগল চিত্রকলার উন্নত যুগ বলা যায়।

(৮) মোগলযুগে চিত্র শিল্পে কোনও কোনও আধুনিক শিল্প-সমালোচকের মতে ইয়োরোপীয় প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।

(৯) মোগল চিত্র শিল্পে বৃহদায়তন ছবিও আঁকা হয়েছে। রঙ ও তুলির কাজ অসাধারণ। বস্তুত মোগলরাই তরবারি, কলম এবং তুলিকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

(১০) মোগল চিত্রকলায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য তথা সমন্বয়বাদের চিত্র পরিস্ফুট। তারাচাঁদ তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মোগল চিত্রকলায় রামায়ণ মহাভারতের ছবিও আঁকা হয়েছে।

বস্তুত মোগল চিত্রকলা ভারতীয় শিল্পের এক নতুন দ্বার উদ্‌ঘাটন করে। অধ্যাপক ঈশ্বরীপ্রসাদ লিখেছেন যে, দিল্লির সুলতানগণ চিত্রকলায় অনুরাগী ছিলেন না। সম্ভবত চিত্রকলা ইসলাম সম্মত নয় বলে তারা মনে করতেন। ফিরুজ তুঘলক তো প্রাসাদে অঙ্কন নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন।[১] মোগল সম্রাটগণ ছিলেন বিপরীত মতাদর্শের শরিক। আনন্দ কুমারস্বামী লিখেছেন যে, জাহাঙ্গীর নিজেই ছিলেন এক সার্থক শিল্পী।[২] এমনকি প্রতিকৃতি অঙ্কন কঠোর দৃষ্টিতে ইসলামসম্মত নয়, তবু তারও প্রসার ঘটেছিল।

বাবর নিজে ছিলেন শিল্প ও সৌন্দর্যের পূজারী। তিনি মোগল দরবারে চিত্রশিল্পী নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ভারতে আসার সময় পারসিক শিল্পী বিহাজাদ এর কিছু ছবি নিয়ে এসেছিলেন। তৈমুরের আমলে মধ্য এশিয়াতে যে শিল্পধারা গড়ে উঠেছিল তাতে চৈনিক ছাপ ছিল। সেই তৈমুরীয় ধারা, চৈনিক ধারা এবং পারসিক শিল্পরীতি ভারতীয় শিল্পীদের উপর প্রভাব ফেলে। হুমায়ুন নিজে পারস্যে গিয়েছিলেন এবং ভারতে আসার সময় দুজন শিল্পীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তাদের নাম মীর সৈয়দ আলি তাবরেজি এবং খাজা আবদুস সামাদ। পারস্যে থাকার সময় তিনি পারসিক চিত্রের সৌন্দর্যে বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'দস্তাম-ই-আমীর হামজা'র পাণ্ডুলিপিতে এই দুই শিল্পের তুলির স্পর্শ আছে। হুমায়ুন পারসিক শিল্পীদের উপাধি দান করে সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিলেন।[৩] সৈয়দ আলি

এবং আবদুস সামাদ হুমায়ুনের সঙ্গে এসে প্রথমে কাবুলে কাজ শুরু করেন। সেখানে বাল্যকালে তাদের কাছে আঁকা শিখেছিলেন স্বয়ং আকবর। আবদুস সামাদের অঙ্কন সংগ্রহ করেছিলেন পরে জাহাঙ্গীর ; চিত্রগুলি বর্তমানে ইরানের তেহেরানের গুলিস্তাঁ পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। তবে এই দুই শিল্পী পরে দিল্লি যান এবং হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

আকবরের আমলে চিত্রকলা প্রসার লাভ করে। তিনি একটি পৃথক চিত্র শিল্প বিভাগ স্থাপন করেছিলেন। আকবরের আমলের ১৭ জন শিল্পীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু। পাণ্ডুলিপি বিদ্যা, পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কন এবং প্রতিকৃতি অঙ্কন সবই শুরু হয়। নৈসর্গিক চিত্র, দরবারী চিত্র এসব তো ছিলই। আকবরের দরবারে গুণী শিল্পী ছিলেন অনেক যেমন, মীরসৈয়দ আলি, আবদুস সামাদ, ফারুক বেগ প্রমুখ মুসলমান ছাড়াও ছিলেন দসওয়ান্ত, মাধো লাল, কানহা, সিকিন, সানওয়ালা, তারা, নানহা, মুকুন্দ, মহেশ, খেম, হরিবংশ, ভগবান, কেশু প্রমুখ। আবুল ফজল তার 'আইন ই আকবরি'তে উল্লেখ করেছেন যে বসওয়ান নামে একজন শিল্পী ছিলেন প্রতিকৃতি অঙ্কনে বিশেষ দক্ষ। দসওয়ান্তও ছিলেন উঁচু দরের শিল্পী। আবার সমসাময়িক গোয়ালিয়র, গুজরাট, কাশ্মীরেও অনেক উচ্চাঙ্গের শিল্পী ছিলেন যারা মোগল চিত্রকলার ধারাতেই আঁকতেন। এদের মধ্যে সুরদাস, ঈশান, শঙ্কর, সুরজন, নারায়ণ, ভীম গঙ্গাসিং, পরশ প্রমুখের নাম পাওয়া যায়।

আকবরের নির্দেশে ফতেপুর সিক্রি, দিল্লিতে, আগ্রায় বহু চিত্রঅঙ্কিত হয়। বর্তমানে লন্ডনে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট যাদুঘর সহ বিশ্বের নানাস্থানে তা রক্ষিত আছে। 'দস্তানই আমীর হামজা', যা 'হামজানামা' নামে সমধিক পরিচিত; তার পাণ্ডুলিপিতে মোগল চিত্রকলার অসাধারণ নিদর্শন আছে যা আকবরের সময়কার। দসওয়ান্ত এবং বসওয়ান, আবদুস সামাদ ও সৈয়দ আলি কেউ কারো চাইতে কম নন। বাবরের আত্মকথা 'তুজুক ই বাবুরি' তুর্কি ভাষায় লেখা, আকবরের আমলে 'বাবরনামা' নামে তা ফারসিতে অনূদিত হয়। ঐ কেতাবে এবং আবুল ফজলের 'আকবরনামা'তেও অনেক চিত্র ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের ফারসি অনুবাদ প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য।

জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল চিত্র শিল্পের সুবর্ণযুগ শুরু হয়। তাঁর আমলের অন্যতম শিল্পী ছিলেন বিষেন দাস। তিনি ছিলেন প্রতিকৃতি অঙ্কনে দক্ষ। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক ই জাহাঙ্গীরী'তে আবদুস সামাদ, আবুল হাসান, আগা রিজা, ফারুক বেগ, মনসুর এবং বিষেন দাসের নাম উল্লেখ করেছেন। এই বিষেন দাসের আঁকা দশরথের পুত্রোষ্টি যজ্ঞ, রাবনের সীতাহরণ , জটায়ু বধ একদিকে যেমন মোগল চিত্রকলার উজ্জ্বল উদাহরণ, তেমনি হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়বাদেরও উদাহরণ। এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীর ছিলেন আকবরের সার্থক উত্তরসূরী।

পিতার মতন জাহাঙ্গীর যে শুধু চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাই নয়, তিনি নিজেও আঁকতেন। তাছাড়া তার স্থাপত্যে যেমন উৎসাহ ছিল, অনুরাগ ছিল, তেমনি ছিল

চিত্রকলায়। আনন্দ কুমারস্বামী জাহাঙ্গীরের যুগকে মোগল চিত্রকলার 'সুবর্ণ যুগ' বলেছেন। ওস্তাদ মনসুর বা আবুল হাসানের মতন নামকরা চিত্রশিল্পী তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। জাহাঙ্গীর বহু গ্রন্থের চিত্রায়ন করিয়েছিলেন এবং প্রতিকৃতি সংগ্রহ করে (অ্যালবাম) সংরক্ষণ করেছিলেন। বিষেন দাস ছাড়াও তুলসী, কেশব, মনোহর, মাধব প্রমুখ হিন্দু শিল্পীরাও তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই মোগল চিত্রকলা ইয়োরোপীয় চিত্রকলার সংস্পর্শে আসে বেশি করে।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর থেকে মোগল চিত্রকলার অবনতি হতে থাকে বলে পার্সি ব্রাউন থেকে অশোককুমার দাস পর্যন্ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন। তবু শাহজাহনের রাজত্বকালে চিত্র আঁকা হত। সেই সব অঙ্কনে শোভা যাত্রা, শিকার, বিবাহ ইত্যাদির চিত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া আসফ খাঁ সহ কিছু কিছু অভিজাত মানুষদের প্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়ও আঁকা হত। শাহজাহানের আমলের শিল্পীদের মধ্যে কল্যাণ দাস, অনুপ, বিচিত্র, ফকিরউল্লাহ খান, মনোহর, মীর হামিম, মহম্মদ নাদির, সমরকন্দী প্রমুখের নাম করা যায়।

আকবর থেকে শাহজাহান পর্যন্ত যেসব পুস্তকের পাণ্ডুলিপি চিত্রিত সেগুলির মধ্যে হামজানামা, আকবর নামা, তারিখ-ই-রশিদী, রামায়ন-মহাভারতের অনুবাদ, বাবরনামা, মজনু লায়লা, তৈমুর নামা, বাহারিস্তান জামি, আনোয়ার-ই-সুসাইলি ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

শাহজাহানের পর আওরঙ্গজেবের আমলে মোগল চিত্রকলার অপমৃত্যু ঘটে। তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করা দূরে থাক চিত্রগুলিকে নষ্ট করার নির্দেশ দেন। তবে মোগল রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা হারালেও লক্ষ্ণৌ, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে মোগল শিল্পরীতিতে চিত্রকলার চর্চা অব্যাহত থাকে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো যে রাজপুত চিত্রশিল্পে মোগল প্রভাব লক্ষ্যণীয়। মেবার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দি, মালব প্রভৃতি কেন্দ্রে অবশ্য নিজস্ব ঘরানার রাজপুত চিত্রকলার চর্চা অব্যাহত ছিল। রাজপুত চিত্র শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল মোগল যুগেই।

অধ্যায় ৫

আওরঙ্গজেব ও সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত ক্ষমতা

Syllabus : Aurangzeb and the Zenith of the Empire.

১। রাজনৈতিক সম্প্রসারণ

সূচনা ঃ রক্তক্ষয়ী উত্তরাধিকার যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বিলাসপ্রিয় শাহজাহানের পুত্র ধর্মবিলাসী আওরঙ্গজেব প্রায় অর্ধশতক ধরে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ) মোগল সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর রাজত্বে কখনও অনুকূল, কখনও প্রতিকূল পরিস্থিতির সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি নিজে যে বিষয়টিকে দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেছেন, অভিনিবেশ সহকারে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবে বিশাল সর্বশক্তিমান মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম দশা তাঁর জীবদ্দশাতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

আওরঙ্গজেবের অভিষেক ঃ আগ্রা অধিকার ও পিতা শাহজাহানকে বন্দী করার (১৬৫৮ খ্রিঃ) পর আওরঙ্গজেব নিজের নামে খুৎবা পাঠ করেন ও নিজেকে দিল্লির সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন (২১ জুলাই, ১৬৫৮ খ্রিঃ)। এরপর খানুয়ার যুদ্ধে সুজা এবং দেওয়াই-এর যুদ্ধে দারাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ক'রে তিনি দিল্লির দেওয়ান-ই-খাসে সাড়ম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেক কার্য সম্পাদন করেন (৫ই জুন, ১৬৫৯ খ্রিঃ)। এই সময় তিনি 'আলমগীর' (বিশ্বজয়ী), 'বাদশাহ' (সম্রাট) এবং 'গাজী' (ধর্মযোদ্ধা) উপাধি ধারণ করেন। শাহজাহানের মৃত্যুর পর (১৬৬৬ খ্রিঃ) আগ্রার দুর্গে মহাসমারোহে তৃতীয়বার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (মার্চ, ১৬৬৬ খ্রিঃ)। অবশ্য দ্বিতীয়বার অভিষেকের পূর্বেই সিংহাসন নিষ্কন্টক হয়েছিল। কারণ মুরাদ, সুজা, দারা, দারার পুত্র ইত্যাদি সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে তখন নিহত করা হয়েছিল।

প্রাথমিক কার্যাবলী ঃ উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। তাই অভিষেকের পরই আওরঙ্গজেব জনসাধারণের আনুগত্য লাভের আশায় তাদের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করেন। এই সময় শাসনব্যবস্থা এক প্রকার অচল হয়ে পড়েছিল, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, দস্যু তস্করের উপদ্রব বেড়েছিল। তাই প্রজানুরঞ্জনের চেষ্টায় আওরঙ্গজেব শাসনব্যবস্থাটিকে সংহত করলেন, প্রজাদের বহু প্রকার কষ্টকর খাজনা মকুব করলেন এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এইসব কার্যকলাপের পশ্চাতে তাঁর নিজের শক্তিকে সুদৃঢ় করা ও নিজের শাসনকে সর্বজনগ্রাহ্য করাই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে তিনি উত্তর ভারতের প্রতি মনোযোগ দেন। সামরিক ও বেসামরিক কার্যকলাপের সবকিছু

উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রথমাংশের বিস্তার কাল ছিল ১৬৫৮ থেকে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ১৬৮২ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল দাক্ষিণাত্য। এই সময়সীমার মধ্যে তিনি দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন সুলতানগণকে পদানত করতে সক্ষম হন। তাছাড়া এই সময় মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বও তীব্রতর হয়ে ওঠে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজ্য বিস্তার ঃ সিংহাসন অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেব পূর্ববর্তী বাদশাহদের মত রাজ্য জয় ও বিদ্রোহ দমনে তৎপর হন। উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কোচ, অহম এবং আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ দস্যুরা নানা গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল। এদের দমন করার জন্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব বাংলার শাসনকর্তা মীরজুমলাকে নির্দেশ দেন। মীরজুমলা ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে প্রথমে কোচবিহার অধিকার করেন। কোচবিহারের নাম দেওয়া হলো আলমগীর নগর। কোচবিহারের পর মীরজুমলা আসাম আক্রমণ করলেন। ত্রয়োদশ শতকে অহোমরা তাদের আদি বাসভূমি ব্রহ্মদেশ থেকে এসে এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। 'অহোম' শব্দটি থেকেই নাম হয়েছে 'আসাম'। অহমরাজ জয়ধ্বজ মোগল বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে পারলেন না। আসামের রাজধানী সরগাঁও মোগল বাহিনীর অধিকারে এলো। অহমরাজ জয়ধ্বজ মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ছাড়াও বার্ষিক করদান করতে স্বীকার ক'রে এই সন্ধি স্থাপিত হলো। আসাম থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের সময় কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মীরজুমলা মারা গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে অহোম রাজ সন্ধি ভঙ্গ করে আসাম পুনরুদ্ধার করেন। অহোমরাজ জয়ধ্বজের পর তাঁর পুত্র চক্রধ্বজ মোগলদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। ফলে অহোমদের সঙ্গে মোগলদের লড়াই চলতেই থাকে।

মীরজুমলার পর আওরঙ্গজেব স্থায়ীভাবে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁ-কে। শায়েস্তা খাঁ প্রায় তিরিশ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। ১৬৯৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পূর্বেই তিনি বাংলার পর্তুগীজ হানাদারদের দমন করে বাংলার উপকূলে নিরাপত্তা বিধান করেন, পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের দমন করে সন্দীপ অধিকার করেন (১৬৬৫ খ্রিঃ), পরের বছর (১৬৬৬ খ্রিঃ) আরাকানরাজকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তাঁর সময় বাংলা শান্তি ও সম্পদে পরিপূর্ণ হয়েছিল। বলা হয়, 'এই সময় টাকায় আট মন চাল বিক্রয় হত'।

শায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর পর বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলেন আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উশ্‌শান। তাঁর দেওয়ান মুর্শিদকুলি খান ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজস্ব বিভাগটিকে স্থানান্তরিত করেন। শায়েস্তা খাঁর আমল থেকে বাংলায় যে সমৃদ্ধির সূচনা হয় তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্তের মত মোগল সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলও ছিল উপদ্রুত। এখানে বসবাস করত আফ্রিদি, ইউসুফজাই, খাতক প্রভৃতি

দুর্দান্ত আফগান উপজাতি। এরা নিজেদের আইন ও রীতি-নীতি ছাড়া অন্যের চাপানো কোনও আইন মানত না। এরা সুযোগ পেলে কচ্ছ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর পর্যন্ত চলে আসত ও লুটপাট করত। সম্রাট আওরঙ্গজেব এরূপ নিরাপত্তাহীন অবস্থার অবসান কল্পে অর্থ, বৃত্তি ও ভাতা দিয়েও এদের বশীভূত করতে পারেননি। শেষে তিনি ভেদনীতি প্রয়োগ করে এদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। এরপর ইউসুফজাই উপজাতির নায়ক ভাগু নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে পেশোয়ারের চারিদিকে যখন তাণ্ডব চালাতে থাকে তখন মোগল সেনাপতি আমিন খাঁ তাদের অত্যাচার স্তব্ধ করে দেন (১৬৬৭ খ্রি:)। কয়েক বছর পর (১৬৭২ খ্রি:) আফ্রিদিগণ তাদের সর্দার আজমল খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। ভাগুকে যিনি পরাজিত করেন সেই মোগল সেনাপতি আমিন খাঁ আফ্রিদিদের হাতে পরাজিত হলেন। এই সময় খাতক উপজাতির নেতা দুঃসাহসী খুশ্হল খাঁ আফ্রিদিদের সঙ্গে যোগদান করেন। পাঠানদের মধ্যে একটা জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়। এই অভ্যুত্থান দমনের উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব প্রধান প্রধান মোগল সেনাপতিদের সীমান্তের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেন। মহবৎ খান, সুজাত খান ও যশোবন্ত সিংহও সেখানে উপস্থিত হন। শেষে আওরঙ্গজেব স্বয়ং সসৈন্যে রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী আসান আবদাল নামক স্থানে হাজির হলেন (জুন, ১৬৭৪)। সম্রাটের উপস্থিতিতে মোগল বাহিনীর মনে সাহস ও উৎসাহ সঞ্চারিত হলো। মাঝে মাঝে পরাজিত হয়েও ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে মোগল বাহিনীর জয় হতে থাকে। আওরঙ্গজেব এই সময় দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করলেন। অবশেষে ১৬৭৮ থেকে ১৬৯৮ সালের মধ্যে সীমান্তের বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়। এরপর এখানে সুবাদাররূপে নিযুক্ত হলেন আমীর খান।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধে মোগল পক্ষের জয় হলেও এই যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যের অশেষ ক্ষতির কারণ। **প্রথমত,** যুদ্ধে অর্থক্ষয় ও সৈন্যক্ষয় হলো অস্বাভাবিক— যা বিজিত ভূখণ্ড পূরণ করতে পারেনি। **দ্বিতীয়ত,** সীমান্তের বিদ্রোহী পাঠানদের শায়েস্তা করার জন্যে দাক্ষিণাত্য থেকে শ্রেষ্ঠ মোগল সেনাপতিদের সীমান্তে আনা হলো। এর ফলে দক্ষিণ ভারতে শিবাজীর অভ্যুত্থান সম্ভব হলো। সীমান্তে আওরঙ্গজেবের জয়লাভ, কূটনীতি ও রণনৈপুণ্যের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য দিতে হলো। যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হলো শক্তিক্ষয়।

২। দাক্ষিণাত্য ও মারাঠা—মোগল দ্বন্দ্ব

দাক্ষিণাত্য নীতি ঃ উদীয়মান মারাঠা শক্তি দমন এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া মতাবলম্বী সুলতানি রাজ্যগুলিকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করাই ছিল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মৌলিক বিষয়। এই নীতির সার্থকতার মাধ্যমে সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার আশাও তিনি পোষণ করতেন। দিল্লির সিংহাসন লাভের পূর্বেই তার মনে এরূপ আশার সঞ্চার হয়। কারণ পিতা শাহজাহানের আমলে তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যে মোগল-শাসিত ভূখণ্ডের শাসনকর্তা। ১৬৫৫-৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকারের উপক্রম করেছিলেন; কিন্তু শেষ মুহূর্তে পিতা

শাহজাহানের সন্দিগ্ধ হস্তক্ষেপে তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। অবশ্য শাসক হিসেবে দাক্ষিণাত্যে থাকার সময় তিনি শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু তিনি যখন পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে (১৬৫৭-৫৮ খ্রিঃ) ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। তাছাড়া এই সময় বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাও কিছুটা দুর্বল ছিল। কারণ দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসক আওরঙ্গজেবের হাতে এই দুটি রাজ্য বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয় (১৬৫৫-৫৭ খ্রিঃ)।

প্রথম পর্ব ঃ সম্রাট হওয়ার পর আওরঙ্গজেব তার রাজত্বের প্রথম তেইশ বছর (১৬৫৮-১৬৮১ খ্রিঃ) উত্তর ভারতের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দক্ষিণ ভারতের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি। তবে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শক্তি যে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে— এ সংবাদ তিনি রাখতেন। অনুদার ও ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেব এত বেশি গোঁড়া ছিলেন যে, মুসলমান হলেও যেহেতু গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর সুলতানরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত তাই তাঁদের ধ্বংস করার জন্যে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। **দ্বিতীয়ত,** তিনি মনে করতেন, এই দুটি রাজ্য শিবাজীর নেতৃত্বে উত্থিত মারাঠাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মোগল-বিরোধী হয়ে উঠতে পারে।[১] তাই উত্তর ভারতে কর্মব্যস্ত থাকতেই (১৬৫৮-১৬৮১ খ্রিঃ) শিবাজীর উত্থান প্রতিহত করার জন্য তৎপর ছিলেন। শিবাজীকে দমন করার উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব প্রেরণ করলেন মাতুল শায়েস্তা খাঁকে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন (১৬৬০ খ্রিঃ)। এরপর পাঠান হলো সেনাপতি দিল্লির (দিলওয়ার) খাঁ ও অম্বররাজ জয়সিংহকে। এক্ষেত্রে পুরন্দরের সন্ধিতে (১৬৬৫ খ্রিঃ) শিবাজী আবদ্ধ হলেন। কিন্তু শিবাজীর অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয়নি। কারণ এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব বাধ্য হয়ে উল্লেখযোগ্য সেনাপতিদের দক্ষিণ ভারত থেকে সরিয়ে নেন। সেই সুযোগে শিবাজী নিজের অভিষেক ক্রিয়া শেষ করে দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তৃত অংশ অধিকার করেন এবং ছয় বছর (১৬৭৪-৮০ খ্রিঃ) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার পর পরলোক গমন করেন (১৬৮০ খ্রিঃ)।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ শিবাজীর মৃত্যুর পরও মারাঠা শক্তির অবসান ঘটেনি। বরং তিনি মারাঠাদের মধ্যে যে জাতীয় ভাবধারা ও আদর্শ স্থাপন করে যান তা মারাঠাদের এক অজেয় শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। তাই যখন আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবর শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন আওরঙ্গজেব মারাঠা শক্তির বিলোপ ও আকবরকে ধরার উদ্দেশ্যে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং আহম্মদনগরে উপস্থিত হলেন। এর পর আমৃত্যু (১৭০৭ খ্রিঃ) তিনি আর উত্তর ভারতে ফিরে যাননি। এবার তিনি তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতিকে পুরোপুরি রূপায়নে মনোনিবেশ করলেন।

দাক্ষিণাত্য নীতিকে পুরোপুরি রূপায়নে মনোনিবেশ করলেন।

বিজাপুর জয় (১৬৮৬ খ্রিঃ): সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত তখনই মোগল পক্ষ থেকে কূটকৌশল, ভীতি প্রদর্শন ও লুণ্ঠন শুরু হলো। দিলওয়ার খানের মত সেনানায়কের অভিযান চলল বিজাপুরের সর্বত্র। ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গ জেব স্বয়ং বিজাপুর অবরোধ করেন। প্রায় দেড়বছর প্রতিরোধের পর ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে আদিলশাহী সুলতান সিকন্দর আত্মসমর্পণ করলেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে লক্ষ টাকার বাৎসরিক ভাতা ঠিক করে দিলেন, অথচ দৌলতাবাদে তিনি বন্দী রইলেন। অন্যদিকে রাজপ্রাসাদের সুন্দর সুন্দর চিত্রকার্য নষ্ট করে দেওয়া হলো। জনমানবহীন বিজাপুরের দৈন্যদশা প্রাচীন গৌরবকে মুছে দিল।

গোলকুণ্ডা জয় (১৬৮৭ খ্রিঃ): বিজাপুরের পর গোলকুণ্ডার কুতবশাহী সুলতানের দিন ফুরিয়ে এলো। এখানকার শেষ সুলতান আবুল হাসান মোগল পক্ষের চরমপত্র পেয়েও মাথা নত করলেন না। কাজেই হায়দরাবাদ আক্রান্ত হলো, গোলকুণ্ডার দুর্গগুলি অবরুদ্ধ হলো (১৬৮৭ খ্রি:)। সম্রাট আওরঙ্গজেব উদ্বিগ্ন হলেন। অবশেষে আব্দুল্লা পনি নামক এক আফগান সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে মোগল বাহিনী দুর্গ দখল করল। আবুল হাসানকে দৌলতাবাদ দুর্গে বন্দী করা হলো। গোলকুণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো (১৬৮৭ খ্রিঃ)।

মারাঠা শক্তির ক্ষয় ঃ সুলতানি রাজ্য দুটিকে ধ্বংস করেই আওরঙ্গজেব মারাঠা শক্তি দমনে মনোযোগী হলেন। প্রথমদিকে তাঁর প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছিল। তিনি শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে পরাজিত ও হত্যা করে রায়গড় দুর্গ অধিকার করতে সমর্থ হন। শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহুকে তিনি বন্দী করে অন্তঃপুরে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করলেন। এরপর তিনি আটবছর অবরোধ করে রেখে জিঞ্জির দুর্গ অধিকার করেন। ইতোমধ্যে আওরঙ্গজেব তাঞ্জোর ও ত্রিচিরাপল্লির হিন্দুরাজগণকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। অপরপক্ষে, শিবাজীর কনিষ্ঠপুত্র রাজারাম এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বীরপত্নী তারাবাঈ মারাঠাদের পক্ষে মোগল-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকেন। সুতরাং শিবাজীর অকাল মৃত্যুর (১৬৮০) পর যুদ্ধে শম্ভুজীকে নিহত করা এবং শম্ভুজীর পুত্র শাহুকে বন্দী করে নিয়ে গেলে মারাঠা স্বরাজ্য ভেঙে যায় ঠিকই, এবং তা মোগল অধিকারে যায় এ কথাও সত্য, কিন্তু মারাঠা জাতিকে মোগল সম্রাট দমন করতে পারেন নি। দাক্ষিণাত্যে এই সময় এক ধরনের জনযুদ্ধের সূচনা হয়। আঞ্চলিক অধিবাসীরা মারাঠাপক্ষে এক সার্বিক মোগল-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হলো। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (১৭০৭) আওরঙ্গজেব মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণ দমন করতে পারেননি।

বস্তুত মারাঠা-মোগল সংঘর্ষ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা দরকার। কীভাবে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ঘটলো এবং শিবাজীর সংগঠন প্রতিভা,শাসন ও কৃতিত্ব এবং তার মৃত্যুর পর মারাঠা রাজ্যের পতন আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মারাঠা শক্তি বিকাশে নানা প্রভাব ঃ আরব সাগরের পূর্বতীরের পর্বতসঙ্কুল দেশটি মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। কখনও কখনও এই অঞ্চলটিকে বলা হত মারাঠাবাদ। তাই এখানকার অধিবাসীরা মারাঠী নামে পরিচিত। সপ্তদশ শতকে মারাঠীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। মারাঠা জাতীয়তাবাদের বিকাশে যেসব প্রভাব কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা হলোঃ

পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের সীমানা পর্যন্ত মহারাষ্ট্র দেশ বিস্তৃত ছিল। এই দেশে অবস্থিত বিন্ধ্য, সাতপুরা ইত্যাদি পার্বত্য ভূ-ভাগসহ মালভূমি অঞ্চলটি দুর্গম অরণ্যে পরিপূর্ণ। প্রাচীন আগ্নেয় শিলায় গঠিত এই দেশ নর্মদা, তাপ্তী নদীদ্বয় দেশটিকে যেন পরিখার ন্যায় রক্ষা করছে। প্রাকৃতিক কঠোরতাই জনসাধারণকে স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, দুর্ধর্ষ এবং সংগ্রহশীল করে তুলেছে। এখানকার জমি অনুর্বর, জীবনধারনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করা ভয়ঙ্কর কষ্টসাধ্য। কৃষির মাধ্যমে উৎপাদন ছাড়াও জীবন-জীবিকার জন্যে তাদের উত্তর ভারতের সমভূমির উপর নির্ভর করতে হত। প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করেই তাদের বেঁচে থাকতে হত। আবার এই মহারাষ্ট্রের পর্বত, গিরিকন্দর তাদের আত্মরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলটি শিখিয়েছিল। সেই কৌশলটির নাম 'গেরিলা' কৌশল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে প্রকৃতিই তাদের দিয়েছিল সাহস, শৌর্য ও কৌশল। স্বভাবতই দুর্ধর্ষ, কষ্টসহিষ্ণু, দৃঢ়চেতা, সুকৌশলী অধিবাসীরা উপযুক্ত নেতার নেতৃত্বে ভারতের এক দুর্জয় শক্তিতে রূপান্তরিত হবে— সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না।

এই মহারাষ্ট্রে প্রাচীন যুগে চালুক্য, সাতবাহন প্রভৃতি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এখানে যাদব বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। আলাউদ্দিন খলজীর আক্রমণে যাদব বংশের পতন ঘটে। এরপর এটি ছিল বাহমনী রাজ্যের একটি গুরুত্ব পূর্ণ অংশ। বাহমনীর পতনের পর মহারাষ্ট্র বিজাপুর, আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দুর্ধর্ষ মারাঠাগণ উক্ত রাজ্যগুলিতে সরকারি পদে ও সৈন্যদলে নিযুক্ত থাকত। অনেকে স্থানীয় জমিদার ও জায়গিরদারদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে। চাকরি করতে করতে মারাঠাদের অনেকেই জমিদারী লাভ করেন। যেমন শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে আহম্মদনগরের অধীনে চাকরি করতেন। শাহজাহান যখন আহম্মদনগর অধিকার করেন তখন তিনি বিজাপুরের সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে পুনাতে ছিল তাঁর জমিদারী। সুতরাং লক্ষ্য করা যায়, প্রকৃতির অবদানে কষ্টসহিষ্ণু মারাঠীরা উক্ত রাজন্যবর্গ, সুলতান ও জমিদারদের কর্মে লিপ্ত থেকে যথারীতি রাজনৈতিক ও সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

মহারাষ্ট্রের সামাজিক সাম্য ও জাতীয় চেতনার বিকাশে সহায়তা করে ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব। উত্তর ভারতে যেমন কবীর, গুরুনানক, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ে সমাজে বৈষম্যহীন এক নব আলোড়ন সৃষ্টি করেন তেমনি

মহারাষ্ট্রেও প্রায় তিনশ বছর ধরে আঞ্চলিক গুরুগণ তাঁদের জীবন ও কর্ম দিয়ে নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সাধু-সন্তদের মধ্যে জ্ঞানেশ্বর, একনাথ, তুকারাম, বামন পণ্ডিত, রামদাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম স্মরণীয়। তাঁরা ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। মহারাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সামাজিক বৈষম্য দূর করাই ছিল সন্তদের প্রচেষ্টা। সন্তদের মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন, যেমন—সখুবাঈ, জনাবাঈ প্রমুখ। স্বয়ং রামদাস ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর গুরু। মহারাষ্ট্র জীবন বিকাশে এঁদের আনীত সমন্বয়ী বাণী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ভক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে মারাঠী সাহিত্যের অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধুসন্তদের লেখা নানা গ্রন্থ মারাঠী সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিল। যেমন,তুকারামের 'আভঙ্গ', রামদাসের 'দাশবোধ' ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এই যুগে মহারাষ্ট্রে আবির্ভূত হন বহু চারণ কবি। তারা রচনা করেন মারাঠা ব্যালাড বা বীরগাথা। এগুলিতে থাকত মারাঠাদের অতীত গৌরবের কাহিনী। দাদাজী কোন্ডদেবের মুখ থেকে শিবাজী শুনেছিলেন যাদব বংশের প্রাচীন কীর্তি, শিশোদিয়া বংশের বীরত্বের কাহিনী। মারাঠা বীরগাথাগুলি মারাঠীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিল।

সুতরাং মারাঠাদের একটা পৃথক জাতি হিসেবে শক্তি সঞ্চার করতে সাহায্য করেছিল বিচিত্র প্রভাব, যেমন— প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি। তবে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পরে শিবাজীর মতো উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব ঘটায় মারাঠা জাতি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ দুর্ধর্ষ সামরিক অথচ ধর্মপ্রাণ জাতিতে পরিণত হতে পারল।

শিবাজীর প্রথম জীবন ঃ দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাজাতির অভ্যুত্থান একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় ঘটনা। দক্ষিণ ভারতে যখন মুসলিম শাসন প্রচলিত তখন মারাঠাদের মধ্যে অনেকেই সুলতানদের অধীনে থেকে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে ছিলেন এরূপ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্যতম। শাহজী প্রথমে আহম্মদনগরের অধীনে সামান্য সৈনিকের কাজ নিয়ে জীবন আরম্ভ করেন। তিনি নিজগুণে আহম্মদনগরেই বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেন। পুনা জেলায় ছিল তাঁর বিস্তৃত জায়গীর। পুনায় অবস্থানকালে ১৬২৭ অথবা ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে শিবনের গিরিদুর্গে শাহজীর প্রথমা স্ত্রী জিজাবাঈ-এর গর্ভে মারাঠা কুলতিলক শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক আহম্মদনগর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হলে (১৬৩৬ খ্রিঃ) শাহজী বিজাপুর সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। অবিলম্বে স্বীয় দক্ষতায় বিজাপুর সুলতানকে সন্তুষ্ট করে শাহজী কর্ণাটক অঞ্চলে নতুন জায়গিরের অধীশ্বর হলেন। এরপর শাহজী তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী তুকাবাঈকে নিয়ে নতুন জায়গিরে চলে যান। এদিকে তাঁর প্রথমা পত্নী জিজাবাঈ শিশুপুত্র শিবাজীকে সঙ্গে নিয়ে দাদাজী কোণ্ডদেব নামক জনৈক ধার্মিক ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে পুনায় কালাতিপাত করতে থাকেন।

মাতা জিজাবাঈ ছিলেন যাদব বংশের কন্যা, আর পিতা শাহজী ছিলেন শিশোদিয়া বংশদ্ভুত। পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত শিবাজী বাল্যকাল থেকে মায়ের একান্ত অনুগত হয়ে পড়েন। তিনি মায়ের মুখ থেকে শুনতেন যাদব বংশের প্রাচীন কীর্তি,আর শিশোদিয়া বংশের বীরত্বের কাহিনী। মায়ের মুখ থেকে তাঁর পূর্বপুরুষদের ও প্রাচীন হিন্দু বীরগণের আদর্শের কাহিনী শুনে এবং দাদাজী কোণ্ডদেবের কাছে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী ও উপদেশ শুনে বাল্যকাল থেকেই শিবাজী বীরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই ভারতবর্ষে এক স্বাধীন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। বাল্যকালে শিবাজী আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অনেক ঐতিহাসিকের অনুমান শিবাজী হায়দার আলি ও রণজিৎ সিংহের মত নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকে তিনি অশ্বচালনা, অসিচালনা ইত্যাদিতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন এবং মাওয়ালী উপজাতীয় কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। তাদের নিয়ে তিনি একটি ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীও গঠন করেন। ক্রমে সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা হয়ে দাঁড়াল শিবাজীর শক্তি বিস্তারের অনুকূল। এরূপ রাজনৈতিক পরিবেশে শিবাজী তাঁর শক্তি সঞ্চারের সুবর্ণ সুযোগ পেলেন। তিনি তাঁর মাওয়ালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের তোরণা দুর্গটি অধিকার করলেন। কিছুকাল পরেই তার নিকটবর্তী রায়গড় অধিকার করে তার সংস্কার সাধন করলেন। দাদাজী কোণ্ডদেবের জীবদ্দশায় শিবাজী বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। কিন্তু ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে দাদাজীর মৃত্যু ঘটলে শিবাজীর কর্মে বাধাদানের আর কেউ রইলেন না। বাধামুক্ত হয়েই শিবাজী বিজাপুর সুলতানের অধীনস্থ আরও কয়েকটি দুর্গ ছলে-বলে-কৌশলে অধিকার করলেন। এদের মধ্যে চাকন্, সিংহগড়, পুরন্দর প্রসিদ্ধ। তাছাড়া রায়গড়ে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করলেন এবং কোঙ্কন প্রদেশটি অধিকার করলেন।

বিজাপুরের সঙ্গে শিবাজীর সংঘাত ঃ শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের আগ্রাসী নীতি লক্ষ্য করে বিজাপুরের সুলতান ক্রুদ্ধ ও শঙ্কিত হলেন। তাই শিবাজীকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বিজাপুর সুলতান অবিলম্বে তাঁর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিবাজী কিছুকাল শান্তভাবেই অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তিনি ভাবী প্রস্তুতি হিসেবে নিজের সামরিক বিভাগের সংগঠন ও শক্তিবৃদ্ধিতে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুদিন পর বিজাপুরের আমীর ওমরাহদের পরামর্শে ও অনুরোধে পিতা শাহজী মুক্তিলাভ করলেন। শাহজীর কারামুক্তির পর কিছুদিনের মধ্যে শিবাজী আবার আক্রমণাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। ১৬৫৬ খিস্টাব্দে তিনি বিজাপুরের বশংবদ জাওলীরাজকে পরাজিত করে ঐ রাজ্যটি অধিকার করেন। শিবাজী যখন এইভাবে নিজের শক্তিবৃদ্ধিতে সচেষ্ট তখন মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ করলে (১৬৫৬ খ্রিঃ) শিবাজী সুযোগ বুঝে মোগল অধিকৃত আহমদনগরের কিছু অংশ দখল করেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র

আওরঙ্গজেব এক মোগল বাহিনী প্রেরণ করে শিবাজীকে পরাজিত করেন। অবশ্য মোগল বাহিনী শিবাজীকে বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারেনি। এই সময় সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব উত্তর ভারতে চলে আসেন ও উত্তরাধিকার যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দাক্ষিণাত্য থেকে আওরঙ্গজেবের অনুপস্থিতির সুযোগে বিজাপুর সুলতান শিবাজীকে দমন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি অবিলম্বে সেনাপতি আফজল খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন (১৬৫৯ খ্রিঃ)। আফজল খাঁর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর না হয়ে শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতাপগড় দুর্গ জয় করা সহজ নয় দেখে আফজল খাঁ শিবাজীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। শিবাজী পূর্ব থেকেই আফজল খাঁর দুরভিসন্ধির কথা জানতেন। সন্ধিক্ষেত্রে আফজল খাঁ শিবাজীকে আলিঙ্গনের ভান করে হত্যা করার চেষ্টা করলে শিবাজী 'বাঘনখ' নামক ধারাল গুপ্ত অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁকে হত্যা করলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে বিজাপুরের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। সুযোগ বুঝে শিবাজী দক্ষিণ কোঙ্কন ও কোলাপুর অঞ্চল অধিকার করলেন। পরে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের সেনাদল শিবাজীকে পানহালা দুর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। অবশ্য এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

শিবাজী ও আওরঙ্গজেব ঃ বিজাপুর সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করে শিবাজী স্বস্তি পেলেন না। তিনি আরও শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হলেন। আওরঙ্গজেব যখন দক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন তখনই তাঁর সঙ্গে শিবাজীর সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এবার বাদশাহী সিংহাসন অধিকারের পর সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিয়োগ করে শিবাজীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন (১৬৬০ খ্রিঃ) শায়েস্তা খাঁ সহজেই মারাঠাদের পরাজিত করে পুনা, চাকন, কল্যাণ প্রভৃতি স্থান দখল করতে সমর্থ হন। সম্মুখ যুদ্ধে জয় করা অসম্ভব ভেবে শিবাজী শায়েস্তা খাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁর পুত্র আবুল ফতাকে হত্যা করলেন। এছাড়া আরও কিছু মোগল সৈনিক নিহত হলো। শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর তরবারির আঘাতে একটি আঙুল হারিয়ে পলায়ন করলেন (১৬৬৩ খ্রিঃ)। শায়েস্তা খাঁর অকৃতকার্যতায় ক্ষুব্ধ আওরঙ্গজেব মাতুলকে বাংলার সুবাদার করে পাঠালেন। তার পরিবর্তে শিবাজীর শাস্তিবিধানের জন্য দক্ষিণ ভারতে প্রেরিত হলেন সেনাপতি দিলীর খাঁ ও অম্বররাজ জয়সিংহ। রাজা জয়সিংহ কূটকৌশলে বিজাপুর সুলতান ও আঞ্চলিক কিছু শক্তিশালী জমিদারের সহায়তা নিয়ে পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। বাধ্য হয়ে শিবাজী পুরন্দরের সন্ধিতে (১৬৬৫ খ্রিঃ) সম্মত হলেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে শিবাজী মাত্র বারোটি দুর্গ হাতে রেখে অন্যান্য দুর্গগুলি মোগল হস্তে অর্পণ করলেন। এছাড়া শিবাজী যে কোনও যুদ্ধে মোগলদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পুরন্দরের সন্ধির ঠিক পরেই জয়সিংহ যখন বিজাপুর আক্রমণ করলেন তখন শিবাজী তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে মোগলদের সাহায্য করেন। তাই জয়সিংহ শিবাজীর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দিল্লির দরবারে আমন্ত্রণ জানালেন। শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ-এর উপর শাসনভার অর্পণ করে পুত্র শম্ভুজী সহ শিবাজী আগ্রায় আগমন করেন (১৬৬৬ খ্রিঃ)। সেখানে শিবাজী যথাযথ সম্মান না পেয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সুযোগে আওরঙ্গজেব শিবাজীকে তাঁর পুত্রসহ আগ্রা দুর্গে এক প্রকার নজরবন্দী করে রাখলেন। সুচতুর শিবাজী রোগমুক্তির পর দেবমন্দিরে পূজার জন্যে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল ও মিষ্টি পাঠাতে থাকেন। প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে একদিন তিনি পুত্রসহ ফলের ঝুড়িতে করে, মতান্তরে ছদ্মবেশে আগ্রা দুর্গ থেকে পলায়ন করেন। তিনি মথুরা,বারানসী, গয়া ইত্যাদি পর্যটন করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। জানা যায়, জয়সিংহের পুত্র রায়সিংহ শিবাজীকে আগ্রা থেকে পালাতে সাহায্য করেন। অবশ্য এইসময় আওরঙ্গজেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতি বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন।

স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর শিবাজী দেশের শাসন কার্যে মনোযোগ দিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবও শিবাজীকে 'রাজা' বলে স্বীকার করলেন (১৬৬৮ খ্রিঃ)। কিন্তু এই শান্তি বেশিদিন স্থায়ী হলো না। প্রায় দু'বছর পর পুনরায় শিবাজী মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। শিবাজী তার হৃতরাজ্য ও দুর্গগুলি একে একে অধিকার করলেন। দ্বিতীয়বার তিনি সুরাট লুণ্ঠন করলেন (১৬৭০ খ্রি:)। এর দু বছর পর তিনি খান্দেশ ও সুরাট থেকে মোটা অঙ্কের চৌথ আদায় করেন।

শিবাজীর অভিষেক ও মৃত্যু : ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন শিবাজী মহাসমারোহে অভিষেক কার্য সুসম্পন্ন করলেন। তিনি 'ছত্রপতি' এবং 'গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক' (গো, অর্থাৎ বেদ) উপাধি ধারণ করে স্বাধীনভাবে স্বীয় রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। এই সময় মোগল সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পার্বত্য উপজাতিগুলিকে দমন করার উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য থেকে মোগল সেনাপতি ও সৈনিকদের উক্ত বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। এই সুযোগে শিবাজী পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে কর্ণাটক, জিঞ্জি, ভেলোর ও মহীশূরের একাংশ অধিকার করেন। এরপর তিনি বিশাল নৌবাহিনী গঠন করেন। এইভাবে বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে শিবাজী ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিবাজীর বেসামরিক ও সামরিক শাসন সংগঠন : সারাজীবন যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থেকেও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শিবাজী অল্প কয়েক বছরের মধ্যে যে সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তা তাঁর মত সুদক্ষ সংগঠকের পক্ষেই সম্ভব। শাসন ব্যাপারে তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় ধারাকেই গ্রহণ করেন। তিনি প্রচলিত সমাজের বিধিবিধানের উর্ধে নিজেকে স্থাপন করেননি। ধর্ম সমাজকে ধারণ করে এবং রাজার দায়িত্ব ধর্মানুসারে দেশ শাসন— এই ছিল তার শাসনব্যবস্থার মৌলিক তাৎপর্য। এসব কথা স্মরণ রেখেই

ছত্রপতি হলেন সার্বভৌম, শাসন ব্যাপারে রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা। শিবাজীকে সাহায্য করার জন্যে 'অষ্টপ্রধান' নামে অভিহিত আট জনকে নিয়ে গঠিত এক মন্ত্রীসভা সংগঠিত হয়। এই আট জনের মধ্যে একজন ছিলেন প্রধানমন্ত্রি—যাকে 'পেশোয়া' বলা হত। পেশোয়া ছাড়া অন্য সাতজন ছিলেন— (১) রাজস্ব সচিব 'অমাত্য' বা 'মজুমদার', (২) প্রধান বিচারপতি 'ন্যায়াধীশ', (৩) পুরোহিত 'পণ্ডিতরাও', (৪) পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী 'দবীর', (৫) শাসনসংক্রান্ত বিবরণ লেখক 'ওয়াকিয়ানবীশ' (৬) সমর বিভাগীয় মন্ত্রী 'সেনাপতি' এবং (৭) রাজার পার্শ্বচর 'সুর্নিস' বা সচিব নামে অভিহিত। উক্ত অষ্ট প্রধানের মধ্যে ন্যায়াধীশ এবং পণ্ডিতরাও ব্যতীত অন্য সকলকেই সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের দায়িত্ব পালন করতে হত। মারাঠা শাসনে সামরিক কর্মের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। মন্ত্রীদের নিযুক্তি ও পদচ্যুতি রাজার ইচ্ছাধীন বিষয় ছিল। রাজাদেশ অনুসারে মন্ত্রিগণ স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করতেন। শিবাজীর অর্থাৎ রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোনও স্থান ছিল না। মন্ত্রিসভার ক্ষমতা রাজাকে পরামর্শদানের মধ্যে সীমিত ছিল।

স্বরাজ্যের বিভাগ ও শাসন ঃ শিবাজীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলের নাম ছিল 'স্বরাজ্য'। শাসনের সুবিধার জন্যে তিনি তাঁর স্বরাজ্যকে তিনটি প্রান্ত বা প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেকটি প্রদেশ ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা প্রদেশ পালের অধীন। রাজা সরাসরি প্রদেশ পালকে নিয়োজিত ও পদচ্যুত করতে পারতেন। প্রত্যেকটি প্রদেশ বা প্রান্ত কয়েকটি 'পরগণায়' বিভক্ত ছিল। পরগণা ছিল তরফে এবং তরফ ছিল গ্রামে বিভক্ত। পরগণা ও তরফের শাসনভার ছিল রাজ প্রতিনিধির উপর এবং গ্রাম শাসনের দায়িত্ব ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর। এই সব শাসনকার্য যাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় তার জন্যে শিবাজী 'দেশপাণ্ডে' নামক পরিদর্শক মণ্ডলী নিযুক্ত করতেন।

চৌথ ও সরদেশমুখী ঃ রাজস্বব্যবস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে শিবাজী প্রথমে নিজস্ব শাসনাধীন অঞ্চলের জমি জরিপ করে জমির সীমানা নির্দেশ করেন। তিনি উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ অংশ প্রথম দিকে এবং পরে দুই-পঞ্চমাংশ অংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করেন। কৃষকরা ইচ্ছামত শস্যের দ্বারা অথবা নগদ মূল্য দিয়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে পারত। মহারাষ্ট্রের ভূমি ছিল অনুর্বর। তাই এখানে ফসল ফলানো খুবই কষ্টসাধ্য ছিল এবং উৎপাদিত শস্য দিয়ে জনগণের চাহিদা পূরণ হত না। তাছাড়া রাজস্বের যৎসামান্য অর্থ দিয়ে দেশশাসন ও প্রতিরক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হত না। তাই মারাঠাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে লুণ্ঠন করতে হত। সরাসরি লুণ্ঠন নির্ভর না থেকে শিবাজী প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। যদি তারা উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ অংশ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক-দশমাংশ অংশ কর হিসেবে প্রদান করে তবে মারাঠারা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এই করের প্রথমটি 'চৌথ' এবং দ্বিতীয়টি 'সরদেশমুখী' নামে অভিহিত করা হয়। শেষোক্ত এই দুটি কর আদায়ের পক্ষে কোনও যুক্তি ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করেন না। তবে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করে শিবাজী

সীমান্তের রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। পরবর্তীকালে ঐ রাজ্যগুলিকে মারাঠা শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করাও সহজ হয়।

শিবাজী প্রথমে দুর্ধর্ষ মাওয়ালী কৃষকদের নিয়ে সৈন্যদল গঠন করেন ও সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন। পরে তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভায় সংগঠিত মারাঠা বাহিনী ভারতের সেরা এক শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়। ৪০ হাজার অশ্বারোহী, ১২৬০টি রণহস্তী, ১৫০০ উষ্ট্র, ১০ হাজার পদাতিক ও ৮০টি কামান নিয়ে শিবাজীর সমর বাহিনী সংগঠিত হয়। শিবাজীর অশ্বারোহী সৈন্যগণ 'বর্গী' ও 'শিলাদার'—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বর্গী ছিল নিয়মিত বাহিনী, তারা রাজ্য সরকার থেকে নিয়মিত বেতন, অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ পেত। আর শিলাদাররা রাজ্য সরকার থেকে এককালীন প্রাপ্ত অর্থ ও জমির বিনিময়ে নিজেরাই পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে রাখত। শিলাদাররা মূলত জমিতেই কর্মরত থাকত এবং প্রয়োজন হলে যুদ্ধে যোগদান করে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। তবে যুদ্ধের সময় তারা রাজ্য সরকার থেকে পারিশ্রমিক পেত। তবে শিলাদার ছিল অনিয়মিত বাহিনী।

সামরিক বিভাগ : 'সেনাপতি' উপাধিধারী মন্ত্রীর উপর থাকত সেনাবাহিনীর দায়িত্বভার। কিন্তু প্রতিটি বিভাগের সর্বোচ্চে থাকতেন ছত্রপতি শিবাজী। তিনি আবার পাঁচ হাজারী, দশ হাজারী, হাজারী প্রভৃতি পর্যায়ে সামরিক পদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতেন। প্রতি ২৫জন অশ্বারোহী সৈন্যের উপর একজন 'হাওলাদার', প্রতি ৫ জন হাওলাদারের উপর একজন 'জুমলাদার', প্রতি ১০ জন জুমলাদারের উপর একজন 'হাজারী' থাকতেন। 'সর্নোবৎ' উপাধিধারী কর্মচারী অশ্ববাহিনীর পরিদর্শনে নিযুক্ত থাকতেন। তিনি ছিলেন অশ্বারোহীদের সর্বাধিনায়ক। পদাতিক বাহিনীর সৈনিকদের বলা হত 'পাইক'। ৯ জন পাইকের নেতা ছিলেন 'নায়ক', ৫ নায়কের উপর একজন 'হাবিলদার', ৩ হাবিলদারের উপর একজন 'জুমলাদার', তার উপর এক হাজারী, সাতহাজারী আর সর্নোবৎ থাকতেন।

নৌবাহিনী : শিবাজীর শাসনকালে ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগিজ বণিকরা সমুদ্রের বুকে একাধিপত্য বিস্তার করেছিল। দূরদর্শী শিবাজী বিদেশীদের রুখবার জন্য প্রায় ৪০০ পোতের একটি বিশাল নৌবাহিনী গঠন করেন। এই নৌবাহিনীর সাহায্যে শিবাজী উপকূল রক্ষা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন।

দুর্গ : শিবাজী মহারাষ্ট্রের পার্বত্য বনাঞ্চলের সুযোগ নিয়ে বহু দুর্গ নির্মাণ করেন। প্রত্যেকটি দুর্গে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন তিনজন প্রধান কর্মচারী নিয়োগ করা হত। তাদের মধ্যে একজন থাকতেন ব্রাহ্মণ এবং অন্য দুজন মারাঠী। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করে দেওয়া হত। ফলে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কোনও সুযোগ ছিল না। শিবাজীর দুর্গসংখ্যা ছিল ২৪০-এরও বেশি।

শৃঙ্খলা : সুদক্ষ সংগঠক শিবাজী তাঁর সামরিক বাহিনীকে এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিলেন যে এ বাহিনী অবিলম্বে ভারতের যে-কোনও বাহিনী অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। তাঁর

বাহিনীর মূল আদর্শ ছিল ক্ষিপ্রতা। তাই মারাঠা বাহিনীতে স্ত্রীলোকের প্রবেশ, বিলাসব্যসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধের সময় বা অন্য রাজ্য আক্রমণ কালে তাঁর সৈন্যরা যাতে স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশুহত্যা না করে,অন্য ধর্মীয় গ্রন্থ নষ্ট অথবা ধর্মের উপর অত্যাচার না করে তার জন্যে কঠোর নির্দেশ জারি করা ছিল। নির্দেশের ব্যতিক্রম ঘটলে মৃত্যুদণ্ড ছিল অপরিহার্য। শিবাজীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ঐতিহাসিক কাঁফি খাঁ তাঁকে 'নরকের কুকুর' বলেছেন, কিন্তু তাঁর শাসনব্যবস্থার প্রশংসা না করে পারেননি।

শিবাজীর মূল্যায়ন ঃ প্রত্যেক শাসকেরই একটা ব্যক্তিগত চরিত্র বা ব্যক্তিভিত্তিক বৈশিষ্ট্য থাকে— যার উপর ভিত্তি করে তার কৃতিত্ব প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে শিবাজী ছিলেন সমকালীন কলুষতার উর্ধে। তাঁর একাধিক স্ত্রী থাকলেও সমসাময়িক পানদোষ ও প্রাসঙ্গিক নীতিহীনতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর নৈতিক জ্ঞান ও চরিত্র ছিল দেবতুল্য। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সাহসী ও লক্ষ্য পূরণে একনিষ্ঠ। তিনি তাঁর মাতা জিজাবাঈ ও গুরু রামদাসের নিকট ধর্ম বিষয়ে যে আন্তরিকতা শিখেছিলেন তা তাঁকে ধর্মান্ধ ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু করতে পারেনি। বিরুদ্ধ সমালোচক ঐতিহাসিক কাঁফি খাঁও শিবাজীর পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, নারী জাতির প্রতি সম্মান, কোরাণ ও মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধার কথা স্বীকার করেছেন। শিবাজীর চরিত্রের এই উদারতার সঙ্গে মিশেছিল দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা। তিনি যোগ্য ব্যক্তিকে যথাযথ কর্মে নিয়োগ করতেন, তাদের আপনজন হিসেবে বিবেচনা করতেন। এজন্যে তিনি সহজে তাদের আনুগত্য অর্জন করেছিলেন। সাংগঠনিক শক্তিতে শিবাজী ছিলেন অনন্য। তাই তিনি সারাজীবন যুদ্ধে ব্যাপৃত থেকেও বেসামরিক ও সামরিক সংগঠন ও শাসনব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করতে সমর্থ হন। তাঁর চরিত্রের আদর্শ ও বাস্তব বুদ্ধি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দুর্ধর্ষ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মারাঠা জাতিকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করেছিল। মুসলিম সুলতানের বেতনভোগী জায়গিরদারের পুত্র হয়েও তিনি নিজের দেশ ও দেশবাসীকে চিনতেন, বুঝতেন, তাদের আশা-আকাঙ্খার সংবাদ রাখতেন। তাঁরই সাংগঠনিক প্রতিভায় মারাঠা জাতির বুকে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। সে-শক্তি সুদীর্ঘকাল মোগল ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামর্থ্য যুগিয়েছিল।

সামরিক প্রতিভা ঃ বিজেতা হিসেবে সামরিক প্রতিভায় শিবাজী ছিলেন অনন্য। রণ শিবিরে অনাড়ম্বর ও ক্ষিপ্রতাই ছিল তাঁর সামরিক বৈশিষ্ট্য। সমর ক্ষেত্রে তিনি গেরিলা কৌশল ব্যবহার করতেন। মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান, পাহাড়-পর্বত, বনভূমিকে তিনি তাঁর সামরিক কৌশলের অন্তর্ভুক্ত করেন। সম্মুখ যুদ্ধের পরিবর্তে অতর্কিত আক্রমণে তিনি সর্বত্র সুফল পেয়েছিলেন। পাহাড়ঘেরা ২৪০ টি দুর্গকে তিনি আত্মরক্ষা ও দেশ জয়ের কৌশলে প্রয়োগ করেন। দূরদর্শী শিবাজী নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সমুদ্রের উপকূল রক্ষা, বিদেশী বণিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজে তিনি নৌ বাহিনী ব্যবহার করতেন।

বিদেশী ঐতিহাসিক গ্রান্ট ডফ্ কিম্বা ভিন্‌সেন্ট স্মিথের মত ঐতিহাসিকদের মতে শিবাজী দস্যুবৃত্তিকে আশ্রয় করে মারাঠাশক্তির জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিকরাই তাঁর কৃতিত্ব ও মর্যাদাকে অস্বীকার করতে পারেননি। গ্রান্ট ডফ্ বলেন, শিবাজী রাজ্য ও সম্পদের চেয়ে যে আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার মূল্য অনেক বেশি। হিন্দু ধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েও তিনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না। মুসলিম সন্তদের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান, পীরের দরগার ব্যয় বহনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। অধ্যাপক রলিনসন বলেছেন, " মেয়েদের সম্মান রক্ষা করা, মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, যুদ্ধের সময়ও এগুলিকে রক্ষা করা, যুদ্ধ শেষে হত্যা বন্ধ করা, যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিদান—ইত্যাদি কম গুণ নয়।" তবে তিনি কখনও ভাবাবেগে অভিভূত হতেন না। বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে তিনি ছিলেন সর্বদা অগ্রণী। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁকে বাধ্য হয়ে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করতে হয়েছিল। তবুও লক্ষ্য করা যায়, সম্রাট আওরঙ্গজেব যেমন জিজিয়া, অর্থকর, অতিরিক্ত কর আদায়ের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের দ্বারা তাড়িত হতেন। সেইভাবে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় বিচার না করে ছত্রপতি শিবাজী প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্রের নিকট থেকে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজ রাজ্যে বসবাসকারী মুসলিমদের উপর তিনি অত্যাচার করেছেন—এমন তথ্য আজও বিরল। তাই শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান ভারত-ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়।

শিবাজীর উত্তরাধিকারীগণ ঃ শম্ভুজী ও শাহুজী ঃ শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৮০ খ্রিঃ)। তিনি বীর ও সাহসী হলেও শিবাজীর মত চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর ছিল না। তিনি আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দিয়ে মোগল সম্রাটের বিরাগভাজন হন। পুত্র আকবরকে ধরা, মারাঠা শক্তিদমন এবং বিজাপুর গোলকুণ্ডা জয়ের উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব এই সময় (১৬৮১ খ্রিঃ) দক্ষিণ ভারতে আসেন। এরপর আমৃত্যু (১৭০৭ খ্রিঃ) দক্ষিণ ভারতে থেকে তিনি লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করেন। আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ ভারতে আগমনের পূর্বেই পুত্র আকবর পারস্যে পালিয়ে যান। আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতে এসেই গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর দখল করেন। এই সময় শম্ভুজী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সাহায্যে এগিয়ে যেতে সাহস পাননি। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার পতনের পর (১৬৮৯ খ্রিঃ) আওরঙ্গজেব মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করে শম্ভুজী, তাঁর শিশুপুত্র শাহু এবং অনুচরবর্গকে বন্দী করলেন। শম্ভুজীর পুত্র শাহুকে (দ্বিতীয় শিবাজী) বন্দী অবস্থায় মোগল শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। শম্ভুজী সহ অন্য সকলকেই হত্যা করা হলো। এ কাজের পর আওরঙ্গজেব মনে করলেন যে, মারাঠা শক্তি অবদমিত হলো।

রাজারাম ঃ মারাঠাদের এই দুর্দিনে শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম শাসনভার নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করলেন। তাঁর নেতৃত্বে মারাঠাদের মধ্যে পুনরায় জাতীয় জাগরণ ঘটল। কর্ণাটকের অন্তর্গত জিঞ্জি দুর্গে নতুন রাজধানী স্থাপিত হলো। তাঁকে সাহায্য

করলেন রামচন্দ্র পন্থ, শঙ্করজী মলহর, পরশুরাম ত্রিম্বক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ক্রমাগত আট বছর (১৬৯০-৯৮ খ্রিঃ) অবরোধের পর জিঞ্জি দুর্গ মোগলদের অধিকারে এলো (১৬৯৮ খ্রিঃ। রাজারাম জিঞ্জি থেকে পালিয়ে সাতারায় রাজধানী স্থাপন করলেন। মোগল বাহিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। মারাঠা-মোগল সংঘর্ষ এবার জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হলো: মহারাষ্ট্রের সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মোগল বিরোধী সংগ্রামে সামিল হলো। কিন্তু হঠাৎ রাজারাম মারা গেলেন (১৭০০ খ্রিঃ)।

তারাবাঈ : রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর বীর পত্নী তারাবাঈ তাঁর শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করে মোগল বিরোধী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না এই বীরাঙ্গনার আহ্বান আবার মারাঠাদেরকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করল। প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটক মানুচি লিখেছেন, "মারাঠা সৈন্যের সাহস ও শৌর্যের সম্মুখে মোগল সৈন্য ও সেনাপতি ছিল ভীত, কম্পিত ও ত্রস্ত। দাক্ষিণাত্যে মোগল সৈন্য বিজিত এবং মারাঠা সৈন্য বিজেতার আসন লাভ করেছে"। এই সময় করুণ হাতাশার মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের ভূমিতে মৃত্যুবরণ করলেন (১৭০৭ খ্রিঃ)। শিবাজীর উত্তরাধিকার তখনও ভারতের বুকে একটা ঐতিহাসিক স্বীকৃত বিষয়।

দাক্ষিণাত্য নীতির ফল : স্মিথ, এলফিন্‌স্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, দক্ষিণভারতের সুলতানি রাজ্যগুলি ধ্বংস করে সম্রাট আওরঙ্গজেব ভুল কাজ করেছিলেন। কারণ এইসব মুসলিম রাষ্ট্রগুলির বিলোপ সাধন করার ফলে মারাঠাগণ নির্বিবাদে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ রায় চৌধুরী প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলি যদি ধ্বংস নাও করতেন তবুও আওরঙ্গজেবের পক্ষে মারাঠাশক্তির অভ্যুত্থান প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে মারাঠাদের জাতীয় সংহতি ও আদর্শ ছিল তাদের সহায়ক।

রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্যের বিস্তার বিচারে সম্রাট আওরঙ্গজেব পৌছেছিলেন শক্তির শীর্ষসীমায়। সম্রাট আকবর ভারতব্যাপী মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করল। কাবুল থেকে চট্টগ্রাম ও কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড নিয়েই তৈরি হলো মোগল সাম্রাজ্য। কিন্তু এই সাফল্যে ছিল বাস্তবে অন্তঃসারশূন্য। রাজ্যজয়ের চরমশীর্ষে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করল। **প্রথমত**, দক্ষিণ ভারতে বছরের পর বছর অবস্থানের ফলে উত্তর ভারতে রাজকর্মচারীদের উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হলো, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় শৈথিল্য দেখা দিল, শৃঙ্খলা নষ্ট হলো। **দ্বিতীয়ত**, দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অজস্র অর্থব্যয়ে দিল্লির রাজকোষ প্রায় শূন্য হলো। অর্থব্যয়ের মতই সৈন্যক্ষয় হলো। ফৌজদের বেতন নিয়মিত প্রদান করার ক্ষমতাও রইল না। মুর্শিদকুলি খাঁর মত বিশ্বস্ত রাজভৃত্যরাই বিপুল পরিমান রাজস্ব পাঠিয়ে আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্য

করতেন। তৃতীয়ত, আপ্রাণচেষ্টা করেও তিনি দক্ষিণ ভারতে মারাঠা শক্তি সম্প্রসারণ রোধ করতে পারেননি। চতুর্থত, আওরঙ্গজেব নিজের পুত্রদেরকে বিশ্বাস করতে পারতেন না। তাঁর অবর্তমানে পুত্রদের মধ্যে যে উত্তরাধিকার যুদ্ধ হবে--- এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি প্রিয়পুত্র কামবক্সের নিকট পত্র লিখে সাম্রাজ্য বিভাগের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবই সাম্রাজ্যের অবক্ষয় সূচিত করে। কিন্তু সেই প্রস্তাব কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব ৯০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। দাক্ষিণাত্য হলো তাঁর সমাধিক্ষেত্র। তাই ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন, ইয়োরোপের দিগ্বিজয়ী নেপোলীয়নের ক্ষেত্রে যেমন ছিল স্পেনীয় ক্ষত, তেমনি দাক্ষিণাত্যের দুষ্ট ক্ষতই আওরঙ্গজেবের সর্বনাশ সাধন করেছিল (The Deccan Ulcer ruined Aurangzeb)।

৩। রাজপুতনীতি

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে রাজপুত বিদ্রোহ ছিল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এই রাজপুতগণ ছিলেন সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংরক্ষণে তাঁর রাজত্বে রাজপুতদের ভূমিকা ছিল প্রধান। আওরঙ্গজেব তাঁর ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণ রাজনীতি সেই রাজপুতদের শত্রুশিবিরে পরিণত করে। তবে শ্রীরাম শর্মা তাঁর "The Religious Policy of the Mughal Emperors" গ্রন্থে এবং উত্তরকালে অনেক গবেষক আওরঙ্গজেবের রাজপুতনীতি যতখানি হিন্দুবিদ্বেষ প্রসূত বলে মনে করেন, আধুনিক গবেষকগণ তা মানতে নারাজ। তবে তারা একথা স্বীকার করেন যে আকবরের রাজপুতনীতি থেকে আওরঙ্গজেব অনেকটা সরে এসেছিলেন। এর জন্য রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে ধর্মীয় মনোভাব যুক্ত হয়েছিল মাত্র। আতহার আলি, জি ডি শর্মা প্রমুখ লেখকদের রচনা থেকে স্পষ্ট যে, আওরঙ্গজেবের সময় রাজপুতদের সঙ্গে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে হিন্দু সমবেত শক্তির নেতৃস্থানীয় রাজপুত জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার প্রবণতা কাজ করেছিল এমন বলা যায় না। বস্তুত আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির মতন তার রাজপুত নীতিও জটিল অথচ মোগল ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু ঃ উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় মাড়ওয়াররাজ যশোবন্ত সিংহ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার পক্ষ সমর্থন করলেও শেষ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের পক্ষে এসেছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সদা সন্দিগ্ধ মন তাঁকে বিশ্বাস করত না। তবে আওরঙ্গজেব তাঁকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেখানে জামরুদ নামক স্থানে সন্দেহজনকভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (১৬৭৮ খ্রিঃ)। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু সংবাদ আওরঙ্গজেবকে স্বস্তি দিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রসিংহ নামে যশোবন্তের এক আত্মীয়কে মাড়ওয়ারের উত্তরাধিকার করলেন এবং ৩৬ লক্ষ টাকা আদায় করলেন। কিন্তু ইন্দ্র সিংহ ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি।

রাজমাতা ও অজিত সিংহের প্রত্যাবর্তন ঃ এদিকে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর সময় রাণী মহামায়া ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর দুর্গদাসের তত্ত্বাবধানে লাহোরে চলে আসেন এবং সেখানে দুই যমজ সন্তান প্রসব করেন। এই দুই সন্তানের একজন জীবিত ছিল, তার নাম অজিত সিংহ। দিল্লিতে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেব রাজমাতা মহামায়া ও অজিত সিংহকে বন্দী করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন ও মাড়ওয়াড়কে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসেন। এই বিপদের দিনে যশোবন্ত সিংহের বিশ্বস্ত কর্মচারী রাঠোর বীর দুর্গাদাস রাজামাতা মহামায়া ও শিশুপুত্র অজিতসিংহকে কৌশলে অশ্বপৃষ্ঠে নিয়ে মাড়ওয়ারের রাজধানী যোধপুরে উপস্থিত হলেন।

মারওয়ার-মেবার জোট ঃ এই পরিস্থিতিতে ক্রুদ্ধ আওরঙ্গজেব তিন দিক থেকে যোধপুর আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং নিজে আজমীর থেকে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যবস্থা করলেন। অন্যদিকে দুর্গদাস রাজপুতদের দেশ রক্ষায় উৎসাহিত করলেন ও আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবারের শিশোদিয়া বংশের কন্যা। তাই সঙ্কটময় মুহূর্তে অজিত সিংহের মাতা মেবারের রানা রাজ সিংহের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। মেবারের রানা রাজাসিংহ আগেই 'জিজিয়া কর' সংক্রান্ত ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাছাড়া তিনি জানতেন যে, মাড়ওয়ারের পতন হলে মেবার রেহাই পাবে না। সুতরাং রাজসিংহ মাড়ওয়ারের পক্ষে যোগ দিলেন। রাঠোর শিশোদিয়া যুগ্ম বাহিনী এবার আগ্রাসী মোগলদের প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করল।

রাজপুত-মোগল দ্বন্দ্ব ঃ অবস্থা অনুসারে আওরঙ্গজেব এবার সরাসরি মেবার আক্রমণ করলেন। রাজপুত বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধ বর্জন করে 'গেরিলা' পদ্ধতিতে আক্রমণ শুরু করল। ফলে আওরঙ্গজেব সহজে চিতোর দুর্গ দখল করলেন। আওরঙ্গজেব চিতোর দখল করে নিজপুত্র আকবরকে সেখানকার যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে আজমীর অভিমুখে রওনা দিলেন। এদিকে আকবর রাজপুত গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত হলেন। এবার আওরঙ্গজেব পুত্র আকবরকে তিরস্কার করে মাড়ওয়ারে প্রেরণ করলেন এবং মেবারের দায়িত্ব দিলেন অপর পুত্র আজমকে। পিতার এরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ আকবর রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা করে পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূচনা করলেন। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব কূট চক্রান্তের সাহায্যে আকবর ও রাজপুতদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেন। আকবর তখন নিরুপায় হয়ে দুর্গাদাসের সাহায্যে প্রথমে দক্ষিণ ভারতে, পরে পারস্যে পলায়ন করেন (১৬৮১ খ্রি:)। পরে সেখানেই তিনি মারা যান(১৭০৪ খ্রি:)।

মেবারের সঙ্গে সন্ধিঃ মোগল-রাজপুত সংগ্রাম তখনও অব্যাহত আছে। এই দুর্যোগের মধ্যে রাজসিংহ পরলোক গমন করেন (১৬৮০ খ্রি:)। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র জয়সিংহ উদয়পুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঠিক এই সময় দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহ দমনের জন্যে বিব্রত হয়ে আওরঙ্গজেব জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করতে

বাধ্য হলেন (১৬৮১ খ্রিঃ)। সন্ধির শর্তে— (ক) জয়সিংহ মেবারের রাণা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন, (খ) জিজিয়া করের পরিবর্তে আওরঙ্গজেবকে জয়সিংহ তিনটি পরগণা দিয়ে দিলেন।

জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি হলেও দুর্গাদাস আমৃত্যু মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহ অজিত সিংহকে মাড়ওয়ারের রাণা হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (১৭০৯ খ্রিঃ)। ফলে আওরঙ্গজেবের রাজপুত দমন নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

রাজপুত নীতির ফল : একটা সময় ছিল যখন রাজপুত শক্তিই মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারে ও সংরক্ষণে স্তম্ভস্বরূপ ছিল। আওরঙ্গজেব তাঁর সন্দিগ্ধ মানসিকতার জন্যে রাজপুত শক্তিকে মোগল স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেন নি। **দ্বিতীয়ত,** মোগল-রাজপুত দ্বন্দ্বের ফলে উভয় পক্ষে যেমন অর্থব্যয় হলো তেমনি লোকক্ষয় হলো। **তৃতীয়ত,** আওরঙ্গজেবের রাজপুতনীতি দক্ষিণ ভারতে শিবাজীর উত্থান প্রতিরোধের সহায়ক ছিল না। তবে আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষকগণ স্বীকার করেন যে, মোগল রাজপুত দ্বন্দ্বের এই অংশে আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতি অপেক্ষা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাড়ওয়ারের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে দিল্লির সঙ্গে পশ্চিম ভারতের বন্দর ও সমৃদ্ধ শহরগুলির যোগাযোগ রক্ষা করতে গেলে মাড়ওয়ারকে দিল্লির অধীনে নিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। তাই মাড়ওয়ার জয় করাই ছিল আওরঙ্গজেবের বিশেষ উদ্দেশ্য। আওরঙ্গজেবের সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হলো। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, "আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতির ফলে শুধুমাত্র মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এমন নয়, সাম্রাজ্যের বস্তুগত প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল মারাত্মক।"[১]

তবে আচার্য যদুনাথ সরকার, শ্রীরাম শর্মা, আশীর্বাদিলাল শ্রীবাস্তব প্রমুখ ঐতিহাসিকরা আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতির মধ্যে যে রকম হিন্দু-বিরোধিতা ও বিদ্বেষের তথ্য দিয়েছেন, বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণ থেকে তা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয় না। কোনও সন্দেহ নেই যে আওরঙ্গজেব ধর্মীয় ব্যাপারে গোঁড়া ও নিষ্ঠাবান ছিলেন, রাজপুতদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন, আকবরের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন ; তার রাজপুত নীতি বাস্তবিকপক্ষে (দাক্ষিণাত্য নীতি বা হিন্দুনীতি সবই) মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তার যে-কোনও পদক্ষেপ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, মোগল আইন অনুসারে কোনও 'মনসব' অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে, তার রাজ্য (ওয়াতন) মোগল রাজ্যভুক্ত বা সরাসরি প্রত্যক্ষ রাজস্বভুক্তের (খালিসা) অন্তর্গত করা ছিল বিধি। মারওয়াড়ের রাজা যশোবন্ত সিং মারা গেলে তাই তিনি ঐ এলাকা দখল করে নেন। এজন্য নয় যে যশোবন্ত সিং হিন্দু বা

একদা তিনি দারা শুকোহ্-র পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তেমনি, অনুরূপভাবে বলা যায়, আওরঙ্গজেবের চরম ধর্মান্ধতার দ্বারা রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিলে তার আমলেই হিন্দু শাসক মনসবদারদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হলো কী করে? আতহার আলি গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, আকবর থেকে শাহজাহান পর্যন্ত নানা আমলের তুলনায় আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই হিন্দু মনসবদারদের সংখ্যা বেশি। ঘনশ্যামদাস শর্মা দেখিয়েছেন যে, যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা জানার পর আওরঙ্গজেব রাজপুতদের হাতে রাজ্যভার রাখতে চেয়েছিলেন। মোগল-রাজপুত বৈরিতার পিছনে রাজপুতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কম ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে বলতেই হবে—আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি ছিল ভ্রান্ত এবং অসফল।

৪। রাষ্ট্র ও ধর্মনীতি

সম্রাট আকবর কর্তৃক অনুসৃত উদার ধর্মনীতি শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত অংশত অব্যাহত ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় সেই উদার ভাবধারা সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে পুরোপুরি ধর্মান্ধ নীতিতে রূপান্তরিত হলো। তাই তাঁর ধর্মনীতির প্রেক্ষাপটে সমকালীন রাজনীতি বিবেচনা করা প্রয়োজন। অভিষেকের সময় আওরঙ্গজেব নিজেকে 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করেন। সুন্নী মতের পৃষ্ঠপোষক আওরঙ্গজেব নিজেকে 'গাজী' অর্থাৎ ধর্মযোদ্ধা হিসেবে ঘোষিত করেন। কোরাণের নীতির উপর ভিত্তি করে যেমন তিনি নিজের জীবনচর্চা শুরু করেন, তেমনি রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিকেই একমাত্র পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করেন। ভারতকে তিনি 'দার-উল-ইসলাম' বা ইসলামের দেশে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং ইসলামের অনুশাসনগুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে মোগল দরবার থেকে শিয়া প্রথা 'নওরোজ' জন্মদিনে 'তুলাদান' প্রথা রদ করলেন। সম্রাট আকবরের সময় থেকে এগুলি চালু হয়েছিল। দরবার থেকে নৃত্য, গীত নিষিদ্ধ হলো। গায়ক, বাদক, জ্যোতিষী দিল্লি থেকে নির্বাসিত হয়। চিত্রকর, শিল্পী দরবার থেকে বিতাড়িত হলেন। প্রতিদিন সকালে জনসাধারণের দর্শন দানের জন্য 'ঝারোকা দর্শন' প্রথা নিষিদ্ধ হলো।

দরবারী রীতি-নীতি ছাড়াও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা রদবদল লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মন্দির শিক্ষায়তন ধ্বংসের নির্দেশ জারি করা হলো। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে এক নির্দেশনামায় বলা হলো যে, হিন্দুদের অধিক হারে বাণিজ্য শুল্ক দিতে হবে। বাদশাহী দরবার ও প্রাদেশিক সরকারের উচ্চপদ থেকে হিন্দুদের অপসারিত অথবা বিতাড়িত করা হলো। হিন্দু কর্মচারীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হলো। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে অমুসলমানদের উপর 'জিজিয়া' কর চাপানো হলো। রাজপুত ভিন্ন অন্যদের (অমুসলমান) ঘোড়ায় বা পাল্কীতে চড়া, সৌখীন পোষাক পরা নিষিদ্ধ হলো। অন্যদিকে তাঁর আমলেই 'মুহতাশিব' নামে এক শ্রেণীর ধর্মীয় কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হলো। মৌলভি, মোল্লা ও উলেমাদের ভাতা দানের প্রথাও প্রবর্তিত হলো। বিচার বিভাগে

এঁদেরকেই নিয়োগের প্রথা চালু হলো। এই ভাবে আওরঙ্গজেব সমসাময়িকদের বর্ণনায় হয়ে দাঁড়ালেন 'জিন্দাপীর' কিম্বা 'বাদশাহের ছদ্মবেশে দরবেশ।'

ধর্মদ্রোহের অভিযোগে তিনি দারার প্রাণ হরণ করলেন। ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে এই ভাবধারা সর্বত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দূত ও উপঢৌকন আদান-প্রদান হলো। শুধু হিন্দু নয়, শিয়া মুসলমানদের তিনি নানাভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা করলেন। রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্রের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে চারদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল।

ইরফান হাবিব, সতীশ চন্দ্র, আতহার আলি, গৌতম ভদ্র প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বে বিদ্রোহের পশ্চাতে ধর্মের ভূমিকা থাকলেও সে যুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক প্রভাবগুলি মোটেই কম দায়ী ছিল না। আওরঙ্গজেবের তরবারির নাম ছিল 'রাফিজকুশ'—অথাৎ বিধর্মী হন্তা। কিন্তু শুধু হিন্দুরা তাঁর নিকট বিধর্মী ছিল না। শিয়া, মাহাদী, সুফী এবং মোগল পরিবারের দারশিকো, সুলেমান শিকো, মুরাদ, আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ প্রমুখ অনেকেই তাঁর রাফিজ কুশের আঘাত থেকে অব্যাহতি পায়নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ইউসুফজাই, আফ্রিদি, খতক প্রভৃতি বিদ্রোহী পাঠানরা ছিলেন মুসলমান।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা এ তথ্যও পেয়েছেন যে বারানসীর শাসক আবুল হাসানকে আওরঙ্গজেব লিখিত নির্দেশ দিয়ে জানালেন যে, নতুন কোনও মন্দির নির্মাণে অনুমতি দেওয়া হবে না; কিন্তু প্রাচীন মন্দিরগুলি ধ্বংস করাও চলবে না (১৬৫৯ খ্রিঃ)। আবার নতুন মন্দির স্থাপনের জন্য বারানসীর ভগবন্ত গোসাঁই ও রামজীবন গোসাঁইকে ভূমিদানের 'ফরমান' বা আদেশপত্র দিয়েছেন (১৬৮১-১৬৮৯ খ্রিঃ)— এ তথ্যও পাওয়া গেছে। আবার লক্ষ্য করা যায়, উত্তর ভারত সুদীর্ঘকাল সুলতান অথবা বাদশাহদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল এবং বাংলা ছিল দিল্লির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলমানের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, অথচ বাংলায় ইসলামে দীক্ষিতের সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং আওরঙ্গজেবের আমলে জোর করে অথবা লোভ দেখিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার কাজ খুব ব্যাপক হারে হয়নি। সুতরাং শুধু ধর্ম নয়, বিদ্রোহের কারণের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের অস্তিত্ব ছিল। যেমন, (ক) আওরঙ্গজেবের আমলে রাজ্যজয় ও বিদ্রোহ দমনের জন্যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও সমপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন থাকায় নানাভাবে কর বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক চাপে শ্রমিক, কৃষক ও খেটে খাওয়া শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। (খ) কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের শিথিলতায় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করে। তারা রাজস্ব ও অন্যান্য শুল্ক আদায়ের সময় অত্যাচার করতেন। (গ) কেন্দ্রীয় শৈথিল্যের ইঙ্গিত পেয়ে অনেকেই আঞ্চলিক স্বাধীনতার আশা পোষণ করতেন ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি করতেন। সম্রাটের ধর্মীয় বৈষম্য, জিজিয়া কর, অতিরিক্ত শুল্ক আদায় ইত্যাদির অজুহাতে বিদ্রোহ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

সুতরাং বলা যায় যে, একটি নয় বহুবিধ কারণেই আওরঙ্গজেবের আমলে বিদ্রোহ ঘটেছিল—যাকে ইতিহাসে প্রধানতঃ আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নানা বিদ্রোহ সংক্ষেপে পরিবেশিত হলো ঃ (ক) সম্রাট আওরঙ্গজেবের সংকীর্ণ ধর্মনীতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করে মথুরা অঞ্চলের জাঠ কৃষকগণ। এরা ছিল পরিশ্রমী অথচ স্বচ্ছল চাষী। মথুরার ফৌজদার আবদুল্লা সম্রাটের আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য জাঠ চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতেন। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে জাঠগণ স্থানীয় জমিদার গোকলার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে ও মোগল ফৌজদারকে হত্যা করে। মোগল বাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে গোকলাকে হত্যা করে এবং তার পরিবারবর্গকে ইসলাম ধর্ম গ্রহনে বাধ্য করে। কয়েক বছর পর (১৬৮৫ খ্রিঃ) রাজারামের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার এবং চূড়ামনের নেতৃত্বে তৃতীয়বার জাঠগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা খাজনা বন্ধ করে আকবরের সমাধি লুণ্ঠন করে। আওরঙ্গজেবের পক্ষে জাঠবিদ্রোহ সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয় নি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এই জাঠরাই স্বাধীনভাবে এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করে।

(খ) মন্দির ধ্বংস ও জোর করে কর আদায়ের প্রতিবাদে বুন্দেলখণ্ডের রাজা চম্পৎ রায় মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। মোগলদের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি ধরা পড়ার পূর্বেই আত্মহত্যা করে আত্মমর্যাদা রক্ষা করেন। তাঁর পুত্র ছত্রসালের নেতৃত্বে বুন্দেল খণ্ড ও মালবের প্রজাবর্গ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ছত্রসাল মোগল বাহিনীকে প্রতিহত করে পূর্ব মালবে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন (১৬৭১ খ্রিঃ)। ছত্রসাল শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর রাজ্যের রাজধানী ছিল পান্না।

(গ) পাতিয়ালা, আলেয়ার অঞ্চলে বসবাস করতেন সৎনামী নামে অভিহিত কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর মানুষ। এরা হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ মানত না, অবৈধ উপায়ে উপার্জনের পথ তার অনুসরণ করত না। কৃষি ও ছোটখাট ব্যবসা এবং সাধারণ কারিগরের কাজ ছিল এদের পেশা। মোগল কর্মচারীদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে এরা বিদ্রোহ করে। আওরঙ্গজেব এদের কঠোর হস্তে দমন করেন। মোগল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হলো কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করল না।

(ঘ) ধর্মবিলাসী আওরঙ্গজেবের আচরণে উত্যক্ত হলো পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়। এই ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক সংকীর্ণতা বর্জিত ধর্মের সঙ্গ কর্মের সমন্বয় বিধান করেন। গুরু নানকের তিরোধানের পর (১৫৩৮ খ্রিঃ) শিষ্যদের ভিতর থেকে গুরু নির্বাচিত হতেন। তাঁর শিষ্য অঙ্গদ (১৫৩৮-১৫৫২ খ্রিঃ), গুরু অমরদাস (১৫৫২-১৫৭৪ খ্রিঃ), গুরু রামদাস (১৫৭৪-১৫৮১ খ্রিঃ) শিখগুরু নির্বাচিত হন। গুরু রামদাসকে সম্রাট আকবর খুবই শ্রদ্ধা করতেন। পঞ্চম গুরু অর্জন (১৫৮১-১৬০৬ খ্রিঃ) শিখ ধর্মের 'আদিগ্রন্থ' সংকলন করেন ও শিখ সম্প্রদায়কে সংগঠিত করেন। জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে সাহায্য করার অজুহাতে গুরু অর্জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এখানেই মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শিখ

বিদ্বেষের বীজ বপন করা হলো। গুরু অর্জনের পুত্র হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫ খ্রিঃ) বারো বছর গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের আমলে গুরু হর গোবিন্দ বিদ্রোহ করে (১৬২৮ খ্রিঃ) আত্মগোপন করেন। এই ভাবে শিখশিবিরে মোগলবিরোধী আবহাওয়া বইতে থাকে। অষ্টম গুরু হররায় (১৬৪৫-১৬৬১ খ্রিঃ) শিখদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলল।

শিখদের নবমগুরু তেগবাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৫ খ্রিঃ) আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ সমাজকে উৎসাহিত করেন। ফলে তাঁকে বন্দী করে আওরঙ্গজেবের সামনে হাজির করা হয়। সম্রাট তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা মৃত্যু—এই দুটির একটিকে বেছে নিতে বলেন। তেগবাহাদুর মৃত্যুবরণ করলেন কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করলেন না (১৬৭৫ খ্রিঃ)। পিতার আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে তেগবাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদেরকে সংঘবদ্ধ করে একটি সামরিক জাতিতে পরিণত করলেন। আওরঙ্গজেব এই দুর্ধর্ষ শিখজাতিকে দমন করতে পারেন নি।

মোটকথা, আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। একদা তাকে যতখানি ধর্মান্ধ দেখানো হত সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ততোখানি ধর্মান্ধ ছিলেন না। তবে ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসকে রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে মিলিয়ে তিনি সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছিলেন।

৫। আওরঙ্গজেবের শেষ জীবন, চরিত্র ও কৃতিত্ব

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত জীবনে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি ছিলেন ভারতের দীর্ঘজীবী মুসলিম শাসক। ইসলাম ধর্মে ছিল তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাস। রোজা, নামাজ ইত্যাদি কোরাণের অনুশাসনগুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। মধ্য এশিয়ায় বালখ-এর যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ তুর্কিদের সামনে দারুণ বিপদকে তুচ্ছ করে তিনি যুদ্ধ পরিবেশেই নামাজ পড়েছেন। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব পড়াশুনায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। অবশ্য কর্তব্য হিসেবে তিনি প্রতিদিন কোরাণ থেকে কিছু কিছু অংশ নকল করতেন। হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। খাওয়া-পরায় তিনি ছিলেন মিতাচারী, তাঁর জীবন ছিল মদ্যপান ও বিলাসব্যসন বর্জিত। টুপি সেলাই করে অর্জিত অর্থ তিনি ধর্মের কাজে ব্যয় করতেন। তাইতো মুসলিমদের কাছে তিনি ছিলেন 'জিন্দাপীর' অর্থাৎ জীবন্ত ধর্মগুরু। অন্য সম্রাটদের মত তিনি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না। হারেমে তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র চার। রাজকার্যে তিনি ছিলেন অনলসকর্মী, কর্তব্যনিষ্ঠ, গভীর কূটনীতিজ্ঞ। আরবি, ফার্সি ও হিন্দি ভাষায় তাঁর দখল ছিল অসামান্য। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হলো "ফতোয়া-ই-আলমগীরী" নামক মুসলিম আইনগ্রন্থ। মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণের চেষ্টাও তিনি করেছেন। মুসলিম পীরের সমাধিপূজা, জন্ম অথবা তিরোধান দিবস পালন, মুসলিম নারীদের অশ্বারোহণ ও নগ্নতাসূচক পরিধান ব্যবহার, দরবারে নৃত্য-গীত, চিত্রাঙ্কন,

নওরোজ ইত্যাদি উৎসব নিষিদ্ধ হলো। এক কথায়, কোরাণের বাইরের সকল কর্মই ছিল নিষিদ্ধ।

এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর দোষের তালিকা কম দীর্ঘ নয়। পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ, পুত্রহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ইত্যাদি ছিল তাঁর চরিত্রের অন্ধকারময় দিক। অবশ্য লক্ষ করা যায় তৈমুর বংশে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ভ্রাতৃ নিধন, পুত্রহত্যা ইত্যাদি ছিল উত্তরাধিকার যুদ্ধের অঙ্গ বিশেষ। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান পিতৃদ্রোহী ও ভ্রাতৃহন্তা ছিলেন। এজন্য শুধু আওরঙ্গজেবকে দোষ দেওয়া অর্থহীন। হয়ত এই ধারা আওরঙ্গজেবকে আরও নির্মম পথে এগিয়ে দিয়েছিল। কাজ হাসিল করার জন্যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতার আশ্রয় তিনি অকুণ্ঠভাবে নিয়েছেন। হয়তো এই সব পাপ থেকে স্বস্তি পাওয়ার জন্য তিনি কোরাণের মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। সর্বাগ্রে তিনি মুসলমান, তারপর হিন্দুস্থানের বাদশাহ। হিন্দু, সূফী, শিয়া—সকলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। বিদ্বেষ নিয়ে এলো সার্বিক বিদ্রোহ। শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

একটু বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, সম্রাট আওরঙ্গজেবের গুণের অতিশয্যই তাঁর অবাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশে সাহায্য করেছিল। যেমন, প্রথমত, তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও আচারনিষ্ঠা যে আন্তরিক ছিল সে, সম্পর্কে সন্দেহ করার বিশেষ কিছু নেই। তবে এ বিষয়ে আতিশয্যই তাঁকে ধর্মান্ধ, ধর্ম বিলাসী ও অনুদার করে তুলেছিল। ধর্মশাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত কিন্তু জ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রসঙ্গে তিনি ছিলেন অজ্ঞ অথবা অনাগ্রহী। ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এসেছিল সংকীর্ণতা। এই সংকীর্ণতাই তাঁর হৃদয়কে শুষ্ক করে দিয়েছিল। তাই তাঁর জীবনে ছিল না কোন্ শিল্প-সংস্কৃতি, ছিল না কোন্ স্থাপত্য। সাহিত্য, সঙ্গীত, ইতিহাস, শিল্পচর্চা তার রাজত্ব থেকে নির্বাসিত হলো এবং নিষিদ্ধ হলো।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য ভ্রাতাদের মধ্যে আওরঙ্গজেব ছিলেন বিচক্ষণ, সাহসী ও একনিষ্ঠ কর্মী। কূটনীতিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। সামরিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তিনি বার বার শৌর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর চেহারায় রাজোচিত গাম্ভীর্যের প্রতিফলন ছিল। কিন্তু এসব গুণের আতিশয্যই তাঁকে শুষ্ক ও কঠোর করে তুলেছিল। তাঁর রাজসভা থেকে রসিকতা, হাস্যরস নির্বাসিত হলো। বাচালতাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর মনে তেজ ছিল, কিন্তু দরদ ছিল না, দৃষ্টি ও অনুভূতির ব্যাপকতা ছিল না। এই সংকীর্ণতা তাকে শাসক হিসেবে ব্যর্থতার পর্যবসিত করেছে।

তৃতীয়ত, তাঁর শ্রমশক্তি, আন্তরিকতা ও একাগ্রতা থেকে এসেছিল মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসের আতিশয্য থেকে তাঁর মনে এসেছিল অবিশ্বাস ও সন্দেহ। কর্মচারীদেরকে তিনি সর্বদা সন্দেহ করতেন, তাদের কর্মে বার বার হস্তক্ষেপ করতেন। ফলে রাজকর্মচারী ও প্রশাসকরা সর্বদাই ছিলেন শঙ্কিত ও পরমুখাপেক্ষী। পরিণতিতে শাসনের সর্বক্ষেত্রে এলো বিশৃঙ্খলা, শিথিলতা। সম্রাটের উদারতা ও দূরদর্শীতার অভাবে

সর্বত্র বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করল। তাই ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, "রাষ্ট্রের প্রশাসক হিসেবে আওরঙ্গজেব ছিলেন ব্যর্থ।"

চুতর্থত, মানুষের জীবনে ধর্মচেতনা কাম্যগুণরাজির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এই ধর্মচেতনার আতিশয্য মানুষকে ধর্মান্ধ, ধর্মবিলাসী, অনুদার, সংকীর্ণমনা একদেশদর্শী করে তোলে। ধর্মবিলাসী আওরঙ্গজেব ভারতের মত একটি বৈচিত্র্যময় দেশকে ইসলামীয় রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনের একদেশ-দর্শিতা ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। সম্রাট আকবর ঔদার্যের মাধ্যমে ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে সংহতি বিধানের ব্রত নিয়েছিলেন। আর মানসিক ঔদার্যহীন আওরঙ্গজেব প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ব্যবধান সৃষ্টি করে বিদ্রোহকে আহ্বান করলেন। রাজপুত, জাঠ, সৎনামী, মারাঠা, শিখ, শিয়া, সূফী সবাই বৈষম্যের শিকার হয়ে বিদ্রোহ করলেন। তাই সাম্রাজ্য বিস্তারের চরমশীর্ষে আরোহণ করেও জীবিত কালেই তার পতনের সূত্রপাত হলো।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কর্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ, কর্মকাণ্ড ছিল বিচিত্র। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সাফল্যের পরিমাণও ছিল প্রচুর। বহুগুণন্বিত হয়েও তিনি মহত্বের অধিকারী হতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর জীবনে আনন্দ, শান্তি বলে কিছু ছিল না, তেমনি অন্যকেও আনন্দ লাভ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। মৃত্যু পূর্বে তাঁর জীবনে এলো হাহাকার। তিনি তাঁর বিফলতার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। পুত্র কার্মবক্সকে তিনি লিখলেন, "জানি না আমি কে, কোথায় আমি যাব অথবা আমার মত পরিপূর্ণ পাপীর ভাগ্যে কি আছে তাও জানি না" ইত্যাদি।[১] ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্বের গৌরব না থাকলেও তাঁর স্থান অসামান্য। তাঁর জীবন—ইতিহাস সভ্য মানব সমাজের প্রগতির স্বার্থে স্মরণীয়।

আওরঙ্গজেবের শেষ জীবন মোটেই সুখের হয়নি। ক্রমাগত ব্যর্থতা তার জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল এবং সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তাও তাকে বিব্রত করে তুলেছিল। পুত্রদের বিদ্রোহ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং মারাঠা শক্তির উত্থান যখন বৃদ্ধ সম্রাটের জীবিতকালে সাম্রাজ্যকে দুর্বল ও ভঙ্গুর করেছিল তখন শেষ জীবন সুখের হয় কী করে? ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগরেই প্রায় নব্বই বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর।

চতুর্থ পর্ব

অধ্যায় ৬

মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন

Syllabus : Break up of the Mughal Empire.

১। পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ ও মোগল সাম্রাজ্য পতনের কারণ

গোড়ার কথা ঃ ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। আওরঙ্গ জেবের রাজত্বকালেই মোগল সাম্রাজ্য একদিকে যেমন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল, তেমনি ভবিষ্যত পতনের বীজও ঐ সময়েই কিছু পরিমাণে রোপণ হয়ে গিয়েছিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যেই সাম্রাজ্যের দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা চারটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দেখতে পাই। সেগুলি হলো ঃ

(১) নানা কারণে মোগল সাম্রাজ্য এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং এই সঙ্কট ছিল সার্বিক, অর্থাৎ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উপায় দুর্বল মোগল সম্রাটদের জানা ছিল না। ফলে মোগল সাম্রাজ্য ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে হতে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে।

(২) মোগল সাম্রাজ্যের ক্রমিক ভাঙনের পরে ভারতবর্ষে নানা আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব হয়।

(৩) এই আঞ্চলিক রাজ্যগুলির মধ্যে মারাঠাদের প্রাধান্য ছিল সংশয়াতীত। মারাঠাদের উত্থান হয় প্রথম তিনজন পেশোয়ার অধীনে।

(৪) আঠারো শতকে ভারতীয় রাষ্ট্র ছিল বিচ্ছিন্ন এবং দুর্বল। রাজনৈতিক শক্তিহীনতার পাশাপাশি ছিল সামরিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা। তবু কৃষি, শিক্ষা ও বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়নি। এই সময়ে ভারতে বাণিজ্যরত ইয়োরোপীয় বণিকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই শতকেই ইয়োরোপীয় বণিকদের মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সাফল্যে সমাপ্ত হয়।

আমরা এই অধ্যায়ে প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব। পূর্ণাঙ্গ আলোচনার স্বার্থে আমরা আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগল সম্রাটদের দিকে প্রথম দৃষ্টি দিতে পারি।

পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ ঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ থেকে সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত (১৫২৬-১৭০৭ খ্রিঃ) প্রায় দু'শো বছর যাবৎ বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ছিল সমকালীন বিশ্বের বিস্ময়। শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সুদূর দক্ষিণের সামান্য অংশ ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ এসেছিল মোগল বাদশাহদের কর্তৃত্বাধীনে। সাম্রাজ্যের আয়তন, জনসংখ্যা, অর্থ-সম্পদ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মোগল সাম্রাজ্য

সমসাময়িক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। বহুবিদ রাজোচিত গুণের অধিকারী হয়েও শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন নিতান্ত রক্ষণশীল। ধর্মবিলাসী আওরঙ্গজেব জীবিত থাকতেই লক্ষ্য করেছিলেন, নানা কারণে সুদৃঢ় মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও অস্তিত্ব প্রকম্পিত। চতুর্দিকে বিদ্রোহ ও অস্থিরতা তাঁকে বিব্রত করে তুলেছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র আজমকে লিখেছিলেন, "আমি একাকী এসেছিলাম, একাই চলে যাচ্ছি। দেশ ও দেশবাসীর জন্যে আমি ভাল কিছুই করতে পারিনি, তাই ভবিষ্যতের জন্যে কোনও আশা রইল না।" তাঁর এই খেদোক্তির মধ্যেই তার ব্যর্থতা ও বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের পরিণতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ও উত্তরাধিকার যুদ্ধ ঃ আওরঙ্গজেব নিজেই অসুস্থ পিতা শাহজাহানের সিংহাসন দখলের উদ্দেশ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধে ভ্রাতৃবর্গকে পরাজিত ও হত্যা করেই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই জানতেন যে তাঁর অবর্তমানে উত্তরাধিকার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তাই মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তিন পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্যটিকে ভাগ করে দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ঠিক তাঁর মৃত্যুর সময় তার পুত্রদের মধ্যে মুয়াজ্জম, আজম ও কামবক্স ছিলেন যথাক্রমে কাবুল, গুজরাট ও বিজাপুরের শাসনকর্তা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (৩রা মার্চ, ১৭০৭ খ্রিঃ) সঙ্গে সঙ্গে তিন পুত্র পিতার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধে নেমে পড়লেন। প্রথমে আগ্রার নিকট জজ্জুর যুদ্ধে আজমকে এবং পরে হায়দরাবাদের নিকট কামবক্সকে পরাজিত করে মুয়াজ্জম বা প্রথম শাহ আলম 'বাহাদুর শাহ' উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করলেন।

বাহাদুর শাহ ঃ আওরঙ্গজেবের অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ছাপ্পান্ন বছর বয়স্ক বাহাদুর শাহ ছিলেন অনেকখানি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, উদার ও বিদ্বান। তিনি প্রথমে আওরঙ্গজেবের অনুদার ধর্মান্ধ নীতিগুলি পরিত্যাগ করে শাসন ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ নীতি প্রয়োগের চেষ্টা করেন। সহনশীল নীতির মাধ্যমে তিনি অমুসলমান নরপতি ও নেতৃবর্গের মন অনেকখানি জয় করতে সমর্থ হন। এই প্রসঙ্গে প্রথমত, লক্ষ্য করা যায়, বাহাদুর শাহ মোগল-বিরোধী রাজপুত রাজ্য অম্বর ও মাড়োয়াড়ের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। এর জন্যে তিনি কূটনীতি ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অপমানজনক শর্তে আপোষ মীমাংসা ও সৌহার্দ্য স্থাপনের পথ অবলম্বন করেন। অম্বররাজ জয়সিংহ ও যোধপুররাজ অজিত সিংহকে তাঁদের স্ব-স্ব রাজ্যে রাজত্ব করার অধিকার প্রত্যাবর্তন করেন। তবে তাঁরা যে মনসবদার পদের দাবি করেছিলেন তা তাঁদের দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, বাহাদুর শাহ দাক্ষিণাত্যের মারাঠাদের 'সরদেশমুখী' আদায়ের দাবি মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু তাদের 'চৌথ' আদায়ের দাবি মঞ্জুর করেন নি। ফলে মারাঠারা তাঁর উপর খুশি হতে পারেনি। এই সময় মারাঠাদের মধ্যে ছিল ঘরোয়া বিবাদ (শাহু ও তারাবাঈ-এর দ্বন্দ্ব)। তা সত্ত্বেও

মোগলদের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকে। সুতরাং দক্ষিণ ভারত ছিল নিতান্ত অশান্ত। তৃতীয়ত, শিখদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার জন্যে তিনি গুরু গোবিন্দ সিংহকে মনসবদারের মর্যাদা দেন। কিন্তু গুরুর মৃত্যুর (১৭০৮ খ্রিঃ) পর শিখনেতা বান্দা পুনরায় মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ এক অভিযানের মাধ্যমে শিখ প্রভাবিত কিছু অঞ্চল অধিকার করেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ্ কর্তৃক নির্মিত লোগড় দুর্গটিও মোগলদের অধিকারে আসে। তবে জীবিত থাকতে তিনি শিখদের দমন করতে পারেন নি। চতুর্থত, বাহাদুর শাহ্ বুন্দোলা নেতা ছত্রসাল এবং জাঠ নেতা চূড়ামনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং তাদের সাহায্যলাভে সমর্থ হন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বিদ্রোহ দমন, রাজ্য জয় ইত্যাদি কারণে বাদশাহী রাজভাণ্ডার শূন্য হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবকে বাংলার শায়েস্তা খাঁ প্রমুখ অনুগত ব্যক্তিবর্গের অর্থদানের উপর নির্ভর করতে হত। সম্রাট বাহাদুর শাহের আমলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। তাঁর সময় রাজস্বের ঘাটতি হয়েছিল এবং নতুন জায়গির দান ও অনুগতদের পদোন্নতির জন্য বাড়তি খরচে রাজকোষ শূন্য হয়েছিল। তবুও তাঁর প্রয়াস ছিল সাম্রাজ্যের নানা সমস্যার সমাধানের অনুকূল। কিন্তু ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর ফলে মোগল শিবিরে গৃহযুদ্ধ ও সাম্রাজ্যের সর্বত্র অশান্তি প্রকট হয়ে উঠল।

জাহান্দার শাহ্ ঃ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহান্দার শাহ্ অপর তিন ভ্রাতা, যথা— আজ্রিম-উস-শান, জাহান শাহ্ এবং রফি-উস-শানকে পরাজিত ও হত্যা করে দিল্লির মসনদ অধিকার করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিতান্ত অকর্মণ্য, ভোগ-বিলাসী, আরামপ্রিয় ও সভাসদগণের উপর নির্ভরশীল। তিনি আবার লাল কুমারী নামক এক বাঈজীর মোহে আচ্ছন্ন হন। সুরুচি ও আত্মসম্মানবোধ বলতে তার কিছুই ছিল না। তার অকর্মণ্যতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বাদশাহের উজীর জুলফিকার খাঁ বাস্তবত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের ক্রটিপূর্ণ শাসননীতি পরিত্যাগ করে বর্তমান সম্রাটের পক্ষে রাজপুত, মারাঠা, জাঠ ও বুন্দেলা নেতাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে শিখনেতা বান্দাকে দমন করার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। শাসন প্রসঙ্গে তিনি কতকগুলি সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় মনসবদারগণ নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তবে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদার নিযুক্ত করার প্রথা চালু করেন। মোগলদের ভুমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় এ-প্রথা ছিল নতুন। কৃষকদের কাছ থেকে ইচ্ছামত যে-কোনও পরিমাণ অর্থ আদায়ের স্বাধীনতা দেওয়া হলো নতুন ইজারাদারদের উপর। ফলে কৃষকদের উপর অত্যাচারের দ্বার উন্মুক্ত হলো।

ফারুখশিয়ার ঃ দিনে দিনে নানা ক্ষেত্রে জুলফিকার খাঁর প্রভাব যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন ঈর্ষাপরায়ণ আমীরগণ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। তারা আবার

উজীরের বিরুদ্ধে সম্রাটকেও পরামর্শ দিলেন। প্ররোচিত হয়ে সম্রাট জাহান্দার শাহ উজীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন দুর্বল ও কুক্রিয়াসক্ত। তাই সুযোগ বুঝে জাহান্দার শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ফারুখশিয়ার (ভ্রাতা— আজিম-উস-শানের পুত্র) সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এবং আগ্রার যুদ্ধে সম্রাটকে নির্মমভাবে হত্যা করে তিনি দিল্লির মসনদ অধিকার করেন (জানুয়ারি, ১৭১৩ খ্রিঃ)।

দিল্লির মসনদ অধিকারের ষড়যন্ত্রে ফারুখশিয়ারকে সাহায্য করেছিলেন বিহারের সুবাদার সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ এবং তাঁর ভ্রাতা এলাহাবাদের সুবাদার সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ। ইতিহাসে এঁরা **"সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়"** নামে বিশেষভাবে পরিচিত। সম্রাট হওয়ার পর ফারুখশিয়ার প্রথম ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে করলেন প্রধান মন্ত্রী। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হলেন সর্বক্ষেত্রে সর্বেসর্বা। আর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে সম্রাট হলেন খেলার পুতুল মাত্র। ফারুখশিয়ার নিজে ছিলেন ভীরু, দুর্বল ও অকৃতজ্ঞ। তাই তিনি অচিরেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের শত্রু মীরজুমলার প্রভাবে পড়েন ও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু ফারুখশিয়ারের সেই ষড়যন্ত্রের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলো। শেষে বিরক্ত হয়ে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাট ফারুখশিয়ারকে হত্যা করেন (১৭১৯ খ্রিঃ) এবং মোগল পরিবারের দুই যুবককে পর পর সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। এই দুই যুবক যখন পর পর মৃত্যু বরণ করলেন তখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বাহাদুর শাহের এক পৌত্র (জাহান শাহের পুত্র) মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করলেন (সেপ্টেম্বর, ১৭১৯ খ্রিঃ)। অচিরে মহম্মদ শাহ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন দূর করার উদ্দেশ্যে সমকালীন হিন্দু শক্তিগুলির (রাজপুত, জাঠ, মারাঠা প্রভৃতি) সমর্থন লাভের চেষ্টায় উদার নীতি অবলম্বন করলেন। জিজিয়া কর থেকে হিন্দুদের মুক্তি দেওয়া হলো। মারওয়াড় রাজ অজিত সিংহ এবং অম্বর রাজ জয়সিংহকে রাষ্ট্রের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। মারাঠা বীর শাহুকে দক্ষিণ ভারতের ছ'টি প্রদেশের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার দেওয়া হলো। এরূপ উদার নীতির ফলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। কিন্তু এই প্রভাব ও প্রতিপত্তি মোগল দরবারের অভিজাতদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করল। তারা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের আগুন সর্বত্র প্রজ্জ্বলিত হলো। এবং ফলে রাজস্ব আদায় বিঘ্নিত হলো— রাষ্ট্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হলো। সামরিক বিভাগে অর্থ-সঙ্কট দেখা দিল। এরূপ বিপর্যয়ের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ব্যর্থ হলেন। মহম্মদ শাহ নিজে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব পছন্দ করতেন না। তাই তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিজাম-উল্-মুলক-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সৈয়দ হোসেন আলি খাঁকে হত্যা করেন।

এই ঘটনার পর অন্য আর একটি ষড়যন্ত্রে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ নিহত হন। এইভাবে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্তৃত্বের অবসান হলো।

মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮ খ্রিঃ) ঃ শেষোক্ত ষড়যন্ত্রে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিজাম-উল্-মুলক ছিলেন সম্রাট মহম্মদ শাহের প্রধান সহায়ক। তাই মহম্মদ শাহ দাক্ষিণাত্যের নিজামকেই প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করলেন। মোগল সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজাম-উল-মুলক ছিলেন যথেষ্ট যোগ্য সহায়ক। কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করেও মহম্মদ শাহ তাঁর সহায়ক প্রধান মন্ত্রীকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নি। কারণ তিনি ছিলেন বাদশাহী মসনদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। বিলাস-ব্যসন ও আমোদ-প্রমোদে তিনি সর্বদা মগ্ন থাকতেন। তিনি সুদক্ষ উজীরকে সাহায্য করার পরিবর্তে তিনি অবিলম্বে অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ, চাটুকারদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। তাদেরই প্ররোচনায় তিনি নিজের উজীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সম্রাটের দুর্ব্যবহার, অভিজাতদের বাদ-বিসম্বাদ, এক কথায় রাজধানীর হালচাল লক্ষ্য করে ভাগ্যান্বেষী কর্মবীর নিজাম-উল্-মুলক দিল্লি পরিত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন এবং সেখানে স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন (১৭২৪ খ্রিঃ)।

মহম্মদ শাহের সুদীর্ঘ তিরিশ বছরের (১৭১৯-৪৮ খ্রিঃ) রাজত্বকাল মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাঁর রঙ্গপ্রিয়তা, বিলাস-ব্যসন, আমোদ-প্রমোদ এবং আমীর-ওমরাহগণের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্রে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ল। দক্ষিণ ভারত, অযোধ্যা ও বঙ্গদেশ (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা) স্বাধীনতা ঘোষণা করল। মারাঠারা চতুর্দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে তৎপর হলো। আগ্রার নিকট জাঠগণ, রোহিলাখণ্ডে আফগান, পাঞ্জাবে শিখগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করল। আবার ঠিক এই দুর্দিনে নাদির শাহের ভারত আক্রমণ ও দিল্লি লুণ্ঠন মোগল শক্তিকে তছনছ করে দিল। ভারতের মোগল সাম্রাজ্য কয়েকটি স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হলো।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর (১৭৪৮ খ্রিঃ) তাঁর পুত্র আহমদ শাহ (১৭৪৮-৫৪ খ্রিঃ) দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু তিনি ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের ক্ষয় রোধ করতে পারলেন না। দাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল্-মুলকের পৌত্র গাজীউদ্দিন ইমাদ-উল্-মুলক ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী (Wazir)। তিনি বাদশাহ আহমদ শাহকে অন্ধ করে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং জাহান্দার শাহের পুত্র আজিজউদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন(১৭৫৪ খ্রিঃ)। আজিজউদ্দিন সম্রাট আওরঙ্গজেবের অনুকরণে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু তিনি উজীর গাজীউদ্দিনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাননি। যখনই মুক্তির চেষ্টা করলেন তখনই তিনি প্রধানমন্ত্রী বা উজীরের আদেশে নিহত হন (১৭৫৯ খ্রিঃ। এরপর প্রধানমন্ত্রী গাজীউদ্দিন দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র দ্বিতীয় শাহ আলমকে সিংহাসনে

প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর আমলেই (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রিঃ) ইংরেজ বাহিনী দিল্লিতে প্রবেশ করে ও সম্রাটকে ইংরেজের অনুগ্রহভাজন বৃত্তিভোগী হিসেবে জীবনযাত্রা নির্বাহে বাধ্য করে। দ্বিতীয় শাহ আলমের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আকবর নামমাত্র সম্রাট উপাধি নিয়ে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লিতে অবস্থান করেন। পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সিপাহী যুদ্ধে সাহায্য করার অপরাধে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন এবং ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সেখানে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে মোগল বংশের অবসান হলো।

বৈদেশিক আক্রমণ ঃ বাবর, আকবর, আওরঙ্গজেবের দুর্বল ও অযোগ্য বংশধরদের সঙ্গে অভিজাত ও সভাসদগণের স্বার্থপরতা ও অযোগ্যতা যুক্ত হওয়ায় মোগল-শক্তি অবনতির চরম পর্যায়ে নেমে এলো। এই অবস্থায় দেশে ও বিদেশে সর্বত্রই ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলো। অথচ ভারতের অতুল ঐশ্বর্যের সংবাদ বিদেশী শত্রুদের প্রলোভিত করত। মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে প্রথম লুব্ধ হলেন পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ। বাল্যে তিনি নাদির কুলি খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন। গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে শক্তিমান। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল ডাকাত দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমাংশে যখন পারস্যের সাফভি বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে তখন আফগানরা ঐ দেশ অধিকার করে (১৭২২ খ্রিঃ)। ঠিক এই সময় রাশিয়ার জার মহান পিটার পারস্যের কিছু অংশ অধিকার করেন। এইসব দুর্যোগের মধ্যে দুঃসাহসী নাদির কুলি খাঁ পারস্য-রাজ শাহ তাহমাস্পকে পারস্যের সিংহাসন উদ্ধারে সাহায্য করলেন। অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাহমাস্প নাদিরকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন। নাদির শাহ হলেন দেশের প্রকৃত শাসক। কয়েক বছর পরেই অকর্মণ্য শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে নাদির শাহ তাঁর শিশুপুত্রকে নামমাত্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন (১৭৩২ খ্রিঃ)। কয়েক বছরের মধ্যে সেই শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর নাদির শাহ পারস্যের সম্রাট হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করলেন (১৭৩৬-৩৭ খ্রিঃ)।

নাদির শাহের আক্রমণ ঃ নাদির শাহ যখন পারস্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত তখন ভারতে মোগল সিংহাসনে ছিলেন সম্রাট মহম্মদ শাহ। তাঁর আমলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিশেষ কোনও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। নাদির শাহ বিনা বাধায় ভারত-সীমানায় অবস্থিত কান্দাহার দখল করলেন (১৭৩৮ খ্রিঃ)। কিছুদিনের মধ্যে তিনি গজনী ও কাবুল দখল করলেন। আফগানিস্তানের পতন ঘটল। এরূপ বিরামহীন যুদ্ধে সৈনিক সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্যে নাদির শাহের রাজভাণ্ডারে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিল। নাদির শাহ অতীতের সুলতান মামুদের মত ভারত লুণ্ঠনের সংকল্প গ্রহণ করলেন। ভারত অভিযান ও লুণ্ঠনের অজুহাত তিনি হাতে পেয়ে গেলেন— প্রথমত, কান্দাহার জয়ের পরই অনেক আফগান ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এর বিরুদ্ধে

নাদির শাহ্ ভারতে দূত প্রেরণ করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত থেকে উক্ত প্রতিবাদের কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, ভারতে নাদির শাহ্ কর্তৃক প্রেরিত দূত সদ্ব্যবহার পাননি, বরং তাকে আটক করে রাখা হয়েছিল। তৃতীয়ত, সমকালীন মোগল বাদশাহদের ঘরোয়া বিবাদ, অবক্ষয় ও শক্তিহীনতার সংবাদ নাদির শাহ্ জানতেন। তাই তিনি বিনা দ্বিধায় ভারত অভিযানের সূচনা করলেন। অনেকে বলেন, মোগলদের শত্রুপক্ষ যেমন নিজাম-উল-মূলক এবং অযোধ্যার সাদাদ খাঁ ভারত অভিযানে নাদির শাহকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অবশ্য বিষয়টি বিতর্কিত।

লক্ষ্য করা যায় কাবুলের পতনের পরই নাদির শাহ্ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। শীঘ্রই পেশোয়ার ও লাহোর তাঁর হস্তগত হলো। সমগ্র পাঞ্জাবে ত্রাসের সঞ্চার হলো। এরপর বিনা বাধায় নাদির শাহ্ পানিপথের কুড়ি মাইল উত্তরে কর্ণাল নামক স্থানে পৌঁছে যান। বিলম্বে হলেও এই সময় মোগল বাহিনী তাঁকে বাধা দিল (১৭৩৯ খ্রিঃ)। কিন্তু যুদ্ধে প্রায় কুড়ি হাজার মোগল সৈন্য নিহত হলো। যুদ্ধে নাদির শাহকে পরাজিত করা অসম্ভব ভেবে মোগল সম্রাট প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন। এরপর মোগল সম্রাট ও পারস্যের সম্রাট একত্রে দিল্লিতে প্রবেশ করলেন। "দেওয়ান-ঈ-খাস"-এ নাদির শাহের থাকার ব্যবস্থা হলো। কয়েকদিন নিরুপদ্রবে কাটল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দিল্লিনগরীতে নাদির শাহের মৃত্যু সংবাদ রটে গেল। নিষ্ঠুর শত্রুর মৃত্যুতে অনেকে খুশি হলো। দিল্লির কিছু লোক কয়েকজন পারসিক সৈনিককে হত্যা করল। ক্রুদ্ধ নাদির শাহ্ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দিল্লিবাসীদের হত্যার নির্দেশ দিলেন। ফলে শুরু হলো হত্যা, লুণ্ঠন ও অমানুষিক অত্যাচার। নিষ্ঠুরতার প্রতীক হিসেবে নাদির শাহের নাম ইতিহাসে পাকা হলো। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা নাদির শাহ্ এই হত্যা ও প্রতিশোধের দৃশ্য দেখলেন। একটানা বিরামহীন হত্যার পর সম্রাট মহম্মদ শাহের অনুনয়ে এই হত্যা কাণ্ড স্থগিত হলো। তবে এরপর হত্যার পরিবর্তে শুরু হলো লুণ্ঠন। প্রায় সাতান্ন দিন কিছু কিছু হত্যার সঙ্গে সঙ্গে চলল বিরামহীন লুণ্ঠন। ফিরে যাওয়ার পূর্বে নাদির শাহ মোগল দরবারের ময়ূর সিংহাসন, কোহিনুর মণি সহ বহু হীরা-জহরত ও নগদ সোনাদানা ও অর্থ নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে ছিল হিন্দু সঙ্গীত বিষয় সম্পর্কে ফারসি ভাষায় লেখা এক মহামূল্যবান গ্রন্থ। এছাড়া ছিল সামগ্রী বহণের জন্যে বহু সংখ্যক হাতি, ঘোড়া, উট। নাদির শাহ সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্তী ভূখণ্ড নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন (১৭৩৯ খ্রিঃ)। ভারতে রইল যেন যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও অবসাদের শ্মশান ভূমি।

আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণ ঃ নাদির শাহের প্রত্যাবর্তনের পর মোগল রাজশক্তির শেষটুকুও নিঃশেষ হলো। কয়েক বছর পর সম্রাট মহম্মদ শাহ্ পরলোকগমন করলেন (১৭৪৮ খ্রিঃ) এবং দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর পুত্র আহমদ

শাহ্। তিনিও ছিলেন দুর্বল ও অকর্মণ্য, তাই তার দরবারেও সভাসদদের দলাদলি চরম পর্যায়ে উঠল। অন্যদিকে এক আততায়ীর হাতে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের মৃত্যুর (১৭৪৭ খ্রিঃ) পর আহমদ শাহ্ আবদালি নামে একজন আফগান সর্দার রাজ্যের পূর্বাংশে আফগানিস্থানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি 'দর-ই-দুরান' (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মণি) বা "দর-ই-দররান" (অর্থাৎ দুর্গের প্রবাল) উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি আহমদ শাহ্ দুররাণী নামেও পরিচিত। নাদির শাহের ভারত অভিযানের সময় তিনি এদেশে এসেছিলেন। তখন ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্দশা যেমন তার চোখে পড়েছিল, তেমনি এদেশের ধন-সম্পদ তাঁকেও লুব্ধ করেছিল। এই প্রলোভন তীব্রতর হলো যখন স্বরাজ্যে অর্থাৎ স্বাধীন আফগানিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে অধিক অর্থের প্রয়োজন হলো। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য আহমদ শাহ্ আবদালি প্রথমে কাবুল, পেশোয়ার ও সিন্ধু দেশের রাজস্ব হস্তগত করলেন। এই রাজস্ব অতীতে নাদির শাহ্ ভোগ করতেন। কিন্তু এই রাজস্ব তাঁর আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে পারল না। আফগান উপজাতিদের মধ্যে সংহতি স্থাপনের জন্যে অধিক অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই দ্বিতীয় পদক্ষেপে আবদালি নাদির শাহের ভারতীয় অংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে মোগল সম্রাট আহমদ শাহের নিকট দাবি জানালেন। কিন্তু মোগল সম্রাট উক্ত দাবি পূরণে অসম্মত হলে আহমদ শাহ্ আবদালির দুর্ধর্ষ সেনা বাহিনী সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর অবধি সমুদয় অঞ্চলে অধিকার করল (১৭৪৭ খ্রিঃ)। অবশ্য এই অঞ্চল নাদির শাহ্ কর্তৃক অধিকৃত ছিল। ফলে পেশোয়ার পর্যন্ত আহমদ শাহ্ আবদালির অগ্রগতি হলো। তৃতীয় পদক্ষেপে ভারত হলো তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য — ভারতের সোনাদানা আফগানদের ভরসা।

লক্ষ্য করা যায় আফগানিস্থান প্রতিষ্ঠার পর (১৭৪৮ খ্রিঃ) থেকে তিনি বার বার ভারতে অভিযান প্রেরণ করতে থাকেন। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সিন্ধুর পশ্চিমাঞ্চলসহ পাঞ্জাব ও কাশ্মীর তাঁর অধিকারে আসে। মোগল সম্রাট আহমদ শাহ্ তাঁকে স্রহিন্দ পর্যন্ত ভূভাগ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তখন আহমদ শাহ্ আবদালি মীর মান্নু নামক এক ব্যক্তিকে লাহোরের শাসনভার অর্পণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মীর মান্নু প্রথম দিকে ছিলেন মোগলদের পক্ষে লাহোরের শাসনকর্তা। তিনি আহমদ শাহ্ আবদালির হাতে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আহমদ শাহ্ আবদালি তাঁকেই লাহোরের শাসনভার অর্পণ করলেন।

ইতোমধ্যে মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের ফলে সম্রাটের (আহমদ শাহ্) প্রধানমন্ত্রী নিজের প্রভুকে অন্ধ ও সিংহাসন চ্যুত করে দ্বিতীয় আলমগীরকে সিংহাসনে বসালেন (১৭৫৪ খ্রিঃ)। এই সময় আবদালির ভারতীয় অংশের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে গোলমাল সৃষ্টি হয়। অই আহমদ শাহ্ আবদালি পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও নিষ্ঠুরভাবে মথুরা ও দিল্লি লুণ্ঠন করেন (১৭৫৬-৫৭ খ্রিঃ)। তারপর তিনি স্বীয়

পুত্র তৈমুর শাহকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিয়োগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন (১৭৫৭ খ্রিঃ)।

তৈমুর শাহের এক বছরের (১৭৫৭-৫৮ খ্রিঃ) অমানুষিক অত্যাচারমূলক শাসন পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়কে দারুণভাবে উত্তেজিত করল। জলন্ধর দোয়াবের শাসনকর্তা আদিনা বেগ খাঁ আফগানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও মারাঠাদের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। কালবিলম্ব না করে রঘুনাথ রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী পাঞ্জাব অধিকার করল (১৭৫৮ খ্রিঃ) এবং লাহোর থেকে আফগানদের বিতাড়িত করল। লাহোরে মারাঠা অধিকার ছ'মাসের বেশি স্থায়ী হলো না। এরপর আহমদ শাহ আবদালি পঞ্চমবার ভারত অভিযান করে পাঞ্জাব অধিকার করেন (১৭৫৯ খ্রিঃ)।

এবার মারাঠা বাহিনীর সঙ্গে আফগানবীর আহমদ শাহ্ আবদালির তুমুল ও চরম সংগ্রামের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কারণ উভয়েই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করতেন। পাঞ্জাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে বিপুল মারাঠা বাহিনী প্রস্তুত হলো। কিন্তু এবার রঘুনাথ রাও সেনাপতি হতে অস্বীকার করলেন। তাই পেশোয়ার সতের বছর বয়স্ক পুত্র বিশ্বাস রাও সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাকে পরামর্শ দানের জন্যে প্রস্তুত হলেন সদাশিব রাও। অচিরে মারাঠা বাহিনী দিল্লি অধিকার করে পানিপথের প্রাঙ্গনে আহমদ শাহ্ আবদালির বাহিনীর সম্মুখীন হলো। *ইতিহাসে এই যুদ্ধ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১ খ্রিঃ) নামে খ্যাত।* যুদ্ধে সেনাপতিদ্বয়সহ বিপুল সংখ্যক মারাঠা সৈন্য নিহত হলো। বিজয়ী আহমদ শাহ্ আবদালি এবার মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে সম্রাটরূপে স্বীকৃতি দিলেন।

এই গোলমালের সুযোগে পাঞ্জাবে শিখশক্তির পুনরুত্থান ঘটল। এই ঘটনা পুনরায় আহমদ শাহ্ আবদালিকে ভারতে পরপর দুবার (১৭৬৪, ১৭৬৭ খ্রিঃ) অভিযান প্রেরণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু শিখশক্তিকে পরাজিত ও স্তব্ধ করা সম্ভব হয়নি। তবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাঁর প্রভাব বহুকাল অব্যাহত ছিল। আহমদ শাহ্ আবদালির ভারত অভিযানের ঐতিহাসিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, এই আক্রমণ ও লুণ্ঠন পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করল। মোগল সার্বভৌমত্ব দিল্লি ও তার চারপাশের কতকগুলি জেলার সীমায় সীমিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ল। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য এই সময় হ্রাস পায়। তৃতীয়ত, মারাঠাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের গতি এই আক্রমণের দ্বারা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তারা এবার পৃথক মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো। চতুর্থত, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধসহ অন্যান্য অভিযান পলাশির (১৭৫৭ খ্রিঃ) যুদ্ধজয়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রথম স্তরে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে

রেখেছিল বটে, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে তারা ভারতে প্রভাব বিস্তারে উৎসাহিত হলো। কারণ মোগলশক্তির অবর্তমানে যেসব শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল তারা ছিল ইংরেজ কূটনীতিজ্ঞের হাতে খেলার পুতুল মাত্র। তবে এই যুগেই পৃথক শিখ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঃ তৈমুর বংশীয় মহান ও শক্তিশালী সম্রাটদের হাতে তৈরি মোগল সাম্রাজ্য অবক্ষয়ের স্রোতধারায় একদিন অবলুপ্ত হলো। সম্রাট শাহ্‌জাহানের মধ্য-এশিয়া অভিযানের ব্যর্থতার মাধ্যমে যে অবক্ষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেই অবক্ষয় প্রকট হয়ে দেখা দিল এই বংশের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট আওরঙ্গ জেবের জবরদস্ত শাসন ও ধর্মান্ধ নীতির বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে। তবুও সে সাম্রাজ্য পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী যাবৎ নামের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। সমসাময়িক যুগে বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেককারী এমন একটা সুবিশাল শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি তাই সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সাম্রাজ্যের বিশালতা ঃ তৈমুর বংশীয় বাবর কর্তৃক স্থাপিত মোগল সাম্রাজ্য সম্রাট আকবরের অধিনায়কত্বে উন্নতির পথে আরোহণ করে। কিন্তু শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেই সাম্রাজ্যের দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তাঁর চেষ্টায় সেই সাম্রাজ্যের সীমা সুদূর দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সাম্রাজ্যের এই বিশালতাই ছিল মোগলশক্তির পতনের জন্যে অংশতঃ দায়ী। কারণ সে যুগে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। এত বড় সাম্রাজ্যকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার জন্যে যে জনশক্তি, সামরিক সাজসরঞ্জাম, সম্প্রসারিত প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রয়োজন তার যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। তাই দূরদূরান্তের অংশগুলিকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা সম্ভব হয়নি। তখনকার দিনে কোথাও থেকে কোনও বিদ্রোহের সংবাদ কেন্দ্রে পৌঁছাতে যত বিলম্ব হত, সেই বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি নিয়ে পৌঁছাতে ততোধিক বিলম্ব হত।

দাক্ষিণাত্য নীতি ঃ এই বিশালতার পটভূমিতে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াল। আওরঙ্গজেবের পঞ্চাশ বছর রাজত্বকালের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ) মধ্যে প্রথম চব্বিশ বছর (১৬৫৮-১৬৮১ খ্রিঃ) তিনি দিল্লি ও আগ্রায় থেকে উত্তর ভারতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে রাজ্য শাসন করলেন। আর শেষ ছাব্বিশ বছর (১৬৮১-১৭০৭ খ্রিঃ) দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি শিয়াপন্থী মুসলিম রাষ্ট্র গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর অধিকার করেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তিনি মারাঠা শক্তির অগ্রগতি রোধ করতে পারেননি। এদিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে উত্তর ভারতের শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, রাজকোষ শূন্য হলো, প্রাদেশিক শাসকরা একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, মোগল রাজকর্মচারীদের অত্যাচার জর্জরিত জমিদাররা লুণ্ঠন ও দস্যুগিরি শুরু করলেন। এ সম্পর্কে আচার্য

যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, স্পেনীয় খত যেমন নেপোলিয়নকে ধ্বংস করেছিল তেমনি দাক্ষিণাত্য ক্ষত (Deccan Ulcer) আওরঙ্গজেবের পতন ঘটায়।

আওরঙ্গজেবের সংকীর্ণতা ঃ বৈচিত্রময় ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত কোনও সাম্রাজ্য নিশ্চয়ই বিদ্বেষমূলক ধর্মবিলাসী নীতির মাধ্যমে স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে না। বিচক্ষণ ও উদার সম্রাট আকবর বুঝেছিলেন যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, বিস্তার ও সংরক্ষণের জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সমর্থন ও আনুগত্য একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি অমুসলমানদের প্রতি উদার ধর্ম-সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেন। পক্ষান্তরে ধর্মবিলাসী আওরঙ্গজেব এই নীতির বিরোধিতা করে অমুসলমানের দেশকে 'দার-উল-ইসলাম' বা ইসলামের দেশে পরিণত করতে চাইলেন। ফলে আকবরের রাজত্বে যে রাজপুত শক্তি সাম্রাজ্যের সহায়ক ছিল সেই শক্তি শত্রুশিবিরে নিক্ষিপ্ত হলো। আওরঙ্গজেবের আমলে শুধু রাজপুত নয়, জাঠ, সৎনামী, বুন্দেলা, শিখ, মারাঠা ইত্যাদি সকলের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। সম্রাট আওরঙ্গজেব সে বিদ্রোহের আগুন নেভাতে পারেন নি।

নৌশক্তির অভাব ঃ মোগল সাম্রাজ্য মূলত সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। দরবারী অভিজাতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মোগল সামরিক বিভাগ যুদ্ধযাত্রার সময় স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, বিলাস-ব্যসনের সাজসরঞ্জাম, এমনকি হাট-বাজারসহ অগ্রসর হত। তাই তারা সমসাময়িক দুর্ধর্ষ, সংযমী ও দ্রুত গতিশীল মারাঠা বাহিনী অপেক্ষা দুর্বল ছিল। অন্যদিকে মধ্যএশিয়ার স্থলভাগ থেকে আগত মোগলরা সামুদ্রিক শক্তির উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই তারা সামুদ্রিক নৌবাহিনী সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন না। অথচ সমসাময়িক ইয়োরোপীয় বণিক গোষ্ঠী সমুদ্রের উপর ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে একাধিপত্য বিস্তার করে এবং মোগল বাদশাহদের অনুমতি নিয়ে এদেশে বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। শুধু ইয়োরোপীয় নাবিকরা নয়, এদেশেরই নরপতি শিবাজী নৌশক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পৃথক নৌবাহিনী সংগঠন করেন। এই নৌশক্তির অভাবই কালক্রমে মোগলদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা ঃ নৌশক্তির অভাব ছাড়াও সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেমন অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর দুর্বলতা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, অভিজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই সামরিক বিভাগের পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন। দুর্বল শাসকদের আমলেই তাদের বিলাস-ব্যসনের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। যারা সৈন্যদলে নাম লেখাত তাদের সামরিক শিক্ষা বিশেষ কিছু ছিল না। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারেও এদের অনীহা দেখা দেয়। যুদ্ধাশ্বের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং তাদের তড়িৎ গতি বজায় রাখার কোনও ব্যবস্থাই শেষ দিকে ছিল না। ক্রমে বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, তাদের যুদ্ধ করার প্রবণতা হ্রাস পায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিক থেকে

রাজভাণ্ডারের অর্থনৈতিক দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে সেই দুর্বলতা অনেকবেশি প্রকট হয়ে দেখা দিল। তখন সৈনিকদের বেতন মাসে মাসে পরিশোধ করা সম্ভব হতনা। নিছক অর্থের প্রয়োজনে অধিকাংশ সৈনিক যোদ্ধার খাতায় নাম লেখাতেন, দেশ রক্ষার জন্যে নয়। তাই বেতন প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা সমর বাহিনীতে সামরিক দায়িত্ব পালনে অনীহা সৃষ্টি করল। একজন মনসবদারকে যত সংখ্যক অশ্বারোহী ও অশ্ব পরিপোষণের দায়িত্ব দেওয়া হত। সেই সৈন্যসংখ্যা ও অশ্বের সংখ্যাও কমে গেল। ফলে সামরিক বাহিনীর অবক্ষয় দ্রুততর হলো। আর সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল মোগলশক্তি পতনের শেষ সীমার দিকে ধাবিত হলো।

আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের দ্বন্দ্ব ঃ মোগল রাজবংশের উত্তরাধিকার আইন ছিল সমস্যাপূর্ণ। যে কোনও সম্রাটের মৃত্যুর পর পুত্ররা সবাই সিংহাসনের দাবিদার হতে পারতেন। আওরঙ্গজেব নিজেই পিতার (শাহজাহান) শেষ জীবনে এরূপ উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী আমলে এই উত্তরাধিকার যুদ্ধ একটা অনিবার্য ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। এইসব উচ্চরাধিকার যুদ্ধে অভিজাত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সেনাধ্যক্ষরা নানা ষড়যন্ত্র, হত্যা, দুর্নীতি ও অবাঞ্ছনীয় কর্মে লিপ্ত হতেন। ফলে মোগল শক্তি অবক্ষয়ের পথে দ্রুতগতিতে পতনের সম্মুখীন হলো।

আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুর্বল ও অকর্মণ্য উত্তরাধিকারীগণের আমলে অনেকগুলি মুসলিম -শাসিত রাষ্ট্রের যেমন উত্থান ঘটে তেমনি হিন্দু রাজশক্তির পুনর্জাগরণেরও সূচনা হয়। মুসলিম রাষ্ট্রর মধ্যে দাক্ষিণাত্যের নিজাম, উত্তর ভারতের অযোধ্যা ও বাংলা সুবার নাম উল্লেখযোগ্য। এসব সুবা মূলত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও এবং উপরিতালগতভাবে মোগল আইন-কানুন মেনে চললেও সংশ্লিষ্ট শাসকদের সার্বভৌম ও স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। পরে সম্রাট ও কেন্দ্রীয় শক্তির অযোগ্যতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এসব রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে সুবারাষ্ট্র শাসনের ব্যবস্থা করেন ও ক্রমশ মোগলশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এই যুগেই ঠিক এমনি করে হিন্দু রাজশক্তির পুনরুত্থান ঘটে। রাজপুত, জাঠ, শিখ ও মারাঠা শক্তি জাগরণ ছিল তার মধ্যে অন্যতম। লক্ষ্য করা যায়, এসব শক্তিবর্গের মধ্যে যেমন পারস্পরিক বিবাদ ছিল তেমনি মোগলদের বিরুদ্ধেও তাদের তৎপরতা ছিল। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সাম্রাজ্যের মধ্যে যে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন ধর্মবিলাসী আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতদুষ্ট নীতি সেই উদার নীতি লঙ্ঘন করেন। জিজিয়া কর, তীর্থকর প্রবর্তন হিন্দু-মন্দির ধ্বংস, হিন্দু প্রজাদের উপর বিশেষ বিশেষ বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করে আলমগীর আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা নষ্ট করেন। তার জন্য রাজপুত, শিখ, জাঠ, মারাঠারা মোগলশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিন্তু লক্ষ্য করা

যায় আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটগণ সেই পক্ষপাতদুষ্ট ধর্মান্ধ নীতি পরিত্যাগ করেন ও হিন্দু নেতাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তবুও হিন্দু রাজন্যবর্গ মোগল সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার অনুকূল ব্যবহার করেন নি। অন্যদিকে নিছক হিন্দুত্বের স্বার্থে হিন্দু নায়কগণ রুখে দাঁড়ান নি। ধর্মীয় সংহতি বিধান অপেক্ষা নিজ-নিজ রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও লুণ্ঠনের দিকেই ছিল তাদের মনোযোগ। এঁদের যুদ্ধ ও লুণ্ঠনমূলক কার্যকলাপের ফলে দেশে হিন্দু-মুসলমান সমভাবে নির্যাতিত ও শোষিত হত। তার ফলশ্রুতি স্বরূপ মোগল সাম্রাজ্যের পতন যেমন নিশ্চিন্ত হলো তেমনি ভারতীয় নতুন কোনও শক্তির উত্থান সম্ভব হলো না। পথিমধ্যে তৃতীয় বিদেশী ইংরেজশক্তি, বাণিজ্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী হলো।

অভিজাতদের চারিত্রিক অবনতি ও দলাদলি ঃ মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করত সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ও সক্ষমতার উপর। সম্রাটই মোগল অভিজাতদের সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সেনাপতি পদে নিয়োগ করতেন। শক্তিশালী সম্রাটদের আমলে অভিজাত ওমরাহরাই সকল কর্মেই চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী অযোগ্য অক্ষম সম্রাটদের আমলে সেইসব অভিজাতদের মধ্যে যেমন চারিত্রিক দুর্বলতা, বিলাস-ব্যসন, জাঁকজমকতা, অনৈতিকতা প্রকট হয়ে উঠল তেমনি আবার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বেও তাঁরা এক এক সম্রাটের বা সিংহাসনের দাবিদারের বিরোধিতা অথবা পৃষ্ঠপোষকতায় মেতে উঠলেন। এর জন্যে তাঁদের মধ্যে নানা দলের সৃষ্টি হলো। ইরাণী, তুরাণী, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি দলগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য। এরূপ চারিত্রিক দুর্বলতা ও দলাদলির ফলে তাঁরা সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য চেষ্টা করার পরিবর্তে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষা আমোদ-প্রমোদ উপভোগ ইত্যাদিতে নিমগ্ন হতেন। ফলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হলো।[১]

অমিতব্যয়ী সম্রাট ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী ঃ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পশ্চাতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আবার এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রাথমিক দায়িত্বের অধিকারী ছিলেন অমিতব্যয়ী সম্রাটসহ ওমরাহ ও সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ। সম্রাট শাহজাহান তার আড়ম্বরপ্রিয়তা ও জাঁকজমকের জন্যে রাজভাণ্ডার শূন্য করেন। সারাজীবন যুদ্ধ করে রাজকোষ শূন্য করেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। তিনি যে ১৩ কোটি টাকা রেখে যান তাও শেষ করে দিলেন বাহাদুর শাহ। এরপর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সম্রাটদের আদায়ীকৃত রাজস্বের উপর নির্ভর করতে হত। মোগল দরবারের জাঁকজমক ও ব্যয়বহুল হারেমের ব্যয় সঙ্কুলান করা আর সম্ভব হত না। শেষ দিকে মোগল সম্রাটগণ এমনই এক অর্থ-সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন যে খাদ্যাভাবে তাঁদের

রন্ধনশালার কোনও কোনও প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যেত (স্যার যদুনাথ সরকার)। সম্রাটদের এই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মোগল অভিজাতদের বিলাস-ব্যসন। জাঁকজমকতা, নর্তকী-গায়ক-বাদক দল নিয়ে পরিচালিত মজলিস। অর্থের অভাবে প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রেও অচল অবস্থার সৃষ্টি হলো।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা ঃ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দ্বিতীয় একটি কারণ ছিল রাজস্ব প্রথার পরিবর্তন। সম্রাট আকবরের আমলে রাজা টোডরমল যে রাজস্ব প্রথা প্রবর্তন করেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরও সেই প্রথার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ক্রমশ সেই প্রথার বিলোপ ঘটতে থাকে। সম্রাট ফারুখশিয়ারের আমলে রাজকোষের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারি খাস জমির ইজারা দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়। ইজারাদাররা চুক্তি অনুসারে সম্রাটকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকত। কিন্তু ইজারাদারদের উপর অন্যকোনও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়নি। তাই তারা স্বাধীনভাবে কৃষকদের নিকট থেকে যত বেশি সম্ভব খাজনা আদায় করত। সুতরাং এই যুগে অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এরপর জমিদার ও জায়গিরদাররা সরকারের খাজনা বন্ধ করতে *থাকে। ফলে সরকারের আর্থিক বিপর্যয় চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়।*

কৃষক বিদ্রোহ ঃ আবার উপরোক্ত, রাজস্ব প্রথার অন্যতম ফলশ্রুতি হলো কৃষক অসন্তোষ। মোগল আমলে জমির খাজনা ছাড়াও অন্যান্য করের বোঝা কৃষকদের উপর চাপান হত। রাজস্বের ঘাটতি পূরণের জন্যে জাঁকজমকপ্রিয় শাহজাহানও গরিব কৃষকদের করভারে জর্জরিত করেছিলেন। জায়গিরদার ও দেওয়ানরা সাধারণ মানুষের নিকট থেকে অতিরিক্ত পাওনা আদায়ের জন্যে অত্যাচার করত। মোগল আমলে কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত না, কিন্তু জায়গির হস্তান্তর করা হত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন থেকে ইজারা-প্রথা চালু করা হলো তখন ইজারাদাররা অধিক অর্থের লোভে শোষক শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত কর বৃদ্ধি করতে থাকে। ফলে মোগল আমলে বহুবার কৃষক-বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছে। এছাড়া জিজিয়া করের বিরুদ্ধে অমুসলমান সম্প্রদায় যখন বিদ্রোহ করে তখনও কৃষক-বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। শিখ, জাঠ, সৎনামী নেতাদের মোগল-বিরোধী আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল কৃষক-অসন্তোষ।

শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি ঃ অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রসঙ্গে কৃষির অবনতির সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের অবনতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করত লুণ্ঠনকারী বর্গী, হিমালয়ের উপজাতি, মগ ও পর্তুগিজ দস্যুরা। তাদের অত্যাচারের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পণ্য চলাচল ব্যাহত হত। সম্রাট ফারুখশিয়ার যখন (১৭১৭ খ্রিঃ) ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দিলেন তখন সরকারি বাণিজ্য শুল্কের আয়ে ঘাটতি হলো। এরপর বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি বা দস্তকের অপব্যবহার থেকে শিল্প-বাণিজ্যের জগতে নেমে এলো এক নিদারুণ দুর্যোগ।

দেশীয় বণিক ও শিল্পী-কারিগররা বিদেশী বণিকদের নিকট প্রতিযোগিতায় টিকতে পারল না। এর ফলে শুধুমাত্র মোগল-শাসিত অংশ নয়, মোগল সাম্রাজ্য থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন রাষ্ট্রগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এর পরিণতি এগিয়ে চলল পরাধীনতার দিকে।

বৈদেশিক আক্রমণ ঃ বৈদেশিক আক্রমণ ছিল শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের হাতে যখন মোগল সাম্রাজ্য মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেছে সেই সময় প্রথমত, পারস্যের নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করলেন (১৭৩৯ খ্রিঃ)। তিনি লুণ্ঠন ও হত্যা লীলার মাধ্যমে দিল্লিকে শ্মশানে পরিণত করলেন। যাওয়ার সময় তিনি নিয়ে গেলেন বহু কোটি মুদ্রা, সোনাদানা, কোহিনুর মণি, ও ময়ূর সিংহাসনসহ বহু সম্পদ। দ্বিতীয়ত, এলেন আফগানিস্তানের সুলতান আহমদ শাহ্ আবদালি। তিনি পশ্চিম ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে অধিকার করেন ও দিল্লির উপকণ্ঠ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেন। তৃতীয়ত, এদেশে এসেছে ইংরেজসহ্ বহু ইয়োরোপীয় বণিক গোষ্ঠী। তারা দিল্লি থেকে বহু দূরে সমুদ্রের উপকূল বরাবর প্রথমে বাণিজ্য বিস্তার করেন। কেন্দ্রীয় মোগলশক্তির দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে তারা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ইয়োরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজরাই ছিল রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সর্বাধিক তৎপর। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা অধিকারের পর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মূল মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র দিল্লির উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি ইংরেজ বাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। এরপর মোগল সাম্রাজ্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

উপসংহার ঃ মোগল সাম্রাজ্যের ক্রমিক ভাঙনের প্রসঙ্গে শুধু উত্থান ও পতন প্রকৃতির নিয়ম বললে ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করা যায় না। যদিও একথা সত্য যে ইতিহাসে কোনও সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী নয়। প্রকৃতির নিয়মে সব শক্তিশালী রাজবংশের উত্থান যেমন হয়েছে, পতনও তেমনি হয়েছে।

প্রাকৃতিক নিয়ম নয়, অষ্টাদশ শতকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এমন কতকগুলি কারণ ঐতিহাসিকরা নির্দেশ করেছেন যেগুলি সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল। যেমন সাম্রাজ্যের বিশালতা, আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব, মনসবদারি প্রথা তথা সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলহীনতা ও দুর্বলতা, আরঙ্গজেবের ভ্রান্ত দাক্ষিণাত্য নীতি, নৌশক্তির অভাব, স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান, আওরঙ্গ-জেবের ধর্মান্ধতা ও ভ্রান্ত রাজপুত তথা হিন্দু-নীতি অর্থনৈতিক দুর্বলতা ইত্যাদি ইত্যাদি। আচার্য যদুনথ সরকার তাঁর সুপরিচিত গবেষণা The Fall of the Mughal Empire (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৪৯) এর চার খণ্ডে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস লিখেছেন। এছাড়া ভিনসেণ্ট স্মিথ থেকে ঈশ্বরীপ্রসাদ পর্যন্ত দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকগণ অনেকেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের চিরাচরিত কারণগুলি নির্দেশ করেছেন।

আচার্য যদুনাথের প্রবাদপ্রতিম মন্তব্য আমাদের মনে পড়ে। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যেমন বলেছিলেন 'স্পেনীয় ক্ষাত'ই আমাকে ধ্বংস করেছে, তেমনি আওরঙ্গজেবের 'দাক্ষিণাত্য ক্ষত' তার সাম্রাজ্যে পচন ধরিয়েছে। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণের গবেষণায় জানা যায় যে ভ্রান্ত দাক্ষিণাত্যে নীতির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া চলে না। ঠিককথা যে দাক্ষিণাত্য নীতির লাভ বিশেষ হয়নি, এতে লোকবল অর্থবলের বিপুল ক্ষতি হয়েছিল তবু এজন্যই সাম্রাজ্য ভেঙে যায়নি। তেমনি আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের একমাত্র প্রকৃত কারণ নয়। যদিও এক্ষেত্রেও আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না।

আসলে অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সব দিক থেকে মোগল সাম্রাজ্য এক সার্বিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং তার থেকে বেরিয়ে না আসতে পারার জন্যই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই কথাই আধুনিক ইতিহাসবিদরা বলতে চেয়েছেন।[১] উপরিউক্ত যে চিরাচরিত কারণগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি নিশ্চয়ই মোগল সাম্রাজ্য পতনের জন্য দায়ী তবে এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কারণ যুক্ত করা দরকার। আওরঙ্গজেব বা কোনও ব্যক্তিবিশেষের ব্যর্থতা বা ধর্মান্ধতার উপর অতিরিক্ত জোর দিলে সংকটের স্বরূপ স্পষ্ট হয় না। পতনের কারণগুলি খুঁজতে হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই। যেমন শাসকশ্রেণী ছিল মোগল সাম্রাজ্যের এক স্তম্ভ, সৈন্যবাহিনী ছিল দ্বিতীয় স্তম্ভ। দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত শাসকশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, সম্পদের আত্মসাৎ তথা জায়গির নিয়ে মনসবদারদের মধ্যে রেষারেষি, বাণিজ্যের অবনতি, কৃষি উৎপাদনে অবনতি এবং কৃষক বিদ্রোহ সাম্রাজ্যে সংকটের সৃষ্টি করে। কৃষি ও বাণিজ্য ছিল সাম্রাজ্যের অপর স্তম্ভ। সতীশ চন্দ্র ইরফান হাবিব, আতহার আলি, মুজাফফর আলম প্রমুখ অনেকেই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শাসকশ্রেণীর অধঃপতন, সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি এবং দলাদলি যেমন মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ, তেমনি কৃষি সংকট এবং পৌণঃপুনিক কৃষক বিদ্রোহও পতনের জন্য দায়ী।

২। স্বাধীন আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের যুগে, বিশেষ করে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। মোগল সামরিক শক্তির দুর্বলতা সর্বাধিক আত্মপ্রকাশ করে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে আগত বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে চরম কুঠারাঘাত করে। অন্যদিকে সামুদ্রিক উপকূল বরাবর

ইয়োরোপীয় বণিকগণ ক্রমশ প্রভাব বৃদ্ধি করতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ অঞ্চলের শাসন পরিচালনার সূচনা করেন। প্রথম স্তরে তত্ত্বগতভাবে তারা দিল্লির অধীনতা স্বীকার করতেন। কিন্তু পরবর্তী সুযোগে তাঁরা বাস্তবত স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কুণ্ঠিত হননি। এইভাবে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর একাধিক স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়; যেমন হায়দ্রাবাদ, কর্ণাটক, অযোধ্যা মারাঠা, বাংলা ও অন্যান্য শক্তি।

হায়দ্রাবাদ স্বাধীন নিজাম রাজ্য ঃ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন নিজাম রাজ্য। নিজাম বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চিন কিলিচ খাঁ বা আসফ ঝা নামক এক সুদক্ষ শাসক। সম্রাট আওরঙ্গজেবেরে মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতে বিজাপুরের সুবাদার। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ ১৭১৩ খ্রিঃ তাঁকে অযোধ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। এরপর সম্রাট ফারুখশিয়ার তাঁকে 'নিজাম-উল্-মুলক' উপাধি দিয়ে দক্ষিণ ভারতের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ঠিক এই সময় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মোগল দরবারে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে সাময়িকভাবে চিনকিলিচ খাঁর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে এবং তাঁকে নানা ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হলো। তবে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের (১৭২০ খ্রিঃ) পর সম্রাট মহম্মদ শাহ্ নিজামকে 'আসফ ঝা' উপাধিতে ভূষিত করেন ও দিল্লিতে আহ্বান করে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু সম্রাট মহম্মদ শাহ্ অন্যান্য সভাসদদের প্রভাবে পড়ে পদে পদে নিজামকে বাধা দিতে শুরু করলেন। শেষে সম্রাটের উপর বিরক্ত হয়ে নিজাম প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। এবং সেখানে হায়দ্রাবাদকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন (১৭২৪ খ্রিঃ)। তবে তিনি দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি। তবুও দিল্লির অনুমতি না নিয়েই তিনি শাসন ও রাজনীতি পরিচালনা করতেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁর নীতি ছিল উদার; যোগ্যতাসম্পন্ন হিন্দুদের তিনি উচ্চপদে নিয়োগ করতেন। পূরণ চাঁদ ছিলেন তাঁর দেওয়ান। প্রতিবেশী মারাঠাদের আক্রমণ থেকে নিজরাজ্যকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কূটকৌশল, কখনও বা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। তাঁর জীবিতকালে ইয়োরোপীয় বণিকদল আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। সুশাসক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল হায়দ্রাবাদ নিজাম-শাসিত থাকে।

কর্ণাটক ঃ সম্রাট আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জয় করেছিলেন। তার মধ্যে কর্ণাটক ছিল একটি অন্যতম সুবা। তবে এই সুবাটি শাসিত হত হায়দ্রাবাদের

নিয়ন্ত্রণাধীনে। কিন্তু নিজাম-উল্-মুলক যখন হায়দ্রাবাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন তখন কর্ণাটকের সুবাদার নিজামের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করেন ও 'নবাব' উপাধি নিয়ে কর্ণাটক শাসন করতে থাকেন। কর্ণাটকের নবাব সাদাতউল্লাহ্ খাঁ ছিলেন স্বাধীনচেতা প্রশাসক। বাংলার মুর্শিদকুলি খাঁর মত তিনি স্বাধীনভাবে কর্ণাটকের শাসন পরিচালনা করতেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দোস্ত আলিকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। পরবর্তীকালে কর্ণাটকের নবাব পদে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সময় (১৭৪০ খ্রিঃ-এর পর) ইয়োরোপীয় বণিকগণ, বিশেষ করে ফরাসি ও ইংরেজ বণিকগণ কর্ণাটকের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে থাকে।

অযোধ্যা ঃ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে অযোধ্যা ছিল অন্য একটি বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিকেন্দ্র। খুরাসান থেকে আগত সাদাত খাঁ ছিলেন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পুর্বে বারাণসী এবং পশ্চিমে এলাহাবাদ ও কানপুরের নিকটবর্তী অঞ্চল নিয়ে এই অযোধ্যা সুবা গঠিত ছিল। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে সাদাত খাঁ এই সুবার গভর্ণর বা সুবাদার পদে নিয়োজিত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধিমান, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এক ভাগ্যান্বেষী। অযোধ্যার সুবাদার পদে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জমিদারগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় নিজস্বসেনাবাহিনী গঠন ও দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করে। সাদাত খাঁ কঠোর হস্তে সেই বিদ্রোহ দমন করেন। পরাজিত জমিদারদের মধ্যে যারা আনুগত্য স্বীকার করতেন তাদের তিনি উৎখাত করেন নি। তবে তারা সুযোগ পেলেই সুবাদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। তাই সাদাত খাঁর উত্তরাধিকারী সফদার জং অযোধ্যার জমিদারদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে "অযোধ্যার প্রধানগণ চোখের নিমেষে এক একটা উপদ্রব সৃষ্টি করতে সক্ষম। এরা দাক্ষিণাত্যের মারাঠাদের চেয়েও অধিক বিপজ্জনক।"

অযোধ্যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কার করেন এবং জমিদারদের শোষণের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্য পরিহার করে হিন্দু ও মুসলমানদের ভিতর থেকে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের উচ্চপদে নিয়োগ করতেন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় মোগল সম্রাট তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান। কিন্তু এই সময় তিনি আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেন। তবে মৃত্যুর (১৭৩৯ খ্রিঃ) পূর্বেই তিনি অযোধ্যায় স্বাধীন রাজবংশের সূচনা করেন।

অযোধ্যার পরবর্তী সুবাদার ছিলেন সাদাত খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সফদর জং। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মোগল দরবারে প্রধান মন্ত্রী (উজির) হিসেবে নিয়োগ করা হয়। নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত (১৭৫৪ খ্রিঃ) মোগল দরবারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর আমলেই অযোধ্যার সঙ্গে এলাহাবাদ প্রদেশটি যুক্ত করা হয়।

সফদর জং-এর পর তাঁর পুত্র সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার শাসক পদে নিযুক্ত হন। তিনিও আমৃত্যু (১৭৭৫ খ্রিঃ) উত্তর ভারতের এক প্রভাবশালী শাসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আমল থেকে অযোধ্যার শাসকরা নামেমাত্র মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করলেও কার্যত স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র শাসন করতেন।

রোহিলা খণ্ড ও বুন্দেল খণ্ড ঃ ষোড়শ শতকে মোগলদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পাঠানরা। ঐ শতকের শেষাংশে এবং সপ্তদশ শতকে পাঠান-শক্তি বা আফগানরা হীনবল হয়ে পড়ে। অবশেষে অষ্টাদশ শতকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রোহিলা ও বঙ্গাস গোষ্ঠীর আফগানরা যথাক্রমে রোহিলা খণ্ড ও বুন্দেল খণ্ডে দুটি পাঠান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। (১) রোহিলাখণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রোহিলা গোষ্ঠীভুক্ত দাউদ খাঁ নামক এক ভাগ্যান্বেষী আফগান। হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরে কুমায়ুন পর্বতমালা ও দক্ষিণে গঙ্গার মধ্যবর্তী ভুখণ্ডটি রোহিলাখণ্ড নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে দাউদ খাঁ প্রথমে স্থানীয় জমিদারের সৈনিক হিসেবে জীবনযাত্রার সূচনা করেন। মোগলদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্থানীয় জমিদার-মহাজনদের দমন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সূচনা করেন। বেরিলীর আওলান নামক স্থানে প্রথমে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল, পরে রামপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রোহিলারা অযোধ্যার, দিল্লির জাঠদের বিরুদ্ধে সর্বদা সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। দাউদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলি মহম্মদ রোহিলাদের নেতৃত্ব দেন ও স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখেন। আহমদ শাহ আবদালির ভারত লুণ্ঠনের সুযোগে তিনি রোহিলাখণ্ডে সীমা বৃদ্ধি করেন।

(২) রোহিলা খণ্ডের মত সমকালীন ভারতে মহম্মদ খাঁ বঙ্গাস নামক অন্য এক ভাগ্যান্বেষীর চেষ্টায় বুন্দেলখণ্ড রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লিতে তখন ছিল ফারুখশিয়ার ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল। এঁদের রাজত্বকালে আলিগড় ও কানপুরের মধ্যবর্তী ফারুখাবাদ অঞ্চলে বুন্দেলখণ্ড রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রোহিলাখণ্ড ও বুন্দেলখণ্ডের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল উন্নত। কৃষক ও বণিকদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা বজায় রাখা হত। হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষহীন শাসক ব্যবস্থাই ছিল এই দুটি রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক।

রাজপুতশক্তি ঃ উদার বাদশাহ আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানে রাজপুত শক্তি ছিল প্রধান সহায়ক। কিন্তু ধর্মবিলাসী আওরঙ্গজেবের বিদ্বেষমূলক নীতির ফলে রাজপুতরা মোগলদের প্রতি অসহযোগ ও অবজ্ঞার নীতি গ্রহণ করে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রিঃ) মেবার (উদয়পুর) মারওয়াড় (যোধপুর) এবং অম্বর (জয়পুর) এই তিনটি প্রধান রাজপুত রাষ্ট্র মোগলদের সঙ্গে সরাসরি শত্রুতার সূচনা করে। সম্রাট বাহাদুর শাহ তার উদারতা দ্বারা কিছুকাল এদের বশীভূত রাখতে সমর্থ হন। কিন্তু খুব শীঘ্র মারওয়ারের অজিত সিংহ,

অম্বরের দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং যোধপুরের দুর্গাদাস রাঠোর সম্মিলিতভাবে মোগলদের বিরোধতায় অবতীর্ণ হন। ঠিক এই সময় উত্তর ভারতে শিখশক্তির উত্থান ঘটায় বাধ্যে হয়ে বাহাদুর শাহ্ রাজপুতদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করেন। ফলে এই সময় থেকে বাস্তবত রাজপুত প্রধানরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা ও শক্তিবৃদ্ধিতে তৎপর হন।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর (১৭১২ খ্রিঃ) মোগল দরবারে পুনরায় অশান্তির দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মোগল দরবারে প্রভাব প্রতিষ্ঠা করলেন। রাজপুত প্রধানরাও মোগল দরবারে নানা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। মারওয়ার এবং অম্বরের রাজারা দিল্লির রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। নিজ নিজ ভূখণ্ডের সার্বভৌম অধিকার ছাড়াও মারওয়ারের অজিত সিংহ ১৭২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আজমীর ও গুজরাটের শাসক নিযুক্ত হন। তেমনি অম্বররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ সুরাট ও আগ্রার শাসক রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং বলা যায়, ভারতের একটি বিস্তৃত অংশে রাজপুত প্রতিপত্তি বজায় ছিল। পক্ষান্তরে মোগল প্রতিপত্তি দিল্লি এবং তার চতুপার্শ্বস্থ অঞ্চলে সীমিত হতে থাকে।

অষ্টাদশ শতকে রাজপুত প্রধানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব ছিল। বড়ো বড়ো রাজ্য সংলগ্ন ছোট ছোট রাজ্যগুলি গ্রাস করত। আবার বড়ো বড়ো রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নানা ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মকলহ, দুর্নীতি খুবই প্রবল ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এগুলি হলো সমকালীন মোগল দরবার ও বাদশাহী পরিবারের প্রভাব। যেমন, মারওয়ারের অজিত সিংহ তাঁর পুত্রের হাতে নিহত হন। এরূপ ঘটনা মোগল পরিবারে হামেশাই ঘটত। এ যুগের রাজপুত প্রধানদের মধ্যে অম্বররাজ জয়সিংহ ছিলেন নানা গুণের অধিকারী। তাঁরই প্রচেষ্টায় জয়পুর শহর একটি শিল্পকলা ও বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হয়। জয়সিংহ ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। তিনি দিল্লি, উজ্জয়িনী, বারানসী, মথুরা ও জয়পুরে মানমন্দির স্থাপন করেন। পাশ্চাত্য ভাষায় অনুদিত বিভিন্ন গ্রন্থ যা জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার সহায়ক সেগুলিকে তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত করিয়েছিলেন। রাজপুত 'কন্যাহত্যা' নামক কুপ্রথা সমাজ থেকে বিদূরিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৬৯৯ থেকে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জয়পুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজপুতদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সওয়াই জয়সিংহের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

জাঠশক্তি : জাঠরা মূলত কৃষিজীবি। তাদের বসবাস ছিল দিল্লি, আগ্রা ও মথুরা অঞ্চলে। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সময় মোগল শাসকদের হাতে জাঠরা অত্যাচারিত হতে থাকে। তখন তারা জাঠবংশীয় জমিদারদের নেতৃত্বাধীনে মোগলবিরোধী বিদ্রোহ লিপ্ত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম

পঁচিশ বছরের মধ্যে ১৬৬৯ খ্রিঃ এবং ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে দু-দুবার প্রধান দুটি জাঠ-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তবে দুটি বিদ্রোহই কঠোরভাবে দমন করা হয়। বিদ্রোহ অদমিত হলেও আঞ্চলিক অশান্তি ও ক্ষোভ অক্ষুণ্ণ ছিল। উত্তর প্রদেশের মথুরা অঞ্চলে ছিল জাঠশক্তির কেন্দ্রভূমি। রাজারাম, ভোজ এবং চূড়ামন ছিলেন নেতা হিসেবে বিশেষ প্রভাবশালী। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রিঃ) জাঠেরা দিল্লির চতুষ্পার্শ্বে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিল। জাঠ কৃষকরা জাঠ জমিদারদের সাহায্য করল। জমিদারদের বিদ্রোহ ক্রমশ লুণ্ঠনের আকার ধারণ করল। ধনী দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান সবারই ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাই ছিল বিদ্রোহের প্রক্রিয়া। আবার মোগল দরবারের ষড়যন্ত্রে জাঠরা সুযোগ বুঝে এক এক পক্ষকে সমর্থন করে মোগলশক্তির পতনে সাহায্য করেছিল। জাঠনেতা চূড়ামণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভরতপুরের জাঠরাজ্য। এই অঞ্চলে ছিল তাঁর বিশেষ প্রভাব। চূড়ামণের পর ভরতপুরের রাজা হলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বদনসিংহ। আবার তাঁর মৃত্যুর পর (১৭৫৬ খ্রিঃ) তাঁরই পোষাপুত্র সুরজমলের নেতৃত্বে জাঠগণ গৌরবের চরমসীমায় পৌঁছে যায়। তিনি ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি শুধুমাত্র নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন না, প্রশাসক ও রাজনীতিজ্ঞ হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পূর্বে গঙ্গা ও দক্ষিণে চম্বল নদী, পশ্চিমে আগ্রা এবং উত্তরে দিল্লির মোগল এলাকার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জাঠ অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাঠদের এরূপ শক্তিবৃদ্ধি মোগল শক্তির পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

শিখ শক্তির অভ্যুদয় ঃ মোগল শাসনাধীন ভারতে পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় রাজশক্তির বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়। এই শিখ সম্প্রদায় তাদের আদি গুরু নানকের (১৪৫৯-১৫৩৮ খ্রিঃ) প্রচারিত ধর্মের অনুগামী। গুরু নানক সর্বধর্মের মহত্ব ও অন্তর্নিহিত ঐক্যের কথা প্রচার করেছিলেন। রাজশক্তির সঙ্গে বিরোধিতার কথা তিনি প্রচার করেন নি। কিন্তু মোগল শাসনাধীন ভারতের এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটল যে গুরু নানকের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিখ সম্প্রদায় বাধ্য হয়ে রাজশক্তির বিরোধিতা করতে শুরু করল।

নানা প্রভাব ঃ শিখ শক্তির উত্থান প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের ভৌগলিক রাজনৈতিক সামাজিক প্রভাব ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাশাপাশি পাঞ্জাবের অবস্থান হওয়ায় এই অঞ্চল দিয়েই এসেছে তুর্কি, আফগান আর মোগল অভিযানকারীরা। অভিযানকারীদের আঘাত পড়েছিল পাঞ্জাব বসবাসকারী অধিবাসীদের উপর। পাঞ্জাবের অধিবাসীরা ছিল কঠোর পরিশ্রমী সাহসী ও দুর্ধর্ষ জাঠ সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলিম আক্রমণ ও তাদের শাসনে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বহুকাল একত্র পাশাপাশি থাকতে থাকতে এখানকার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয় খুব বেশি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে যখন ভারতের নানা স্থানে ধর্মীয় ভক্তি-আন্দোলন দেখা দেয় তখন এখানকার অধিবাসীরা গুরু নানকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

দিল্লির ধর্মান্ধ শাসক সিকন্দর লোদীর (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রিঃ) সমসাময়িক ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের গুরু নানক। হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য, হিন্দুদের জোর করে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত করা, হিন্দুদের মূর্তি পূজা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি গুরু নানকের মনে ব্যথা দিয়েছিল। কঠোর সাধনার মাধ্যমে তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে নানান অজুহাতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ চলতে পারেনা। ভেদাভেদ সমাজে দুর্গতি সৃষ্টি করে। ঈশ্বরে ভক্তিই একমাত্র মুক্তির পথ। ভারতের বহু তীর্থস্থান দেব-দেবতার মন্দির, মুসলিম তীর্থস্থান মক্কা-মদিনা পরিভ্রমণ করেই তিনি সর্বধর্মের মহত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত ঐক্যের কথা প্রচার করেন। তাঁর চারদিকে সমবেত হলো তার শিষ্যবর্গ— যাদের বলা হলো শিষ বা শিখ। শিখধর্মের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। প্রথমস্তরে ধর্মচর্চাই ছিল শিষ্যবর্গের একমাত্র আদর্শ।

তিরোধানের (১৫৩৮ খ্রিঃ) পূর্বে গুরু নানক অঙ্গদ (১৫৩৮-১৫৫২ খ্রিঃ) নামক এক শিষ্যকে গুরুপদে মনোনীত করে উত্তরাধিকার অর্পণ করে যান। তিনি গুরুমুখী ভাষায় গুরুর উপদেশগুলি সঙ্কলন করেন ও শিখদেরকে একটা সংগঠিত সংঘে রূপান্তিরিত করেন।

অঙ্গদের পরবর্তী মনোনীত গুরু ছিলেন অমরদাস (১৫৫২-৭৪ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। সম্রাট আকবর গুরু অমরদাসের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। তিনি অমরদাসের ধর্মচর্চার প্রয়োজনে অমৃতসরে একখণ্ড ভুমি দান করেন। তিনি জাঠ সম্প্রদায়ের বহু ভক্ত কৃষককে শিখধর্মে দীক্ষা দিয়ে শিখ ধর্মকে সম্প্রসারিত করেন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য বন্ধনকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে লঙ্গরখানা স্থাপন ও খিচুড়ী বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এই সময় থেকে শিখদের মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়।

অমরদাসের পর গুরুপদে মনোনীত হলেন তার জামাতা রামদাস (১৫৭৪-১৫৮১ খ্রিঃ)। সম্রাট আকবর তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। আকবর প্রদত্ত ভূখণ্ডের উপর তিনি একটি সরোবর খনন করেন। এটিই হলো অমৃতসর বা অমৃত সরোবর। এই সরোবরের তীরেই রামদাস নির্মাণ করলেন শিখদের তীর্থস্থান প্রধান শিখমন্দিরের ভিত্তি। ক্রমে এই স্বর্ণ মন্দির বিশ্বের অন্যতম দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়। গুরু রামদাসের নির্দেশেই গুরুপদ পুরুষানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়।

পুরুষানুক্রমিক রীতি অনুসারে গুরু রামদাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অর্জন (১৫৮১-১৬০৬ খ্রিঃ) গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন সাংগঠনিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁর আমলেই শিখ সম্প্রদায় সমগ্র পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি পূর্ববর্তী গুরুদের নীতিবাক্য সংগ্রহ করে শিখ ধর্মগ্রন্থ আদিগ্রন্থ বা 'গ্রন্থসাহিব' সংকলন করেন। ইতিপূর্বে শিখগুরুগণ শিষ্যদের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর নির্ভর করতেন। গুরু অর্জন শিষ্যদের নিকট থেকে ধর্মশুল্ক আদায়ের প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি শুল্ক আদায়ের জন্য 'মসন্দ' নামে এক শ্রেণীর আদায়কারী নিয়োগ করেন। ইতোপূর্বে শিখ গুরুগণ কোনও

রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না। পঞ্চম গুরু অর্জন জাহাঙ্গীর ও খসরুর উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে খসরুকে আশীর্বাদ করেন। বিদ্রোহীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের অপরাধে সম্রাট জাহাঙ্গীর অর্জনকে দুলক্ষ মুদ্রা অর্থদণ্ড প্রদানের আদেশ দিলেন। অনাদায়ে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। গুরু অর্জন অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকার করেন, কারণ তাঁর কাছে যে অর্থ ছিল তা শিখপন্থের অর্থ তাঁর ব্যক্তিগত অর্থ নয়। সুতরাং খসরুকে আশীর্বাদ করার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ গুরু অর্জনের প্রাণদণ্ড হলো। এই ঘটনা শিখ সম্প্রদায়ের মনে আঘাত করল।

পরবর্তী গুরু ছিলেন অর্জনের পুত্র গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫ খ্রিঃ)। জাহাঙ্গীরের আদেশে তাঁকে বার বছর গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখা হলো। কারণ তাঁর পিতার উপর যে অর্থদণ্ড ধার্য করা হয় তা হরগোবিন্দও পরিশোধ করতে অস্বীকার করেন। মুক্তি প্রাপ্তির পর হরগোবিন্দ শিখদের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শিখদের নিয়ে ছোট্ট একটি সেনাবাহিনীও গঠন করেন। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান যখন সম্রাট তখন হরগোবিন্দ বিদ্রোহ করেন এবং অমৃতসরের কাছে সংগ্রামের যুদ্ধে মোগল বাহিনীকে পরাজিত করেন। পরে অবশ্য তাঁকে কাশ্মীরে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। সেখানেই তিনি ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। শিখদের মধ্যে ঐক্য চেতনা ও ধর্মীয় সংহতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরু হরগোবিন্দের অবদান অসামান্য। শিখদের মাংস ভক্ষণের নির্দেশ, অস্ত্র চালনা ও দেহচর্চার নির্দেশ, সমবেত প্রার্থনার নিয়ম প্রচলন ইত্যাদি ছিল হরগোবিন্দের অবদান। ধর্মীয়ঐক্য-চেতনা বৃদ্ধি ও সামরিক নির্দেশ জারিকরার সুবিধার্থে তিনি অমৃতসরে তৈরি করলেন 'আকাল তখৎ'। ক্রমে 'আকাল তখৎ শিখশক্তির কেন্দ্রে রূপান্তরিত হলো।

মৃত্যুর পূর্বে হরগোবিন্দ তাঁর কনিষ্ঠ প্রপৌত্র হররায়কে (১৬৪৫-১৬৬১ খ্রিঃ) উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। গুরু হর রায়ের সঙ্গে শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোর হৃদ্যতা ছিল। হর রায়ের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হরকিষেণ (১৬৬১-১৬৬৪ খ্রি:) গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিনি মাত্র কয়েকবছর জীবিত ছিলেন। তবে এই সময় শিখ সম্প্রদায় একটা স্বতন্ত্র সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

হরকিষেণের তিরোধানের পর গুরুর আসন নিয়ে শিখদের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি হয়। অবশেষে হরগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র তেগবাহাদুর (১৬৬৪-৭৫ খ্রিঃ) নবম গুরু হিসেবে আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি কাশ্মীরে কিরাতপুর থেকে ছ'মাইল দূরে আনন্দপুর নামক স্থানে বসবাস করতেন। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিরোধী ধর্মনীতির বিরুদ্ধে যেমন নিজে প্রতিবাদ করেন তেমনি কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদেরও উত্তেজিত করেছিলেন। এর ফলে আওরঙ্গজেবের আদেশে তেগবাহাদুর বন্দী অবস্থায় সম্রাটের সম্মুখে আনীত হন। আওরঙ্গজেব গুরু তেগবাহাদুরকে মৃত্যু ভয় দেখিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন। তেগবাহাদুর ধর্মত্যাগ না করে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেন (শির দিয়া

সর ন দিয়া)। তেগবাহাদুরের আত্মত্যাগ শিখ সম্প্রদায়কে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল। ফলে শিখ-মোগল সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

তেগবাহাদুরের পর তাঁর পুত্র গুরুগোবিন্দ (১৬৭৫-১৭০৮ খ্রিঃ) দশম গুরুর স্থান অধিকার করলেন। গুরুগোবিন্দ মোগলদের বিরুদ্ধে শিখ সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করে ভবিষ্যৎ সামরিক শক্তির ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। তিনি তরবারির দ্বারা আলোড়িত বারি সিঞ্চন করে শিখদেরকে ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। সংঘবদ্ধ শিখরা 'খালসা' (পবিত্র) নামে পরিচিতি লাভ করলেন। প্রত্যেক শিখকে 'সিংহ' সামরিক উপাধি ধারনের নির্দেশ দেওয়া হলো। শিখদের মধ্যে সামরিক ঐক্য-চেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের উদ্দেশ্যে গুরুগোবিন্দ শিখ সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে পঞ্চ 'ক' ধারণের নির্দেশ দিলেন। পঞ্চ 'ক' হলো— কেশ, কংঘা (চিরুণী), কৃপাণ, কাচ্চা (খাটো পাজামা বা চোস্ত) এবং কড়া (লোহার বালা)। যুদ্ধে শিখরা কখনও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না এবং দুস্থ আতুরের সেবায় সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এছানা শিখদের ক্ষেত্রে ধূমপান নিষিদ্ধ হলো। গুরুগোবিন্দ আরও ব্যবস্থা করলেন যে, এর পর শিখদের আর কোনও গুরু থাকবেন না— গুরুর স্থান অধিকার করবে 'আদিগ্রন্থ'। তাঁর অবর্তমানে কোনও সমস্যা সমাধানের জন্যের পাঁচজন নির্বাচিত সদস্যের মতামত গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের সিদ্ধান্তই হবে গুরুর নির্দেশ। গুরু গোবিন্দ সত্যই শিখ ভ্রাতৃসংঘের মনে সামরিক প্রেরণা সঞ্চার করে শিখজাতিকে একটা স্বতন্ত্র সামরিক জাতিতে উত্তীর্ণ করে দেন।

সমকালীন মোগল রাজশক্তির দৃষ্টি এড়ানোর উদ্দেশ্যে গুরুগোবিন্দ পাঞ্জাব ও জম্মুর পার্বত্য অঞ্চল আনন্দপুরে পৃথক সামরিক শিবির সংস্থাপন করেন। সেখানেই উপজাতিদের মধ্যে শিখধর্ম প্রচারে উদ্যোগ গ্রহণ করলে উপজাতীয় শাসকরা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে শিখ-মোগল সংঘর্ষ শুরু হলো। আনন্দপুরের যুদ্ধে (১৭০৩ খিঃ) গুরুগোবিন্দ পরাজিত হলেন। তাঁর একাধিক পুত্র এই যুদ্ধে নিহত হন। তবুও গুরুগোবিন্দ হতাশ হননি। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খিঃ:) পর তাঁর পুত্রদের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে গোবিন্দ নিজেই মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের সিংহাসন প্রাপ্তির সাহায্যার্থে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। সেখানে গোদাবরী নদীর তীরে নান্দেদ নামক স্থানে একজন গোঁড়া আফগান আততায়ী কর্তৃক নিহত হন (১৭০৮ খ্রিঃ। তাঁর অবর্তমানেও শিখ জাতির অগ্রগতি স্তব্ধ হয়নি।

গুরু গোবিন্দের পর শিখধর্মে উত্তরাধিকার সূত্রে 'গুরু' পদের অবসান ঘটে এবং গুরুর স্থান অধিকৃত হয় ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব'-এর অস্তিত্বের দ্বারা। তবে শিখদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে নিযুক্ত হলেন গুরু গোবিন্দের বিশ্বস্ত শিষ্য বান্দা— যিনি বান্দা বাহাদুর নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ন'বছর যাবৎ (১৭০৮-১৭১৬ খ্রিঃ) শিখদের নেতৃত্ব দিলেন। বান্দা গুরু গোবিন্দের পুত্রদের হত্যাকারী সরহিন্দের ফৌজদার ওয়াজীর খাঁকে হত্যা করেন। শতদ্রু থেকে যমুনাপর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি

বিস্তৃত হলো। তিনি মুকলিশপুরে গড়ে তুললেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। নিজের নামে তিনি মুদ্রাও তৈরি করে চালু করলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রবল মোগলশক্তির সম্মুখীন হতে হলো। শিখরা অনেকেই মোগল হস্তে বন্দী হলেন। বান্দার পুত্রকে তাঁর চোখের সামনে হত্যা করা হয়। সবশেষে বান্দাকে হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট করে হত্যা করা হয় (১৭১৬ খ্রিঃ)।

শিখনেতা বান্দার হত্যার পর শিখজাতি কেন্দ্রীয় শক্তি হারিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে নাদির শাহের ভারত আক্রমণে যখন মোগল শক্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়ল তখন শিখরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে ওঠে। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রিঃ) জয়লাভের পর আহমদ শাহ্ দুররানী যখন ভারত পরিত্যাগ করেন (১৭৬২ খ্রিঃ) তখন শিখগণ লাহোর পুনরুদ্ধার করে ঝিলাম থেকে শতদ্রু নদী পর্যন্ত ভূখণ্ড অধিকার করতে সমর্থ হন। এর পর ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে শিখগণ আহমদ শাহের দুর্বল পুত্র তৈমুর শাহের নিকট থেকে তাঁর ভারতীয় অংশ অধিকার করেন। এই সময় স্বাধীন শিখনেতাগণ কয়েকটি 'মিস্‌ল' বা দলে বিভক্ত ছিল। তারা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন হলেও শিখরাজ্য এই সময় গ্রন্থসাহেবের বিধান অনুসারে 'ধর্মীয় রাজ্য সমবায়' (Confederation of Theocratic Feudalism) রূপে শাসিত হত। বস্তুত, গুরু গোবিন্দ সিং-এর মৃত্যু (১৭০৮) থেকে ১৭৬৮ পর্যন্ত শিখশক্তির অভ্যুদয়ের প্রস্তুতি-কাল বলা যায়। তখনও পাঞ্জাব ছিল মোগল সুবা বা প্রদেশ এবং ১৭৬৮ খ্রিঃ তাঁরা স্বাধীন হয়। অবশেষে পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিংহ ধর্মীয় রাজ্য সমবায়কে ভেঙে একটি একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন ও ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষায় তৎপর হন।

মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুদয় ঃ শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ ঃ শিবাজীর মৃত্যুর পর (১৬৮০ খ্রিঃ) তার জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী মারাঠা সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি পিতার ন্যায় সাহসী ও সমরকুশলী হয়েও শম্ভুজী অন্যান্য প্রতিভা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ কবিকুলেশ ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। তাঁর রাজত্বকালে আভ্যন্তরীণ সমস্যার অন্ত ছিল না। প্রথমত, লক্ষ্য করা যায় পর্তুগিজদের সঙ্গে বার বার নৌযুদ্ধে মারাঠা শক্তির অপচয় হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, শম্ভুজী সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দান করে সম্রাটের বিরাগভাজন হন। সম্রাট আওরঙ্গজেবও মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করে বহু মারাঠা সৈন্যধ্যক্ষসহ শম্ভুজীকে বন্দী করলেন। কিছুকাল নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর মোগল অনুচররা শম্ভুজীকে হত্যা করল (১৬৮৯ খ্রিঃ)। শম্ভুজীর সাত বছর,বয়স্ক শিশুপুত্র শাহু (পরবর্তী কালে দ্বিতীয় শিবাজী) তাঁর মায়ের সঙ্গে মোগল হস্তে বন্দী হন ও মোগল দুর্গে লালিত পালিত হতে থাকেন।

অবস্থার প্রেক্ষাপটে মারাঠা রাজ্য রাজাহীন হয়ে পড়ল। কিন্তু মোগল-মারাঠা সংঘর্ষ স্তব্ধ হলো না। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে শিবাজীর আদর্শ ছিল মারাঠাদের

একমাত্র সম্বল। সেই আদর্শ অবলম্বন করেই পরশুরাম ত্রিম্বক, রামচন্দ্র পন্থ, শঙ্করজী মলহর প্রমুখ মারাঠাবীর মোগল শক্তির ওপর তীব্র আঘাত হানতে শুরু করলেন। বাস্তবত এ যুদ্ধ ছিল জাতীয় জনযুদ্ধ—মারাঠা রাজ্যের যে কোনও অধিবাসী মোগল-বিরোধী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করল। ইতিমধ্যে শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম কর্ণাটকের অন্তর্গত জিঞ্জি দুর্গে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর পক্ষে সান্তাজী ঘোড়পাড়ে, ধনাজী যাদব প্রমুখ মারাঠা নেতারা সর্বদা মোগল ফৌজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব ক্রমাগত আট বছর যাবৎ (১৬৯০-১৬৯৮ খ্রিঃ) যুদ্ধ করে জিঞ্জি দুর্গ অধিকার করলেন। কিন্তু মোগল সম্রাট মোটেই লাভ করতে পারেননি; কারণ জিঞ্জি দুর্গ ত্যাগ করার সময় রাজারাম 'পোড়ামাটি' নীতি অনুসরণ করেছিলেন। জিঞ্জি ত্যাগ করে রাজারাম সাতারাতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি মোগলবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করতে লাগলেন। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে রাজারাম পরলোক গমন করেন।

রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর বীরপত্নী তারাবাঈ তাঁর শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করে (১৭০০ খ্রিঃ) নিজেই মোগল-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করলেন। স্বামী (রাজারাম) জীবিত থাকতেই তিনি সামরিক জ্ঞান যেমন তিনি অর্জন করেন, তেমনি শাসন কার্যেও দক্ষতা লাভ করেন। কাফি খাঁনের মতে তারাবাঈ ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী ও কর্মপটিয়সী। তাঁরই প্রেরণায় মারাঠা বাহিনী মালব, গুজরাট, বরোদা ইত্যাদি স্থান লুণ্ঠন করে। বিখ্যাত প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটক মানুচি বলেন, "মারাঠা সৈন্যের সাহস ও শৌর্যের সামনে মোগল সৈন্য ও সেনাপতি ছিল ভীত, কম্পিত ও ত্রস্ত। দাক্ষিণাত্যে মোগল সৈন্য ছিল বিজিত এবং মারাঠা সৈন্য ছিল বিজেতা।" তাই নিদারুণ ব্যর্থতার মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মারাঠাভীতি তাঁকে বিশেষভাবে শঙ্কিত করেছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী ছিলেন শিবাজীর পৌত্র শাহু। আওরঙ্গজেব অবশ্য শাহু ও তাঁর মাতার সম্মান, মর্যাদা ও ধর্মরক্ষার প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। মোগল সম্রাটের একটা আশা ছিল যে শাহু এবং তার মায়ের মন জয় করতে পারলে মোগল মারাঠার মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে (১৭০৭) সম্রাট আওরঙ্গজেব সেই সৌহার্দ্যর পরিবেশ দেখে যেতে পারেন নি। তবে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রিঃ) দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্তা জুলফিকার খান শাহুকে মুক্তি দান করেন। এই মুক্তির দ্বারা মোগলরা মারাঠাদের মধ্যে আত্মকলহ ও গৃহবিবাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত শাহু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে মারাঠা সিংহাসন দাবি করলেন। কিন্তু ছত্রপতির আসনে বসেছিলেন তৃতীয় শিবাজী অর্থাৎ শিবাজীর কনিষ্ঠপুত্র রাজারামের বিধবা তারাবাঈ-এর শিশুপুত্র। এই শিশুপুত্রকে মারাঠা সিংহাসনে বসিয়ে বীরাঙ্গনা তারাবাঈ মোগল-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করে সিংহাসনে অধিকার বজায় রেখেছেন।

সুতরাং তিনি (তারাবাঈ) মোগল দরবার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত শাহুকে (শম্ভুজীর পুত্র) অস্বীকার করলেন ও শাহুর বিরুদ্ধে সেনা বাহিনী প্রেরণ করলেন। ফলে মারাঠাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হলো। 'খেদ' নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হলো (১৭০৭ খ্রিঃ)। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তারাবাঈ পরাজিত হন ও তার শিশুপুত্রকে নিয়ে কোলাপুরে ঘাঁটি স্থাপন করেন। অন্যদিকে শাহুর ঘাঁটি ছিল সাতারা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রেই তার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (১৭০৮ খ্রিঃ)। কোলাপুর কেন্দ্রের সঙ্গে সাতারা কেন্দ্রের দ্বন্দ্ব এই সময় চরম আকার ধারণ করে। এই সময় মারাঠা নায়কদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। তাঁরা নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে কেউ কোলাপুর কেন্দ্র অর্থাৎ তারাবাঈ-এর পক্ষে অথবা সাতারা কেন্দ্র অর্থাৎ শাহুর পক্ষে যোগদান করলেন। অনেকে আবার মোগলদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। এই অবস্থার মধ্যে শাহুর প্রধান সহায়ক বালাজী বিশ্বনাথ নামক এক কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তারাবাঈ-এর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তার চেষ্টায় অধিকাংশ মারাঠা নায়ক শাহুর পক্ষে যোগদান করেন। ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে শাহু তাকে পেশোয়া বা প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। এই বছরেই ওয়ার্ণার সন্ধির মাধ্যমে শাহু ও তারাবাঈ-এর শিশুপুত্রের রাজ্য সীমা নির্দিষ্ট হয় এবং মারাঠাদের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। কোলাপুরের দক্ষিণাংশে রাজারাম তথা তারাবাঈ-এর প্রভাব আরও কিছুকাল ছিল, তবে ক্রমশঃ তা নিষ্প্রভ হয়ে আসে।

পেশোয়াতন্ত্র ঃ সাতারা কেন্দ্রের শাহু এবং কোলাপুর কেন্দ্রের তারাবাঈ-এর বিবাদের ফলে রাজা শাহুর প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বালাজী বিশ্বনাথের নেতৃত্বে একটা নতুন ধরণের মারাঠা শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। মারাঠার ইতিহাসে এই শাসন ব্যবস্থা পেশোয়াদের নেতৃত্বে নতুন করে মারাঠা সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের ইতিহাস। কারণ রাজা শাহু তার পিতামহ শিবাজীর কোনও গুণই লাভ করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন বিলাসী ও আরামপ্রিয় — শুধুমাত্র 'রাজা' উপাধির পেয়েই খুশি ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তিনি পেশোয়ার উপর অর্পণ করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

মারাঠী ভাষায় পেশোয়া শব্দের অর্থ মুখপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী। শাহুর পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী হিসেবে তিনি জীবন শুরু করেন। ক্রমশ তিনি প্রতিভাবলে সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মেও দক্ষতা অর্জন করেন। অকর্মণ্য শাহুর পেশোয়া হিসেবে তিনি শাহুকে যেমন শত্রুমুক্ত করেন তেমনি পেশোয়া পদটিকে তিনি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মারাঠা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ছত্রপতি বা রাজা হলেন সর্বোচ্চ, তাঁর পরেই রাজ-প্রতিনিধির স্থান। কিন্তু শাহু নিজের অকর্মণ্যতার দোষে পেশোয়াকেই রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ দিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ ও তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও নিজেদের কর্মনৈপুণ্য প্রতিভা ও বিচক্ষণতার জোরে রাজ-মর্যাদা-লাভের সুযোগ সৃষ্টি

করলেন। শিবাজীর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে আর কোনও শক্তিশালী পরম্পরা ছিলেন না যিনি পেশোয়াদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে পারেন। ফলে নতুন মারাঠা সাম্রাজ্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পেশোয়াদের প্রাধান্যই নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল — যাকে ইতিহাসে বলা হয় পেশোয়াতন্ত্র। পেশোয়াতন্ত্রে পেশোয়ারা হলেন মারাঠা-রাজ ক্ষমতার অধিকারী।

বালাজী বিশ্বনাথ ঃ শিবাজীর পৌত্র শাহুর প্রধানমন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের বাস্তবমুখী প্রতিভা মারাঠা জাতি ও রাজ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করল। তার আমলেই মারাঠা রাষ্ট্রে প্রথম পেশোয়াতন্ত্রের সৃষ্টি ও প্রয়োগ শুরু হলো। বালাজী বিশ্বনাথ সমকালীন মোগলদের গৃহবিবাদ ও অবক্ষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এই সময় দিল্লিতে মোগল সম্রাট ছিলেন ফারুখশিয়ার (১৭১৩-১৯ খ্রিঃ) এবং তাঁর দরবারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় (সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ এবং সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ) ছিলেন সর্বাধিক প্রভাবশালী। বালাজী বিশ্বনাথ মোগল সেনাপতি সৈয়দ হোসেন আলির মাধ্যমে সম্রাট ফারুখশিয়ারের সঙ্গে এক সন্ধির মাধ্যমে সৌহার্দ্য স্থাপন করেন (১৭১৪ খ্রিঃ)। সন্ধির শর্ত অনুসারে—(ক) মোগল সম্রাট শিবাজীর রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করলেন। (খ) তাছাড়া তিনি বেবার, বিদর, খান্দেশ, হায়দ্রাবাদ ও বিজাপুর অঞ্চল থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অনুমতি দান করেন। (গ) এসবের বিনিময়ে শাহুর পক্ষে বালাজী বিশ্বনাথ মোগল সম্রাট ফারুখশিয়ারকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা নজরানা দিতে এবং ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সম্রাটকে সাহায্য করতে সম্মত হন।

এই চুক্তির দ্বারা শিবাজীর স্বরাজ্যের আদর্শ খানিকটা ম্লান হলেও চুক্তির তাৎক্ষণিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। প্রথামত, দিল্লি ছিল মারাঠা রাজ্য থেকে অনেক দূরে। দিল্লির নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখাই শ্রেয় বলে মারাঠা নায়করা মনে করতেন। দ্বিতীয়ত, মোগলদের বিরোধিতা করে শক্তি ক্ষয় করার চেয়ে লেনদেনের মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখাই ছিল জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক কর্ম। তাই চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করা এবং কিছু নজরানা দেওয়ার মাধ্যমে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এই চুক্তিতে অক্ষুণ্ণ ছিল। তৃতীয়ত, এই চুক্তি একদিকে যেমন মারাঠা শক্তিকে স্বীকৃতি দিল, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রশাসন নিরাপত্তা বিধান, রাজস্ব সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মারাঠারা হলো মোগলশক্তির সহযোগী। চতুর্থত, এই চুক্তির দ্বারা পেশোয়াতন্ত্রের মাধ্যমে মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান সম্ভব হলো। পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের হাতে এলো অপর্যাপ্ত শক্তি ও শক্তি প্রয়োগের উপায়। সন্ধি-শর্ত অনুসারে ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে একটি মারাঠা সেনাবাহিনী নিয়ে বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ হোসেন আলি খানের সঙ্গে দিল্লি যান এবং সেখানে সম্রাট ফারুখশিয়ারকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে সাহায্য করেন। দিল্লিতে প্রবেশের ফলে বালাজী বিশ্বনাথ ও অন্যান্য মারাঠা নায়কগণ পতনোন্মুখ মোগল

সাম্রাজ্যের দুর্বলতা বা ছিদ্রগুলি নিজেরাই চোখে দেখে গেলেন। এই সময় তাঁদের মনে মারাঠা সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির উচ্চাশা জেগে উঠেছিল।

পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বালাজী বিশ্বনাথ চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশায় এক একটি মারাঠা নায়কের জন্যে এক একটি এলাকা নির্দিষ্ট করে দেন। নায়ক বা সর্দ্দারগণ আদায় করা অর্থের একটা মোটা অংশ নিজেরাই ভোগ করতে পারতেন। কৃপা বিতরণের ক্ষমতা যেহেতু পেশোয়ারের হাতে আছে তাই মারাঠা নায়করা পেশোয়ার নিকট ভীড় জমাতেন। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের প্রলোভন পেশোয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটালো। তবে এই অবস্থার পরিণাম মোটেই ভাল ছিল না। ইজারাদারি প্রথা যেমন মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার একটা বিশেষ অর্থনৈতিক ও ঐক্যবিরোধী কারণ হয়ে উঠেছিল। ঠিক তেমনি চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করে মারাঠা নায়করা স্বনির্ভর ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। সেই সঙ্গে 'ওয়াতন' ও 'সরঞ্জাম' (জায়গির) প্রথা মারাঠা নায়কদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করল। এই নায়কগণ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করতেন। এই অবস্থা মারাঠাদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করে দিয়েছিল। মারাঠা রাজ্যের বাইরে তারা নতুন নতুন ভূখণ্ড অধিকার করে শক্তি বিস্তার করতেন। মারাঠা নায়কগণ যেমন নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে নিমগ্ন থাকতেন তেমনি আবার মোগল অথবা ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন। পরিণতিতে এই অবস্থা মোগল শক্তির ন্যায় মারাঠা শক্তিরও পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক পেশোয়াতন্ত্র চালু করে বালাজী বিশ্বনাথ ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

বালাজী বিশ্বনাথ যেমন ছিলেন পেশোয়াতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা তেমনি আবার তাঁকে মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও গণ্য করা যায়। কোঙ্কন অঞ্চলের চিৎপাবন বংশীয় গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও যেভাবে তিনি রাষ্ট্রশীর্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তা নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভাবান ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে সম্ভব। তারাবাঈকে সরিয়ে তিনি মোগল দরবার থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত শাহুকে ছত্রপতি পদে বসিয়েছিলেন মারাঠাদের জাতীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দের মোগল মারাঠা সন্ধির মাধ্যমে মোগলবিরোধী সংঘর্ষ থেকে মারাঠাদের মুক্ত করেন ও জাতীয় সংহতি বিধানে সাহায্য করেন। পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ে ও মারাঠা নায়কদের ক্ষমতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বালাজী বিশ্বনাথের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁরা মাত্র সাত বছরের শাসনকাল (১৭১৩-১৭২০ খ্রিঃ) নানা সমস্যায় পরিপূর্ণ হলেও মারাঠা সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই রাজা শাহুকে মুগ্ধ করেছিল। তাই শাহু তাঁর যুবক পুত্র বাজীরাওকে পেশোয়া পদে নিয়োগ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রথম বাজীরাও ঃ বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন (১৭২০ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন সাহসী, বীর, সমরকুশলী ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। পতনোন্মুখ মোগল শক্তির যাবতীয় দুর্বলতার কথা তিনি জানতেন। তাই

পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই তিনি রাজা শাহুকে পরামর্শ দিলেন "গাছ (মোগলশক্তি) যখন শুকিয়ে আসছে তখন গুঁড়িতে ঘা দিলেই সব ডালপালা আপনা থেকে ভেঙে পড়বে। এইভাবে কৃষ্ণা থেকে সিন্ধু পর্যন্ত মারাঠা পতাকা উড্ডীন করা যেতে পারে।" মোগলদের পরে ভারতে এক অখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্য বা "হিন্দু পাদ পাদশাহী" প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল তাঁর মনে। হিন্দুদের সহানুভূতি নিজের পক্ষে পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম বাজীরাও "হিন্দুপাদ পাদশাহ"-এর কথা ঘোষণা করলেন। মারাঠা নায়কদের অনেকেই প্রথম বাজীরাও-এর পরিকল্পনার বিরোধীতা করেন। তারা মনে করতেন উত্তর ভারতের পূর্বেই দক্ষিণ ভারতে মারাঠা শক্তির ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রথম বাজীরাও নিজের পরিকল্পনার অনুকূলে রাজা শাহুর অনুমতি লাভে কৃতকার্য হন।

উত্তর ভারত অভিযানের পূর্বে প্রথম বাজীরাও প্রথমে গৃহশত্রুদের পরাজিত করে হায়দ্রাবাদের নিজাম-উল্-মুলকের সঙ্গে চুক্তি করেন (১৭৩১ খ্রিঃ)। সেই চুক্তির মর্মার্থ ছিল প্রথম বাজীরাও উত্তরাপথে গিয়ে নিজের শক্তি বিস্তার করবেন, আর নিজাম-উল্-মুলক দাক্ষিণাত্যে তার অধিকার নিয়ে খুশি থাকবেন। উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি জয়পুর রাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলরাজ ছত্রশালের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করেন। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাজীরাও-এর মারাঠা বাহিনী যখন দিল্লির উপকণ্ঠে হাজির হলো তখন মোগলসম্রাট হায়দ্রাবাদ নিজামের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। নিজাম-উল্-মুলক ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দের চুক্তির শর্ত অগ্রাহ্য করে বাজীরাও-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। মারাঠা বাহিনীকে দুটি প্রান্তে সংগ্রাম করতে হলো। একদিকে মারাঠা সৈন্য গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল অধিকার করল, অন্যদিকে নিজাম-উল্-মুলককে পরাজিত করে নর্মদা থেকে চম্বল এবং মালবের উপর মারাঠা প্রাধান্য স্থাপন করল।

মধ্যভারত থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে মারাঠাদের প্রভাব বিস্তৃত হলেও দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমে কোঙ্কন অঞ্চল ছিল সির্দি, পর্তুগিজ অন্যান্য বিদেশীদের অধিকারে। ১৭৩৩ থেকে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যুদ্ধ ও কূটনীতির সাহায্যে প্রথম বাজীরাও ঐসব অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। পেশোয়ার ভ্রাতা চিমনজী আপ্পা পর্তুগিজদের পরাজিত করে সালসেট ও বেসিন অধিকার করেন। তবে পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজদের অন্যান্য অধিকার বজায় ছিল। এই সময় পারস্যের নাদির শাহের ভারত আক্রমণ আসন্ন হওয়ায় প্রথম বাজীরাও মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে সৌহার্দ্য স্থাপন করে বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু এই কর্মসূচি রূপায়নের পূর্বেই ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যু হয়।

ছত্রপতি শিবাজীর তৈরি মারাঠা সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও উত্তর ভারতে মারাঠা প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রথম বাজীরাও-এর কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিক

সরদেশাই তাঁকে "বৃহত্তর মহারাষ্ট্রের সৃষ্টিকর্তা" হিসেবে গণ্য করেছেন। প্রথম মারাঠা সাম্রাজ্যের স্রষ্টা যদি শিবাজী হন তো প্রথম বাজীরাওকে "দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা" হিসেবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত। সামরিক ও কূটনৈতিক কৃতিত্বের ক্ষেত্রে শিবাজীর পরেই প্রথম বাজীরাও-এর স্থান নির্দিষ্ট করা যায়। শিবাজীর তিরোধানের পর মারাঠা রাষ্ট্রে যে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ও প্রথম বাজীরাও সেসবের অবসান ঘটিয়ে একদিকে যেমন নরপতি হিসেবে শাহুর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, অন্যদিকে তেমনি পেশোয়াতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন।

এসব গুরুত্বপূর্ণ কর্মসম্পাদনার ক্ষেত্রে ধার্য নীতির মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। প্রথমত, লক্ষ্য করা যায়, প্রথম বাজীরাও উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সর্বাধিক সচেষ্ট ছিলেন। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে মারাঠাশক্তিকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা তিনি করেন নি। এক্ষেত্রে শিবাজীর পথ থেকে প্রথম বাজীরাও-এর পথভ্রষ্ট ঘটেছিল। দক্ষিণ ভারত থেকে অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত থাকার ফলে হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মহীশূরের হায়দর আলি শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্রথম বাজীরাও-এর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মারাঠা সামন্তরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে বেপরওয়া হয়ে উঠলেন। এর ফলে মারাঠা পঞ্চ-শক্তির উদ্ভব ঘটে, যথা ইন্দোরে হোলকার, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, নাগপুরে ভোঁসলে, বরোদার গাইকোয়াড় এবং মালবের অন্তর্গত ধার নামক স্থানে পাওয়ার (পাবার) বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। তৃতীয়ত, চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের প্রতিযোগিতায় বর্গীদের অত্যাচার উড়িষ্যা ও বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টি করল। সুতরাং প্রথম বাজীরাও মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন কিন্তু সংগঠক ও প্রশাসক হিসেবে শিবাজীর সমকক্ষ তিনি হতে পারেন নি। তিনি মারাঠাদের কেন্দ্রীয় শক্তিবৃদ্ধি করে জাতীয় সংহতি বিধান, দেশবাসীর মঙ্গল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে পারেননি।

বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-১৭৬১) : প্রথম বাজীরাও মাত্র ৪২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ১৮ বছর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় বালাজী রাও পেশোয়ার গদি অধিকার করেন (১৭৪০ খ্রিঃ)। তিনি সাধারণভাবে বালাজি বাজীরাও নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেকখানি আরামপ্রিয় ব্যক্তি। সামরিক ক্ষেত্রে পিতার মত দক্ষ হয়েও তিনি কর্মোদ্যোগী ছিলেন না। পেশোয়ার গদি অধিকারের সময় রাজা শাহু জীবিত ছিলেন। রাজা শাহু মৃত্যুর পূর্বে (১৭৪৯ খ্রিঃ) রাজ্যশাসনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পেশোয়ার হাতেই ন্যস্ত করেন। পেশোয়া পদটি আগে থেকেই বংশানুক্রমিক হয়ে উঠেছিল। বাস্তবত পেশোয়াই হয়ে উঠলেন মারাঠা সাম্রাজ্যের আসল শাসনকর্তা। তিনি সাম্রাজ্যের রাজধানী সাতারা থেকে পুনেতে (পুনা) স্থানান্তরিত করলেন। রাজা শাহুর মৃত্যুর পূর্বেই তিনি

এই পুনে থেকে শাসন পরিচালনা করতেন। রাজধানী পরিবর্তন করে আসলে শাসকের অধিকার যেন প্রতিষ্ঠিত করলেন।

প্রকৃত ক্ষমতা হাতে পেয়েই বালাজী বাজীরাও মারাঠা সাম্রাজ্যবাদকে আরও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু তিনি তাঁর পিতার আদর্শ থেকে দুটি ক্ষেত্রে বিচ্যুত হলেন। প্রথমত শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে শিবাজী পদাতিক বাহিনীকে গ্রহণ করেছিলেন এবং মারাঠারাই ছিল এই বাহিনীর সৈনিক। প্রথম বাজীরাও পর্যন্ত সবাই সামরিক বাহিনীকে মারাঠা বাহিনী হিসেবে জাতীয় মর্যাদা দিতে সক্ষম হন। কিন্তু বালাজী বাজীরাও জাতীয় বাহিনী গঠনের আদর্শ ত্যাগ করে মুসলিম ও বিদেশীদেরকেও সেনা ও সেনাপতি হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে মারাঠা বাহিনীর জাতীয়তাবোধ ও সংহতি বিনষ্ট হলো। এমন কি যুদ্ধরীতির মধ্যেও পাশ্চাত্য ধারা গৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বালাজী বাজীরাও ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর পিতা কর্তৃক গৃহীত হিন্দুপাদ পাদশাহী-এর আদর্শ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পিতার আমলে হিন্দু প্রধানরা ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক পতাকাতলে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু বালাজী বাজীরাও হিন্দু-মুসলমান সকল রাষ্ট্র লুণ্ঠন করে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করলেন। ফলে রাজপুত এবং অন্যান্য হিন্দু প্রধান রাষ্ট্রের নায়করা সমভাবে অত্যাচারিত হলেন এবং মারাঠারা এদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হলেন। ফলে হিন্দুপাদ পাদশাহীর আদর্শ ধুলায় লুণ্ঠিত হলো।

উপরোক্ত বিচ্যুতি সত্ত্বেও বালাজী বাজীরাও মারাঠা শক্তির বিস্তার নীতি থেকে পিছিয়ে আসেন নি। বরং উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলেই মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বিশাল এক মারাঠা বাহিনী শ্রীরঙ্গপট্টমের দ্বারদেশে পৌঁছে গেল এবং জোরপূর্বক কৃষ্ণানদীর দাক্ষিণাত্যের ছোট্ট ছোট্ট রাজ্যগুলিকে কর প্রদানে বাধ্য করল। আর্কটের নবাব প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা চৌথ হিসেবে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাছাড়া মারাঠারা বেদনোর এবং মহীশূরের হিন্দু রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায় ও অংরিয়াদের বিরুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সাহায্য করে। এই অভিযান পরিচালনার সময় হায়দ্রাবাদের নিজাম, মহীশূরের সেনাপতি হায়দার আলি কিছু কিছু বাধা দিয়েছিলেন। তবুও ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে সদাশিব রাও উদগীরের যুদ্ধে হায়দ্রাবাদের নিজামকে পরাস্ত করলেন। ফরাসি সেনাপতি বুসীর নিকট পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত ইব্রাহিম খান গর্দি নামক এক সেনাধ্যক্ষ মারাঠাদের দলে যোগদান করেন। এই অবস্থায় নিজাম মারাঠাদের সঙ্গে এক সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অনুসারে সমগ্র বিজাপুর, ঔরঙ্গবাদের বৃহত্তম অংশ এবং বিদরের খানিকটা অংশসহ কয়েকটি দুর্গ মারাঠাদের অধিকারে এলো। এইভাবে দক্ষিণ ভারতের এলো বিস্তৃত ভূখণ্ড মারঠাদের অধিকার এলো এবং মোগল অধিকার এক সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ল।

দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তির বিস্তার ছিল আরও বেশি চমকপ্রদ। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের শেষাংশে মালহর রাও হোলকার এবং রঘুনাথ রাও নেতৃত্বে একদল রাজপুতনার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলো এবং একাংশ গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে জাঠদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দিল্লির উপকণ্ঠে হাজির হলো। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা বাহিনী দিল্লিতে প্রবেশ করে ও মোগল সম্রাটকে তাদের মনোনীত ইমাদ-উল-মুলককে উজির পদে নিয়োগ করতে বাধ্য করে। এই উজির ছিলেন মারাঠাদের হাতের পুতুল তিনি মারাঠা নায়কদের নিকট গোপন সংবাদ সরবরাহ করতেন। এর পর রঘুনাথ রাও ও মালহর রাও আহমদ শাহ আবদালির পুত্র তাইমুর শাহ-এর নিকট থেকে পাঞ্জাব অধিকারের জন্যে অগ্রসর হলেন। তাঁরা ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সরহিন্দ এবং এপ্রিল মাসে লাহোর অধিকার করলেন। পাঞ্জাবে আদিনা বেগ খান মারাঠা শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন এবং আদিন বেগ বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা মারাঠা রাজভাণ্ডারে দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই ঘটনায় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের আর্কট পর্যন্ত হিন্দু-প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু ঘটনার বাস্তব চিত্র তা নয়। এই প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন যে এই সাফল্য নিয়ে বেশি গর্ব করা চলে না, রাজনৈতিক বিচারে এটা ছিল ফাঁকা আওয়াজ আর অর্থের দিক থেকে ছিল নিষ্ফল। পাঞ্জাব থেকে একটি কানাকড়িও পুনে পৌঁছায়নি। ফলশ্রুতি ছিল ঋণের বোঝা, আর আহমদ শা আবদালির সঙ্গে অপরিহার্য সংগ্রাম।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও তার ফলাফল ঃ মারাঠারা যখন পাঞ্জাব জয় করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয় তখন আহমদ শাহ আবদালির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। আহমদ শাহ আবদালি ছিলেন পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের বিশ্বস্ত অনুচর। নাদির শাহের মৃত্যুর পর তিনি আফগানিস্থানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৪৮-৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার ভারতে অভিযান প্রেরণ করে ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সমর্থ হন। বালাজী বাজীরাও-এর ভ্রাতা রঘুনাথ রাও যখন আহমদ শাহ আবদালির প্রতিনিধি তৈমুর শাহকে বিতাড়িত করে পাঞ্জাব অধিকার করলেন তখন আহমদ শাহ আবদালি ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় ভারত অভিযানে অগ্রসর হন। অন্যদিকে বালাজী বাজীরাও এক বিশাল বাহিনী গঠন করে সদাশিব রাও-এর নেতৃত্বে আহমদ শাহ আবদালির বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। এই দলে ছিলেন পেশোয়ার সতের বছর বয়স্ক পুত্র বিশ্বাস রাও। সদাশিব রাও প্রথমে দিল্লি অধিকার করে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন।

বিদেশীর সঙ্গে যুদ্ধে দেশীয় কোনও নরপতি মারাঠাদের সাহায্য করলেন না। মারাঠাদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তির জন্যে তারা রাজপুত জাতির সহানুভূতি হারাল, তারা নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করল। দিল্লি অধিকার করায় মোগল সম্রাটও হতাশায়

দূরে অবস্থান করলেন। অন্যদিকে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও রোহিলাখণ্ডের নবাব নজির খাঁ প্রমুখ অনেকেই আহমদ শাহ্ আবদালির পক্ষ অবলম্বন করলেন। তাঁরা মনে করতেন যে সমকালীন মারাঠারা ভারতীয় মুসলিমদের প্রধান শত্রু। বালাজী বাজীরাও-এর অদূরদর্শী নীতির ফলে শিখরাও উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে তারাও নিরপেক্ষ রয়ে গেল। একমাত্র জাঠনেতা সুরজ আবদালির পক্ষে যেতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ আলোচনার পূর্বে মারাঠা বাহিনী দিল্লি অধিকার করল। আহমদ শাহ্ আবদালিও দিল্লির দিকে অগ্রসর হলেন। এককভাবে সদাশিব রাও মারাঠা বাহিনী নিয়ে বিখ্যাত পানিপথের প্রাঙ্গণে আহমদ শাহ আবদালির সম্মুখীন হলেন। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী উভয় পক্ষের তুমুল লড়াই হলো। এই সংগ্রাম পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে ইতিহাসে আখ্যাত। এই যুদ্ধে মারাঠারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং তাদের পক্ষে বহু সেনাপতি ও অসংখ্য সৈন্য হতাহত হলো। সদাশিব রাও ও বিশ্বাস রাও যুদ্ধে নিহত হলেন। ইতোপূর্বেই বালাজী বাজীরাও অসুস্থ ছিলেন। যুদ্ধে পরাজয় ক্ষয়ক্ষতি এবং পুত্রসহ সেনাপতিদের মৃত্যু সংবাদে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন পুনাতে ভগ্ন হৃদয়ে মৃত্যু বরণ করলেন।

পূর্বেকার দুটি যুদ্ধের ন্যায় ভারতের ইতিহাসে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধও ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলাফল যেমন ছিল গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, এই যুদ্ধে সম্প্রসারিত মারাঠা শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মোগল শক্তির অবসানের সুযোগে যে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থায়ীভাবে গড়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা ধুলিস্যাৎ হলো। মারাঠাদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য দেশীয় কোনও নরপতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেল না। বরং এই সুযোগে বিদেশী ইংরেজ বণিকগণ তাদের সুযোগসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাণিজ্যের নামে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলো। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য করা যায়, পেশোয়ার রাজনৈতিক প্রাধান্য লুপ্ত হওয়া উত্তর ভারতে শিখশক্তি ও দক্ষিণ ভারতে মহীশূরের হায়দার আলির অভ্যুত্থান সহজ হয়ে উঠল। তবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কোনও আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে ছিল না। তৃতীয়ত, মারাঠা সম্রাজ্যবাদ চরম আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় পেশোয়ার পদমর্যাদা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল পেশোয়া মাধব রাও মাত্র এগার বছরের (১৭৬১-১৭৭২ খ্রিঃ) চেষ্টায় হৃত গৌরব অংশত ফিরিয়ে আনতে পারলেও ইতোমধ্যে মারাঠা পঞ্চরাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। সিন্ধিয়া, হোলকার, গায়কোয়াড়, ভোঁসলে এবং ধার অঞ্চলের পাওয়ারবংশ স্ব-স্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলেও তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। চতুর্থতঃ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ভারতের পূর্ব সীমান্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ভারতের

শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্রের (মারাঠা) পতন ঘটায় ইংরেজগণ নতুন উদ্যমে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে উঠল। সুতরাং ব্রিটিশ পক্ষের সুবিধার বিচারে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে পলাশি যুদ্ধের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। নাদির শাহের আক্রমণে মোগলশক্তি শেষ হয়েছিল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা জাতির আশাও শেষ হলো। এবার ভারতে তৃতীয় এক শক্তি এলো; এশক্তির নাম ব্রিটিশ শক্তি। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল ব্রিটিশ প্রতিপত্তি। সুতরাং তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত মারাঠা শক্তিকে বিদেশী ইংরেজ শক্তির সঙ্গে অচিরে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হলো।

মারাঠাদের ব্যর্থতার কারণ ঃ মোগল শক্তির অবক্ষয়ের যুগে মারাঠাজাতির স্বপ্ন ছিল যে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তারা বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের সে স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। ঐতিহাসিকগণ এর কারণ অনুসন্ধান করে নানা বক্তব্য পেশ করেছেন। সেগুলিকে পরিবেশন করা যেতে পারেঃ

(১) যে পচনশীল সমাজব্যবস্থা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল মারাঠাদের সমাজব্যবস্থা ছিল ঠিক একই দোষে দুষ্ট। পতনোন্মুখ মোগলযুগের অভিজাতদের প্রভাব পড়েছিল মারাঠা প্রধানদের উপর। মোগল জায়গিরদার প্রথার আদর্শে গড়ে উঠেছিল মারাঠা শাসনের 'সরঞ্জামি' প্রথা। মোগল অভিজাতদের মত মারাঠা নায়কদের মধ্যে ছিল ঐক্য ও শৃঙ্খলার অভাব। তাদের স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, সুযোগ অনুসারে বাইরের যেকোনও শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ছিল মারাঠা নায়কদের প্রবণতা। সুযোগ পেলে মোগল অভিজাতদের মত মারাঠা নায়করাও কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহেলা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

(২) মোগলদের মত মারাঠাদের শাসনব্যবস্থা ছিল ত্রুটিযুক্ত। উভয়ক্ষেত্রে প্রজাপুঞ্জ ছিল কর ভারে ভারাক্রান্ত ও শোষিত। মারাঠাদের ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ খাজনা হিসেবে আদায় করা হত। জনগণ এবং শাসকদের মধ্যে জনসংযোগের অভাব ছিল। ফলে মোগল অপেক্ষা মারাঠা রাষ্ট্রে রাজানুগত্যের অভাব ছিল। বল প্রয়োগের নীতিই ছিল মারাঠাদের গুরুত্বপূর্ণ নীতি। ফলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল সূত্রের একান্ত অভাব ছিল এই মারাঠা রাষ্ট্রে। সাম্রাজ্যকে প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কোনও ইচ্ছাই মারাঠা নায়ক ও শাসকদের ছিল না।

(৩) সমকালীন ভারতের যে কোনও স্বাধীন আঞ্চলিক নরপতির সামরিক বাহিনী অপেক্ষা মারাঠা সামরিক বাহিনী ছিল শক্তিশালী ও দ্রুতগতিশীল। কিন্তু এই মারাঠা বাহিনী অপেক্ষা আবদালির সামরিক বাহিনী ছিল অধিক প্রবল, গতিময় ও আধুনিক। যুদ্ধের কলাকৌশল, সৈনিকদের খাদ্য-পানীয় ও উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদির বিচারে মারাঠা নেতারা কূটকৌশলী ছিলেন না।

(৪) বিদেশী আহমদ শাহ আবদালির সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই মারাঠারা ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহানুভূতি ও সামরিক সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয়েছিল।

মারাঠারা রাজপুত, শিখ ও জাঠদের বিরাগভাজন হয়েছিল। অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের নবাবরা আবদালিকেই সাহায্য করেছিলেন। মারাঠাদের অনৈক্য ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তিই এসবের জন্যে দায়ী ছিল।

অবশেষে বলা যায়, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মারাঠাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হওয়ার পশ্চাতে শুধুমাত্র তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজয় নয়, সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখীন হয়েও মারাঠারা তাদের হঠিয়ে দিতে পারেনি। কারণ মারাঠা শাসকরা সাম্রাজ্যকে একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন। ঐক্য, সংহতি ছিলনা তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্যে, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতির মাধ্যমে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে, আত্মনিয়োগের কোনও প্রবণতাই তাঁদের মধ্যে ছিল না। এক কথায় মারাঠা শাসকগণ আধুনিকীকরণের পদক্ষেপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই বিদেশী ইংরেজদের সঙ্গে দ্বন্দ্বেও তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হলো।

স্বাধীন নবাবদের অধীনে বাংলা ঃ পূর্বকথা ঃ প্রাচীন ভারতে গুপ্ত শাসনের অবসানের পর থেকে বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। রাজা শশাঙ্কের পর বাংলার পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের শাসন বাংলার স্বাধীন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। সুলতানি আমলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ঐতিহ্য স্থাপিত হয় ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজীর সময় থেকে (ত্রয়োদশ শতকের সূচনা)। দিল্লির সুলতানরা বাংলার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতেন, কিন্তু তা কোনদিন স্থায়ী হতে পারেনি। দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব, বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং স্বাধীন ঐতিহ্য এখানকার শাসকদের দিল্লির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে অনুপ্রাণিত করত। বাংলার ইলিয়াস শাহী ও হুসেনশাহী বংশ সুদীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। হুসেন শাহী শাসনের পর বাংলা পুনরায় দিল্লির আফগান সুলতানদের একটা প্রদেশে পরিণত হয়। এরপর মোগল আফগান সংঘর্ষের সময় বাংলা ছিল দিল্লির তাবেদারি থেকে মুক্ত কররাণী সুলতানদের শাসনাধীনে। দিল্লির বাদশাহ আকবরের আমলে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে কররাণী বংশের শেষ সুলতান দাউদ খাঁ মোগলদের নিকট পরাজিত হন। তখন থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে মোগল শাসনাধীনে ছিল। মোগল বাদশাহের মনোনীত প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদারগণ অন্যান্য সুবার মত বাংলাসুবার শাসনকার্য পরিচানলা করতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭) আইনত বাংলাদেশে বাদশাহী প্রভুত্ব স্বীকৃত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ক্রমে ক্রমে বাংলায় স্বাধীন ইতিহাসের সূচনা হয়। তাই বলা হয় আঠার শতকের সূচনা থেকে বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হলো। এই ইতিহাস মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে আরম্ভ হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানি মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলে বাংলায় স্বাধীন নবাবীর অবসান ঘটে এবং ভারতবর্ষে কোম্পানি রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরে বাংলার কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রূপায়িত হতে থাকে।

মুর্শিদকুলি খান (১৭০০-২৭ খ্রিঃ) ঃ দিল্লির সম্রাট শাহ্জাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের রাজকর্মচারী ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। তখন সেখানকার সুবাদার ছিলেন আওরঙ্গজেব (১৬৫২ খ্রিঃ)। সুবাদার আওরঙ্গজেব এই সময় সেখানে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হন। তাই তাঁকে রাজস্বের উন্নতি বিধানে মনোযোগ দিতে হলো। এই কঠিন কর্মে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন পারস্যদেশীয় (মতান্তরে ধর্মান্তরিত ভারতীয়) মুর্শিদকুলী খান[১] নামক একজন বিচক্ষণ কর্মচারী। জমি জরিপ, রাজস্বনির্ধারণ ও যোগ্য কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি টোডরমলের প্রথা অনুসরণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় কৃষি ও রাজস্বের উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

উত্তরাধিকার যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেব বাদশাহ্ হিসেবে রাজত্বের প্রথমাংশ (১৬৫৯-১৬৮১ খ্রিঃ) অতিবাহিত করেন উত্তর ভারতে এবং বাকি অংশ (১৬৮১-১৭০৭ খ্রিঃ) অতিবাহিত হয় দক্ষিণ ভারতে। বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতে এসেই মুর্শিদকুলি খানকে হায়দ্রাবাদের দেওয়ানপদে নিয়োগ করেন। এই সময় পূর্বাঞ্চলের বাংলাসুবা থেকে নানা বিদ্রোহ ও অর্থনৈতিক দুর্যোগের সংবাদ বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবকে বিব্রত করতে থাকে। তাই সম্রাট তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার জন্যে এ বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ মুর্শিদকুলি খানকে বাংলাসুবার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন (১৭০০ খ্রিঃ)। এই সময় বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-শান্। মোগল-প্রশাসনে সুবাদারের পরেই ছিল দেওয়ানের স্থান। দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা এবং তিনি তাঁর কাজের জন্যে একমাত্র বাদশাহের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য ছিলেন। দেওয়ানের উপর সুবাদারের কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। পদমর্যাদার এই তারতম্যের দরুন সুবাদার ও দেওয়ানের মধ্যে খুব শীঘ্র বিবাদ উপস্থিত হলো। ঐ সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-শান্ (সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহের পুত্র)। যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়েও তিনি ছিলেন নিদারুণ অলস ও আরামপ্রিয়। বাংলাসুবার তিনি সুবেদার রূপে নিযুক্ত ছিলেন ১৬৯৭ থেকে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সম্রাট আওরঙ্গ জেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল-সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব

সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে তিনি তৎপর ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বৈধ অথা অবৈধ যে কোনও উপায়ে অথবা সংগ্রহ করাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পুরণের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হন এবং কৃষক-কারিগর ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে অর্থ সঞ্চয় করতে থাকেন। দ্বিতীয় স্তরে মুর্শিদকুলি খান দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হয়েই রাজস্ব বিভাগের নানা দুর্নীতি দমন করতে এবং রাজস্বের খাতে রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর হন। এর ফলে ক্রমশ সুবেদার ও মোগল কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হতে থাকে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে কর্মে ইস্তফা দিতে চেয়েও তিনি তা পারেন নি। কারণ তাঁর সততার জন্যে তাঁর উপর সম্রাটের অনুগ্রহ ও সহানুভূতি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। দক্ষিণ ভারতে সম্রাটের বিরতিহীন যুদ্ধের খরচ বহনের ক্ষেত্রে বাংলা সুবার রাজস্ব ছিল প্রধান অবলম্বন। তাই সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর দেওয়ান মুর্শিদকুলি খানকে রাজস্বের পরিমাণ ধার্য ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ফলে মুর্শিদকুলি খান সুবেদার ও কর্মচারীদের বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হন। তিনি সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দপ্তর মুখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। পরে তাঁর নাম অনুসারে মুখসুদাবাদের নামকরণ করা হয় 'মুর্শিদাবাদ'। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খানকে উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিয়োগ করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মুর্শিদকুলি খান নির্বিঘ্নে কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হন। কিন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রিঃ) মুর্শিদকুলি খানের কিছুটা ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো উত্তরাধিকার যুদ্ধ। যুদ্ধান্তে আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম শাহআলম 'বাহাদুর শাহ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহাদুর শাহের পুত্র আজিম-উস-শান তখন পিতার সান্নিধ্যে ছিলেন। তারই প্ররোচনায় বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খানকে প্রায় দু'বছরের (১৭০৮-০৯ খ্রিঃ) জন্যে বাংলা থেকে দাক্ষিণাত্যে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে বাংলাসুবার সমকালীন অবস্থার জন্যে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খানকে পুনরায় বাংলার দেওয়ান পদে নিয়োগ করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বাহাদুর শাহ ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। তখন পুনরায় শুরু হলো মোগল উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে বাংলার সুবাদার আজিম-উস-শান্ নিহত হন। অবশেষে আজিম-উস-শানের পুত্র ফারুখশিয়ার দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ (১৭১৩ খ্রিঃ) করেন। তাঁর আমলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন দরবারের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। যাইহোক, মুর্শিদকুলি খান নতুন সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেন। সম্রাট তখন মুর্শিদকুলি খানকে পুনরায় বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। তবে এই সময় তাঁকে দেওয়ান ছাড়াও সুবাদারের দায়িত্বও পালন করতে হত (১৭১৩ খ্রিঃ)। তবে পরের বছর (১৭১৪ খ্রিঃ) তাঁকে উড়িষ্যার সুবাদার পদেও

দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুখশিয়ারের এক ফরমান বা আদেশ বলে মুর্শিদকুলি খানকে দেওয়ানের পদ ছাড়াও বাংলার সুবাদার পদে নিয়োগ করা হয়। তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাংলার স্বাধীন নবাবী শাসনের সূত্রপাত ঘটে। আইনের বিচারে দিল্লির অধীন হলেও বাংলার শাসন স্বাধীনভাবেই পরিচালিত হতে থাকে। সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত হয়েই মুর্শিদকুলি খান মুখসুদাবাদের নাম নিজের নামে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে পরিবর্তিত করলেন এবং ঢাকা থেকে এই সময় মুর্শিদাবাদে সুবা বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হলো। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত (১৭২৭ খ্রিঃ) মুর্শিদকুলি খান বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে শাসন কার্যপরিচালনা করেন।

মুর্শিদকুলি খানের শাসন ঃ মুর্শিদকুলি খানের শাসন ব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাজস্ব বিভাগের উন্নততর সংস্কারের সঙ্গে অন্বিত। রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে তাঁর অবদান একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর আগমনের পূর্বে বাংলার ভূমি-রাজস্ব থেকে সরকারের আয় বিশেষ কিছু ছিল না। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। রাজা টোডরমল উত্তর ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া বাংলাসুবায় পর্তুগিজদের অত্যাচার, অন্যান্য বিদেশী বণিকদের অবৈধ উপায়ে বাণিজ্য করার প্রয়াস, যুদ্ধবিগ্রহ, মোগল কর্মচারীদের মধ্যে জায়গির বণ্টন এবং খাসজমির অভাব ইত্যাদি নানা কারণে মুর্শিদকুলি খানের পূর্বে বাংলাসুবার রাজস্ব রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল না।

রাজস্ব থেকে সরকারি আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মুর্শিদকুলি দুটি প্রধান উপায় অবলম্বন করেন। প্রথমত, তিনি মোগল কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টিত সমুদয় জায়গিরকে খাস জমিতে (Crown land) পরিণত করেন এবং পদস্থ রাজকর্মচারীদের উড়িষ্যার অনুন্নত ও জঙ্গলাবৃত এলাকায় নতুন করে জায়গির প্রদান করেন। কারণ, পুরাতন জমিদারগণ অলস ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়ায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মোটেই তৎপর ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, পূর্বতন জমিদার শ্রেণীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া জমির রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হলো ইজারাদার (Contractor) শ্রেণীর হাতে। এই ইজারাদার শ্রেণীকে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদানের জন্যে শপথ গ্রহণ করতে হত। নবপ্রবর্তিত এই রাজস্বব্যবস্থা 'মালজমিনি' (Mal Zamini) ব্যবস্থা নামে খ্যাত। ইজারাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলি খান হিন্দুদের নির্বাচন করতেন। এর ফলে বাংলামুলুকে এক নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীই লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ গ্রহণ করেন। উপরোক্ত প্রধান দুটি বিষয় ছাড়াও মুর্শিদকুলি খান রাজ্যের সমুদয় আবাদী ও অনাবাদী জমি জরিপ করিয়ে জমির উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সংগতি রেখে রাজস্বের

পরিমাণ নির্ধারণ করেন। জঁমির বিবরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মালিকের নাম-ধাম ও রাজস্বের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এছাড়া অনুগত জমিদারদের যেমন তিনি ইজারাদার পদে নিয়োগ করেছিলেন তেমনি আঞ্চলিক রাজাদের (যেমন কোচবিহার, ত্রিপুরা) রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিলেন।

মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য স্তরে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন। যেমন, রাজভাণ্ডারের সঞ্চয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি প্রশাসনিক কর্মে ব্যয়-সঙ্কোচনের ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করা ও বিভাগীয় দুর্নীতি দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকের সংখ্যা হ্রাস করেন। মুর্শিদকুলি খান দেওয়ান পদে নিযুক্তির পূর্বে বাংলার মোগল রাজকর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। এসব ক্ষেত্রে তারা রাজ-ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যবসায়ীদের শোষণ করে নিজ নিজ লাভের অঙ্ক কষতেন। মুর্শিদকুলি খান এই অবস্থা কঠোর হাতে দমন করেন ও ব্যবসায়ীরা যাতে নির্ভয়ে বাণিজ্যে মনোনিবেশ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য নির্দেশ করেন। তিনি জানতেন বাণিজ্যের উপর বাংলার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই তিনি ইয়োরোপীয় ও দেশীয় বণিকদের প্রতি সদয় ছিলেন এবং নির্ধারিত বাণিজ্য শুল্কের অতিরিক্ত অর্থ তিনি তাদের কাছে দাবি করতেন না। তবে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে বিবাদ শুরু হলো ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বছর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে স্যার জন সুরম্যান (Sir John Surman) মোগল সম্রাট ফারুখশিয়রের নিকট থেকে 'দস্তক' বা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি আদায় করেন। মুর্শিদকুলি খান আদেশনামার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং ইংরেজদের দেশীয় বণিকদের মত সমহারে শুল্ক প্রদান করতে বাধ্য করেন। সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তিনি দিল্লির তোয়াক্কা না করে স্বাধীনভাবে আমৃত্যু (১৭২৭ খ্রিঃ) বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব অর্থনৈতিক অন্যান্য সংস্কারের ফলশ্রুতি ছিল আশাপ্রদ। **প্রথমত**, রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কারের ফলে দেওয়ানি বিভাগের সঙ্গে অন্বিত সমুদয় দুর্নীতি দূরীভূত হলো। আবাদী ও অনাবাদী জমি জরিপ করে সংশ্লিষ্ট কৃষকের নাম-ধাম ও রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া কৃষকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেল। কৃষককে ঋণদাণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেল, তেমনি সরকারি আয় নিশ্চিত হলো।

দ্বিতীয়ত পুরাতন জমিদার বা মোগল রাজকর্মচারীদের উচ্ছেদ করে খাজনা আদায়ের জন্যে নতুন ইজারাদার নিয়োগ করায় কৃষকরা অতীতের উৎপীড়ন থেকে যেমন রেহাই পেল, তেমনি খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়ায় কৃষিকর্মে তাদের একাগ্রতা বৃদ্ধি পেল। এই সঙ্গে বলা যায়, নতুন ইজারাদারদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু। তাছাড়া দেওয়ান কানুনগো ইত্যাদি পদে যাদের নিয়োগ করা হত তাদের অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষিত

বাঙালি হিন্দু। ফলে এই সময় থেকে বাংলার উক্ত ইজারাদারদের অনেকেই উচ্চমানের জমিদার বংশ প্রতিষ্ঠা করেন — যারা পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে স্থায়ী জমিদার হিসেবে মর্যাদা ও ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশেষ সম্পদশালী হয়ে ওঠে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষাংশে মুর্শিদকুলি খানই ছিলেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যিনি সম্রাটের বিরতিহীন যুদ্ধ ও প্রশাসনিক খরচের মোট অংশ সরবরাহ করতেন। মুর্শিদকুলি খান দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যে উৎসাহিত করতেন। তিনি মোগল রাজকর্মচারীদের গোপন ব্যবসা বন্ধ করতে সক্ষম হন। নদীপথে ও রাজপথে চোর-ডাকাতের উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশ্যে পথের দুপাশে কিছুদূর অন্তর অন্তর 'থানা' বা 'চৌক' স্থাপন করেন। বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের 'দস্তক' বা বিশেষ সুবিধা নাকচ করা হয়েছিল। ফলে বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলার আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল হয়েছিল।

মুর্শিদকুলি খানের কৃতিত্ব ঃ বাংলার নবাবী শাসনের সূত্রপাতে মুর্শিদকুলি খানের কার্যকলাপ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান, নৈতিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা সাধারণ কর্মচারী থেকে দেওয়ান ও সুবেদারী পদে অধিষ্ঠিত হন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মত ধর্মবিলাসী, গোঁড়া, উন্নত চরিত্রের এবং বিলাসমুক্ত মানুষও তার কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মুর্শিদকুলি খানের শাসন বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত করে। উপরিতলগতভাবে দিল্লির আনুগত্য স্বীকার করেও মুর্শিদকুলি খান বাংলায় এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ, স্বাধীনতার ঐতিহ্য ইত্যাদি বজায় রেখে তিনিও স্বাধীনভাবে বাংলায় রাজস্ব ও অর্থনৈতিক নানা সংস্কার কার্য সম্পাদন করেন। প্রশাসনিক পর্যায়ে তিনি ধর্মীয় বৈষম্যের উপর মোটেই গুরত্ব আরোপ করতেন না। তাই ইজারাদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলায় গড়ে উঠেছিল নতুন নতুন জমিদাসবংশ যাদের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর সংখ্যাধিক্য ছিল। মুর্শিদকুলি খান বাংলায় শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নয়ন, কৃষি ও বাণিজ্যের মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত. করতে সক্ষম হন।

মুর্শিদকুলি নিজে ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁর শাসনকালে এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সুদূর পারস্য থেকে তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের বাংলায় আমন্ত্রণ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি পর্যায়ে উন্নয়নের সূচনা করেন।

সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রিঃ) ঃ অপুত্রক অবস্থায় মুর্শিদকুলি খান মৃত্যুর পূর্বে (১৭২৭ খ্রিঃ) তাঁর দৌহিত্র (জামাতা সুজাউদ্দিনের পুত্র) সরফরাজ খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। মুর্শিদকুলি খানের জীবিতকালে সুজাউদ্দিন উড়িষ্যার

সহকারি সুবাদার পদেনিযুক্ত ছিলেন। বাংলার নবাবী মসনদের উপর তার লালসা ছিল। জামাতা হলেও মুর্শিদকুলির সঙ্গে সুজাউদ্দিনের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল না। বাংলার সিংহাসনে যখন তাঁর পুত্র সরফরাজ খান উপবিষ্ট তখন সুজাউদ্দিন আত্মীয়দের পরামর্শক্রমে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। তার পূর্বে তিনি মোগল বাদশাহের আদেশপত্র সংগ্রহ করেন। হঠাৎ পিতার আগমনে বিস্মিত সরফরাজ খান আত্মীয়বর্গের পরামর্শক্রমে পিতার অনুকূলে বাংলার নবাবী মসনদ ত্যাগ করেন।

বাংলার সিংহাসনে উপবিষ্ট সুজাউদ্দিন নিজের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করেন। প্রথমত, তিনি তাঁর পক্ষভুক্ত আত্মীয়স্বজন ও বিশ্বস্ত অনুচরদেরকে উচ্চরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর শ্বশুর মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক প্রবর্তিত আইনকানুনের কঠোরতা হ্রাস করে কারারুদ্ধ জমিদারদের মুক্তিদান করেন ও তাদের অনুগত অনুচরে পরিণত করেন। তৃতীয়ত, সমকালীন দিল্লির মোগল সম্রাটকে খুশি রাখার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে দিল্লিতে অর্থ ও উপঢৌকন পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে বাংলাসুবায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্ম সম্পাদিত হয় সেগুলির মধ্যে প্রথমত উল্লেখ করা যায়, তাঁর আমলে মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের আদেশে বিহার বাংলাসুবার সঙ্গে সংযুক্ত হলো। ফলে সুজাউদ্দিন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদাররূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। দ্বিতীয়তঃ শাসনের সুবিধার্থে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে মোট তিনটি অংশে বিভক্ত করা হলো, যথা– (১) মধ্যবাংলা, (২) সুদূর পূর্বাংশ, (৩) বিহার ও (৪) উড়িষ্যা। মধ্য বাংলাকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে রেখে অন্য তিনটি অংশ শাসনের জন্য তিনজন বিশ্বস্ত 'নায়েব নাজিম' নিয়োগ করলেন। তৃতীয়ত, সুজাউদ্দিন বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশকে সম্পদশালী করার চেষ্টা করতেন। এই পর্যায়ে এই সময় বাংলায় ইংরেজ, ফরাসি ও হলোন্দাজ বণিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসি ও হলোন্দাজদের সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা মাঝে মাঝে তিক্ততার সৃষ্টি করত। সম্রাট ফারুখশিয়রের 'ফরমান' অনুসারে বাণিজ্য করার চেষ্টা করার সময় ইংরেজদের সঙ্গে অন্যদের বিবাদ ঘনীভূত হত। তাই ইংরেজ বণিকগণ নবাব সুজাউদ্দিনের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখার চেষ্টা করত। তবে সুজাউদ্দিন সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের দস্তক ব্যবহার করতে দেন নি।

ধর্মভীরু ও নিরপেক্ষ বিচারক হিসেবে প্রজার মঙ্গল বিধানের জন্যে সর্বদা তৎপর ছিলেন। মুর্শিদকুলির মত তিনি নিজেও বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ সুজাউদ্দিনের রাজত্বকালকে বাংলার শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর প্রজাহিতৈষণার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একান্ত পৃষ্ঠপোষক। মুর্শিদাবাদে বহু সুরম্য প্রসাদ আজও তার পরিচয় বহন করে।

সরফরাজ খান (১৭৩৯–১৭৪০খ্রিঃ) ঃ সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর (১৭৩৯ খ্রিঃ) পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। সিংহাসন লাভের সময় তিনি 'আলা-উদ্দৌলা হায়দার জঙ্গ' উপাধি গ্রহণ করেন। পিতার নির্দেশ অনুসারে তিনি পূর্বতন রাজকর্মচারীদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন। ব্যক্তিগত জীবনে শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন অলস ও অকর্মণ্য এবং অনভিজ্ঞ। চারিত্রিক বিচারেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট নিম্নমানের ব্যক্তি। তাই অল্পদিনের মধ্যে বাংলার নবাবী শাসন ভেঙে পড়ল, সর্বত্র অরাজকতার সৃষ্টি হলো। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন তাঁরই কর্মচারী অলিবর্দী খান। আলিবর্দীর সহযোগী ছিলেন হাজীআহম্মদ, আলসচাঁদ, জগৎশেঠ, ফতে চাঁদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার মসনদে বসলেন আলিবর্দী খান।

আলিবর্দী খান (১৭৪০–১৭৫৬ খ্রিঃ) ঃ অষ্টাদশ শতকে যেসব বিদেশী ভাগ্যাণ্বেষী ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে বাংলার নবাব আলিবর্দী খান ছিলেন অন্যতম।

আরববংশ সম্ভূত মীর্জা মহম্মদ সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহের অধীনে সামান্য কর্মে নিযুক্ত হলো। মীর্জা মহম্মদের ছিল দুই পুত্র; যথা (১) মীর্জা মহম্মদ আলি এবং (২) হাজী আহমদ। যুবরাজ আজম শাহের অধীনে মীর্জা মহম্মদ আলি এবং হাজী আহমদ ক্রমশঃ নানা কর্মে দক্ষতা অর্জন করতে থাকেন। কিন্তু ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল পরিবারে যে উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় সেই যুদ্ধে আজম শাহ নিহত হলে মীর্জা মহম্মদআলি এবং তার ভ্রাতা হাজী আহমদ উড়িষ্যার চলে আসেন। উড়িষ্যার সহকারি সুবেদার পদে নিযুক্ত ছিলেন সুজাউদ্দিন খান। সুজাউদ্দিন এই দুভাইয়ের আচার-আচরণে খুশি হয়ে কর্মে নিয়োগ করেন। আবার এই দু-ভাইয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদ অধিকার করতে সমর্থ হন। বাংলার মসনদ দখল করেই সুজাউদ্দিন মীর্জা মহম্মদ আলিকে রাজমহলের ফৌজদার পদে নিয়োগ করেন এবং এই সময় তিনি 'আলিবর্দী খান' নামে ভূষিত হন।

নবাব সুজাউদ্দিনের রাজত্বকালেই ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার বাংলাসুবার সঙ্গে যুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সুজাউদ্দিন আলিবর্দীকেই বিহারের নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ করেন। বিহারের অত্যাচারী জমিদারদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করে জনসমাজে শান্তিও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় স্তরে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর (১৭৩৯ খ্রিঃ) পর সরফরাজ খান বাংলার মসনদ দখল করলে অল্পদিনের মধ্যে নতুন নবাবের অকর্মণ্যতার সঙ্গে অরাজকতা আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় আলিবর্দী খান নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং তাঁকে সহযোগিতা

করেন তাঁর ভ্রাতা হাজি আহমদ, আলমচাঁদ, জগৎ শেঠ, ফতেচাঁদ প্রমুখ উচ্চপ্রদস্থ কর্মচারিবৃন্দ। আলিবর্দী খান সদলবলে রাজমহলের নিকট গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেন (১৭৪০ খ্রিঃ)। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিল্লির বাদশাহের নিকট থেকে সুবেদারী মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে তিনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসন পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন।

১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দী বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার কর্তৃত্ব লাভ করলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে একের পর এক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হলো। প্রথমত, উড়িষ্যার শাসনকর্তা রুস্তম জঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা দিলেন। তিনি ছিলেন পূর্বতন নবাব সুজাউদ্দিনের জামাতা এবং দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি নামে বিশেষভাবে পরিচিত। রুস্তম জঙ্গকে সাহায্য করলেন তারই জামাতা মীর্জা বাকর। বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে আলিবর্দী উড়িষ্যার দিকে সসৈন্যে যাত্রা করলেন। উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হলো সুবর্ণরেখা নদীতীরে। যুদ্ধে রুস্তম জঙ্গ পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। আলিবর্দী প্রথমে তার জামাতা সৌকত জঙ্গ, পরে তার ব্যর্থতায় শেখ মাসুমকে উড়িষ্যার সহকারি শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন (১৭৪২ খ্রিঃ)।

আলিবর্দী খানের রাজত্বে দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল বাংলায় মারাঠা অভিযান। নাগপুরের মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোঁসলের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠাগণ উড়িষ্যার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করে এবং বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে কাটোয়া দখল করে। এরপর মারাঠারা রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয় ও জগৎ শেঠের কোষগার লুণ্ঠন করে। ঠিক এই সময় আলিবর্দীখান বাইরে ছিলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করলে মারাঠারা কাটোয়ায় ফিরে যায় (১৭৪২ খ্রিঃ)। গঙ্গার পশ্চিমতীর পর্যন্ত মারাঠাদের অধিকার সুনিশ্চিত করেই সেখানে ফৌজদার নিয়োগ করা হলো। এরপর ১৭৪৩ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মারাঠাগণ বার বার বাংলাদেশ আক্রমণ করতে থাকে। প্রতিবারেই আক্রমণের সময় মারাঠা সৈনিকগন—যারা 'বর্গী' নামে অধিক পরিচিত, তারা, বীভৎস অত্যাচার লিপ্ত হত। হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ ছিল অতি সাধারণ কর্মসূচি। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর তাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হলো, গৃহগুলি অগ্নিদগ্ধ হলো; আবালবৃদ্ধ-বণিতার প্রাণনাশ হলো। দেশের শান্তি বিঘ্নিত হলে আলিবর্দী ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে কৌশলে বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিহত করেন এবং ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে (১) উড়িষ্যার উপর মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোঁসলের প্রভুত্ব স্বীকৃত হলো, (২) মারাঠারা বাংলাদেশ থেকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পেল। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্গীর হাঙ্গামা আর তার বিভীষিকা উড়িষ্যা বা আর বাংলার জনমানসে আজও গেঁথে আছে।

মুর্শিদকুলি খানের মত নবাব আলিবর্দী খানও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সমৃদ্ধির জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি দেশী ও বিদেশী বণিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। অনর্থক তিনি ব্যবসায়ীদের উপর হস্তক্ষেপ করতেন না। তবে ইয়োরোপীয় বণিকদের উপর তিনি এক ধরণের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন। তিনি তাদের সম্পূর্ন স্বাধীনতা দেন নি। মারাঠাদের আক্রমণের সময় আলিবর্দী ইয়োরোপীয় সকল বণিকদের নিকট থেকে তিনি অর্থ আদায় করতেন। আবার ইংরেজরা মারাঠাদের পক্ষে যোগদান করায় আলিবর্দী ইংরেজদের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করেন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ-ফরাসি দ্বন্দ্বের সময় আলিবর্দী বাংলায় তাদেরকে কোনরূপ সংঘর্ষে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করে দেন। মারাঠাদের আক্রমণ থেকে তাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র রক্ষার জন্য ইংরেজ ও ফরাসিরা যখন কলকাতা ও চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন তিনি বাধা দিয়ে ছিলেন "তোমরা বণিক, তোমাদের দুর্গের কি প্রয়োজন?" সুতরাং বলা যায় নবাব আলিবর্দীর রাজত্বকালে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে সৌহার্দ্য অব্যাহত ছিল।

আলিবর্দীর মূল্যায়ন ঃ ভাগ্যান্বেষী হয়েও আলিবর্দী এমন কতকগুলি সমস্যা ও পরিস্থিতির মাধ্যমে বড়ো হয়েছিলেন যে তিনি অনেকগুলি গুণ ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সুদক্ষ যোদ্ধা হিসেবে তিনি যেমন কৃতিত্বে অর্জন করেন, তেমনি প্রশাসক হিসেবেও তিনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। সমকালীন ঐতিহাসিক গোলাম হুসেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

নবাব আলিবর্দীর শাসন নীতি ছিল উদার। নবাব-মারাঠা সংঘর্ষের পর তিনি অল্পকাল শান্তিতে রাজত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই অল্পকালের মধ্যে তিনি বর্গী-বিধ্বস্ত গ্রাম-গঞ্জের পুনর্গঠনে যত্নবান হন। কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। কৃষককে ঋণদানের মাধ্যমে তিনি দেশের কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিলেন। মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব নীতি নবাব আলিবর্দী চালু রেখেছিলেন। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি দেশী ও বিদেশী বণিকদের প্রতি নিরপেক্ষ ও সমধর্মী নীতি প্রয়োগে তৎপর ছিলেন। তবে ইয়োরোপীয় বণিকদের আচার আচরণের প্রতি তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। সমকালীন কোন এক ইংরেজ কর্মচারীর লেখা থেকে জানা যায় যে তিনি ইয়োরোপীয় বণিকদের মৌচাকের মৌমাছি বলে তুলনা করতেন। তিনি জানতেন ওদের চাকে আঘাত করলে তারা মরণপণ লড়বে, অন্যথায় তাদের চাক্ থেকে মধু পান করা সহজ হবে। তাই তিনি ইয়োরোপীয় বণিকদের প্রতি সদয় ছিলেন। তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য চেষ্টা করতেন। ইংরেজ ও ফরাসিরা দুর্গ নির্মাণে অগ্রসর হলে তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। আবার শ্রীরামপুরে দিনেমারদের বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের তিনি অনুমতি প্রদান (১৭৫৫ খ্রিঃ) করেন। রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের সময় তিনি ইয়োরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর নিকট

থেকে অর্থ আদায় করতেন। তবে তা কখনই শোষণ বা নির্যাতনমূলক হয়নি। তাঁর শাসন কঠিন হলেও নিরপেক্ষ ছিল।

রাষ্ট্র-শাসনে হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় বৈষম্য কোনও সমস্যা সৃষ্টি করেনি। জানকী রায়, রামনারায়ণ, দুর্লভরাম, বিরুদত্ত প্রমুখ হিন্দু কর্মচারীরা শাসন প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মারাঠা ও পাঠান অভিযান প্রতিরোধে হিন্দু ও মুসলিম জমিদার ও মনসবদাররা সমভাবে তাকে সাহায্য করতেন।

বাংলার নবাবগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে অদূরদর্শিতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইয়োরোপীয় বণিকদের মধ্যে ইংরেজগন যে জবরদস্ত ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে এটা বাংলার নবাবরা অনুধাবন করতে পারেননি। নবাবদের সঙ্গে বহির্জগতের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ফলে তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন নি যে ইয়োরোপীয় বণিক গোষ্ঠীগুলি কিভাবে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শোষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদির মাধ্যমে উপনিবেশ বিস্তার করে চলেছে। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগ্রাসী নীতি, তাদের দাবি আদায়ের নানা প্রক্রিয়া এবং তাদের উপনিবেশ বিস্তারের মনোভাব দমনের বা তাদের ভীতি প্রদর্শনের মোকাবিলা করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা নবাবদের ছিল। কিন্তু বিষয়টি তাঁরা ঠিক অনুধাবন করতে পারেননি। এই পর্যায়ে নবাবরা একটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীও গঠন করেননি। অতীতে মুর্শিদকুলি খান ব্যয় সঙ্কোচ করার উদ্দেশ্যে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস করেছিলেন। পরবর্তী নবাবগণ সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। বিদেশীরা বিশেষ করে ইংরেজগণ এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল।

স্বাধীন নবাবীর শেষ অঙ্ক : ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আলিবর্দী খানের মৃত্যু হলে বাংলার স্বাধীন নবাবীর সময়কাল প্রায় সমাপ্তির পথে এসে গেল। আলিবর্দীর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র মীর্জা মহম্মদ, যিনি সিরাজউদদৌলা নামে ইতিহাস পরিচিত, তিনি বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নবাব হওয়ার পূর্বাবধি সিরাজের কোনও সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। তাই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিসিরাজের মসনদ প্রাপ্তির সময় কোনও উপঢৌকন পাঠায় নি। তাছাড়া বার বার নতুন নবাবের আদেশও নির্দেশ ইংরেজরা অমান্য করতে থাকে। ফলে নবাব সিরাজউদদৌলা কলকাতা আক্রমণ ও অধিকার করেন (১৭৫৬ খ্রিঃ)। কলকাতা দখলের এই সংবাদ মাদ্রাজে পৌছালে ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে ইংরাজ বাহিনী কলকাতা অধিকার করে (১৭৫৭ খ্রিঃ)। যুদ্ধের পর আলিনগরের সন্ধিতে নবাব ইংরেজদের সমুদয় দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হন। আলিনগরের সন্ধি ছিল বাংলায় ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একটি অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা।

এই সময় সেনাপতি মিরজাফরের নেতৃত্বে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে একটা হীন ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। নবাবের বিশ্বাস ঘাতক, কর্মচারী মিরজাফরের সঙ্গে যোগদান করেন। সুযোগ পেয়ে রবার্ট ক্লাইভ সক্রিয়ভাবে এই ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেন। এই ষড়যন্ত্রে ফলশ্রুতিস্বরূপ সংঘটিত হলো পলাশি যুদ্ধের প্রহসন (১৭৫৭ খ্রিঃ)

সেখানে নবার পরাজিত হলেন এবং পরাজয়ের অল্পকাল পরেই মিরজাফরের পুত্র মিরণের আদেশে সিরাজ ঘাতকের হস্তে নিহত হলেন। পলাশি যুদ্ধের পর বাংলার নবাবীপদে অধিষ্ঠিত হলেন মিরজাফর। তিনি নামে মাত্র নবাব-- আসল ক্ষমতা চলে গেল ইংরেজের কবলে। এইভাবে বাংলার স্বাধীন নবাবীর সৌভাগ্য অস্তমিত হলো।

মারাঠা বা বাংলা বা অন্য যে কোনও আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থানের পরে কেন্দ্রীয় মোগল শক্তির সম্পর্ক কেমন ছিল? অধিকাংশ আঞ্চলিক শক্তিই নামে তখনও মোগলদের অধীনে ছিল কিন্তু কার্যত তারা ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন।

৩। ব্যবসা-বাণিজ্য ইয়োরোপীয় বণিকদের আগমন

আধুনিক যুগের সূচনা ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঠিক কোন সময় আধুনিক যুগের সূচনা হলো তা এক কথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কোনও নির্দিষ্ট বৎসর ধরে এর উত্তর দেওয়া ইতিহাস-সম্মত নয়। মানবসভ্যতায় ইতিহাসের ধারা অবিছিন্নভাবে বহমান। তবু প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক— এই যুগ বিভাগ করা হয় আলোচনার সুবিধার জন্য, অন্য কোনও কারণে নয়। বহমান নদীর যেমন এক-একটা বাঁক্ থাকে তেমনি নিরবিছিন্ন ইতিহাসের ধারায়ও এক একটা সময় আসে যখন সভ্যতা নতুন স্তরে পদার্পণ করে। পর্ব থেকে পর্বান্তর বিভিন্ন দেশে সমাজের বিকাশ (Social formation) এবং বস্তুগত সংস্কৃতির (material culture) পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। কারণ সমকালীন যুগের বস্তুগত পটভূমিকাই সেই সময়ের বা যুগের চিন্তাভাবনা, সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক, সম্পদ তৈরি ও বন্টন ইত্যাদি তৈরি করে।

তবে যুগ বিভাগের সবচাইতে বড়ো অসুবিধা হলো এই যে, ইতিহাসের গতি সর্বত্র একরকম নয়। মধ্যযুগের সভ্যতা থেকে আধুনিক সভ্যতায় পদার্পণ তাই পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাসে সমাজ, ঐতিহ্য, কাঠামো এবং তার বস্তুগত পটভূমিকার উপর নির্ভরশীল, কেননা তার মধ্যে মিল-অমিল দুইই আছে। ইতিহাসের জনজীবন প্রণালীই বৈচিত্র্যময়, তাই চিত্তাকর্ষক। ইয়োরোপের কথাই আগে বলা যাক। ইয়োরোপে পশ্চিমের রোমান সাম্রাজ্যের পতন ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময় থেকে মধ্যযুগের সূচনা ধরা হয়। কেননা তারপরই ধীরে ধীরে দাস-শ্রম (Slave labour) ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে সামন্ততন্ত্রের (feudal-ism) অভ্যুদয়। সামন্ততন্ত্রই মধ্য যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্রমে নতুন সমাজব্যবস্থা নতুনরাষ্ট্র ব্যবস্থা, নতুনঅর্থনৈতিক অবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production) ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। তারপর ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে পূর্বের রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী

কনস্ট্যানটিনোপল এর পতন ইয়োরোপে আধুনিক যুগের সূচনা করে। এর সূচনাতেই আমরা লক্ষ্য করি ভৌগোলিক আবিষ্কার (Geographical discoveries), নবজাগরণ (Renaissance) এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলন (Reformation), জ্ঞানদীপ্তির প্রসার ইত্যাদি। বস্তুগত পটভূমিকায় দেখি ক্রমে সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়।

সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ (Transition from feudalism to Capitalism) এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অসুবিধা হলো এখানে মধ্যযুগের সূচনা বা শেষ নির্দিষ্ট বৎসর দিয়ে বোঝানো যায় না। তবে ভারতবর্ষেও মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যদিও এখানে সামন্ততন্ত্র ইয়োরোপের মতন ছিল না। ধনতন্ত্রের উদ্ভবও অন্যরকম। একদা মধ্যযুগের বদলে 'মুসলিম যুগ' বা আধুনিক যুগের পরিবর্তে 'ব্রিটিশ যুগ' বলা হত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে, এখন তা আর কলা হয় না।

তাহলে ভারতে কী করে আধুনিকযুগের সূচনা হলো? ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিশালী সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নানা কারণে মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি কমে আসে। এই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্য বৈদেশিক আক্রমণের আঘাতে একেবারে ভেঙে পড়ে। অনেকাংশে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙে আঞ্চলিক অনেক স্বশাসিত রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসবিদ কালীকিংকর দত্ত লিখেছেন যে, ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয় বণিক সংস্থাগুলির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের ইতিহাস এক নতুন মোড় নেয়। কথাটি সত্যি এজন্য যে, এই ইয়োরোপীয় বণিকবর্গের অন্যতম ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে, শিথিল মোগল শাসনব্যবস্থায় এবং আঞ্চলিক রাজ্যগুলির অনৈক্য তথা আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগে শেষ পর্যন্ত শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়।

ডঃ বিপান চন্দ্র লিখেছেন : "যে ইয়োরোপীয়গণ ভারতের দ্বার প্রান্তে এসে হানা দিয়েছিল,তারা এমন এক সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যে, সমাজ ছিল উন্নততর আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সদ্ব্যবহারে পূর্ণমাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছিল।" ফলে ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষে শুধু এক ঔপনিবেশিক শাসনেরই সূচনা করেনি, ভারত ও ভারতবাসীর সার্বিক জীবনযাত্রায় নিয়ে এসেছিল এক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের স্রোতাবর্তেই আধুনিক ভারতের জীবনধর্মী চলিষ্ণুতার সূচনা হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলেই ভারতে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজ ইয়োরোপের শিল্প বিপ্লবের দ্বারা উন্নত এক ধনতান্ত্রিক দেশের সংস্পর্শে আসে। অবশ্য ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অচলায়তনের মধ্যেও দেখা দেয় পরিবর্তনের হাওয়া।

মধ্যযুগের শেষ পর্ব এবং আধুনিক যুগের সূচনা পর্বে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠলেও অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েনি। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের মধ্যে পদস্থ

সামরিক কর্মচারি ও বেসামরিক কর্মচারির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সব চেয়ে বেশি। পরিস্থিতি এরকম দাড়াল যে সরকারের তহবিলে অর্থ সম্পদ নেই, জায়গিরদাররা তাদের আয়ের অধিকাংশ থেকে বঞ্চিত, সেনাবাহিনী বেতন পাচ্ছে না। ফলে চাপ বাড়ল কৃষকদের উপর, রাজস্ব বেড়ে গেল। এই চাপ ও দাবির ফলে কৃষি ও অর্থনীতিতে ধাক্কা লাগলো। তবে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতের সর্বত্রই কৃষক শ্রেণীর অবস্থা খারাপ হয়নি। কেননা দেখা যায়, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় কৃষির উৎপাদন ভালোই ছিল।

অপরপক্ষে সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পে ভারত ছিল সমৃদ্ধ। কুটির শিল্পকারখানাগুলির ক্রমবৃদ্ধি ঘটছিল। ইয়োরোপীয় ও এশিয়ার বাজারগুলিতে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে বস্ত্রশিল্প এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প, যেমন সুতো কাটা, ছাপা কাপড় বোনা ও কাপড়ে রঙ করা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। ১৬৫০ থেকে ১৭৫০ পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল সমৃদ্ধ। ইয়োরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ফলে দেশীয় কারিগরী ও কুটির শিল্প বেড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ছোট একটি গ্রাম থেকে মাদ্রাজ ক্রমশ দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার কথা বলা যায়। কৃষি ও শিল্প ছিল ভারতীয় সমাজের মেরুদন্ড। ব্যবসা-বাণিজ্য আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক দু'ধরনেরই ছিল।

আঠারো শতকে এই প্রবণতা লক্ষণীয়। ইয়োরোপীয়দের প্রতিষ্ঠিত কারখানা ও কুঠিগুলির আশেপাশে কারিগরদের সংখ্যা ও বসতি বেড়ে চলেছিল। শহরগুলির মধ্যে গড়ে উঠল ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল ভারতের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু এই লাভের ব্যবসা থেকে যে অর্থসম্পদ পাওয়া যেত তা জমা হত মূলত অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে বিলাস দ্রব্যের আকারে অথবা তাদের সিন্দুকে জমা পড়ত। অর্থাৎ পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয় হিসেবে গণ্য হত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য চলত। ইয়োরোপীয়দের আসার পর বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। প্রতি বছর পারসিক, আবিসিনীয়, আরব, চৈনিক, তুর্কি, আর্মেনিয়ান এবং ইয়োরোপীয় বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বস্ত্র ছাড়া চিনি সমেত বহু পণ্য রপ্তানি হত। কিন্তু ক্রমেই ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি হতে থাকে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।

ইয়োরোপীয় বণিকদের আগমণ ঃ ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুপ্রাচীন। প্রাচীন যুগে ইয়োরোপে ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর যথেষ্ট চাহিদা ছিল। রোম সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করলে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দ থেকে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বাড়ে কিন্তু সপ্তম শতকে পশ্চিম-এঁশিয়াতে আরবদের প্রভুত্ব স্থাপিত হলে ইয়োরোপের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক রহিত হয়। তখন আরব বণিকরাই ভারতের পণ্য সামগ্রী ইয়োরোপে বেচা-কেনা করত। ইয়োরোপের বাজারে ভারতীয় মশলা এবং বস্ত্রের খুব চাহিদা ছিল। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিরা এশিয়া মাইনর এবং পূর্বের রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যানটিনোপল দখল করে নিলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যেকার বাণিজ্যপথ

তুর্কিদের হাতে চলে যায়। তাই ঐ সব পথ দিয়ে পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির পক্ষে প্রাচ্য ভূ-মণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল লাভজনক। তাছাড়া ভারতবর্ষের অফুরন্ত সম্পদ ও ঐশ্বর্য ছিল ইয়োরোপীয়দের অপর আকর্ষণ। সুতরাং পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলি ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসার নতুন জলপথের সন্ধানে প্রয়াসী হয়।

মূল উদ্দেশ্য ছিল আরব ও ভেনেসিয় বণিকদের একচেটিয়া ব্যবসা ধ্বংস করে ও তুর্কিদের পাশ কাটিয়ে ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যপথের সন্ধান। ইয়োরোপে নবজাগরণের পর ভৌগোলিক আবিষ্কারের স্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসাও বৃদ্ধি পায়। স্পেন ও পর্তুগালের নাবিকগণ এ ব্যাপারে ছিলেন পথিকৃৎ। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়েই আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন (১৪৯২)। ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে বার্থোলোমিউ ভিয়াজ নামক এক পর্তুগিজ নাবিক আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ সীমানায় 'কেপ অফ গুডহোপ' প্রদক্ষিণ করে ভারতে আসার একটি নতুন পথের সন্ধান দেন। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঐ পথেই পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কেরালার কালিকটে এসে পৌছন। ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের জলপথে যোগাযোগ আবার শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে জলপথে পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসি ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় বণিকদের ভারতে পদার্পণ ঘটে।

পর্তুগিজ বণিকদের আগমণ ঃ ভারতে পর্তুগিজ বণিকরাই এসেছিল সর্বপ্রথম। এর কারণ অবশ্য এই নয় যে পর্তুগিজ ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে প্রথম এসেছিলেন। ভারতে পর্তুগিজ নাবিক ও বণিকদের আসার তিনটি কারণ ছিল— ভয়, ঈর্ষা ও ধর্মীয় প্রেরণা। খ্রিস্টান দেশগুলির উপর ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আধিপত্য বিস্তারের ফলে পর্তুগিজরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকটা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত আরব বণিকগণ ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য দ্বারা যে প্রভূত ধনসম্পদ অর্জন করেছিল, তাতে পর্তুগিজরা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তৃতীয়ত, ভারতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের অভিসন্ধিও তাদের ছিল। পর্তুগিজদের আগমনের সময় ভারতের প্রধান রাজ্যগুলি ছিল দিল্লি, গুজরাট, বেরার, বিদর, আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিজয়নগর, কোচিন এবং কালিকট।

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনটি বাণিজ্য তরণী নিয়ে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে পৌছাবার পর সেখানকার রাজা ('জামোরিন' উপাধিধারী) তাকে ভালোভাবেই স্বাগত জানান। যদিও আরব বণিকগণ এতে আপত্তি করেছিলেন। বরং ভাস্কো ডা-গামার ব্যবহার ছিল আক্রমণাত্মক।[১] পর্তুগিজ বাণিজ্য তখন পর্যন্ত তেমন সাফল্য লাভ করেনি। প্রথমত ভাস্কো-ডা-গামা স্থানীয় রাজাদের সম্মান-উপহার দেননি, যা ছিল রীতি। দ্বিতীয়ত, পর্তুগিজ পণ্যসামগ্রী ভারতীয়দের মোটেই আকৃষ্ট করেনি। তৃতীয়ত পর্তুগিজ

নাবিকদের জলদস্যুবৃত্তি ও ভারতীয় বাণিজ্যতরী লুণ্ঠন ভারতে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তবে ভাস্কো-ডা-গামার ভারত-আবিষ্কার নতুন পথ খুলে দিয়েছিল এবং পর্তুগিজদের উৎসাহিত করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভাস্কো-ডা-গামার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে পেড্রো আলভারেজ কাব্রাল তেরোটি জাহাজ, বারো শত পর্তুগিজ এবং প্রচুর পরিমাণ পণ্যসামগ্রী নিয়ে কালিকটে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি জামোরিনের সঙ্গে দেখা করে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অধিকার লাভ করেছিলেন। কিন্তু কাব্রাল কালিকট বন্দর থেকে বলপূর্বক আরব নাবিকদের তাড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হলে জামোরিনের সঙ্গে তার বিরোধ বাঁধে। জামোরিন পর্তুগিজ বাণিজ্যকুঠি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিলে আলভারেজ কাব্রাল কালিকটের প্রতিবেশী অথচ শত্রুরাজ্য কোচিনে আশ্রয় নেন কিন্তু জামোরিনের নৌবাহিনী তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেন। এর পর ভাস্কো-ডা-গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন (১৫০২ খ্রিঃ)। তিনিও কালিকট থেকে আরব বণিকদের বিতারণ, হিন্দুতীর্থযাত্রীদের জাহাজগুলিতে জলদস্যুবৃত্তি ইত্যাদি কারণে জামোরিনের বিরাগভাজন হন। ফলে ভাস্কো-ডা-গামাও কালিকট পরিত্যাগ করে কোচিন ও ক্যান্নানোর-এ পর্তুগিজ কুঠি স্থাপন করেন। তাছাড়া পর্তুগিজরা ভারতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। কারণ পর্তুগীজদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য কালিকট-কোচিনে বিবাদ বৃদ্ধি পায়। পর্তুগিজদের ত্রুটি ছিল এই যে, তারা বাণিজ্য বৃদ্ধি করার চেয়ে অভিযান বা আক্রমণ চালানো, প্রতি বৎসর একজন করে নেতা পাঠানো, আরব বণিকদের সমুদ্র বাণিজ্য থেকে হঠিয়ে দেওয়া, ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ইত্যাদিতে বেশি মনোযোগী ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্তুগিজ সরকার তাই নীতি পরিবর্তন করে ভারতস্থিত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির রক্ষণা-বেক্ষণ ও নিরাপত্তা জোরদার করার উপর জোর দেন এবং ভারতে একজন শাসনকর্তা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আসেন ফ্রান্সিসকো আলমিদা, সঙ্গে প্রচুর সৈন্য। তার লক্ষ্য ছিল সমুদ্রের উপর পর্তুগিজদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন। ভারতে কোনও সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা যদিও তাঁদের ছিল না কিন্তু বাণিজ্য কুঠিগুলির নিরাপত্তার কারণে তিনি কোচিন ও ক্যান্নানোর-এ দুর্গ নির্মাণ করেন

১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ শাসনকর্তা হয়ে ভারতে আসেন আলফানসো আলবুকার্ক। তাকেই ভারতে পর্তুগিজ শক্তির সূচনাকারী বলা যেতে পারে। উচ্চাভিলাষী আলবুকার্ক ভারতে পর্তুগিজ সাম্রাজ্য স্থাপনেও আগ্রহী ছিলেন। কালিকট রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি ব্যর্থ হলেও ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আকস্মিকভাবে বিজাপুর সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করে সমুদ্রকূলের গোয়া বন্দরটি জয় করেন। আলবুকার্ক গোয়াকে সুরক্ষিত করে পর্তুগিজ শক্তি ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

ভারতে পর্তুগীজের ইতিহাসে আলবুকার্কই নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। ভারতে পর্তুগিজবাণিজ্য বৃদ্ধি পেল। পর্তুগালের মতন ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি প্রেরণ সম্ভবপর নয় বিবেচনা করে আলবুকার্ক ভারতস্থিত পর্তুগিজদের এ দেশীয় রমনী

বিবাহ করে পর্তুগিজ সংখ্যাধিক্য বাড়াতে নির্দেশ দেন। এর ফলেই প্রথম 'ইউরেশিয়ান' বা ইয়োরোপ-এশিয়ার মিশ্র জাতির উৎপত্তি। আলবুকার্ক বুঝেছিলেন যে প্রাচ্যের বাণিজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এডেন, ওরমুজ এবং মালাক্কা অধিকার করা প্রয়োজন, কেননা তাহলেই আরবদের অধিকার খর্ব হবে। মালাক্কা ও ওরমুজের উপর পর্তুগিজদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তবে এডেন বা জেড্ডায় ব্যর্থ হন।

আলবুকার্কের মৃত্যুর (১৫১৫) পরেও পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে একজন সর্বোচ্চ শাসক মনোনয়ন করে পাঠানো হত। এই পরবর্তী শাসকদের আমলেই ভারতে পর্তুগিজগণ দিউ, দমন, সলসেট, বেসিন, মুম্বাই, স্যানটোম ও হুগলিতে কুঠি স্থাপন করে। পর্তুগিজ বাণিজ্য প্রসারিত হয়। পর্তুগিজরা দিউ অধিকার করবার ফলে ক্যাম্বে উপসাগরের প্রবেশপথ তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, ফলে আরব বণিকগণ হতোদ্যম হয়ে পড়ে। ক্রমে সিংহলের নানা স্থানেও পর্তুগিজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের প্রধান কার্যালয় কোচিন থেকে গোয়াতে স্থানান্তরিত হয়। গোয়া ভারতে পর্তুগিজ অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানীতে পরিণত হয়।

১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ তৃতীয় পল গোয়ার ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানকে একজন বিশপের অধীনে স্থাপনের অনুমতি দেন এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে গোয়ায় প্রথম বিশপ নিযুক্ত হন। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে সুবিখ্যাত জেসুইট ধর্মযাজক ফ্রান্সিসকো জেভিয়ার গোয়াতে আসেন এবং ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে সেন্টজেভিয়ার গোয়াতেই দেহরক্ষা করেন। ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর ক্যাস্ট্রোর মৃত্যুর পর ভারতে পর্তুগিজ শক্তির পতন শুরু হয়। সতেরো শতকে তাদের অনেক বাণিজ্যকেন্দ্র ডাচ ও ইংরেজরা কেড়ে নেয়। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট শাহজাহানের আদেশে হুগলিতে পর্তুগিজদের আধিপত্য ধ্বংস করা হয়। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা রাজ্য সলসেট ও বেসিন কেড়ে নেয়। শেষপর্যন্ত পর্তুগিজদের অধিকারে ছিল কেবল *গোয়া, দমন ও দিউ*। ভারতে ইয়োরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজরাই প্রথম এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তারা তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

পর্তুগিজরা অবশ্য ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে তেমন যত্নবান ছিলেন না। বস্তুত সমুদ্রের উপর দখল এবং বাণিজ্যই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। ভারতে পর্তুগিজ শক্তির পতনের কতকগুলি কারণ আমাদের চোখে পড়ে। যেমন, শাসকমন্ডলার অদূরদর্শিতা, ইয়োরোপে পর্তুগালের শক্তিক্ষয়, পর্তুগালের দুর্বল নৌশক্তি, ভারতে দুর্বলশাসন, মিশ্র বিবাহের কুফল, ধর্মান্ধতা, জলদস্যুবৃত্তি এবং ইয়োরোপের অন্য দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতা। গোয়া, দমন, দিউ স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হয়।

ডাচ বা ওলোন্দাজ বণিকদের আগমণ ঃ ভারতবর্ষে পর্তুগিজ বাণিজ্যের উপর প্রথম আঘাত হেনেছিলেন ডাচ বণিকগণ। ডাচ অর্থাৎ হল্যান্ড বা নেদারল্যানডস্-এর অধিবাসীদের বাংলায় ওলোন্দাজও বলা হয়। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করলে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নেদারল্যান্ডের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি মিলে 'ইউনাইটেড ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করে (১৬০২ খ্রিঃ)। এই

সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি নামে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান কিন্তু নেদারল্যান্ড সরকারের কাছ থেকে তারা যুদ্ধ বিগ্রহে যোগদান, শান্তিচুক্তি স্থাপন, দুর্গনির্মাণ, সৈন্য-পোষণ ইত্যাদির অধিকারও লাভ করেছিল।

ডাচ বণিকগণ ও নাবিকগণ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে অংশগ্রহণ করতে এসে প্রথমেই পর্তুগিজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলা উৎপন্নকারী দ্বীপগুলি। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে তারা পর্তুগিজ-অধিকৃত অ্যামবয়না দখল করে নেয়। ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডাচগণ পিয়েতরসুন কোয়েন-এর নেতৃত্বে জাকার্তা জয় করে সেখানে বাটাভিয়া নামক ডাচ বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। ক্রমে সুমাত্রা, জাভা বা যবদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ডাচ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।। মালয় থেকেও তারা ইংরেজদের হঠিয়ে দেয়। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে মালাক্কা এবং ১৬৫৮-তে সিংহলের সর্বশেষ বাণিজ্য কেন্দ্রটি দখল করে নিয়ে ডাচ বণিকরা ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

ডাচ বা ওলোন্দাজ বণিক ও নাবিকগণ ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়ে পর্তুগিজদের হঠিয়ে দিতে উদ্যত হয়। তারা ভারত থেকে নীল, রেশম, পশম, আফিঙ, সোরা, ইত্যাদি রপ্তানি করত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মশলপাতি ভারতে আমদানি করত। ভারতে ওলোন্দাজ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে সুরাট (১৬১৬) চুঁচুড়া (১৬৫৩), কাশিমবাজার, পাটনা, মেগাপট্টম (১৬৫৯), কোচিন (১৬৬৩) ইত্যাদি প্রধান। তাছাড়া তারা কলকাতার কাছে বরাহনগর. উড়িষ্যার বালেশ্বর ইত্যাদি স্থান কুঠি স্থাপন করে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আঠারো শতকের শতক থেকে ভারতে ওলোন্দাজ বাণিজ্যের অবনতি ঘটতে থাকে এবং বাংলায় পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তির প্রাধান্য সূচিত হলে ডাচ প্রভাব আরও হ্রাস পায়। ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে মিরজাফরের শাসনকালে বিদরের যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে ডাচগণ ভারতে হীনবল হয়ে পড়ে। ডাচাগণ ভারতে আসার পর পর্তুগিজদের কাছ থেকে কিছু কুঠি কেড়ে নিয়েছিল কিন্তু সতেরো শতক থেকেই তাদের ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়েছিল।

ইংরেজ বণিকদের আগমণ ঃ পর্তুগিজদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে ইংরেজ বণিকগণ প্রাচ্য, বিশেষত ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। টিউডর বংশীয় রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে 'ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে। এই বণিক প্রতিষ্ঠানকে প্রাচ্যের যাবতীয় দেশে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল বিশেষ সনদ বলে। এই সময়ে ঠিক হয়েছিল যে, একজন শাসনকর্তা, একজন সহকারী শাসনকর্তা ও চব্বিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনা করবে। তবে কোম্পানির আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের পরিচালনার দায়িত্ব ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত থাকবে। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু করে।

তবে ভিত্ তৈরি হয়েছিল আগেই, ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকেই অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যু পর্যন্ত (১৬৬০) ইংল্যান্ড একদিকে যেমন নৌশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে, তেমনি বিদেশে বাণিজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। ১৫৮০

খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস ড্রেক সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে র‍্যালফ ফিচ ভারত পর্যটন করে গিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখা যায়। ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে স্প্যানিশ আর্মাডার বিরুদ্ধে ইংরেজ নৌবাহিনীর সাফল্য ইংরেজ নাবিকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন মিলডেনহল স্থলপথে ভারতবর্ষে ঘুরে গিয়েছিলেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দেই কয়েকজন ইংরেজ নাবিক ও বণিক প্রাচ্যে বাণিজ্য করার অনুমতি চেয়ে রাণী এলিজাবেথের নিকট সনদ প্রার্থনা করলে তার পরিপ্রেক্ষিতেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়েছিল।

প্রথম কয়েক বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের বদলে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালাক্কা প্রভৃতি মশলা দ্বীপে বাণিজ্য গড়ার চেষ্টা করে। জেমস্ ল্যাংকাষ্টারের নেতৃত্বে এ ব্যাপারে অভিযানও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ডাচদের সঙ্গে সমতা হয়ে উঠতে না পেরে ইংরেজরা ভারতের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হয়। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজগণ ভারতে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে গুজরাটের সুরাটে। ঐ বৎসর ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস-এর সুপারিশপত্র সহ ক্যাপ্টেন হকিন্স মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেন ও তা লাভ করেন। কিন্তু পর্তুগিজ বণিকদের ও সুরাটে ভারতীয় বণিকদের বিরোধিতার ফলে ইংরেজরা সফল হয়নি। বস্তুত প্রথমদিকে ইংরেজদের কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন, পর্তুগিজ ও ডাচদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতীয় বণিকদের অনাগ্রহ, ভারত সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা, সরকারি সাহায্য লাভে বঞ্চিত হওয়া এবং অর্থের অভাব। শেষপর্যন্ত অবশ্য বাধাগুলি ক্রমে ক্রমে দূর হয়।

১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে ইংরেজ বাণিজ্যের ক্রমবিস্তার লক্ষ্য করা যায়। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে হেনরী মিডলটন বাবেলমান্ডের প্রণালীতে সুরাটের বণিকদের কয়েকটি বাণিজ্যপোতের যাবতীয় পণ্য ইংল্যান্ড থেকে আনীত তিনখানি বাণিজ্যপোতের পণ্যের সহিত বিনিময় করতে বাধ্য হন। এই ভয়েই হয়তো ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন বেস্ট-এর নেতৃত্বে দু'খানি বাণিজ্যপোত সুরাটে প্রবেশ করলে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। পর্তুগিজরা বাধা দিয়ে ব্যর্থ হয়। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর এক 'ফরমান' দিয়ে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দিলে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে আর এক নৌযুদ্ধে ইংরেজরা পর্তুগীজদের পরাস্ত করে। ভারতের বাইরেও পারস্যরাজ পর্তুগিজদের কাছ থেকে ওরমুজ কেড়ে নেয়।

১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজার দূত হিসেবে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতে আসেন স্যার টমাস রো। তিনি তিনবছর (১৬১৫-১৮) জাহাঙ্গীরের দরবারে অবস্থান করেন এবং মোগল সম্রাটের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন। সেই কাজে সফল না হলেও ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে টমাসরো ভারত ত্যাগ করার সময়কালের মধ্যেই সুরাট, আগ্রা, আহমদনগর, ভারুচ (ব্রোচ) প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়।[১]

১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ও পর্তুগিজদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলে ইংরেজদের আরও সুবিধা হয়। ইতোমধ্যে দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডার সুলতানকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক দেওয়ার বিনিময়ে গোলকুণ্ডার সর্বত্র ইংরেজগণ যেমন বাণিজ্যের অধিকার পায়, তেমনি ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস ডে নামক এক ইংরেজ বণিক চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজে সুরক্ষিত বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। এই সুরক্ষিত বাণিজ্য কুঠির নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ করা হয়। তৎকালে তা ফোর্ট সেন্ট জর্জ নামে পরিচিত ছিল। পূবের মসুলিপট্টম বন্দরে বাণিজ্যকুঠির (১৬৩২) পরিবর্তে মাদ্রাজ হলো দক্ষিণভারতে ইংরেজ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। তেমনি ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারিন ব্রাগাঞ্জাকে বিবাহ করলে ভারতে পর্তুগিজ অধিকৃত স্থান বোম্বাই (মুম্বাই) শহরটি তাকে যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়। কয়েক বছর পর রাজা আর্থিক কারণে বোম্বাই শহরটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে হস্তান্তরিত করার পরে পশ্চিম ভারতে সুরাটের বদলে বোম্বাই হয়ে ওঠে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র।

পূর্বভারতেও ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি হয়। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত হরিহরপুর ও বালাশেরে (বালেশ্বর), ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে বিহারের পাটনা এবং বাংলার কাশিমবাজারে কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজরা প্রধানত রেশমী ও সূতীবস্ত্র, সোরা ও চিনি ক্রয় করত। ইতোমধ্যে কোম্পানির নীতি পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং তারা ভারতের রাজনৈতিক গোলোযোগে রাজ্যস্থাপনে উৎসাহী হয়। তাছাড়া ভারতের বাণিজ্য কুঠিগুলির সুরক্ষার জন্য তারা অস্ত্র ও সৈন্য মোতায়েন, দুর্গ নির্মাণ ইত্যাদির প্রয়োজন অনুভব করে। এমনকি তারা মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পর্যন্ত করেছিল সুরাট এবং বাংলাদেশে (১৬৮৬ থেকে ১৬৮৮ এর মধ্যে)। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ নিলে কোম্পানি আওরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সঙ্গে মোগলদের নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এরপরই কোম্পানির কর্মচারি জোব চার্নক সুতানটি, গোবিন্দপুর এবং ডিহি কলকাতা নিয়ে বাণিজ্যিক মহানগরী কলকাতার পত্তন করেন। এরপর বাংলাদেশে ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে তারা নব প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যকুঠি সুরক্ষিত করার অনুমতি লাভ করে। এর পর ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বাৎসরিক বারোশত টাকার খাজনার শর্তে সুতানটি, গোবিন্দপুর এবং ডিহি কলকাতার জমিদারি স্বত্ব লাভ করল। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ইংল্যান্ড-রাজ তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি নির্মাণ করা হয় এবং পূর্ব ভারতের বাণিজ্য কুঠিগুলি একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিলের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই নবগঠিত কাউন্সিলের প্রধান কর্মকেন্দ্র হলো ফোর্ট উইলিয়াম এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর হলেন চার্লস আয়ার।

ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয়চার্লস এর রাজত্বকালে (১৬৬০-১৬৮৫) এবং দ্বিতীয় জেমস্ এর রাজত্বকালে (১৬৮৫-৮৮) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ইংল্যান্ডের

কোম্পানির শত্রুরা ঐ কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করলে, ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট একটি নতুন কোম্পানি গঠনের আইন প্রণয়ন করে। পরে অবশ্য পুরাতন কোম্পানির সঙ্গে তার সংযুক্তি ঘটে। এই সংযুক্ত কোম্পানিই ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি নামে পরিচিত হয়। তাদের একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার বহাল ছিল ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার আইন পর্যন্ত।

১৭০০ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস ক্ষমতাবৃদ্ধি ও অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন করে। তারা শুধুমাত্র বাণিজ্যের উন্নতি করেছিল, তাই নয়, অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তিগুলিকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে দিয়েছিল। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুখ শিয়ারের কাছ থেকে এক বিশেষ 'ফরমান' বা আদেশ বলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় বিশেষ কতকগুলি বাণিজ্যিক সুবিধালাভ করে। যেমন—(১) বার্ষিক তিনহাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার (২) বার্ষিক ১১৯৫ টাকা ৬ আনা দেওয়ার শর্তে কলকাতার জমিদারিলাভ এবং (৩) কলকাতার সংলগ্ন আরও ৩৮টি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব বার্ষিক ৮১২১ টাকা ৮ আনার লাভ করে। এছাড়া দুটি নতুন ধারা ছিল ঃ (১) কোম্পানির 'দস্তক' বা ছাড়পত্র দেবার অধিকার। দস্তক ছিল এক ধরনের ছাড়পত্র যা কোম্পানির কলকাতা কুঠির অধিকর্তারা বিলি করতে পারতেন। যা দেখালে নবাবের কর্মচারিবৃন্দ মালপত্র যাতায়াতে বাধা দিতে পারতেন না এবং টাকা আদায় করতে পারতেন না। এবং (২) মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে কোম্পানির সোনা-দানা থেকে মুদ্রা তৈরি করার অধিকার তারা লাভ করে।[১]

ভারতে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশের বণিকদের আগমন ঘটলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজ ও ফরাসিরাই টিকে ছিল ক্ষমতা নিয়ে। ফলে ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, যার পরিণতিতে ইংরেজদের সাফল্য এবং ফরাসিদের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। অবশ্য কতকগুলি বিশেষ সুবিধার জন্য ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ করে।[২]

ফরাসি বণিকদের আগমণ ঃ ইয়োরোপীয় বণিকদের মধ্যে সবশেষে ভারতে এসেছিল ফরাসিরা। সরকারি সাহায্য ছাড়াই কোনও কোনও ফরাসি বণিক বাণিজ্যপোত নিয়ে প্রাচ্যে এসেছিলেন। এদের মধ্যে গাইলস্ দ্য রেজিমেন্ট ও রিগ্যান্ট এর নাম পাওয়া যায়। সতেরো শতকের মধ্যভাগে ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ে মোগল দরবার ও ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও পণ্য নিয়ে বিবরণী লেখেন, তা পাঠ করে ফ্রান্সের সহিত ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

ফরাসি বুবর্বোঁ বংশীয় রাজা চতুর্দশ লুইয়ের অর্থমন্ত্রী কোলবেয়ার (ইংরেজি উচ্চারণ কোলবার্ট) এর উদ্যোগে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ লুই এই কোম্পানিকে বিনাসুদে ত্রিশ লক্ষ লিভর ঋণ দিয়েছিলেন। সরকারি সাহায্য পুষ্ট এই কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য স্থাপনে এগিয়ে আসে। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির

পক্ষে ফ্রাঁসোয়া কাঁ্যারো সুরাটে সর্বপ্রথম ফরাসি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। মারকারা নামক অপর একজন বণিকের দ্বারা ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় কুঠি স্থাপিত হয় দাক্ষিণাত্যের মুসলিপত্তমে। ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরা মাদ্রাজের নিকটস্থ স্যানটোম ওলোন্দাজদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। ফলে ডাচ-ফরাসি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। গোলকুন্ডার সুলতান ও ডাচদের যুগ্মবাহিনী ফরাসি অ্যাডমিরাল লা হে-কে পরাজিত করে স্যানটোম পুনরায় কেড়ে নেয়। ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া মার্তা (ইংরেজি উচ্চারণে মার্টিন) বালিকুন্ড পুরমের নবাবের কাছ থেকে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ইজারা লাভ করে এক ফরাসি উপনিবেশ গড়ে তোলেন। এর বর্তমান নাম পন্ডিচেরী। এই পন্ডিচেরী ক্রমে সমৃদ্ধ হয়ে ভারতে ফরাসি বাণিজ্যের সর্বপ্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিগণ বাংলার শাসানকর্তা শায়েস্তা খাঁর কাছ থেকে চন্দননগরে কুঠিস্থাপনের অনুমতি লাভ করে ফরাসি কুঠি স্থাপন করে।

অতঃপর আঠারো শতকে ফরাসি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থবল কমে এলে সুরাট এবং মুসলিপত্তম কুঠি তাদের হাতছাড়া হয়। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দের পর ফরাসি কোম্পানি নতুনভাবে গঠিত হলে অবস্থার উন্নতি হয়। ফরাসিরা ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বাইরে যেমন মরিশাস দখল করে, তেমনি ভারতে মাহে (১৭২৫) এবং কারিকল (১৭৩৯) দখল করে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ভারতে ফরাসিদের কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রথম ছিল না, বাণিজ্যবিস্তারই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু আঠারো শতকের মধ্যভাগে দুপ্লের আগমণের পর এবং ইঙ্গ ফরাসি দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার বদল ঘটে। সেই দ্বন্দ্বের কাহিনী পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে।

অন্যান্য ইয়োরোপীয় বণিক দল ঃ পর্তুগিজ, ইংরেজ, ডাচ এবং ফরাসি বণিকগণ ছাড়াও ইয়োরোপ থেকে অন্যান্য বণিকদলের আবির্ভাব ঘটেছিল যদিও শেষ পর্যন্ত ভারতের মাটিতে কেউই সাফল্য লাভ করেনি। যেমন ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে ড্যানিশ বা দিনেমার বণিকগণ 'ড্যানিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' স্থাপন করে। তারা ভারতে এসে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্য শুরু করে। হুগলির শ্রীরামপুরে তাদের কুঠি ছিল। শেষপর্যন্ত ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে তারা ভারতের কুঠি ইংরেজদের বিক্রি করে দিয়ে চলে যায়। অনুরূপভাবে ফ্ল্যান্ডার্সের বণিকগণ 'ওয়েস্টেন্ড কোম্পানি' (১৭২৩), সুইডেনের বণিকরা 'সুইডিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' (১৭৩১), অস্ট্রিয়ার বণিকরা 'অস্ট্রিয়ান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' (১৭৫৫) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেও, ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা আদৌ সা ফল্য লাভ করতে পারেনি।

৪। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাফল্য

ইয়োরোপীয় বণিকদের প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এলেও শেষপর্যন্ত ইংরেজ এবং ফরাসি কোম্পানিই ছিল প্রধান। আবার এরা ছিলেন পরস্পরের প্রতিপক্ষ। ভারতে ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল দীর্ঘকাল এবং শেষপর্যন্ত ইংরেজরাই সফল হয়েছিল। ফরাসিরা ভারতের চারটি মাত্র স্থানে (চন্দননগর, পন্ডিচেরী, কারিকল, মাহে) নিজেদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধতা রাখতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতে যে ইঙ্গ-ফরাসি

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল তার কারণ দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একদিকে, তাদের বিরোধের কারণ অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে যেহেতু ইয়োরোপে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড ছিল পরস্পরের শত্রু তাই ভারতেও তারা পরস্পরের বৈরি ছিল। যখন তারা ভারতীয় রাজনীতিতে এবং দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে তখন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ছিল বিরোধীপক্ষে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিরাজউদ্‌দৌলার বিপক্ষে ছিল, ফলে ফরাসি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের পক্ষে ছিল। তবে ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার বৃহত্তর ক্ষেত্র ছিল দাক্ষিণাত্য।

দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগে যেসব ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল তাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের ইঙ্গ-ফরাসি রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সময় ইংরেজ ও ফরাসি উভয় কোম্পানিই দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। করমন্ডল উপকূলে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি ছিল মাদ্রাজ, আর ফরাসিদের প্রধান কেন্দ্র ছিল পণ্ডিচেরীতে। নৌশক্তি ও বাণিজ্য বলে ইংরেজ ও ফরাসিরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তুলনায় অনেক বড়ো ছিল, বিদেশীদের কাছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছিল নিষ্প্রভ। তাই মূলত বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হলেওউভয় কোম্পানিই ধীরে ধীরে স্থানীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে থাকে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্য মোগল সম্রাটের অধীনে থাকলেও আঠারো শতকের মধ্যভাগে ঐ অঞ্চল থেকে মোগল প্রভাব ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে। দক্ষিণ ভারতের মোগল সুবাদার নিজাম-উল্-মুলক কার্যত স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করতেন। তাঁর অধীনে কর্ণাটক ছিল একটি প্রদেশ এবং আর্কট ছিল তার রাজধানী। নিজাম যেমন মোগল বাদশাহকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীন হয়েছিলেন, কর্ণাটকের নবাব তেমনি নিজামকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে মারাঠারা কর্ণাটক আক্রমণ করে আর্কটের নবাব দোস্ত আলিকে হত্যা করে এবং নবাবের জামাতা চান্দা সাহেবকে সাতারায় বন্দী করে নিয়ে যায়। এই রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে নিজাম স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন এবং আনোয়ারউদ্দিন নামে এক সুদক্ষ কর্মচারীকে কর্ণাটকের নবাব নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর এই মীমাংসায় কেউ খুশি হতে পারেননি। দোস্ত আলির কর্মচারীরা এবং চাঁদা সাহেব কেউ আনোয়ার উদ্দিনকে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সুযোগে ইংরেজ ও ফরাসিরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ শুরু করল।

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৪৪-৪৮ খ্রিঃ) ঃ ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স প্রাশিয়ার পক্ষে এবং ইংল্যান্ড অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করে। ইয়োরোপে যেহেতু তারা পরস্পর বিরোধী পক্ষে ছিল সেই হেতু ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফরাসিরা ভারতে নিরপেক্ষতা নীতিরই সমর্থক ছিল এবং শান্তি বজায় রাখার জন্যে ব্রিটিশ

কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করত। কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানি তাদের কথায় কর্ণপাত করত না। ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে নৌসেনাপতি বার্নেটের নেতৃত্বে এক ইংরেজ বাহিনী পণ্ডিচেরী আক্রমণ করলে পণ্ডিচেরীর ফরাসি গভর্নর ডুপ্লে মরিসাসের ফরাসি শাসনকর্তা লা বুর্দনের নিকট সামরিক সাহায্যের জন্যে আবেদন জানালেন। অবিলম্বে লাবুর্দনে মাদ্রাজের দিকে অগ্রসর হলেন এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাবুর্দনে ডুপ্লের আগ্রহ ও আতিশয্যে মাদ্রাজ অবরোধ করলেন। ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। অনেকেই ডুপ্লে এবং ফরাসিদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন মনে করলেন। এরূপ নাটকীয় পরিস্থিতিতে কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দিন নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেননি। বার্নেট পণ্ডিচেরী আক্রমণে উদ্যত হলে ডুপ্লে আনোয়ার উদ্দিনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নবাব ইংরেজদের পণ্ডিচেরী পরিত্যাগের আদেশ দিলেও ইংরেজগণ সে-কথায় কর্ণপাত করেনি। আবার মাদ্রাজ যখন ফরাসিদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয় তখনই ইংরেজরা আনোয়ারউদ্দিনের শরণাপন্ন হন এবং ডুপ্লেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেন। ডুপ্লে নবাবের কথায় কর্ণপাত করেননি। তবে কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দিনকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে মাদ্রাজ অধিকার করে ঐ অঞ্চল তিনি নবাবকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু মাদ্রাজ অধিকার করার পর ডুপ্লে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। তাই আনোয়ারউদ্দিন ফরাসিদের বিরুদ্ধে এক বিশালবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই বিশালবাহিনী মুষ্টিমেয় ফরাসি সৈন্যের হাতে সহজে সেন্ট টোমের (St. Thome) যুদ্ধে পরাজিত হলো। এই যুদ্ধে নবাববাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০,০০০ এবং ফরাসি বাহিনীতে ছিল মোট ৯৩০ জন সৈনিক। ফরাসি-বাহিনীতে ইয়োরোপীয় সৈন্য ছিল মাত্র ২৩০ জন, বাদবাকি ৭০০ জন ছিল দেশীয় সৈনিক।

এই যুদ্ধ জয়ের পর ফরাসি নায়কদের মধ্যে শুরু হলো বিবাদ-বিসংবাদ। লা বুর্দনের ইচ্ছা ছিল— মাদ্রাজ ইংরেজদের হাতে ফেরৎ দেওয়া হোক, ডুপ্লে কিছুতেই এই প্রস্তাব মানতে পারেননি। উভয় নেতার মধ্যে যখন মতভেদ চলছে তখন সামুদ্রিক ঝড়ে লা বুর্দনে যুদ্ধ জাহাজটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। ফলে ডুপ্লের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো, মাদ্রাজ ফরাসিদের দখলে রয়ে গেল। ফরাসি নেতাদের বিবাদের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা পণ্ডিচেরী আক্রমণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। ঠিক এই সময় ইয়োরোপের অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হলো। সেখানকার আই-লা-স্যাপেলের সন্ধি (Treaty of Aix-la-Chapelle, 1748) অনুসারে ইংরেজরা ফিরে পেল তাদের মাদ্রাজ। এইভাবে প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হলো।

এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে প্রথমেই মনে হয় যে, উভয় পক্ষের পরিস্থিতি পূর্ববৎ রয়ে গেল। কিন্তু কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করলে জানা যায় যে, পরিস্থিতির বহু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। এই যুদ্ধের ফলে প্রথমত ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য বিস্তারের এক বিরাট সম্ভাবনা নেতা ডুপ্লের সামনে উদ্ভাসিত হলো। দ্বিতীয়ত, ঘটনার মাধ্যমে ডুপ্লের সামরিক খ্যাতি

বৃদ্ধিপেল। তৃতীয়ত, ইয়োরোপীয়দের নিকট ভারতীয় নরপতিদের দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করল। ফলে উভয়পক্ষই অর্থাৎ ইংরেজ ও ফরাসিরা ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত হলো। চতুর্থত, দেশীয় নরপতিদের মধ্যে চলছিল তখন ক্ষমতার লড়াই। বিদেশী সামরিকবাহিনীর উৎকর্ষ লক্ষ্য করে স্বদেশী নরপতি ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই বিদেশী সামরিক সাহায্য গ্রহণে আগ্রহী হলো এবং ভারতের নৌ-শক্তির দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করায় তার উন্নতি বিধানের জন্যে অনেকেই তৎপর হয়ে উঠলেন।

দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৪৯-৫৪ খ্রি:) ঃ ইয়োরোপের আই-লা-স্যাপেলের সন্ধি ভারতে বাণিজ্যেরত ইংরেজ ফরাসি দ্বন্দ্বের স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডুপ্লে ফরাসিরাজের আদেশে মাদ্রাজ কেন্দ্রটি ইংরেজের হাতে প্রত্যার্পণ করেন। দেশীয় শক্তির দুর্বলতা লক্ষ্য করে তিনি ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অল্পকাল মধ্যে তার সেই আশা পূরণে অনুকূল একটি রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত সুবাদার আসফ ঝা নিজাম-উল্-মুলকের মৃত্যুতে তাঁর পুত্র নাসির জঙ্গ এবং পৌত্র মুজাফফর জঙ্গ-এর বিরোধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। ইতিমধ্যে মারাঠা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে চান্দা সাহেব আর্কটের নবাব আনোয়ারউদ্দিনের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হলেন। দক্ষিণ ভারতের এই জটিল উত্তরাধিকার সমস্যা ডুপ্লের নিকট এক রাজনৈতিক সুযোগ হিসেবে উপস্থিত হলো। তিনি মুজফ্ফর জঙ্গ এবং চান্দা সাহেবের পক্ষ সমর্থন করে আশ্বাস দিলেন যে, মুজফ্ফর জঙ্গকেদাক্ষিণাত্যের সুবাদারীতে এবং চান্দা সাহেবকে আর্কটের নবাবীতে অধিষ্ঠিত করবেন। ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত ত্রিশক্তির মিলিত বাহিনী ভোলার -এর নিকটেএক যুদ্ধে আনোয়ার উদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করল। আনোয়ার উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিচিনাপল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ফরাসিরা সঙ্গে সঙ্গে ঐ শহর আক্রমণ করল। চান্দা সাহেব কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পণ্ডিচেরীর চারপাশে আশিটি গ্রাম ফরাসিদের উপঢৌকন দিলেন।

ইংরেজরা এতদিন দাক্ষিণাত্যের এই বিরোধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি। এবার ফরাসিদের উক্ত প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে ইংরেজরা শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হলো। কিন্তু তাদের তরফ থেকে সেই মুহূর্তে বিশেষ কিছুই করার ছিল না। ইংরেজরা এবার হায়দ্রাবাদে নাসির জঙ্গ ও আর্কটের মহম্মদ আলিকে (আনোয়ার উদ্দিনের পুত্র) সক্রিয়ভাবে সাহায্য দানে অগ্রসর হয়। তবে ফরাসিদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে এক পাঠানের হাতে নাসির জঙ্গ নিহত হলে ফরাসি পক্ষের মুজফ্ফর জঙ্গ নিজেকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বলে ঘোষণা করেন। নিজামের দরবারে যাতে ফরাসি প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে তার জন্যে সেনাপতি বুসী (Bussy) কে হায়দ্রাবাদে অধিষ্ঠিত করা হলো। বুসীর সঙ্গে ছিল একদল ফরাসি বাহিনী। মুজাফ্ফর জঙ্গ কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ ডুপ্লেকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে উপকূলবর্তী অঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় শাসনকর্তা হিসেবে

নিয়োগ করলেন। হায়দ্রাবাদে মুজফ্‌ফর জঙ্গ এবং আর্কটে চান্দা সাহেব রাজত্ব করতেথাকায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে ফরাসি প্রভাব বিস্তৃত হলো। কিন্তু ফরাসিদের এই প্রভাব ইংরেজদের মনে একদিকে যেমন শঙ্কা সৃষ্টি করল, অন্যদিকে তেমনি তাদের ফরাসিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার নেওয়ার জন্যে উৎসাহিত করল।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের ইংরেজ শাসনকর্তা হিসেবে এলেন সন্ডার্স। তিনি ছিলেন যথেষ্ট বিচক্ষণ। স্মরণ করা যায় যে, ইংরেজ পক্ষের আনোয়ার উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিচিনাপল্লীতে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর থেকে ফরাসি বাহিনী ত্রিচিনাপল্লী অবরোধ করে। ইংরেজরা সেই সময় থেকে ত্রিচিনাপল্লীতে মহম্মদ আলিকে সাহায্য করতে অগ্রসরহয়। মহম্মদ আলি ও গভর্নর সন্ডার্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ত্রিচিনাপল্লীকে রক্ষা করতে হলে এই সময় আর্কট আক্রমণ করা উচিত। রবার্ট ক্লাইভ নামক এক সাধারণ সৈনিক উক্ত প্রস্তাব কার্যকরি করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি এসেছিলেন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির এক সামান্য কেরাণী হিসেবে। কিছুদিনের মধ্যে তিনি কোম্পানি সৈন্যদলে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যে তার সামরিক প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহম্মদ আলি ও সন্ডার্স-এর প্রস্তাব অনুসারে রবার্ট ক্লাইভ তড়িৎ গতিতে আর্কট দখল করলেন। তার সঙ্গে ছিল মাত্র দু'শ জন ইংরেজ ও তিনশ জন দেশীয় সৈনিক। রবার্ট ক্লাইভের প্রত্যাশানুযায়ী চান্দা সাহেব ও ডুপ্লে ত্রিচিনাপল্লী থেকে তাদের বাহিনী তুলে নিতে বাধ্য হলেন। এই ঘটনার পর থেকে বার বার ফরাসিদের পরাজয় ঘটতে থাকে। ফরাসি সেনাপতি জাক্‌ল (Jacques Law) ১৭৫২ খিস্টাব্দে সদলবলে আত্মসমর্পণ করেন। ইংরেজের হাতে চান্দা সাহেব বন্দী অবস্থায় নিহত হলেন। ইংরেজদের সহায়তায় মহম্মদ আলি আর্কটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ডুপ্লের প্রচেষ্টা হতাশায় পরিণত হলো।

ডুপ্লে অবশ্য সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি ইংরেজের বন্ধু মারাঠা নেতা মুরারি রাও এবং তাঞ্জোর ও মহীশূরের রাজাদের দলে টানতে সমর্থ হলেন। রবার্ট ক্লাইভের যুদ্ধ জয় তাঁদের মনেও শঙ্কা সৃষ্টি করেছিল। শঙ্কিত এই নবপতিদের নিয়ে ডুপ্লে পুনরায় ত্রিচিনাপল্লী অবরোধ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন (১৭৫২-৫৩ খ্রিঃ)। কিন্তু ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ ডুপ্লের এই অগ্রসর নীতি মোটেই পছন্দ করেন নি। ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সরকারি হুকুমে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করা হয়। তাঁর পরিবর্তে ভারতে প্রেরিত হলেন গডেহু *(Godehu)*। গডেহু ভারতে এসেই ইংরেজদের সঙ্গে এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির শর্ত অনুসারে উভয় পক্ষই দেশীয় রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, হায়দ্রাবাদের ক্ষেত্রে বুসীর ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল। বুসী হায়দ্রাবাদে এসেছিলেন ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বছরই মুজফ্‌ফর জঙ্গ উত্তরাভিমুখে যাওয়ার পথে এক আততায়ীর হাতে নিহত হন। তখন ফরাসি সেনাপতি বুসী প্রথম নিজাম আসফ ঝার তৃতীয় পুত্র সলাবৎ জঙ্গকে হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে বসিয়ে দেন। তখন থেকে হায়দ্রাবাদের নিজামের ধন ভাণ্ডারই ছিল ফরাসিদের যুদ্ধ ব্যয় বহনের উৎস। ডুপ্লের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সেই শোষণ হ্রাস পেল।

তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩ খ্রিঃ) ঃ ডুপ্লের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর (১৭৫৪ খ্রিঃ) ভারতে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে স্তব্ধ ছিল। ইয়োরোপে যখন ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'সাত বছরের যুদ্ধ' *(Seven years war; 1756-63)* আরম্ভ হলো তখন ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষের সূচনা হলো। দক্ষিণ ভারতে আরম্ভ হলো তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ। যুদ্ধের এই পর্যায়ে ফরাসি সরকার কাউণ্ট লালি-কে পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা হিসেবে ভারতে প্রেরণ করলেন। লালির ভারতে পৌঁছাবার পূর্বেই ক্লাইভ ও নৌ-সেনাপতি ওয়াট্সন চন্দননগর অধিকার করেছিলেন (১৭৫৭ খ্রিঃ)। পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে ক্লাইভ বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্বকে সুদৃঢ় করেন (১৭৫৭ খ্রিঃ)।

ভারতে এসেই (১৭৫৭ খ্রিঃ) কাউন্ট লালি সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার করে মাদ্রাজ আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে ইংরেজদের পরাজিত করতে হলে মাদ্রাজ অধিকার করা একান্ত প্রয়োজন। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে লালি মাদ্রাজ অবরোধ করলেন। ঠিক সেই সময় লালি হায়দ্রাবাদ থেকে বুসীকে সরিয়ে এনে মারাত্মক ভুল করলেন। এর ফলে হায়দ্রাবাদে ইংরেজদের প্রভাব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হলো। এদিকে লালির মাদ্রাজ জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কারণ, ইতোমধ্যে ইংরেজ নৌবহর এসে উপস্থিত হওয়ায় লালি অবরোধ মুক্ত করতে বাধ্য হন। এই ইংরেজ নৌবহরে একাংশের নেতৃত্বে ছিলেন কর্নেল ফোর্ড এবং অন্য অংশে ছিলেন সেনাপতি আয়ার কূট। কর্নেল ফোর্ড "উত্তর সরকার" জেলাগুলি দখল করলেন এবং আয়ার কূট ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী বান্দিবাসের যুদ্ধে লালিকে পরাজিত করলেন। পরের বছর (১৭৬১ খ্রিঃ) খাস পণ্ডিচেরী ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। পণ্ডিচেরী ইংরেজদের হাতে লুণ্ঠিত হলো। পণ্ডিচেরীর পর একে একে মাহে ও জিঞ্জির পতন ঘটে।

ইতোমধ্যে ইয়োরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিতে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ফরাসিরা পণ্ডিচেরী, মাহে, চন্দননগর ইত্যাদি স্থানগুলি ফিরে পায়। কিন্তু এগুলিকে সুরক্ষিত করার অধিকার থেকে ফরাসিরা বঞ্চিত হয়। শুধুমাত্র বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে ফরাসিরা উক্ত স্থানগুলি ব্যবহার করবে —এখানে তাদের সৈন্য রাখার অধিকার থাকবে না। সুতরাং ভারতে ফরাসিদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চিরতরে স্তব্ধ হলো।

অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষের বুকে রাজনৈতিককর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ইংরেজ ও ফরাসি বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে যে সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল ইয়োরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রিঃ) সমাপ্তির পর ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে। প্যারিসের সন্ধিতে ভারতে ইংরেজদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। অন্যদিকে ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। সুতরাং আঠোরো

শতকে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বে ইংরেজের সাফল্যই ঘোষিত হলো। ইংরেজের এই সাফল্য ও ফরাসিদের ব্যর্থতার পশ্চাতে অনেককারণ ছিল। কারণগুলি হলো—

প্রথমত, আঠারো শতকে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বে ইংরেজের সাফল্য ও ফরাসিদের ব্যর্থতার পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ ও ফরাসি উভয় কোম্পানিই ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। সমকালীন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সামিল হলেও ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করত। তাছাড়া তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের সময় ইংরেজরা পলাশি যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়। এই সম্পদই ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে, ব্যবসার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেও ফরাসি ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ায় তারা বাণিজ্যের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্থিক অভাবে ডুপ্লের ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। আবার কাউন্ট লালির আগমনের পর ফরাসি সরকার ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম চালনার জন্যে তাঁকে যে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন তা যথেষ্ট ছিল না। ফলে ডুপ্লের ব্যর্থতার পর কাউন্ট লালিও রাজনৈতিক আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হলেন।

দ্বিতীয়ত, সাংগঠনিক বিচারে ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পানির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সরকারি অনুমোদন ও কয়েক বছর অন্তর অন্তর সনদ নবীকরণের মাধ্যমে এই কোম্পানি স্বাধীনভাবে কর্ম পরিচালনা করতে পারত। যে কোনও কর্মে উদ্যোগ গ্রহণ, পরিকল্পনা অনুসারে কর্মের রূপায়ন, পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে কর্মদক্ষতার উন্নয়নে প্রয়োগ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানি ছিল মুক্ত। কিন্তু ফরাসি ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটিসরকারি প্রতিষ্ঠান। ফরাসি সরকারই এই কোম্পানি পরিচালনার উদ্দেশ্যে কর্মী নিয়োগ করতেন। সরকারি আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন ভিন্ন কোম্পানি কোনও কাজ স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করতে পারত না। ফরাসি সরকারের উপর নির্ভরতা ফরাসি কোম্পানিকে দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী করেছিল। ফরাসি কোম্পানির এই সাংগঠনিক অবস্থা তাকে ইংরেজ কোম্পানি অপেক্ষা দুর্বল করেছিল।

তৃতীয়ত, নেতৃত্বের সবলতা ও দুর্বলতা ছিল যথাক্রমে ইংরেজ ও ফরাসিদের জয় ও পরাজয়ের বিশেষ কারণ। ইংরেজ পক্ষে ছিলেন সন্ডার্সের মত সাংগাঠনিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, রবার্ট ক্লাইভ, ওয়াটসন, লরেন্স, স্যার আয়ার কূটের মত প্রতিভাবান সামরিক নেতা। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, ফরাসিরা যখন ত্রিচিনাপল্লী অবরোধ করল তখন রবার্ট ক্লাইভের বাহিনী আর্কট আক্রমণ করে ত্রিচিনাপল্লী থেকে ফরাসি বাহিনীকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য করে। সুতরাং নেতৃত্বের সবলতাই ইংরেজদের জয়লাভে সাহায্য করে। অন্যদিকে ফরাসি পক্ষের নেতাদের নানা কারণে দুর্বল হতে হয়েছিল। এখানে ছিল অনুকূল ব্যক্তিত্ব ও কূটনৈতিক লোকের অভাব। তার উপর ডুপ্লের মত ব্যক্তিত্বও স্বদেশী কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে ভারতে ফরাসি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়নের চেষ্টা করেন— যা ছিল দেশের আইন

বহির্ভূত কর্ম। তাছাড়া, ফরাসিরা দেশীয় রাজাদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করে তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এই নির্ভরশীলতাই ফরাসিদের পতনের অন্যতম কারণ। আবার, বুসীকে হায়দ্রাবাদ থেকে অপসারিত করে ফরাসিরা মারাত্মক ভুল করেছিলেন। বুসীর অপসারণের ফলে হায়দ্রাবাদে ইংরেজদের তৎপরতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হলো। অবশেষে বলা যায়, ডুপ্লে যেমন ছিলেন মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী তেমনি কাউন্ট লালি ছিলেন রূক্ষ। ফলে এই দুজন নেতার উপর ফরাসি কর্মচারীরা মোটেই খুশি ছিলেন না। ফলে তারা ফরাসি স্বার্থ অপেক্ষা স্ব-স্ব স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। যাই হোক, ফরাসি নেতৃত্বের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ছিল না যার ফলে তাদের কোনও প্রচেষ্টাই সার্থক হতে পারে নি।

চতুর্থত, ফরাসিদের বিফলতার অন্যতম কারণ হলো তাদের নৌ-শক্তির অভাব। ব্রিটিশ নৌশক্তি ছিল ফরাসি নৌশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। সামুদ্রিক শক্তিতে ইংরেজ শক্তিশালী হওয়ায় ভারতের অন্যান্য উপকূল থেকে এবং ইয়োরোপের মূলভূখণ্ড থেকে অর্থ ও সৈন্য সামন্ত আনা ও সরবরাহ করা সহজ ছিল। আর সমুদ্রের উপর প্রাধান্য না থাকায় ফ্রান্স ছিল নৌশক্তিতে হীনবল। মরিসাসে সামরিক ঘাঁটি থাকলেও সেখান থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রণতরী ও সৈনিক সরবরাহ করা সম্ভব হত না। ফলে ফরাসিদের পরাজয় নিশ্চিত ছিল।

পঞ্চমত, মূল ইয়োরোপ ভূখণ্ডে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও অবস্থানের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান—যা ফরাসিদের ভারতে বিফলতার বোঝা বহনে বাধ্য করে এবং ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।ইয়োরোপে ফ্রান্স ছিল অবক্ষয়ের ধারায় ক্ষয়িষ্ণু এবং ফরাসি বিপ্লবের দিকে গতিশীল। সেখানকার অভিজাতরা ছিলেন ব্যবসায়ের লভ্যাংশ ভোগের পক্ষপাতী। ফরাসি কোম্পানির বাণিজ্যের প্রসার হলো কিনা তা তারা দেখতে চাইতেন না। তাছাড়া আমেরিকায় ফরাসি কর্তৃত্ব ছিল ক্রমক্ষয়িষ্ণু। ফলে ফরাসিরা ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিল না। সুতরাং ফরাসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যেহেতু সরকারি সংস্থা, তাই সংস্থাকে নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্যে ফরাসি সরকার সর্বদা চেষ্টা করতেন। ফলে স্বাধীনভাবে কোম্পানি কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ন করতে পারত না। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান কখনই বেসরকারি সংস্থা ইংরেজ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর প্রভাব বিস্তার করত না এবং ইংরেজ কোম্পানি ছিল স্বদেশের সরকার ও সাধারণ মানুষের সহায়ক। ব্যবসায়ের মাধ্যমে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল সর্বোত্তম। ফলে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বে তাদের জয় ছিল নিশ্চিত। প্যারিসের শান্তি চুক্তির (১৭৬৩ খ্রিঃ) শর্ত বিচার করলে অনুধাবন করা যায় যে, ফরাসিদের হতমান হয়েই চুক্তির শর্ত মেনে নিতে হয়েছিল। ভারতে সীমিত কয়েকটি স্থানে ফরাসিদের বাণিজ্যে অধিকার রইল বটে, কিন্তু ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সকল সম্ভাবনাই চিরতরে মুছে গেল।

অধ্যায় ৭

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল ঃ গোড়ার যুগ

Syllabus : Early stages of the rise of the E.I. Company.

১। পলাশি, বকসার ও দেওয়ানি ঃ

সূচনা ঃ ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। কিন্তু আঠারো শতকের রাজনৈতিক ডামাডোলের অন্ধকারে ক্রমে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ডরূপে।' তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং শাসনের অধিকার তারা একসঙ্গে সমগ্র ভারতে পায়নি। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আত্মপ্রকাশ বাংলায় ঘটে। নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭) পরাজয় এই আত্মপ্রকাশের প্রথম পদক্ষেপ, তারপর বকসারের যুদ্ধে জয় (১৭৬৪) তার পরবর্তী উত্তরণ এবং পরিণতি মোগল সম্রাট ক্ষমতাহীন দ্বিতীয় শাহ্ আলম কর্তৃক কোম্পানিকে প্রদত্ত 'দেওয়ানি' বা রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া। এর ফলে বাংলার নবাবি শাসনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কোম্পানির শাসন শুরু হয়। কিন্তু এই 'দ্বৈত' শাসন (১৭৬৫-৭২) ক্ষতিকারক ও উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক না হওয়াতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সরাসরি নিজেদের হাতেশাসন ক্ষমতা নেয় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। সেই থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর মহারাণীর ঘোষণা (১৮৫৮) পর্যন্ত কোম্পানির শাসন বহাল ছিল।

ইতোমধ্যে কোম্পানি-বাহাদুর সারা ভারতে সার্বভৌম ক্ষমতাবান শাসকে পরিণত হয়। ভারতবর্ষ পরিণত হয় উপনিবেশে। ১৭৭২ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় কোম্পানির আমলের গোড়ার পর্ব। পাঠ্যসূচি এই পর্যন্ত, তবে আলোচনার ধারাবাহিকতার প্রয়োজনে দ্বিতীয় পর্বও (১৮১৮-১৮৫৭) বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কোম্পানির আমলে ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা, ভারতের অর্থ সম্পদ নিজদেশে নিয়ে যাওয়া এবং সম্প্রসারণশীল নীতির দ্বারা সারা ভারতকে পদানত করে রাখাই ছিল ঔপনিবেশিক নীতি। এজন্য তারা শাসন কাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি, সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, আবার কখনও করেছে যুদ্ধ কখনও আশ্রয় নিয়েছে কূটনীতির।

বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান (১৭৫৭-১৭৭২) ঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খ্রিঃ) পর বাংলা সুবায় নবাবী যুগের সূত্রপাত হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্‌দৌলা, সরফরাজ খাঁ ও আলিবর্দী খাঁর আমল পর্যন্ত (১৭০৭-১৭৫৬ খ্রিঃ) নবাবদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক ভাল ছিল। পূর্বাঞ্চলে নবাবী রাজত্বে ইংরেজদের বাণিজ্য অব্যাহত থাকলেও দক্ষিণ ভারতে তারা প্রবল বাধার

সম্মুখীন হয়েছিল। প্রায় কুড়ি বছর (১৭৪৫-১৭৬৩ খ্রিঃ) যাবৎ সেই সংঘর্ষ চলে। শেষে আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর (১৭৫৬ খ্রিঃ) পর দক্ষিণ ভারতের সেই ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষের রেশ বাংলামুলুকেও চলে আসে। প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের সময় (১৭৪৫-৪৮, ১৭৫০-৫৪ খ্রিঃ) বঙ্গদেশে নবাব ছিলেন আলিবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬ খ্রিঃ)। তাঁর আমলে বর্গীর হাঙ্গামা ছিল নিতান্ত সন্ত্রাসমূলক। হাঙ্গামার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যে নবাব ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পানির নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ-আদায় করতেন। ঠিক এই সময় হাঙ্গামা প্রতিরোধের অজুহাত দেখিয়ে ইংরেজ ও ফরাসিরা যথাক্রমে কলকাতা ও চন্দননগরে দুর্গ-সংরক্ষণ ও সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল। নিরাপত্তার প্রয়োজনে আলিবর্দী তাদের এই কাজে বাধা প্রদান করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, "তোমরা বণিক, বণিকের জন্য দুর্গের কোনও প্রয়োজন নেই। আমার শাসনাধীনে শত্রুর কোনও ভয় নেই।" নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর (১৭৫৬ খ্রিঃ) পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্‌দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করেন।

ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্‌দৌলার বিরোধ ঃ নবাব আলিবর্দীর কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র মির্জা মহম্মদ সিরাজউদ্‌দৌলা তাঁর রাজ্যশাসনের ব্যাপারে সাহায্যে করতেন। সুতরাং আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্‌দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজন এই ঘটনাকে সুনজরে দেখেন নি। আলিবার্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা ঘসেটি বেগম-ও তার মধ্যম কন্যার পুত্র পুর্নিয়ার দেওয়ান শৌকত জঙ্গ সিরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আলিবর্দীর সিংহাসনের উপর তাঁদেরও দাবি ছিল। আবার এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাহায্যার্থে ইংরেজ বণিকদল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এসব শত্রুতার সংবাদ—নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হলেন। তিনি অবিলম্বে ঘসেটি বেগমকে মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী করলেন এবং তার সমুদয় ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। ঘসেটি বেগমকে নিষ্ক্রিয় করার পর নবাব ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভকে মুর্শিদাবাদে এসে সরকারী হিসাব-পত্র দাখিল করার নির্দেশ দিলেন। তিনি ছিলেন ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজেম মহম্মদের দেওয়ান। সুতরাং নবাবের শাস্তির ভয়ে ভীত রাজবল্লভের নির্দেশে তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাস নওয়াজেম মহম্মদের ধন সম্পত্তি নিয়ে কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় ইংরেজদের উপর নবাবের সন্দেহ আরও প্রবল হলো এবং তিনি কৃষ্ণদাসকে নবাবের হস্তে প্রত্যার্পণের নির্দেশ দিলেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশের উপর গুরুত্ব দেন নি। বরং কলকাতার গভর্নর ড্রেক আন্তর্জাতিক আইনের অজুহাত দেখিয়ে নবাবের আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে নবাব ও ইংরেজদের বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে।

নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদের অন্য একটি কারণ হলো সিরাজের প্রতি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অসৌজন্যমূলক আচরণ। মোগল আইন অনুসারে জমিদাররা ছিল নবাবের

অধীন। ইংরেজ কোম্পানি নবাবের অধীনে কলকাতার জমিদারী স্বত্ব পেয়েছিল। সুতরাং অধীনস্থ জমিদার নতুন নবাবের মসনদে আরোহণের সময় উপযুক্ত উপঢৌকন দিয়ে নবাবকে সম্মান দেখাবেন— এটাই নিয়ম। অন্যথায় নবাবী প্রথার অবমাননা করা হয়। এই প্রসঙ্গে এস. সি. হিল এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইংরেজরা বিশ্বাস করত যে সিরাজের নবাবী বেশীদিন স্থায়ী হবে না। তাই তারা উপঢৌকন প্রদানের মাধ্যমে সৌজন্য প্রকাশ করতে পারেনি। কিন্তু কারণ যাই থাকুক, প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করায় ইংরেজদের উপর নবাব সিরাজউদ্দৌলা সর্বাধিক রুষ্ট হলেন।

এই সময় বাণিজ্য শুল্ক সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে নবাবের মনোমালিন্য ঘটে। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুখশিয়ারের নিকট থেকে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। কালক্রমে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য বিনা শুল্কে বাণিজ্যের (দস্তক) সুযোগ ভোগ করতে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যবসায়ীরা দস্তক সংগ্রহ করে এবং কোম্পানির নামে-ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে থাকে। পূর্বতন নবাবদের আমল থেকে এইসব ঘটনা ঘটতে থাকলেও নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলে দস্তকের এই অপবাবহার নগ্নরূপ ধারণ করে। ফলে নবাবের বাণিজ্য দপ্তরে শুল্কখাতে আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়। অন্যদিকে বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৩৪·৩ ভাগ কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারে চলে যায়। এমতাবস্থায় নবাব ইংরেজ কোম্পানিকে এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকবার নির্দেশ দেন। কিন্তু কোম্পানি নবাবের কথায় কর্ণপাত করেনি। ফলে ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে নবাবের আক্রোশ আরও বৃদ্ধি পেল।

সিরাজউদ্দৌলার নবাবী প্রাপ্তির সময় ইয়োরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রিঃ) সূত্র ধরে এদেশে ইংরেজ ও ফরাসিরা পুনরায় সংগ্রামে লিপ্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটকের ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের (তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ) রেশ বাংলায়ও ছড়িয়ে পড়ল। ইংরেজ ও ফরাসিরা যথাক্রমে কলকাতা ও চন্দননগরে দুর্গ পুনর্নির্মাণ করতে শুরু করল। এর জন্যে তারা মোগল আইন অনুসারে বাংলার সুবাদার বা নবাবের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। অবিলম্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাদের দুর্গ নির্মাণ প্রসঙ্গে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। ফরাসিরা তাঁর আদেশ মান্য করল কিন্তু ইংরেজরা সে নিষেধাজ্ঞায় সাড়া দিল না। একাধিকবার আদেশ-জারি করায় ইংরেজরা ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অজুহাত দেখাল। এরপর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য বিশেষ দূত হিসেবে নারায়ণ দাস নামক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে প্রেরণ করা হলো। নারায়ণ দাস ইংরেজ গভর্নর ড্রেক কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হলেন। ফলে সিরাজ বাধ্য হয়ে কলকাতা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব সসৈন্যে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠি অধিকার করেন। কলকাতার ইংরেজ গভর্নর ড্রেক সাহেব

আপোষ মীমাংসার চেষ্টা না করে নবাবের বাহিনীকে বাধা দেন। উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে উভয় পক্ষের তুমুল লড়াই হয়। ইংরেজ বাহিনী ক্রমশ পশ্চাৎ অনুসরণ করতে থাকে। তখন নবাবের পক্ষে সেনাপতি মীরজাফর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করলেন। তুমুল লড়াইয়ের পর দুর্গটি নবাব বাহিনীর দখলে এলো (২০ শে জুন, ১৭৫৬)। ইংরেজ গভর্নর ড্রেক সাহেব অনুচরদের নিয়ে নদীপথে ফলতায় পলায়ণ করলেন। ধৃত বন্দীদের ফোর্ট উইলিয়ামের একটা সুরক্ষিত কক্ষে আটক রাখা হয়। পরদিন সকালে বন্দীদের অধিকাংশকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হলোওয়েল *(Holwell)* নামক এক ইংরেজ কর্মচারী এই ঘটনাকে "অন্ধকূপ হত্যা" *(Black Hole Tragedy)* নামে বর্ণনা করেছেন। হলো ওয়েলের বিবরণ থেকে জানা যায় ১৪৬ জন বন্দীকে ১৮×১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি পরিমিত কক্ষে রাখা হয়। এখানে একটিমাত্র জানালা ছিল। তাই বন্দীদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। গোলাম হুসেন খাঁর "সিয়ার-উল্-মুতাখেরিণ" নামক গ্রন্থে এই বিষয়টির উল্লেখ আছে। বাংলা বিহারের নবাবী কোর্টে কর্মরত গোলাম হুসেন ছিলেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও তৎকালীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের এক যোগ্য কর্মবীর। তাঁর মতে যুদ্ধে আহত কয়েকজন বন্দীর মৃত্যু হয়— একথা সত্য। আবার এই ঘটনার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা দায়ী নন— একথাও সত্য। কিন্তু ১৪৬ জন যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ১২৩ জন মারা যেতে পারেনা। কারণ এ ক্ষুদ্র কক্ষে ১৪৬ জনকে জোর করে রাখাও সম্ভব নয়। তাই অ্যানি বেসান্ত বলেছেন "Geometry disproving arithmetic gave lie to the story." আধুনিক ইতিহাসবিদরা ঘটনাটি অলীক বা অতিরঞ্জিত বলেছেন। যাই হোক্ ফোর্ট উইলিয়াম জয়ের পর পূবর্তন নবাব আলিবর্দীর নাম অনুসারে কলকাতার নাম দেওয়া হলো "আলিনগর"। মানিক চাঁদকে আলিনগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হলো। তবে কলকাতা জয়ের পর সিরাজ নিজেকে বিপদমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ঘরের শত্রু শৌকত জঙ্গ এর বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। শৌকত জঙ্গ এই যুদ্ধে নিহত হন।

ফোর্ট উইলিয়ামের পতন ও অন্ধকূপ হত্যার সংবাদ মাদ্রাজে পৌছালে সেখানকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কোম্পানির একনিষ্ঠ কর্মী ও ভাগ্যান্বেষী রবার্ট ক্লাইভ এবং নৌসেনাপতি ওয়াটসনকে এক বিশাল নৌবহর দিয়ে কলকাতায় প্রেরণ করলেন। দক্ষিণ ভারতে ত্রিচিনাপল্লীর ফরাসি-অবরোধ মুক্ত করার জন্যে তড়িত গতিতে আর্কট আক্রমণ করা এবং মাদ্রাজ অঞ্চল থেকে ফরাসি প্রভাব দূরীকরণে রবার্ট ক্লাইভ-ই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক্, রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসনের আগমনে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম পুনর্দখল করা সহজ হলো। অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীদের রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও উত্তর ভারতে আহম্মদ শাহ আবদালির ভারত আক্রমণের সংবাদে বিচলিত নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেও শেষ পর্যন্ত সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। এটাই ইতিহাসে **আলিনগরের সন্ধি** (৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৭ খ্রিঃ) নামে খ্যাত। সন্ধির শর্তে ঠিক হলো যে (১) ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবে, (২) তারা টাকশালে নিজস্ব মুদ্রা প্রস্তুত করবে;

(৩) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি সুরক্ষিত করবে, উপরন্তু (৪) নবাব ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। এই সন্ধির শর্তেই বাংলায় ইংরেজদের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। আলিনগরের সন্ধি ইংরেজ ও নবাবের সম্পর্ককে নতুন মর্যাদা দিল। যুদ্ধের পূর্বে ইংরেজের কলকাতা নগরী ছিল বাংলার নবাবের অধীন একটি জমিদারী মাত্র। কলকাতার যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকার হিসেবে পরিগণিত করল। কলকাতা হয়ে দাঁড়াল একটা স্বাধীন ভূখণ্ড যার সরকার হলো ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।

পলাশির যুদ্ধ ঃ কারণ ও ফলাফল ঃ আলিনগরের সন্ধির পর বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন পথে মোড় নিল। এই সন্ধিতে নবাব ও ইংরেজের মধ্যে উপরিতলগত মিত্রতা হলেও সন্ধির শর্তে নবাব মাত্রাতিরিক্ত অপমানিত হলেন। অন্যদিকে বিজয়ী ইংরেজের প্রতিপত্তি বিস্তারের লালসা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। এ-দুটি বিষয় ছিল পরবর্তী কোনও বৃহত্তর সংগ্রামের মৌলিক কারণ। এই মৌলিক কারণের সঙ্গে নতুন যেসব বিষয় যুক্ত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নির্দেশ করা হলোঃ

প্রথমত, ঠিক এই সময় দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে চলছিল তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩ খ্রিঃ)। এই সূত্রে বাংলার ইংরেজ বণিকরা নবাবের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর অধিকার করে (১৭৫৭)। আবার ঠিক এই সময় আফগানিস্তানের আহ্‌মদ শাহ আবদালি দিল্লি এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল লুণ্ঠন করে ক্রমশ পূর্বাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সংবাদে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা বিব্রত বোধ করেন ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সাহস পেলেন না। তবে চন্দননগর ছেড়ে ফরাসিরা নবাবের এলাকায়, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করল। ফরাসিদেরকে কোনরূপ সামরিক সাহায্য না দিলেও নবাব দক্ষিণ ভারতের ফরাসি সেনাপতি বুসির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন। এই সংবাদ ইংরেজদের নিকট গোপন রইল না। সুতরাং ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এটুকু অনুধাবন করলেন যে সিরাজ যতদিন সিংহাসনে থাকবেন ততদিন ইংরেজদের স্বার্থ নিরাপদে থাকবে না। তাই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সিরাজের পরিবর্তে অন্য কোনও দাবিদারকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকেন। ভাগ্যান্বেষী রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন শেষোক্ত কর্মে বিশেষ অগ্রণী।

দ্বিতীয়ত, আলিনগরের সন্ধির পর নবাব যখন মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। নবাবের পদস্থ কর্মচারী— যেমন, মিরজাফর, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখ এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাঁরা সিরাজের পরিবর্তে মিরজাফরকে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মিরজাফর প্রথম স্তরে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রস্তাবে সম্মত হন নি। মিরজাফর ছিলেন মৃত নবাব আলিবর্দীর ভগ্নীপতি এবং বাংলার প্রধান সেনাপতি। তিনি একাধিকবার অপমানিত হয়েও একথা কখনও ভাবেন নি যে, সিরাজকে সরিয়ে তিনি নিজে সিংহাসনে বসবেন। তবে পরে

যখন সিংহাসনের জন্যে অন্যকোনও ব্যক্তির নাম প্রস্তাবিত হলো তখন মীরজাফর ষড়যন্ত্রকারীদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

তৃতীয়ত, নবাব দরবারের ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। অবিলম্বে রবার্ট ক্লাইভ কলকাতার সিলেক্ট কমিটির পক্ষে, সেই গোপন ষড়যন্ত্রে যোগদান করলেন। উমিচাঁদের সামনে ক্লাইভ ও মীরজাফরের মধ্যে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো (জুন ১৭৫৬ খ্রিঃ)। ঠিক হলো যে— (১) সিরাজকে পদচ্যুত করে মিরজাফরকে নবাবী মসনদে বসানো হবে, (২) নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ আবাসিক থাকবেন, (৩) ফরাসি বিতাড়ণ ও শত্রু প্রতিহত করার জন্য নবাব দরবারে একদল ইংরেজ সৈন্য থাকবে, (৪) নবাব সেই সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন করবেন, (৫) সিরাজের নিকট থেকে প্রাপ্ত ইতিপূর্বেকার বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বজায় থাকবে ইত্যাদি। ওয়াটসন সেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করায় রবার্ট ক্লাইভ ওয়াটসনের নাম জাল করলেন। অন্যদিকে চুক্তিটির গোপনীয়তা রক্ষার জন্য উমিচাঁদ প্রচুর উপঢৌকন লাভের প্রতিশ্রুতি পেলেন। ঘসেটি বেগম মিরজাফরকে যথাসাধ্য সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পলাশির যুদ্ধ ঃ নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্র যখন পাকাপাকি হলো তখন ক্লাইভের উচ্চাশা আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি দ্বিতীয় কোনও যুদ্ধের অজুহাত খুঁজতে শুরু করলেন। অজুহাত পেয়েও গেলেন। ক্লাইভ অভিযোগ করলেন যে নবাব আলিনগরের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছেন। আবার তিনি নবাবের দরবারে আশ্রিত ফরাসিদের ইংরেজের হাতে অর্পণ করার দাবি করলেন। তাছাড়া তিনি কলকাতা আক্রমণের জন্যে অধিক ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন। এসব অজুহাতসহ তিনি নবাবের নিকট যে চরমপত্র দেন তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন মুর্শিদাবাদের ২০ মাইল দূরে নদীয়া জেলায় পলাশির প্রান্তরে নবাব ও ক্লাইভের বাহিনীর সাক্ষাৎ হলো। যুগান্তর সৃষ্টিকারী এই পলাশির যুদ্ধ কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর ও গুরুতর ধরণের কিছু ছিল না। যুদ্ধ হলো নাম মাত্র—যাকে যুদ্ধের প্রহসন বলা যেতে পারে। যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের উনত্রিশ জন এবং নবাব পক্ষের প্রায় পাঁচশত জন নিহত হলো। যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মিরজাফর, রায় দুর্লভ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা ছিলেন নিষ্ক্রিয়। শুধু মীরমদন ও মোহন লাল মুষ্টিমেয় নবাবী সৈন্যসহ সাহসিকতার সঙ্গে মরণপণ লড়াই করেছিলেন। মীরমদনের মৃত্যুতে মোহনলাল একাই যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এমন সময় মিরজাফরের পরামর্শে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। এদিকে ক্লাইভের পাল্টা আক্রমণে নবাবী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সিরাজ পলায়নের পথে ধৃত হন। পরে মিরজাফারের পুত্র মীরণের নির্দেশে ঘাতক মহম্মদী বেগ কর্তৃক নবাব নিহত হন। সিরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হলো। তাই অনেকেই সিরাজউদ্দৌলাকে 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবরূপে' চিহ্নিত করেন।

পলাশির যুদ্ধ মাত্র একদিনের যুদ্ধ হলেও এটি ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তাই এই যুদ্ধের জন্য নবাব এবং ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে কে দায়ী ছিলেন এই নিয়ে ঐতিহাসিকরা অনুসন্ধান করেছেন। ঐতিহাসিক এস. সি. হিল নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের জন্য নবাবকেই দায়ী করেছেন। নবাবের অহমিকা ও লোভ ছিল অত্যধিক। তিনি দুর্গ সংস্কার ও দস্তকের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করে কোম্পানির নিকট থেকে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহের আশা পোষণ করতেন। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিক এস. সি. হিলের অভিমতকে নাকচ করেছেন ঐতিহাসিক ডঃ ব্রিজেন গুপ্ত। তাঁর মতে, সমসাময়িক কোনও নথিপত্রে কোম্পানির নিকট থেকে অর্থ আদায়ের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে দক্ষিণ ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল পূর্বভারতে সেই ধরণের প্রভাব বিস্তারে রবার্ট ক্লাইভ অনেক বেশি প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। ক্লাইভ চেয়েছিলেন বাংলায় এমন একজন ব্যক্তি নবাবী মসনদে অধিষ্ঠিত হন যিনি সিরাজের মত শক্ত না হয়ে ইংরেজের হাতের পুতুলের মত কাজ করে যাবেন। তাই ক্লাইভ সিরাজ বিরোধী চক্রান্তকারীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। সমসাময়িক ঘটনাপুঞ্জ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলী পলাশি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকরা সিরাজকে দায়ী না করে এইসব ঘটনাপুঞ্জের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

পলাশি যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ পলাশির যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে বড়ো ধরণের কোনও যুদ্ধ ছিল না। এটি ছিল মূলত একটি খণ্ডযুদ্ধ মাত্র। তবে এর প্রত্যক্ষ ফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। **প্রথমত,** এই যুদ্ধের দ্বারা পূর্বাঞ্চলে বিজয়ী ইংরেজদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেল। নতুন নবাব মীরজাফর গোপন ষড়যন্ত্রের শর্ত অনুসারে মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু তিনি হলেন ইংরেজের হাতের পুতুল। তিনি এবার বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইংরেজ কোম্পানির একছত্র বাণিজ্যিক অধিকার মঞ্জুর করলেন। এছাড়া উপঢৌকন হিসেবে ইংরেজরা কলকাতাসহ চব্বিশ পরগণার জমিদারী পেল। সিরাজের কলকাতা আক্রমণ ও পলাশি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ইংরেজ কোম্পানি মীরজাফরের নিকট থেকে ১,৭৭,০০,০০০ টাকা আদায় করল। একা ক্লাইভ পেলেন কুড়ি লক্ষ টাকারও কিছু বেশি। নতুন নবাবের সঙ্গে এমন একটি চুক্তি হলো যে, ব্রিটিশ বণিক ও কোম্পানির কর্মচারীগণ বিনাশুল্কে বাণিজ্য করতে পারবে। পলাশির যুদ্ধ কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের হাতে তুলে দিল অপরিমিত অর্থ। আর বাংলার মানুষ হলো সহায় সম্পদহীন। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড টমসন এবং জি.টি. গ্যারাট লিখেছেন, "একটা বিপ্লবের পরিকল্পনা ও সংঘটন যে সর্বাধিক লাভজনক কৌশল এটা বেশ পরীক্ষিত সত্য। কোর্টেজ ও পিজারোর যুগে স্পেনদেশের মানুষরা সোনার খোঁজে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে একই উন্মাদনা পেয়ে বসেছিল ইংরেজদের। বিশেষ করে বাংলার মানুষের শেষ রক্ত বিন্দু শুষে না নেওয়া পর্যন্ত ইংরেজরা তাদের শোষণ অব্যাহত রেখেছিল।"

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজরা বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করলেও তারাই হলো রাজস্রষ্টা (King-maker)। নবাব হলেন ইংরেজের হাতের পুতুল। কোম্পানির নির্দেশমত নবাবকে চলতে হত। সুতরাং ইংরেজ কোম্পানি নবাবী সিংহাসনের পশ্চাতের শক্তি (Power behind the throne) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। কোম্পানির সামরিক শক্তির উপর মীরজাফরকেও নির্ভর করতে হত। অতীতে নবাবের কৃপা লাভের জন্যে ইংরেজরাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। অথচ পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজের কৃপা লাভের জন্যে নবাবকেই উদ্‌গ্রীব হতে হলো।

তৃতীয়তঃ, সামরিক শক্তি ও রণকৌশলে ইংরেজ পূর্ব-ভারতে অদ্বিতীয় শক্তিরূপে প্রতিপন্ন হলো। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সংস্কার করে সেখানে যেমন ইংরেজ বাহিনীকে শক্তিশালী করা হলো, তেমনি নতুন নবাবের দরবারেও ইংরেজ বাহিনী মোতায়েন করা হলো। অন্যদিকে পূর্বভারতে ফরাসিদের সামরিক শক্তি বিলুপ্ত হলো। আবার পলাশি যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ফল ইংরেজের হাত শক্ত করে দেওয়ায় দক্ষিণ ভারতে ফরাসিদের পরাজয় ঘটল।

চতুর্থত, পলাশি যুদ্ধের ফলে বাংলার আর্থিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটা অস্বাভাবিক শূন্যতার সৃষ্টি হলো। নবাবের হাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার থাকলেও বাস্তবত নবাব ছিলেন সেই ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত— তিনি ছিলেন ইংরেজের আজ্ঞাবাহক। কোম্পানির নির্দেশ ছাড়া নবাব কোনও কিছুই করতে পারতেন না। অন্যদিকে সরাসরি প্রশাসন পরিচালনা করার মত কোনও সংগঠন ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ছিল না। কর্ণেল ম্যালেসনের ভাষায়, কোম্পানির কর্মচারীদের মূল লক্ষ্য ছিল "যতটা পারা যায় ততটাই আদায় করে নেওয়া।" সুতরাং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো।

তবে ঐতিহাসিক বিচারে পলাশি যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। (১) এই যুদ্ধ প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় এবং পরে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ প্রতিপত্তি বিস্তারের পথ পরিষ্কার করে। ভারতের বুকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল দাবিদাররূপে ইংরেজরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। (২) মুর্শিদাবাদের নবাবী ভাণ্ডার এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সম্পদ শোষণ করতে করতে কোম্পানির ডাইরেক্টরদের এই ধারণা জন্মেছিল যে, এখানকার সম্পদ নিঃশেষ হবার নয়। তাই ডাইরেক্টরদের এক নির্দেশে বলা হলো যে, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কোম্পানি পরিচালনায় যে অর্থ খরচ করা হবে তা বাংলা প্রেসিডেন্সিকেই বহন করতে হবে। তাছাড়া রপ্তানিযোগ্য পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য কোম্পানি বাংলার রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করতে পারত। অতীতে মোগল বাদশাহরা বাংলার সুবাদারদের দেওয়া অর্থ নিয়ে দক্ষিণভারতে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করে গেছেন। এবার শুধু বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জন্য নয় খোদ ইংল্যান্ডের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির কাজে পূর্বাঞ্চলের অর্থ-সম্পদ শোষিত হতে থাকল।

(৩) পলাশি যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজ বণিকদের সার্বিক প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পেল যে তারাই হয়ে দাঁড়াল এদেশ ও দেশবাসীর ভাগ্যবিধাতা। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা, হাব-ভাব; পাশ্চাত্যের চলন-বলন এদেশের মানুষ অনুকরণ করতে শুরু করল। স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায়, "পলাশি যুদ্ধের ফলে বাংলায় নব জাগরণের সূচনা হলো।" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথায়, পলাশি যুদ্ধই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত করল। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব ইংরেজের কলকাতাতেই এসে কেন্দ্রীভূত হলো। কলকাতাই হলো ইংরেজ অধ্যুষিত ও পরিশাসিত ভারতের কেন্দ্রবিন্দু। প্রকৃতপক্ষে পলাশিযুদ্ধের গুরুত্ব এতই ব্যাপক, তাৎক্ষণিক এবং চিরস্থায়ী যে, এই যুদ্ধকে অপর কোনও যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

মীরজাফর (১৭৫৭-৬৩ খ্রিঃ) ঃ পলাশি যুদ্ধের পর বিজয়ী রবার্ট ক্লাইভ গোপন ষড়যন্ত্রের (১ মে, ১৭৫৭ খ্রিঃ) শর্তানুসারে মীরজাফরকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পরিবর্তে ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে কুড়ি লক্ষেরও কিছু বেশি টাকা আদায় করলেন। ইংরেজ কোম্পানি কলকাতার পাশাপাশি ২৪ পরগণার জমিদারী লাভ করল। যুদ্ধের পরেই কোম্পানি অর্থ আদায় ছাড়াও কলকাতা ও মুর্শিদাবাদে সৈন্য মোতায়েন করল। রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকরা নানাভাবে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল। যেমন, মীরজাফরের সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরের শাসনকর্তা রাজা রাম সিংহ, বিহারের শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণ এবং পুর্নিয়ার শাসনকর্তা হাজির আলি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নবাব তাদের শাস্তিদানের জন্যে প্রস্তুতি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভ হস্তক্ষেপ করলেন ; বিরোধের নিষ্পত্তি হলো। এর ফলে বাংলায় নবাবের পরিবর্তে ইংরেজ কর্তৃপক্ষই হয়ে দাঁড়ালেন ভরসাস্থল। ইংরেজের প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেল। নবাবও ক্রমশ ইংরেজের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হলেন।

শাসনকার্যে নবাবের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল আর্থিক সমস্যা। গোপন চুক্তি অনুযায়ী সকল পাওনাকড়ি পেয়েও ইংরেজদের দাবিদাওয়া শেষ হলো না। পুরস্কার ও উপঢৌকনের আকারে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দাবির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেল। নৌবহর ও সামরিক বাহিনীর জন্য অতিরিক্ত পঁচিশ লক্ষ টাকা দিতে নবাব বাধ্য হলেন। নদীয়া, হুগলি, বর্ধমান ইত্যাদি জেলার রাজস্ব হস্তগত করার জন্য কোম্পানির লালসা ক্রমশ বৃদ্ধি পেল। এই প্রসঙ্গে পার্সিভাল স্পীয়ার লিখেছেন, "বাংলার আর্থিক রক্তক্ষরণ শুরু হলো" (The Financial Bleeding of Bengal had begun)।

পরমুখাপেক্ষী হতমান মীরজাফর ক্রমশ অনুধাবন করলেন যে তিনি নামে মাত্র নবাবরূপে মসনদে বসেছেন, এই রাজ্যের আসল মালিক ক্লাইভ। মীরজাফর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং গোপনে গোপনে চুঁচুড়ার ওলোন্দাজদের সঙ্গে ইংরেজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। বাটাভিয়া থেকে সামরিক সাহায্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওলোন্দাজরা হুগলি আক্রমণ করে। জানা যায়, এই আক্রমণের পূর্বে ওলোন্দাজরা নবাবের অনুমতি

গ্রহণ করেনি। সংবাদ পেয়ে রবার্ট ক্লাইভ বিদারার (চুঁচূড়া ও চন্দননগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে) যুদ্ধে (১৭৫৯ খ্রিঃ) ওলোন্দাজদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এইভাবে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি করে ক্লাইভ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন।

রবার্ট ক্লাইভের অবর্তমানে কলকাতার গভর্নর হলেন ভ্যান্সিটার্ট। তিনি ছিলেন 'নীচ, অর্থলোলুপ ও চক্রান্তকারী"। একথা স্বয়ং মীরজাফরও স্বীকার করেছেন। তাঁর অর্থলোলুপতা ইংরেজ জাতিকে কলঙ্কিত করেছিল। তিনি যখন দেখলেন যে মীরজাফরের নিকট থেকে আর অর্থপ্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা নেই তখন ভ্যান্সিটার্ট তাকে সিংহাসন থেকে সরানোর পরিকল্পনা করলেন। পুত্র মীরন মারা যাওয়ায় উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল। পরে ভ্যান্সিটার্টের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো যে, মীরজাফরকে অপসারিত করে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে মসনদে বসানো হবে। এই উপলক্ষে ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তে ঠিক হলো যে, (১) ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়নির্বাহের জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানিকে দিতে হবে ; (২) এছাড়া কোম্পানিকে নগদ দশ লক্ষ টাকা এবং (৩) কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যগণকে ঊনত্রিশ লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিতে হবে ; এছাড়া (৪) কোম্পানিকে পৃথক মুদ্রা প্রচলনের অধিকার প্রদান করতে হবে। এইভাবে বাংলা বিক্রীত হতে শুরু করল। চুক্তি সম্পাদনার পরই মীরজাফর অপসারিত হলেন, তাঁর জায়গায় জামাতা মীরকাশিম হলেন নতুন নবাব (১৭৬০ খ্রিঃ)।

মীরকাশিম (১৭৬০-৬৪ খ্রিঃ) ঃ মীরজাফরের পর তাঁর জামাতা মীরকাশিম বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন (১৭৬০ খ্রিঃ)। পূর্বশর্ত অনুসারে ইংরেজদের প্রাপ্য অর্থ প্রদান করে তিনি নবাবী রাজকোষ শূন্য করলেন। তাই মীরকাশিম রাজভাণ্ডারটিকে পূর্ণ করার আশায় অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। এই পর্যায়ে তিনি কয়েকটি জরুরি উপায় অবলম্বন করলেন, যেমন— (১) যেসব সরকারী কর্মচারী সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন তিনি তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন; (২) কোনও কোনও ধনী পরিবারের নিকট থেকে বলপূর্বক ঋণ গ্রহণ করলেন। জমিদারদের উপর ধার্য করা হলো অতিরিক্ত কব (আবওয়াব) এবং (৩) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মীরকাশিম ব্যয় সঙ্কোচনের ব্যবস্থা করলেন। মীরকাশিমের অর্থ-সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভ্যান্সিটার্ট তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। যেমন, বিহারের ডেপুটি গভর্নর রামনারায়ণ ছিলেন কোম্পানির দালাল। তিনি কোম্পানির নামেই অর্থসংগ্রহ করে আত্মসাৎ করতেন। ভ্যান্সিটার্ট তাকে মীরকাশিমের হস্তে অর্পণ করেন। মীরকাশিম তার যথা-সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করেন। যাই হোক্, অল্পকাল মধ্যে মীরকাশিম আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হয়ে উঠলেন।

মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাসক। তিনি পূর্ববর্তী নবাবের আর্থিক ও

সামরিক দুর্বলতা সম্পর্কে জানতেন। অন্যদিকে ইংরেজদের অর্থ-লোলুপতা ও শোষণ প্রবৃত্তির বিষয়টিও তাঁর অজানা ছিল না। তাই তিনি আর্থিক স্বনির্ভরতার সঙ্গে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন। (ক) তিনি বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট থেকে ফরমান লাভ করলেন। এর দ্বারা তিনি দিল্লির মোগল বাদশাহের অধীনে আইনসম্মত নবাব হলেন। (খ) মুর্শিদাবাদ হলো ইংরেজের শক্তিকেন্দ্র কলকাতার সন্নিকটে। এখানে থেকে শাসন পরিচালনা করতে গেলে ইংরেজরা বার বার তাঁর স্বাধীন কর্মে হস্তক্ষেপ করবে। তাই ইংরেজদের প্রভাব এড়াবার জন্য মীরকাশিম মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। (গ) স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রশাসনের জন্যে চাই শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ও দুর্গ। এজন্য মীরকাশিম মুঙ্গেরের দুর্গটিকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করে সেখানে গড়ে তুললেন একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। সমরু, মার্কর প্রমুখ ইয়োরোপীয় দক্ষ সেনাপতিদের সাহায্যে তিনি নবগঠিত বাহিনীকে শিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করলেন। তাছাড়া মুঙ্গেরে একটি আধুনিক অস্ত্রাগার এবং কামান-বন্দুক নির্মাণের কারখানাও গড়ে উঠল। (ঘ) ইংরেজের দালাল হিসেবে চিহ্নিত সকল স্তরের কর্মচারী ও জমিদারগণকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করলেন।

মীরকাশিমের এইসব কার্যাবলী ইংরেজ বণিকদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল।। এসবের দ্বারা যে ইংরেজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে তা তারা অনুধাবন করল। তাই তারা নবাবের কাজকর্মের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল। অল্পকাল মধ্যে বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নবাবের বিবাদ ঘনীভূত হলো। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে মোগল সম্রাট ফারুখশিয়ারের 'ফরমান' অনুসারে ইংরেজ কোম্পানি 'দস্তক' বা বিনা শুল্কে (Duty free) বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধে ভোগ করে আসছিল। শেষ পর্যায়ে এই দস্তকের অপব্যবহার শুরু হলো। এই প্রসঙ্গে কোম্পানি চেয়েছিল যে ইয়োরোপে রপ্তানির জন্যে হোক অথবা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্যে হোক্ কোনও ক্ষেত্রেই তাদের শুল্ক দিতে হবে না। এই পদ্ধতিতে দেশীয় বণিকরা ক্ষতিগ্রস্থ হল। কারণ দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য শুল্ক দিয়ে ব্যবসা করতে হত। এর উপর দুর্নীতির খেলা চলত। কোম্পানির কর্মচারীরা বেআইনীভাবে দেশীয় অসৎ বণিকদের নিকট দস্তক বিক্রয় করত। অথচ এইসব বণিক রাষ্ট্রকে বাণিজ্য শুল্ক দিত না। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সৎ ব্যবসায়ীরা টিকতে পারত না। এসবের ফলে (১) দেশীয় বণিকদের ব্যবসা করার পথ রুদ্ধ হলো। (২) নবাবের রাজকোষে বাণিজ্য শুল্কবাবদ আর্থিক আয় হ্রাস পেল। তদুপরি (৩) কোম্পানির কর্মচারীরা নবাবের কর্মচারী ও জমিদারদের নিকট থেকে ঘুষ বা নজরানা আদায় করত। (৪) দেশীয় কারিগর, কৃষক ও ছোট বণিকদের ভয় দেখিয়ে সস্তায় ইংরেজদের কাছে সামগ্রী বিক্রয় করতে বাধ্য করত। ইংরেজদের কাছে সস্তায় সামগ্রী বিক্রয় করতে অথবা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে চড়া দামে সামগ্রী

ক্রয় করতে যারা অস্বীকার করত তাদেরকে চাবুক মেরে সায়েস্তা করা হত। কখনও কখনও কোম্পানির কারাকক্ষে এদের বন্দী করে রাখা হত। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার তাই এই যুগটিকে "নির্লজ্জ ও প্রকাশ্য লুণ্ঠনের যুগ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

বক্সার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ঃ মীরকাশিম দস্তকের অপব্যবহার এবং ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ভ্যান্সিটার্ট মীরকাশিমের যুক্তি অনুধাবন করেন এবং নবাবের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নেন। ঠিক হলো যে, ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত কোম্পানির কর্মচারীরা কিছু কিছু বাণিজ্য শুল্ক দেবেন। কিন্তু কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যরা এ ব্যাপারে একমত হতে পারলেন না। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখে মীরকাশিম নতুন এক চাল চাললেন। তিনি দেশী-বিদেশী সকল বণিকের ক্ষেত্রে অন্তর্বাণিজ্য শুল্ক নেওয়ার প্রথা তুলে নিলেন। এর ফলে ইংরেজ বণিকরা বিনা শুল্কে একচেটিয়া বাণিজ্য করার যে সুবিধা পেত তা নষ্ট হলো। অথচ বিদেশী বণিক কোম্পানি দেশীয় বণিকদের সঙ্গে একত্রে সুবিধা ভোগ করতে রাজী হলো না। তারা দাবি করল দেশীয় বণিকদের ক্ষেত্রে বাণিজ্য শুল্ক মকুব করা চলবে না। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের আবার একটা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। সূচনাতে পাটনার ইংলিশ ফ্যাক্টরীর প্রধান মেজর এলিস ইংরেজদের ন্যায্য দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে পাটনা শহর দখলের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার প্রয়াস ব্যর্থ হলো, পাটনায় তার সেনানিবাস ধ্বংস হলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ ঘোষণা করল।

কিন্তু মীরকাশিম ও ইংরেজদের যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নানা মত ব্যক্ত করেছেন। ডঃ নন্দলাল চ্যাটার্জির মতে মূলত রাজনৈতিক কারণেই নবাব মীরকাশিম ও কোম্পানির মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পলাশির যুদ্ধ, দস্তকের অপব্যবহার, মীরজাফরের পদচ্যুতি ইত্যাদির মাধ্যমে ইংরেজ বণিকদল ক্রমশ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করে। মীরকাশিম চেয়েছিলেন ইংরেজদের কবল থেকে মুক্তি এবং স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র শাসনের সুযোগ সৃষ্টি করতে। কোম্পানির হাতের পুতুল হিসেবে কাজ করার ইচ্ছা মীরকাশিম বরদাস্ত করতে পারেননি। তাই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ডঃ কালিকিঙ্কর দত্তের মতে কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে বিরোধের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক।— (১) দস্তকের অপব্যবহার, (২) সস্তায় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় এবং তারজন্যে দেশীয় বণিক, কারিগর, কৃষক, শিল্পীর উপর নিপীড়ন, (৩) বাংলার রাজস্ব থেকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন, (৪) কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রসঙ্গে সমসুযোগ লাভ, (৫) সরকারি কর্মচারী, দেশীয় জমিদার এবং অন্যান্যদের নিকট থেকে ঘুষ, নজরানা, উপঢৌকন প্রাপ্তি ইত্যাদি ছিল ইংরেজ বণিকদের মূল লক্ষ্য— যার সব কিছু মূলত অর্থনৈতিক। অন্যদিকে মীরকাশিম চেয়েছিলেন এইসব অর্থনৈতিক শোষণ থেকে সরকার ও দেশবাসীর মুক্তি। তাই সংঘর্ষ ছিল একটি অপরিহার্য ঘটনা। ইংরেজ

ঐতিহাসিক ডড্‌ওয়েলের মতে "এ যুদ্ধ ছিল ঘটনাচক্র, ইচ্ছাকৃত নয়।" আসলে ঘটনাটির পশ্চাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুটি কারণই ছিল। বাংলায় তখন ছিল দুই মালিক—কোম্পানি ও নবাব। কিন্তু এক দেশে দুজন মালিকের বা রাজার রাজত্ব চলতে পারে না। মীরকাশিম ভেবেছিলেন যে, তিনি হলেন একজন স্বাধীন নৃপতি, আর কোম্পানি ভেবেছিল যে, নবাব তাদের আজ্ঞাবহ পুতুল। কারণ কোম্পানিই তাকে নবাবী মসনদে বসিয়েছিল। অর্থনৈতিক ঘটনাবলীই পরস্পর দুটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করল। ফলে যুদ্ধ হয়ে উঠল অনিবার্য ঘটনা।

বকসারের যুদ্ধ ঃ সকল বণিক—দেশী ও বিদেশী উভয়ের নিকট থেকে বাণিজ্য শুল্ক আদায় না করার প্রথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে নবাবকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাটনার ইংরেজ কারখানার কর্তা এলিস পাটনা শহরটি দখল করার জন্যে উন্মাদ হলো। এলিস সাহেবের এই হঠকারিতার জবাব দিতে গিয়েই নবাব মীরকাশিম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন মেজর অ্যাডামস ১০০০ জন ইয়োরোপীয় সেনা এবং ৪০০ জন সিপাহী বা ভারতীয় সেনা নিয়ে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়লেন। নবাবের পক্ষে ছিল প্রায় ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ সৈন্য। ইয়োরোপীয় আদর্শে শিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকরাও এই দলে ছিল। সৈনিকের সংখ্যাগত পর্যায়ে বিরাট ফারাক থাকলেও ইংরেজ বাহিনী কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সুতী, উদয়নালা ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে জয়লাভ করল। মীরকাশিম মুঙ্গের থেকে পাটনায় পালিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি বন্দী ইংরেজ সৈনিক ও অফিসারদের হত্যা করে অযোধ্যায় পলায়ন করলেন। সেখানে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্‌দৌলা এবং মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে যুক্ত হলেন। ত্রি-শক্তির মিলিত বাহিনী এবার ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হলো। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২১শে অক্টোবর বক্সারের রণাঙ্গনে মেজর হেক্টর মানরো ত্রি-শক্তির প্রয়াস ব্যর্থ করে জয়ী হলেন। পরিস্থিতির বিচারে মোগল সম্রাট শাহ্ আলম ইংরেজ পক্ষে যোগদান করলেন। কিছুদিন পর তাদের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তিও স্বাক্ষরিত হলো। পরাজিত মীরকাশিম পলায়ন করলেন এবং পলাতক অবস্থায় দিল্লির নিকট অনাহারে তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৭৭৭ খ্রিঃ)।

বকসারের যুদ্ধ ক্ষণস্থায়ী হলেও এটি ছিল চূড়ান্ত মীমাংসক। পলাশি যুদ্ধে জয়লাভের পশ্চাতে বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল বড়ো কথা। সেখানে ইংরেজকে অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হয়নি। কিন্তু বকসারের যুদ্ধে মীরকাশিমকে সিরাজের মত প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা দিশাহারা হতে হয়নি। মীরকাশিম নিজেও জানতেন যে ইংরেজের সঙ্গে তার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি নবাব বাহিনীকে আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত করেন। ইংরেজের সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত দেশীয় দালালদের নিয়ন্ত্রিত করেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। প্রথম স্তরে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়েও মোগল বাদশা এবং অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। অথচ ভারতের তিন প্রধানের মিলিত শক্তি অপেক্ষা ইংরেজের রণকৌশল ও সামরিক

শক্তির প্রাধান্য প্রমাণিত হলো। পলাশি যুদ্ধ অপেক্ষা বকসারের যুদ্ধ ইংরেজকে বাংলার প্রকৃত মালিক বা শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। তাই ভিনসেন্ট স্মিথের মতে বক্সারের যুদ্ধই ছিল ইংরেজের চূড়ান্ত বিজয়। তবে পলাশি যুদ্ধ ইংরেজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করে দিয়েছিল। তাই তারা মীরকাশিমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয়লাভ করল। তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে, নবাব মীরকাশিম স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

মীরজাফরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১৭৬৩-৬৫ খ্রিঃ)ঃ মীরকাশিমের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার ঠিক পরেই ইংরেজ কোম্পানি পুনরায় মীরজাফরকে নবাবী মসনদে স্থাপন করে (জুলাই, ১৭৬৩)। এই প্রসঙ্গে নতুন করে মীরজাফরের সঙ্গে এক চুক্তিতে ঠিক হয় যে, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ নবাব কোম্পানিকে ৬৫ লক্ষ টাকা এবং সামরিক ও বাণিজ্যসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেবেন। অবশ্য বিলেতের কোম্পানি-কর্তৃপক্ষ মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ না করে আপোষ মীমাংসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করে মীরকাশিমকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও মীরজাফরকে পুতুল নবাব হিসেবে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করেন।

মীরজাফর সিংহাসনে বসেই তাঁর অনুগত নন্দকুমারকে দেওয়ান হিসেবে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ নন্দকুমার ক্লাইভ ও মীরজাফরের খুবই প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা তাঁর কর্মে মোটেই খুশি হতে পারেনি। তবে অল্পদিনের মধ্যে বৃদ্ধ নবাব মীরজাফর মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৬৫)। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রভাব বিস্তারের আরও অনেক বেশি সুযোগ নিয়ে তার পুত্র নজমউদ্দৌলার সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করল (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫)। সন্ধিশর্তে ঠিক হলো যে, নবাবের নিজস্ব কোনও সেনাবাহিনী থাকবে না। তাঁকে কোম্পানির সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভর করতে হবে। এছাড়া কোম্পানির মনোনীত কোনও 'নায়েব সুবার' উপর রাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হবে। কিন্তু কোম্পানির অনুমতি ভিন্ন তাকে পদচ্যুত করা যাবে না। সর্বোপরি, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকবে। এই সময় ভ্যান্সিটার্টসহ কলকাতা কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা নজমউদ্দৌলার নিকট ১৫ লক্ষ টাকা দাবি করেন। এসব চুক্তি অনুসারে কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও নিজেরা সেই দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করেনি। পুতুল নবাবকেই সব কিছু করতে হত। অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের শোষণ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। এ দুঃসংবাদ ইংল্যাণ্ডে পৌঁছালে অরাজকতার অবসানকল্পে কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ রবার্ট ক্লাইভকে 'লর্ড' উপাধি দিয়ে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে এদেশে প্রেরণ করেন (মে, ১৭৬৫)।

লর্ড ক্লাইভের প্রত্যাবর্তন ও কোম্পানির দেওয়ানি লাভ ঃ বাংলায় প্রত্যাবর্তনের পর

লর্ড ক্লাইভ অনেকগুলি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলেন। **প্রথমত,** তিনি লক্ষ্য করলেন যে, বক্সার যুদ্ধের ফলে কোম্পানি বাংলার নতুন নবাব মীরজাফর এবং তাঁর পুত্র নজমউদ্‌দৌলার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে বাংলায় অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষমতার আইনানুগ কোনও ভিত্তি ছিল না। কারণ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ছিলেন আইন মাফিক সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। সুতরাং সম্রাটের অনুমতি ভিন্ন ইংরেজ কোম্পানি যুদ্ধের দ্বারা লব্ধ ক্ষমতার আইনানুগ অধিকারী হতে পারে না। বাংলার নবাব মূলত মোগল বাদশাহের অধীনস্থ একজন শাসকমাত্র। **দ্বিতীয়ত,** বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের সঙ্গে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্‌দৌলাও পরাজিত হন। সুতরাং সামরিক বিচারে দিল্লি ও অযোধ্যা ইংরেজ কোম্পানির অধীন হলো। কিন্তু বাংলায় থেকে দিল্লি ও অযোধ্যার শাসন পরিচালনা করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। **তৃতীয়ত,** বক্সার যুদ্ধের ঠিক পরেই অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্‌দৌলাকে কোম্পানি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। এই সময় অন্য এক চুক্তিতে (১৭৬৪) ঠিক হলো যে— (১) পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ছাড়াও নবাব এলাহবাদ কোম্পানিকে প্রদান করবে। (২) অযোধ্যার উপর শত্রু পক্ষের আক্রমণ হলে কোম্পানি নবাবকে সামরিক সাহায্য দেবে কিন্তু তার ব্যয়ভার নবাবকেই বহন করতে হবে। (৩) বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ন্যায় অযোধ্যাতেও কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবে। এইসব শর্তের দ্বারা অযোধ্যা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হলো। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে কোনও চুক্তি হয়নি। ভ্যান্সিটার্টের ইচ্ছা ছিল অযোধ্যা রাজ্যটি শাহ্ আলমকেই দিয়ে তাঁর নাম ও পদমর্যাদার সুযোগ নেওয়া। কিন্তু ক্লাইভ এই চিন্তাধারা ত্যাগ করলেন। কারণ মারাঠা প্রতিরোধের জন্য অযোধ্যার অস্তিত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল। আবার এর জন্যে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। **চতুর্থত,** বাংলার নজমউদ্‌দৌলার সঙ্গে কোম্পানির চুক্তির শর্তে লর্ড ক্লাইভ খুশি হতে পারেননি।

লর্ড ক্লাইভ এইসব সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে— (ক) বাংলার নবাব নজমউদ্‌দৌল্লাকে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ক'রে (১৭৬৫) এখানকার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানিকে দিয়ে দিলেন। অবশ্য নবাবের উপর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বেসামরিক শাসনের দায়িত্ব রয়ে গেল। (খ) ক্লাইভ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্‌দৌলার সঙ্গে কোম্পানির চুক্তিটিকে স্বীকৃতি দিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের (বাংলা ও মারাঠা) মধ্যে আশ্রিত ও সীমান্ত রাষ্ট্র হিসেবে অযোধ্যাকে স্বীকৃতি দিলেন। (গ) উক্ত দুটি চুক্তিকে আইনমাফিক করার উদ্দেশ্যে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে এলাহবাদ সন্ধিতে স্বাক্ষর করলেন (১২ই আগস্ট, ১৭৬৫)। এই সন্ধির শর্তে (১) ক্লাইভ দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে সার্বভৌম মোগল সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। (২) তাঁর সম্মানার্থে অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে পাওয়া কারা ও এলাহবাদ অঞ্চল দুটি সম্রাটকে উপহার দিলেন। (৩) পরে বার্ষিক ২৬ লক্ষ

টাকা করদানের বিনিময়ে লর্ড ক্লাইভ শাহ্ আলমের নিকট থেকে 'বাংলা সুবা' অর্থাৎ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কোম্পানি শাহ্ আলমকে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অবশ্য এই ঘটনার পর শাহ্ আলমকে প্রায় ছয় বছর (১৭৬৫-৭২ খ্রিঃ) কোম্পানির রক্ষণাধীনে থাকতে হয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ ছিল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার মাধ্যমে ক্লাইভের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সার্বিক স্বীকৃতি অর্জন করল। শুধুমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে সম্মান দিলে কোম্পানিকে বিরতিহীন যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হত। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি অযোধ্যাকে 'বাফার স্টেট' হিসেবে মর্যাদা দিয়ে সেখানকার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলেন। এর ফলে বিরতিহীন যুদ্ধের অবসান হলো এবং লর্ড ক্লাইভ পূর্বাঞ্চলে শক্তি প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পেলেন। মোগল সম্রাটের নিকট থেকে দেওয়ানি লাভ করায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় কোম্পানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনভিত্তিক হলো। এর ফলে কোম্পানির সার্বভৌমত্বের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হলো। নবাবের হাতে কোনও ক্ষমতাই আর রইল না। ভবিষ্যতে কোনও স্বাধীনচেতা নবাবের পক্ষে বিদ্রোহ করার আর কোনও উপায় রইল না। নবাবের কর্মচারীরা এবার কোম্পানির কর্মচারীরূপে গণ্য হলো। কোম্পানির মনোনীত কর্মচারীরা নবাবের নামেই শাসন করতে শুরু করল। বাংলার রাজস্ব কোম্পানির ভাণ্ডারে জমা হলো। সেই অর্থে কোম্পানির ব্যবসা যেমন স্ফীত হলো তেমনি সামরিক ও প্রশাসনিক বিভাগও শক্তিশালী হলো। 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' পরিণত হলো। বাংলার নবাবকে গদীচ্যুত না করে তাঁকে পুতুল নবাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে একদিকে যেমন দেশীয় নরপতিদের মনে আশঙ্কা জাগার পথ রুদ্ধ হলো, অন্যদিকে তেমনি ইয়োরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের (যেমন, ফরাসি, দিনেমার প্রভৃতি) মনে ঈর্ষার ভাব জেগে ওঠার পথও রুদ্ধ হলো।

দেওয়ানি লাভের ফলশ্রুতি : ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা-সুবার প্রকৃত প্রভুত্ব ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কুক্ষিগত হলো। এই সূত্রে সুবার শাসনব্যবস্থাও পরিবর্তিত হলো। মোগল আইনে নবাব ছিলেন একাধারে দেওয়ান ও সুবাদার। (১) দেওয়ান হিসেবে তিনি যেমন রাজস্ব আদায় করতেন তেমনি দেওয়ানি মামলার বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। (২) সুবাদার হিসবে তিনি নিজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যেমন গ্রহণ করতেন তেমনি আবার ফৌজদারী মামলার বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। সুতরাং নবাব একাধারে ছিলেন দেওয়ান-সুবা বা নায়েব নাজিম। নতুন ব্যবস্থায় অর্থাৎ দেওয়ানি লাভের পর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব এলো কোম্পানির হাতে, আর বিচার ও আইনশৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা রইল নবাবের হাতে। অর্থের ভাণ্ডার নিজের হাতে নিয়েও কোম্পানি শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে নবাবের হাতে অর্থ ও ক্ষমতা রইল না কিন্তু দায়িত্ব মূলত তাকেই দেওয়া হলো। **এই অবস্থাটি ইতিহাসে দ্বৈত-শাসন নামে খ্যাত।** অন্যভাবেও দ্বৈত-শাসনের

ব্যাখ্যা দেওয়া হয়; যেমন— দেওয়ানি লাভের পর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করে। কিন্তু এদেশে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইংরেজ কর্মচারীদের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। তাছাড়া ক্লাইভ সম্ভবত মনে করতেন যে, ইংরেজ কর্মচারী যদি সরাসরি রাজস্ব আদায় করতে যায় তাহলে ব্যাপারটি অনেকেরই মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলবে। তাই অর্থ আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হলো কোম্পানি কর্তৃক মনোনীত রেজা খাঁ ও সিতাব রায় নামক দুজন নায়েব সুবার (নায়েব-দেওয়ান বা নায়েব নাজিমও বলা হয়) হাতে। রাজস্ব আদায় ছাড়াও বাণিজ্য শুল্ক আদায়, দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচারের ভারও তাঁদের উপর দেওয়া হয়। নায়েব-সুবা ছিলেন কোম্পানির মনোনীত। সুতরাং ইংরেজের দালাল, তাই ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধি করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। নবাবের দরবারে থেকে তিনি যেমন রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি বিচার পরিচালনা করতেন তেমনি নবাব তাকে দিয়েই নিজামতী ক্রিয়াকলাপ বা সুবাদার হিসেবে শৃঙ্খলা বিধানের কাজও করাতেন। এটাই ইতিহাসে যুগ্মশাসন বা দ্বৈত-শাসন নামে পরিচিত। এই অবস্থার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ও নামত নবাবের শাসন বজায় থাকল। কিন্তু কার্যত পরোক্ষভাবে প্রকৃত ক্ষমতা রইল ইংরেজ কোম্পানির হাতে। তাই ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "ইংরেজরা তাহাদের প্রকৃত রাজশক্তি একটি সূক্ষ্ম আবরণের দ্বারা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।" এই পদ্ধতি ছিল ইংরেজদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। কারণ, **প্রথমত**, এর দ্বারা কোম্পানি সকল ক্ষমতা ভোগ করত কিন্তু তাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে হত না। **দ্বিতীয়ত**, রাজস্ব আদায় করে তারা তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করত ও অর্থের জোরে সৈন্যবাহিনীও পুষত, কিন্তু শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগ ছিল না বা সেসব দায়িত্ব পালন করতে হত না। **তৃতীয়ত**, শাসনব্যবস্থায় কোনও গলদ থাকলে নবাবকে এবং তাঁর কর্মচারীদের দায়ী করা হত। আর শাসনের ক্ষেত্রে ইংরেজদের ত্রুটি ধরার ও তার বিচার করার কোনও অধিকারই নবাবের ছিল না। তাদের ক্ষেত্রে ছিল 'সাত খুন মাফ'। **চতুর্থত**, কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার ইচ্ছা বা সাধ নবাবের থাকলেও তাঁর কোনও সাধ্য ছিল না। কাজেই নবাব ক্ষমতার অভাবে উদাসীন থাকতে বাধ্য হতেন।

দ্বৈত-শাসনের ফলশ্রুতি হলো ভয়াবহ। ইংরেজ বণিকের সুযোগ-সুবিধা বাংলা সুবাকে করল অবাধ ও অবাঞ্ছনীয় লুণ্ঠনের ক্ষেত্র। দেশের নবাব পরিণত হলেন নামমাত্র উপাধিধারী ব্যক্তিতে। রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেল কোম্পানি। কিন্তু কোম্পানির জনশক্তি এবং অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছু ছিল না। তাই কোম্পানি বাংলার জন্য রেজা খাঁ এবং বিহারের জন্যে সিতাব রায়কে দেওয়ান নিযুক্ত করল। এঁরা কোম্পানির দালাল কর্মচারী। সুতরাং তাদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নবাবের ছিল না। অন্যদিকে নবাব এইসব দেওয়ানকেই নিজামতের শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব দিতে বাধ্য ছিলেন। আবার এই নায়েব সুবাদাররা নবাবের শাসনযন্ত্রকে কাজে লাগাতেন। কাজেই নায়েব সুবার হাতে রইল শান্তি শৃঙ্খলা

বিধানের ভার এবং কোম্পানির হয়ে শোষণ, নিপীড়ন ও লুণ্ঠন করার অমোঘ অস্ত্র। সুতরাং ইংরেজ বণিকদের খুশি করার উদ্দেশ্যে এঁরা শোষণের বিচিত্র উপায় অবলম্বন করতেন। শুরুতেই লক্ষ্য করা যায়, মীরকাশিমের আমল পর্যন্ত জমি থেকে কাউকে উচ্ছেদ করা হত না। কোনও কোন সময় খাজনার হার বৃদ্ধি করা হত মাত্র। দেওয়ানি প্রাপ্তির পর একশালা বন্দোবস্ত বা বছর বছর ইজারাদারদের নিকট জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রথা চালু হলো। যে ইজারাদার অধিক রাজস্বের প্রতিশ্রুতি দিতেন তাকেই জমি দেওয়া হত। ইজারাদার ইচ্ছামত খাজনা আদায় করতেন। যে রায়ত বা কৃষক খাজনা দিতে পারতেন না তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত। "দেওয়ানি পাওয়ার পূর্ব বৎসর (১৭৬৪-৬৫) মোট রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৮১,৭০,০০০ টাকা। দেওয়ানিলাভের পর প্রথম বছর অর্থাৎ ১৭৬৫-৬৬ সনে ১,৪৭,০০,০০০ টাকা ; ১৭৭১-৭২ সনে ২,৩৪,১০,০০০ টাকা এবং ১৭৭৫-৭৬ সনে ২,৮১,৮০,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছিল।" এরপর, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ভারতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্যে ইংল্যাণ্ড থেকে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিল এবং নির্দেশ দিল যে এদেশের রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সামগ্রী ক্রয় করেই ইয়োরোপের বাজারে বিক্রয় করতে হবে। আবার কোম্পানির লাভের অঙ্ক লক্ষ্য করে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির উপর বার্ষিক ৪০০,০০০ পাউণ্ড কর ধার্য করল (১৭৬৭ খ্রিঃ)।

সুতরাং শোষণ ও লুণ্ঠনের যন্ত্রটি নায়েব সুবাদার সহ সরকারী কর্মচারী, তারপর এদেশে কার্যরত কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সহ কোম্পানি কর্মচারী, পরবর্তী পর্যায়ে ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত কোম্পানি কর্তৃপক্ষসহ ব্রিটিশ সরকার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাই ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বিলেতের পার্লামেন্টে যে হিসাব দাখিল করে তাতে দেখা যায়, বাংলার মোট রাজস্ব তের কোটি টাকার মধ্যে নয় কোটি টাকা এদেশে ব্যয় হয়েছে, আর বাকি চার কোটি টাকা বিলাতে রয়ে গেল। এছাড়া, দেওয়ানি লাভের পর বাংলার বাণিজ্য ধ্বংস হলো। ১৭৬৫ সনের পূর্বে ছিল বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার রীতি। দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্য রীতি প্রবর্তন করল। ১৭৬৭ সনে লবণ, সুপারি, তামাকের বাণিজ্য একচেটিয়া করা হলো। অর্থাৎ কোম্পানির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া এই সব পণ্য আর কেউ কেনাবেচা করতে পারবে না। জমিদারদের নিকট থেকে মুচলেখা নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, প্রত্যেক জমিদারের এলাকাধীনে উৎপাদিত লবণের এক কণাও অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ভিন্ন অন্য কারও নিকট বিক্রয় করা যাবে না। ফলে বাংলার হাজার হাজার মানুষের জীবিকার পথ রুদ্ধ হলো। ১৭৬৮ সনে এই অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করা হয় এবং হেস্টিংস ১৭৭২ সনে লবণ ব্যবসায়ে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেন।

বাংলায় তাঁতিরা বাংলার উৎপাদিত কার্পাসজাত সুতো ব্যবহার করত। আর প্রয়োজনে উত্তর প্রদেশ থেকে সুতো আমদানি করত। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি শেষোক্ত সুতোর উপর শতকরা ৩০ টাকা শুল্ক ধার্য করল। ফলে বাংলার তাঁতিরা

ইংল্যাণ্ড জাত সুতো ব্যবহার করতে বাধ্য হলো। তাই শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসের ফলে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হলো। কিন্তু সেখানেও আমিন ও রাজস্ব আদায়কারীদের অকথ্য অত্যাচার অব্যাহত ছিল।

পলাশি যুদ্ধের ঠিক পরেই ক্লাইভ বলেছিলেন যে, "মুর্শিদাবাদ নগরীর বিস্তৃতি, লোকসংখ্যা ও ধনসম্পদ লণ্ডন শহরের তুল্য—কিন্তু মুর্শিদাবাদে এমন বহু লোক আছেন যাদের ঐশ্বর্য লণ্ডনের ধনীদের অপেক্ষা অনেক বেশি।" আবার শোষণের মাত্রা লক্ষ্য করে সেই ক্লাইভই বলেছেন, "পৃথিবীর আর কোনও দেশে এত অরাজকতা, বিভ্রান্তি, ঘুষ, দুর্নীতি এবং পীড়ন-শোষণের ঘটনা কেউ শোনেনি বা দেখেনি যতটুকুর লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল একমাত্র বঙ্গদেশ। এত বিপুল সম্পদ, এত অবৈধ উপায়ে, এত উন্মত্ত লালসার প্রেরণায় আর কোনও দেশ থেকে লুণ্ঠিত হয়নি।..... স্বয়ং নবাব থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট জমিদার কারোর এদের উৎপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না।" ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থিত কোম্পানির রেসিডেন্ট রিচার্ড বিচার কোম্পানিকে লিখলেন, "এই সুন্দর দেশে স্বেচ্ছাচারী রাজাদের অধীনেও স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ ছিল। কিন্তু যখন এর শাসনভার প্রধানত ইংরেজের হাতে আসল তখন থেকে ইহা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে।" এই শোষণ ও লুণ্ঠনের কথা স্বীকার করেছেন সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের বহু ঐতিহাসিক। তাই র‍্যামসে মূর লিখেছেন, "জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধির জন্য দায়ী ছিল নির্মমভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রয়াস ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের অফুরন্ত লাভের আকাঙ্খা।"

১৭৭০-এর মন্বন্তর ঃ দেওয়ানি লাভ ও দ্বৈত-শাসনের দৌলতে বাংলা-সুবায় চলতে থাকল রাজস্ব আদায়ের প্রতিযোগিতা, বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সঙ্গে কোম্পানিসহ তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রথা যুক্ত হলো। বাংলার সকল স্তরের সাধারণ মানুষ হলো নির্যাতিত, শোষিত ও লুণ্ঠিত। সহায়-সম্বলহীন মানুষের ঘরে ঘরে যখন হাহাকার উঠল তখন পরপর দু'বছর (১৭৬৮-৬৯ খ্রিঃ) হলো অনাবৃষ্টি। ফলে শস্য-শ্যামলা বাংলার মাঠ-ঘাট খাঁ খাঁ করতে থাকে। বাংলার বুকে মন্বন্তরের করাল ছায়া নেমে আসে। সর্বত্র খাদ্যের অভাব, তাই মানুষ প্রথমে অখাদ্য, কুখাদ্য, গাছের পাতা ইত্যাদি খেতে শুরু করে। এর ফলে দেখা দিল দুরারোগ্য ব্যাধি, মহামারী। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করল। বাংলার গ্রাম জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হলো। মানুষের ইতিহাসে এই ধরনের 'ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ' ও মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কথা আর বিশেষ শোনা যায় না। বাংলার জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অনাহারে ও মহামারীতে প্রাণ হারাল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মুখবন্ধে এই ভয়াবহ মন্বন্তরের এক হৃদয়বিদারক চিত্র তুলে ধরেছেন।

অনাবৃষ্টির জন্যে শস্যহানি ঘটেছিল। তার ফলে দুর্ভিক্ষের সূচনা হলো—একথা সত্য। কিন্তু দুর্ভিক্ষকে সর্বগ্রাসী করা ও ব্যাপক মহামারীর জন্য প্রকৃত দায়ী ছিল কোম্পানির

শাসনব্যবস্থা। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি বা প্লাবনের জন্য শস্যহানি অতীতেও হয়েছে। মোগল আমলে দুর্ভিক্ষের সময় সরকারের খয়রাতি ব্যবস্থা তাকে সর্বগ্রাসী হতে দেয়নি। সেযুগেও রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু রায়তকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত না। কিন্তু কোম্পানি আমলের দ্বৈত-শাসন ছিল মূলত অরাজকতা। নবাবের হাতে দায়িত্ব দেওয়া ছিল, ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সুতরাং দুর্ভিক্ষ-বিরোধী প্রতিকারের ব্যবস্থা স্বপ্ন মাত্র। অন্যদিকে কোম্পানির হাতে আর্থিক, সামরিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সর্বস্তরের ক্ষমতা রইল কিন্তু দায়িত্ব ছিল না। কোম্পানি ক্ষমতার আবরণে থেকে শোষণ ও লুণ্ঠন করেছে এবং দেশের সাধারণ মানুষের শেষ কপর্দক শুধু নয়, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষে নিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে, কোম্পানি এবং তার দালাল গোষ্ঠী তখন রাজস্ব আদায়ের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। ১৭৬৬ থেকে ১৭৬৮— এই তিন বছরের মধ্য ৫০৭ মিলিয়ন পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ থেকে শোষিত হলো। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে কোম্পানির কাউন্সিল এক বিবরণে প্রকাশ করল তাতে বলা হলো "সম্প্রতি নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং ফলে বহুলোকের প্রাণনাশ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বর্তমান বছরে রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে।" এক-তৃতীয়াংশ লাঘব ও কৃষিজাত উৎপাদন হ্রাস হওয়ার জন্য রাজস্বের পরিমাণ কম হওয়ার কথা। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় ১৭৬৮ সনের চেয়ে ১৭৭১ সনে রাজস্বের পরিমাণ অনেক বেশি। এর কারণ ব্যাখ্যা করে হেস্টিংস যে রিপোর্ট দেন তাতে তিনি বলেছেন, "জোর জবরদস্তি করে পুরাতন পরিমানের রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।" তাহলে প্রমাণিত হয় যে অনাবৃষ্টি থেকে শস্যহানি এবং দুর্ভিক্ষ হলেও তার প্রচণ্ডতা, গভীরতা ও প্রসারতার জন্য সমকালীন শাসনব্যবস্থাই ছিল সর্বাধিক দায়ী। দ্বৈত-শাসনের কুফলের চরম আত্মপ্রকাশ হলো এই মন্বন্তর। বাংলা ১১৭৬ সালে (বঙ্গাব্দে) এই চরম অবস্থার প্রকাশ ঘটে বলেই ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'** নামে অভিহিত।

মন্বন্তরের ফল অবর্ণনীয়। **প্রথমত,** শস্যহানির ফলে ঘটল খাদ্যাভাব, খাদ্যাভাব থেকে অখাদ্য, কুখাদ্য ভক্ষণ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব, তার থেকে এলো মৃত্যু, ঘরে ঘরে হাহাকার। শস্য-শ্যামল বাংলার বুকে সৃষ্টি হলো শ্মশানের মর্মান্তিক রুক্ষতা। 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' দিল কোম্পানির দালাল ও লোকলস্কর। তারা মেতে উঠল রাজস্ব আদায় ও একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায়। **দ্বিতীয়ত,** মন্বন্তরের ফলে সমাজের সর্বস্তরে দেখা দিল দুর্নীতি ও অবাঞ্ছনীয় কার্যকলাপ। খাদ্যের অভাবে মানুষ সন্তান বিক্রয় করল, চুরি-ডাকাতি ও রাহাজানি ঘটতে থাকল। দ্বৈত-শাসনে বা যুগ্ম শাসনে সমগ্র দেশে কোনও আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বলতে কিছুই ছিল না। সুতরাং বাঁচার আশায় মানুষ সমাজ-বিরোধী কর্মে তৎপর হয়ে পড়ল। **তৃতীয়ত,** মন্বন্তরে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কবলে পড়ল। কৃষক, তাঁতি, শিল্পী, কারিগর, কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি খেটে খাওয়া মানুষের অভাবে বাংলার কৃষি শিল্পের অস্বাভাবিক অবনতি ঘটল। শুধু সাধারণ শ্রেণীর খেটে-খাওয়া মানুষ নয়, দুর্ভিক্ষে

মহামারীতে ছোট বড়ো বহু পুরাতন জমিদার বংশ বিলুপ্ত হলো। অনেকেই গরীব ভিখারীতে পরিণত হলো। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে কোম্পানি নতুন নতুন ব্যক্তিকে জমির ইজারা দিয়ে নতুন নতুন জমিদার সৃষ্টি করল। এরা নায়েব, গোমস্তা দিয়ে জমিদারী পরিচালনা করতেন। নতুন জমিদারের সঙ্গে প্রজার কোনও সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। ফলে প্রজার দুর্দশা দূর হলো না। মন্বন্তরের এই শোচনীয় অবস্থার কথা সমসাময়িক ব্রিটিশ লেখকগণ স্বীকার করেছেন। ১৭৮৭ সনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য উইলিয়াম ফুলার্টন বলেছেন, "'বাংলাদেশ সকল জাতির শস্য-ভাণ্ডার এবং প্রাচ্যের বাণিজ্য সম্পদের কেন্দ্র বলে পরিগণিত হতো কিন্তু আমাদের অতিরিক্ত কুশাসনে গত বিশ বছরের মধ্যে এই দেশের অনেক স্থান মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। অনেক স্থলে জমিতে চাষ হয় না, বিস্তৃত জঙ্গল তার স্থান অধিকার করেছে। কৃষকের ধন লুণ্ঠিত, শিল্পীরা উৎপীড়িত। বার বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে—ফলে লোকসংখ্যা কমে গেছে।" ঠিক তার দু'বছর পর (১৭৮৯ খ্রিঃ) লর্ড কর্নওয়ালিস লিখলেন, "কোম্পানির শাসনাধীন ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র বন্য পশুর বাসস্থান জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।"

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ চিরকালের জন্যে ভারত ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে চলে যান। ক্লাইভের পর বাংলার গভর্নর রূপে এলেন ভেরেল্‌স্ট এবং তার পর এলেন কার্টিয়ার (১৭৬৯ খ্রিঃ)। দেওয়ানি লাভের পর এদেশে প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় যে দুর্যোগ পর্বের সূচনা হলো তার চরম আত্মপ্রকাশ ঘটল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তার ফলাফলের মাধ্যমে। ইংল্যাণ্ডে কোম্পানির পরিচালক সভা অন্তত এটুকু অনুধাবন করলেন যে, উক্ত বিপর্যয়ের প্রতিকারের জন্যে শাসনব্যবস্থার সার্বিক পুনর্গঠন প্রয়োজন। দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানির নিজের দায়িত্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। তাই কোম্পানির পক্ষে ওয়ারেন হেস্টিংস নতুন গভর্নররূপে ভারতে এলেন (১৭৭২ খ্রিঃ)।

২। শাসন কাঠামোর পুণর্গঠন (১৭৭২-১৮৫৭ খ্রিঃ)

কোম্পানির শাসনের সূত্রপাত ঃ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। ভারত তারা এসেছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। কিন্তু কালক্রমে ইংল্যাণ্ডের এই কোম্পানি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করার পর ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরের সূচনা। ১৭৬৪তে বকসারের যুদ্ধে জয়লাভ তার পরিণতি এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ক্ষমতাহীন মোগলসম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম কর্তৃক কোম্পানিকে প্রদত্ত সুবে বাংলার 'দেওয়ানি' অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ কোম্পানির শাসনের সূত্রপাত।

কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের শাসনভার একজন গভর্নর ও কাউন্সিলের উপর অর্পিত হয়। ইংল্যাণ্ডে ছিল কোম্পানির পরিচালক সভা বা

'কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্', কোম্পানির মালিকগোষ্ঠী। তারাই ছিল শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে, যেমন বাংলায়, কোম্পানি 'দ্বৈত শাসন' (Dual Government) প্রবর্তন করেছিল। এর অর্থ যে, দু-ধরণের দুটি শাসন পাশাপাশি ছিল। মাদ্রাজেও তাই। এই দ্বৈত শাসনব্যস্থায় একদিকে কোম্পানির হাতে রাজস্ব, এমনকি সামরিক নীতি পরিচালনা আর অন্যদিকে আঞ্চলিক নবাবদের হাতে আভ্যন্তরীণ প্রশাসন। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত দ্বৈতশাসন চলাকালীন নানাবিধ অসুবিধা দেখা দেওয়ার ফলে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দ্বৈত শাসন উঠিয়ে দিয়ে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হলো কেনঃ ইংল্যাণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হলেও তা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সনদ বা চার্টার-এর উপর নির্ভরশীল ছিল। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধে দান করা ছিল চার্টার-এর লক্ষ্য। অর্থাৎ যেহেতু কোম্পানি বিদেশে বাণিজ্য করতে যাবে, সেজন্য তাদের অধিকার ও কর্তব্য ব্রিটেনের সরকার নির্দিষ্ট করে দেয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বৈধতা নিয়েই রাণী এলিজাবেথের আমলে কোম্পানির জন্ম। পরে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্ট তাকে নতুনভাবে অনুমোদন করে। কোম্পানির পরিচালনা ভার অবশ্য ছিল বেসরকারি মালিকদের হাতে।

কিন্তু ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্রমে ক্রমে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হলে স্বাভাবিকভাবেই আগেকার চার্টার-এর উপর নির্ভর করে কোম্পানিকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নানারকম অসুবিধা দেখা দিল। আরও উল্লেখযোগ্য যে, পলাশির পর ভারতবর্ষ থেকে সম্পদ লুণ্ঠন করা সত্ত্বেও কোম্পানির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়নি, বরং তা শোচনীয় হয়ে পড়ে। কোম্পানি ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের কাছে ঋণের জন্য আবেদন জানায় কিন্তু ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে অস্বীকৃত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে দশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণের জন্য আবেদন করে। তখন ব্রিটেনের পার্লামেন্ট এই ঋণ দেওয়া উচিত কিনা বুঝে নেবার আগে পরিস্থিতি তদন্ত করে দেখার জন্য এক কমিটি গঠন করে। সেই তদন্তে দেখা গেল, কোম্পানির শাসন আসলে শোষণ। অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং বিস্ময়কর সেই চিত্র। দেখা গেল, কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, অর্থলালসা এবং দুর্নীতির ফলেই বাংলার অর্থনীতি ভেঙে পড়ার মুখে। ফলে কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণের বা কোম্পানিকে 'রেগুলেট করার' প্রয়োজন দেখা দিল। তাছাড়া কোম্পানির নিজস্ব শাসন শুরু হলে (১৭৭২) তাকে বৈধতা দান করারও প্রশ্ন ছিল। সুতরাং রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩) পাশ করাবার প্রয়োজন হয়ে পতন। এই রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় বিবেচনা ক'রে এবং

কোম্পানির কর্মচারিবর্গের দুর্নীতি রোধ করার প্রয়োজনে এই আইন। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির শাসনকে বৈধতা দান করার জন্যও এই আইন। মাইকেল এডওয়ার্ডস তাই লিখেছেন যে, "এই আইন বাণিজ্য শক্তি হিসেবে কোম্পানির পতনের সূচনা করেছিল।"

কেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নিছক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান মনে করা সমীচিন মনে করলেন না ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, তার কারণ আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায়। লর্ড ক্লাইভ যখন বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন তখন সুবে বাংলার (অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা একত্রে) রাজস্ব থেকে কোম্পানির অংশীদারদের লভ্যাংশের দাবির মাত্রা বেড়ে যায় এবং তারা তাদের লগ্নীকৃত মূলধনের উপর যেমন সাড়ে বারো শতাংশ আদায় করে, তেমনি ব্রিটিশ সরকারও কোম্পানির কাছ থেকে বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড আদায় করেন। এই বিপুল অর্থ ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হত ভারতকে লুণ্ঠন করে। তদুপরি ছিল কোম্পানির কর্মচারিবর্গের ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি। এই কর্মচারিবর্গের অনেকেই ইংল্যাণ্ডে সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। বাংলায় কিন্তু শাসনের নামে শোষণ ও মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচারের পরিণতি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। মন্বন্তর হেতু রাজস্ব অনাদায়ের ফলে যেমন অর্থে ঘাটতি পরে, তেমনি কোম্পানির শাসনব্যবস্থার ত্রুটি ইংল্যাণ্ডের সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, **দ্বৈত শাসনে কোম্পানির ছিল দায়িত্ব-বিহীন বিপুল ক্ষমতা, কারণ অর্থ তাদের হাতে আর অন্যদিকে নবাবের ছিল ক্ষমতা-বিহীন দায়িত্ব।** ত্রুটি দূর করার জন্যই দরকার হলো নতুন আইনের বা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপের।

রেগুলেটিং আইন (অ্যাক্ট), ১৭৭৩ ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, যেহেতু নতুন আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা, তাই তাকে বলে রেগুলেটিং অ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রণের আইন। তবে এই আইন নিয়ন্ত্রণ করা হলেও ব্রিটেনের সরকার কোম্পানির ক্ষমতায় ভাগ বসায় নি। বরং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র ও কোম্পানির ভারতীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে এই আইন ছিল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এক ধরণের সমঝোতা। রাজস্ব আদায়ের ভার ভারতে কোম্পানির হাতেই রইল। বস্তুতপক্ষে রেগুলেটিং অ্যাক্টের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে কোম্পানির গঠনতন্ত্র সংশোধন এবং অন্যদিকে ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রথমে কোম্পানির পরিচালন সমিতি বা কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্ এবং অংশীদারদের সভা বা কোর্ট অফ শেয়ার হোল্ডারস এর গঠনতন্ত্রের সংস্কার করা হলো। আগেকার পাঁচশো পাউণ্ডের শেয়ার হোল্ডারদের ভোটদানের ক্ষমতা নাকচ করা হলো। অন্তত একহাজার পাউণ্ড শেয়ার থাকলে তবেই ভোটাধিকার থাকবে, সাব্যস্ত হয়। তিন, ছয় এবং দশ হাজার পাউণ্ডের শেয়ার হোল্ডারদের যথাক্রমে দুই, তিন ও চারটি ভোট দেবার অধিকার দেওয়ার ফলে কোম্পানিতে যার যত বেশি অর্থ লগ্নী করা আছে তার তত ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলো। আরও ঠিক হলো যে, ডিরেক্টরগণ চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন, তাদের সংখ্যা হবে

২৪ এবং তাদের এক-চতুর্থাংশ প্রতি বছর অবসর নেবেন। একবছর ব্যবধানে অবশ্য তারা আবার ডিরেক্টার হতে পারবেন। ভবিষ্যতে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের সদস্যগণকে নিযুক্ত করবেন কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ তবে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। কোম্পানির শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এবং ভারত থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করা বাধ্যতামূলক করা হলো।

কোম্পানির ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রশাসনের জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই ভার দেওয়া হয় একজন 'গভর্নর জেনারেল' এবং চারজন সদস্য বিশিষ্ট এক কাউন্সিলের হাতে যারা গভর্নর জেনারেলকে সাহায্য করবেন। সবমিলে বলা হত গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল। বাংলার গভর্নরকেই 'গভর্নর জেনারেল' করা হলো (আইনের ভাষায় গভর্নর জেনারেল অফ ফোর্ট উইলিয়াম)। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভারতে এলেন। বোম্বাই এবং মাদ্রাজের কর্তৃত্ব গভর্নর জেনারেলের হাতে অর্পণ করা হয়। কাউন্সিলের সদস্যগণের প্রত্যেকের অধিকার ছিল সমান। অধিকাংশের ভোটে সকল বিষয়ের মীমাংসা হবে তবে কোনো বিষয়ে কাউন্সিলে দুই-দুই ভোট হলে গভর্নর জেনারেল স্বয়ং অতিরিক্ত 'কাস্টিং' ভোট দেবেন, যে-কোনও পক্ষে। কলকাতা প্রেসিডেন্সির সামরিক ও বেসামরিক শাসনভার স-পারিষদ গভর্নর জেনারেলের হাতে অর্পণ করা হলো। কাউন্সিলের প্রথম চারজন সদস্য ছিলেন ক্ল্যাভারিং, জনসন, বারওয়েল এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস। শুধু তাই নয়, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির তদারকি করা, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপন, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় এসব তো ছিলই। এই কাউন্সিল পাঁচ বছরের মেয়াদে নিযুক্ত হবে তবে বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ প্রয়োজনে পাঁচ বছরের আগেই তা ভেঙে দিতে পারবেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজে একজন করে গভর্নর ও চারজনের কাউন্সিল ছিল, তবে ঐ দুই প্রেসিডেন্সি ছিল কলকাতা বা ফোর্ট উইলিয়ামের তথা গভর্নর জেনারেলের অধীনে।[১]

রেগুলেটিং আইন অনুসারে একজন প্রধান বিচারপতি ও অপর তিনজন সাধারণ বিচারপতিকে নিয়ে কলতাকার ফোর্ট উইলিয়ামে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। স্যার এলিজা ইম্পে প্রথম প্রধান বিচারপতি হয়ে আসেন। এই বিচারালয়কে অবশ্য গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের থেকে সতন্ত্র এবং স্বাধীন করা হয়। গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যগণ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নরগণও তাদের কাউন্সিলের সদস্যগণ, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ প্রত্যেকের উপযুক্ত বেতন ধার্য করা হয় এবং কারও পক্ষে কোনও পারিতোষিক গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্টের নানাবিধ ত্রুটি ঃ কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ, নতুন ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো গড়ে তোলা এবং শাসনব্যবস্থাকে বৈধতা দানের উদ্দেশ্যে রেগুলেটিং আইন পাস হলেও এর অনেক ত্রুটি ছিল। যেমন, (১) এই গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের ক্ষমতা নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেয় নি, (২) গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাউন্সিলের উপর কী ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন তা পরিষ্কার ছিল না। ফলে ঐ দুই প্রেসিডেন্সির গভর্নর ও পরিষদ অনেক সময় স্বাধীনভাবে চলত। এর ফলে ইঙ্গ মারাঠারা বা মহীশূর সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিমত দেখা যায়। (৩) সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা এবং স-পার্ষদ গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক পরিষ্কার না থাকায় দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা যেত। (৪) সুপ্রিম কোর্ট দেশীয় বিচারালয়ের ক্ষমতাতেও হস্তক্ষেপ শুরু করে। (৫) গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে তার কাউন্সিলের পার্থক্য দেখা দিলেও গভর্নর জেনারেলের চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল না এবং (৬) ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব, ব্রিটিশ সরকারের না কোম্পানির, তার মীমাংসা হয়নি।

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের সংশোধনী ঃ রেগুলেটিং অ্যাক্ট গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঔপনিবেশিক শাসন বিষয়ে এটি ব্রিটেনের প্রথম সংসদীয় দলিল। কোম্পানির অরাজকতা ও দুর্নীতি বন্ধ করে এক সুষ্ঠু শাসন গড়ে তোলা এর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইঙ্গ ভারতীয় আইনে নানা ত্রুটি দেখা দেওয়ায়, বিশেষত সুপ্রিম কোর্টে সম্পর্কিত ধারার সংশোধনীর প্রয়োজন হয়। এজন্য ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড নর্থ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কিছু সংশোধনী গৃহীত হয় পার্লামেন্টে। এতে বলা হয় যে, (১) গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল যুগ্মভাবে স্বতন্ত্রভাবে সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার ভুক্ত থাকবেন, (২) রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের কোনও এক্তিয়ার থাকবে না, (৩) ভারতীয় জমিদারদের উপর সুপ্রিম কোর্টের কোনও এক্তিয়ার চলবে না এবং (৪) কোম্পানি তথা দেশীয় আদালতগুলির অস্তিত্বও স্বীকৃত হলো।

এখানে বলা দরকার যে, হেস্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বিচারব্যবস্থার উন্নতি ও সংস্কার। তিনি সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত নামে দুটি পৃথক বিচারালয় স্থাপন করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট বিচার করত ইংল্যাণ্ডের আইনানুসারে। আর ভারতীয় দেওয়ানি ও ফৌজদারী আইন অনুসারে সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত আদালত চলত। ফলে বিচারব্যবস্থায় জটিলতার উদ্ভব হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট অনেক সময় দেশীয় বিচারালয়ে হস্তক্ষেপ করত। সেজন্য ১৭৮১-র সংশোধনীর প্রয়োজন হয়েছিল।

পিট-এর ভারত-আইন (১৭৮৪ খ্রিঃ) ঃ ১৭৭২ থেকে কোম্পানির ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় তবুও রেগুলেটিং আইন কুড়ি বছর চলেছিল। কিন্তু হেস্টিংসের কাজকর্ম ইংল্যাণ্ডে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। পার্লামেন্টও তা সুনজরে দেখেনি। পার্লামেন্টে বিরোধী দলের প্রস্তাব অনুযায়ী এক ‘সিলেক্ট কমিটি’ ভারতীয় শাসনব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সুপারিশ করার জন্য গঠিত হয়। রেগুলেটিং আইন

কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ বা রেগুলেট করতে পারেনি। একই সময়ে আমেরিকার উপনিবেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধ অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পে-কে ভারত থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর সংসদ সদস্য ও পরে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি হেনরী ডান্ডাস পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করলেও বিরোধিতার কারণে সফল হননি। যেমন সফল হননি প্রধানমন্ত্রী ফক্স। উভয়েই চেয়েছিলেন শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রয়োজনে সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন। ভারতের থেকে আমদানিকৃত রাজস্ব থেকে ইংল্যাণ্ডের চাপ কমতে পারে, এমন কথাও অনেকে মনে করতেন। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে তার ভারত শাসন আইন প্রস্তাব পার্লামেন্ট কর্তৃক পাস করিয়ে নিতে সমর্থ হন।

এই আইনের ধারাগুলি অনুযায়ী— (১) ব্রিটিশ অর্থসচিব, একজন রাষ্ট্র সচিব ও ব্রিটেনের রাজা কর্তৃক মনোনীত চারজন প্রিভিউ কাউন্সিলারকে নিয়ে একটি 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল' গঠিত হয়। এই বোর্ডের উপর কোম্পানির সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। (২) কোম্পানির তিনজন ডিরেক্টরকে নিয়ে গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটির উপর 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল'-এর গোপন নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত কোম্পানির ভারতীয় কর্মচারিবর্গের কাছে পাঠানো হবে বলে স্থির হয়, (৩) বোর্ড অফ কন্ট্রোল এবং সিক্রেট কমিটির যুগ্ম সিদ্ধান্ত সংশোধন বা বদল করার ক্ষমতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ প্রোপ্রাইটারদের ছিল না। (৪) গভর্নর জেনারেলকে একজন সেনাপতি ও দু'জন কাউন্সিলার সাহায্য করবেন বলে স্থির হয়, (৫) যুদ্ধ, শান্তি, রাজস্ব এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন বিষয়ে বোম্বাই এবং মাদ্রাজ সরকারের উপর বাংলা সরকারের কর্তৃত্ব সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করা হয়, (৬) কোম্পানির কর্মচারিগণ ভারতে চাকরি জীবন শেষ করে কী পরিমাণ অর্থ দেশে নিয়ে গেলেন তার হিসাব দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। (অবশ্য এটি কোনও দিনই কার্যকর হয়নি)। (৭) বলা হয়েছিল 'রাজ্যজয় এবং সাম্রাজ্যবিস্তার ইংল্যাণ্ডের জাতীয় মর্যাদা ও নীতি বহির্ভূত', কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল ধাপ্পা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল।

পিটের ভারত-আইনের ত্রুটি ঃ পিটের ভারত আইনেও কতকগুলি ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। (১) এই আইন কোম্পানির ক্ষমতা হ্রাস করেছিল বটে কিন্তু বোর্ড অফ কন্ট্রোল যাতে ভারতের শাসনব্যবস্থা ও ভারতের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে অবহিত পারে সেরকম কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। (২) বোর্ড অফ কন্ট্রোল এবং কোম্পানির মধ্যে ক্ষমতা কার্যত ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে কোম্পানির পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ অনেক কমে যায়। তাছাড়া ভারত শাসনের ব্যাপারে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল, তাদের অর্থ বা পুঁজি লগ্নী করা ছিল কিন্তু বোর্ড অফ কন্ট্রোলের তা ছিল না। (৩) বোর্ড অফ

কন্ট্রোল এবং কোম্পানির মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়াতে দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি মধ্যপন্থা। হয়তো সমসাময়িক জনমতের চাপ এর পিছনে ছিল। কিন্তু কেউই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করত না। (৪) বোর্ড অফ কন্ট্রোলও স্বাধীন ছিল না। তারা ছিল মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং (৫) কোম্পানি কর্তৃক সাম্রাজ্য প্রসার না করার নীতি ছিল নিতান্তই অসার ও প্রতারণামাত্র।

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের আইনী সংশোধনী ঃ ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এক আইন পাস করে কিছু কিছু ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করা হয়। যেমন, (ক) কোম্পানির যে সব কর্মচারিবর্গ ভারত থেকে ফিরে যেত, ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তাদের বিষয় সম্পত্তির হিসেব দেওয়ার দায়িত্ব থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। বস্তুত আগেও এটি তেমন কার্যকর হয়নি, (খ) ভারতে গভর্নর জেনারেল নিয়োগের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীর অনুমোদন আর লাগবে না ঠিক হয়। তবে গভর্নর জেনারেলকে প্রয়োজনে প্রত্যাবর্তনের আদেশ রাজা বা রাণী দিতে পারতেন, (গ) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বা বিশেষ কারণে গভর্নর জেনারেলকে তার কাউন্সিলের বা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত অগ্রাহ্য করার অধিকার দেওয়া হয়। এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস অনেক বেশি ক্ষমতাবান হন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইন ঃ ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুড়ি বছরের জন্য (১৭৭৩-৯৩) ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন করে সনদ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং সেই কারণেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে আর একটি চার্টার অ্যাক্ট পাস করে। তবে ঐ আইন পাস হওয়ার আগে কোম্পানিকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে জনমত তীব্র হয়। হৈ-চৈ -এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে ইংল্যাণ্ডের সব বণিক, পুঁজিবাদী ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কাছে ভারত উন্মুক্ত হতে পারে। অবশ্য এই দাবি কার্যকর হয়নি এবং কোম্পানি আরও কুড়ি বছরের জন্য ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার পায়। পুরোপুরি একচেটিয়া বলা যায় না এজন্য যে, বছরে মোট তিন হাজার টন পণ্য ভারত থেকে ক্রয় করার অধিকার কোম্পানি-বহির্ভূত বণিকদেরও দেওয়া হয়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদে কোম্পানির গঠনতন্ত্রে এবং ভারতের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। যেমন, (১) বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সদস্যদের বেতনের ব্যবস্থা করা হলো, (২) শাসনকার্যে গভর্নর জেনারেল বাংলার বাইরে গেলে তার অনুপস্থিতিতে এক সহসভাপতি নিয়োগ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পরিষদে প্রয়োজন হলে গভর্নর জেনারেলকেসভাপতিত্ব করার অধিকার দেওয়া এবং মাদ্রাজ অথবা বোম্বাই পরিষদকে কিছু না জানিয়েও কোম্পানির উপর আদেশ জারি অধিকার দেওয়া হলো গভর্নর জেনারেলকে। ফলে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়, (৩) গভর্নর জেনারেল

তার পরিষদের কাকেসহসভাপতি করবেন তার ভারও তাঁর হাতে দেওয়া হয়, (৪) বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্-এর অনুমোদন ছাড়াই প্রধান সেনাপতিকে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করা হলো, (৫) ১৭৮৬-এর সংশোধনী মোতাবেক গভর্নর জেনারেল ক্ষেত্রবিশেষে পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করতে পারবে, (৬) কোনও প্রেসিডেন্সিতে কোনও পদখালি হলে সেই প্রেসিডেন্সিতেই কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে তা পূরণ করা হবে, (৭) ভারতে একাধিকক্রমে তিন বছর কাজ করেছেন এমন ব্যক্তিই ঐ সব শূন্য পদে নিযুক্ত হবে। ফলে বহিরাগতদের নিয়োগ বন্ধ হয়। বোর্ড অফ ডিরেক্টারস এর ক্ষমতা কমলো এবং প্রশাসনিক উচ্চপদ শুধু ইয়োরোপীয়দের মধ্যে সীমিত হলো।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ-আইন ঃ ১৭৯৩-এর সনদের মেয়াদ শেষ হয় কুড়ি বছর পর ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে এবং তখন নতুন চার্টার অ্যাক্ট পাস করার প্রয়োজন হয়। এর আগেই ভারতে লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনপদ্ধতির (১৭৮৬-৯৩) ফলাফল অনুসন্ধান করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এক 'অনুসন্ধান কমিটি' গঠন করেছিলেন (১৮০৮)। চার বছর অনুসন্ধান করে তারা এক প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে আইনের ভিত্তি ছিল সেই রিপোর্ট।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট পাস হবার সময় ইয়োরোপে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান 'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম' বা মহাদেশীয় অবরোধের মাধ্যমে ইংরেজ বণিকদের ইয়োরোপের বন্দরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, ফলে ভারতীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করবার ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়। লর্ড গ্রেনভিল ভারতে কোম্পানির শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের শাসন চেয়েছিলেন। তা অবশ্য গ্রহন করা হয়নি।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের প্রধান ধারাগুলি ছিল—(১) ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার নাকচ করা হলো, (২) চীন সাম্রাজ্যে অবশ্য কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যে বহাল রইল, (৩) কোম্পানির অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডারগণ ভারতে একচেটিয়া অধিকার বাতিলের বিরুদ্ধে সোরগোল তুললে তাদের জন্য অর্থ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, (৪) ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়, (৫) ইংরেজদের ভারতে জমি ক্রয় করবার এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করবার অধিকার দেওয়া হয়, (৬) কোম্পানির সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, (৭) কলকাতার জন্য একজন বিশপ এবং তিনজন অধস্তন আর্চ ডিকন বা যাজক নিযুক্ত করা হয় এবং (৮) ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা বজায় রেখে কোম্পানিকে ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসন করার অধিকার দেওয়া হয়। *এটাই উত্তরকালে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের পথ তৈরি করে।*

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইন ঃ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট-এর মেয়াদ কুড়ি বছর পর শেষ হলে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় চার্টার আইন পাস করার

প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ঐ সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়। একদল কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার হাতে দেওয়ার পক্ষপাতী, অপর দল কোম্পানির হাতেই তা রেখে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাড়া পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত 'সিলেক্ট কমিটি' (১৮২৯) ভারতে কোম্পানির কার্যাদির সম্পর্কে এক বিরাট প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। এই সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তৎকালে ইংল্যাণ্ডে অবস্থানরত রাজা রামমোহন রায়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট পাস হলো যার দ্বারা কোম্পানির গঠনতন্ত্রে ও ভারতীয় শাসনতন্ত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয়।

এই আইনের ধারা অনুসারে— (১) পুনরায় কুড়ি বছরের জন্য ইংল্যাণ্ডের রাজার 'পক্ষ' থেকে ভারতে শাসনকার্য পরিচালনা করবার অধিকার দেওয়া হয়, (২) কোম্পানি-কেই ভারতে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করার ভার দেওয়া হয়, (৩) চীন সাম্রাজ্যে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার কোম্পানির হাতে অবশ্য রইল না। ভারতে তাদের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল। ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এখন থেকে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত হলো, (৪) কোম্পানির ভারতীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এটি হলো নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আগে তারা রেগুলেশন পাস করতে পারত, আইন করত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, (৫) বাংলার গভর্নর জেনারেলকে ভারতের গভর্নর জেনারেল (Governor General of India) করা হলো। এতদিন পর্যন্ত ভারতের সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষের নাম ছিল 'স-পারিষদ বাংলার গভর্নর জেনারেল।', এখন স-পারিষদ ভারতের গভর্নর জেনারেল সেই স্থান নিল। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এই সময় ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হলেন, (৬) গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে বা পরিষদে একজন 'আইন-সদস্য' (Law member) নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। টমাস ব্যবিংটন মেকলে এই পদে আসীন হলেন। এই পদক্ষেপটিও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর দ্বারা সরকারের আইন প্রণয়ন ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণের সূত্রপাত, (৭) বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নরদ্বয়কে গভর্নর জেনারেল অফ ইণ্ডিয়ার অধীনে আনা হলো, (৮) একজন গভর্নরের অধীনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে একটি আলাদা প্রদেশে পরিণত করা হলো এবং (৯) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে-কোনো ভারতীয় ও ব্রিটিশ নাগরিককে কোম্পানির অধীনে সরকারি চাকরি দেওয়া যাবে, একথা স্বীকৃত হয়। সরকার অবশ্য তা বাস্তব রূপায়নে বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইন ঃ ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টারের মেয়াদ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে শেষ হলে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন চার্টার আইন পাশ করা হয়। কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক পাস হওয়া এটাই শেষ সনদ যদিও তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই নতুন আইনের মধ্যে ভবিষ্যতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় বলে অনেকে মনে করেন। তবে আইন পরিষদে কোনও ভারতীয় সদস্য না থাকায় এবং শাসনব্যবস্থার

উঁচু পদে ভারতীয়দের তখন পর্যন্ত না নেওয়াতে শাসনব্যবস্থার ত্রুটি থেকেই গেল। এই আইন প্রণয়নের চার বছর পর ভারতীয় মহাবিদ্রোহ কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটাতে বাধ্য করেছিল।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের প্রধান ধারাগুলি ছিল— (১) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যতদিন না ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অন্য ব্যবস্থা করছেন ততদিনের জন্য 'ইংল্যাণ্ডের রাণী ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের অনুকূলে' ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসন পরিচালন করবার ভার দেওয়া হয়। লক্ষ্যনীয় যে, এবার আর কুড়ি বছরের জন্য মেয়াদ দেওয়া হয়নি। (২) বাংলার জন্য ছোটলাট বা লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর অফ বেঙ্গলের স্বতন্ত্র পদ সৃষ্টি করা হয়। (৩) ভারতের গভর্নর জেনারেল হলেন ভারতের সর্বময় কর্তা বা বড়লাট। (৪) অন্য তিন সদস্যের মতন আইন সদস্যও গভর্নর জেনারেলের পরিষদের পূর্ণ সদস্য হলেন। (৫) গভর্নর জেনারেল এবং উক্ত চারজন সদস্য ছাড়া ভারতের সেনাপতি, বাংলার প্রধান বিচারপতি ও অন্য একজন জজ এবং বোম্বাই-মাদ্রাজ-বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সরকারের একজন করে প্রতিনিধি— এই সর্বমোট বারোজনকে নিয়ে গভর্নর জেনারেলের পরিষদ গঠিত হয়। (৬) আইন প্রণয়নের জন্য একটি আইন পরিষদ (Legislative Council) গঠন করা হয়। (৭) বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ এর সদস্য সংখ্যা কমিয়ে করা হয় ১৮ জন। এদের মধ্যে ছয়জন রাণী কর্তৃক মনোনীত। অবশ্য এরা সকলেই অন্তত দশ বছর ভারতে কোম্পানির অথবা ব্রিটিশ সরকারের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন। অবশিষ্ট বারোজনের মধ্যে ছয়জন ভারতবর্ষে অন্তত দশ বছর কাজের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হতে হবে। মাত্র দশজন সদস্য হলেই কোরাম হবে। ফলে কোনও কোনও পরিস্থিতিতে রাণী কর্তৃক মনোনীত সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে গেল। (৮) বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ কর্তৃক কোম্পানির কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হলো এবং তার পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের নীতি গৃহীত হলো। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেকলের সভাপতিত্বে এক কমিটি গঠিত হয়। (৯) ভারতে নতুন প্রেসিডেন্সি গঠনের জন্য ডিরেক্টর সভাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রদেশগুলির সীমারেখা প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করার অধিকারও ডিরেক্টর সভাকে দেওয়া হয়। এই ক্ষমতার প্রয়োগ করেই ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে একজন লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর-এর অধীনে পাঞ্জাব প্রদেশ গঠিত হয়। (১০) বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি ও সেক্রেটারি অফ স্টেট উভয়ের ক্ষমতা সমান করে দেওয়া হয়। বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সদস্যদেরও মাসিক বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এইভাবে ১৭৭২ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার তথা পার্লামেন্ট নানাভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতে শাসককালে কোম্পানির গঠনতন্ত্র এবং শাসনের উপর পুর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে, এবং শাসনকে সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের আমলে এবং পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসন সংস্কার ঃ ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্নর হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন তখন পূর্বেকার দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যাবতীয় কুফলের ফলে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যাণ্ডে যেমন রেগুলেটিং অ্যাক্ট এর সাহায্যে শাসনব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়া হয়, তেমনি তার আগেই ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর নির্দেশ অনুসারে হেস্টিংস দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে কোম্পানির শাসনের সূচনা করেন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে তিনি হন বাংলার গভর্নর জেনারেল। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত কোম্পানির দায়িত্বহীন ক্ষমতা এবং নবাবের ক্ষমতাহীন দায়িত্ব যে ক্ষতি করেছিল তা দূর করে এক ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো গড়ে তোলার কঠিন কাজ পড়েছিল হেস্টিংসের কাঁধে। কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন, কেন-না তিনটি প্রধান সমস্যা হেস্টিংসের সামনে ছিল। এক, দ্বৈত শাসনের দুর্বলতা ও কুফলগুলির পরিবর্তন করা। দুই, একটি নিছক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে শাসনতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে বদল করা। তিন, কোম্পানির বণিক ও কর্মচারিগণকে (কেরাণী তার উপর ফ্যাক্টর, জুনিয়ার ফ্যাক্টর এবং সিনিয়র ফ্যাক্টর তিনরকম কর্মচারী ছিল)। প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা। বহুবিধ সংস্কার সাধন করে হেস্টিংস কাজে যত্নবান হন। ইংরেজ ঐতিহাসিক আলফ্রেড লায়াল তাই লিখেছেন, "শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে হেস্টিংস মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।" হেস্টিংসের সংস্কারের দুটি উদ্দেশ্য ছিল— (১) দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা এবং (২) দ্বৈত শাসনের ফলে যে অব্যবস্থা এবং অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল তা দূর করে বাণিজ্যের প্রসার সৃষ্টি করা।

হেস্টিংসের শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপের মধ্যে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানির হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি শাসনকাঠামো গড়ে তোলা। তিনি নবাবের বার্ষিক ভাতা ৩২ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ লক্ষ টাকা করে দিলেন। রেজা খান ও সীতাব রায়কে পদচ্যুত করে দেওয়ান পদ দুটি উঠিয়ে দেন। (তাঁর রাজস্ব সংস্কার পরে আলোচিত হবে)। আগে বলা দরকার, নবাব বংশের হাতে কোনও ক্ষমতাই রইল না। নবাবের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব মীরজাফরের বিধবা পত্নী মণি বেগমের হাতে দেওয়া হলো। মহারাজ নন্দ কুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত করা হলো। তবে দ্বৈত শাসনের অবসানের পরও অন্য এক ধরনের দ্বৈত চরিত্র শাসনে এসে গেল। একদিকে গভর্নর জেনারেল ও তার পারিষদ বা কাউন্সিলের মধ্যে দ্বৈতভাব, আবার স-পারিষদ গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা দু'ভাগ হয়ে গেল।

হেস্টিংসের রাজস্ব সংস্কার ঃ কোম্পানির আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়েছিল অথচ ভূমি রাজস্ব

বিষয়ে তাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে তারা মোগল আমলের নবাবী ব্যবস্থা বজায় রেখে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দুজন নায়েব দেওয়ানের হাতে দেন। এরা হলেন পাটনার সীতাব রায় এবং মুর্শিদাবাদের মহম্মদ রেজা খান। তারপর কোম্পনির লুণ্ঠন, কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধির চাপ, কর্মচারিদের দুর্নীতি, নায়েব— দেওয়ানদের অত্যাচার ইত্যাদির করাল গ্রাসে বাংলার ইতিহাসে যে ভয়াবহ অন্ধকার নেমে এলো তাতে রাজস্ব আদায় করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়ার পর রাজস্ব সংস্কারে মনোযোগী হন। ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি এ ব্যাপারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন।

তিনি প্রথমেই নায়েব পদ দুটি উঠিয়ে দিলেন। রেজা খান ও সীতাব রায়কে দুর্নীতির অভিযোগে বিচারালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরে অবশ্য তারা ছাড়া পান। হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য কিছু কর্মচারী নিয়োগ করেন। এই কর্মচারীদের সুপারভাইজার (Superviser) বলা হত। পরিদর্শকরা তাদের কাজে অর্থাৎ রাজস্ব নির্ধারণ এবং তা আদায়ে ব্যর্থ হন। হেস্টিংস পরিদর্শকদের নামকরণ করেছিলেন 'কালেক্টর' এবং জেলায় জেলায় তাদের অফিসকে বলা হত 'কালেক্টরেট'। যাই হোক, এরা ব্যর্থ হলে রাজস্বনীতির পরিবর্তন করা হয়। তিনি বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর নির্দেশে গভর্নর ও তার পরিষদ (Council)কে দিয়ে একটি রাজস্ব বোর্ড (Board of Revenue) গঠন করেন। এই বোর্ডের উপর দেওয়ানি সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে সেই সঙ্গে একটি ভ্রাম্যমান কমিটি (Committee of Circuit) নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়। এই কমিটি প্রত্যেক জেলায় উপস্থিত হয়ে জমিদারদের সঙ্গে পাঁচ বছরের মেয়াদে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেওয়ানি কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

হেস্টিংস চেয়েছিলেন পূর্বেকার জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যে সকল ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়েছে তাদের অনেককে জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এদের অনেকেরই জমিদারী, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি কোনও ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই। কোম্পানির বহু কর্মচারী বেনামীতে জমির বন্দোবস্ত হাতে নেয়। এই অনভিজ্ঞ ও লোভী নতুন জমিদারগণ প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করার ফলে ভূমিরাজস্ব আদায় কঠিন হয়ে পড়ে।

এর ফলে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন পদ্ধতি নেওয়া হয়। কোম্পানির অসাধু কর্মচারী ও নব্য জমিদারদের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য হেস্টিংস পাঁচশালা বন্দোবস্তের বদলে এক বছরের মেয়াদে জমি বন্দোবস্ত করার কথা ভাবেন। রাজস্ব বোর্ডের দু'জন সদস্য ও কোম্পানির তিনজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীকে নিয়ে কলকাতায় এক রাজস্ব কমিটি (Committee of Revenue) গঠন করা হয়। কলকাতার ইয়োরোপীয় কালেক্টারের পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং প্রত্যেক জেলায় রাজস্ব সংক্রান্ত সব দায়িত্ব দেশীয় ব্যক্তিদের হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ এই ব্যবস্থা অনুমোদন না করার ফলে আবার নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

রাজস্ব বোর্ড রাখা হলো তবে গঠন প্রক্রিয়া বদলে গেল। এর সদস্য হলেন কাউন্সিলের দুজন সদস্য এবং তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে ছয়টি অংশে ভাগ করে প্রত্যেক অংশ একটি প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধীনে রাখা হয়। প্রত্যেক কাউন্সিলের কাজে সাহায্যের জন্য একজন করে দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস আমিনী কমিশন নিযুক্ত করে রাজস্ব সংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। এই ব্যবস্থায় পূর্বের সর্বাধিক রাজস্ব যে দিতে পারবে, সেই ধরনের ইজারাদারদের বাদ দিয়ে সাবেকী জমিদারদের হাতেই জমির বন্দোবস্ত ছেড়ে দিলেন কিন্তু জমিদারদের পুরাতন চরিত্র বদল হয়ে তারা কেবল রাজস্ব আদায়কারীতে পরিণত হলো।

ফলে হেস্টিংসের রাজস্ব বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়নি। কৃষক শ্রেণীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়। প্রাচীন গ্রামীণ কাঠামোতেআঘাত লাগে। নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষার ব্যাপার ছাড়াও খাজনা বৃদ্ধি এবং অত্যাচার শুধু কৃষকদের উপর নয়, বহু জমিদার পরিবারেরও দুর্দশা ডেকে আনে।

বিচার বিভাগীয় সংস্কার ঃ মোগল শাসনব্যবস্থায় দেওয়ান শুধু রাজস্ব আদায়ই করতেন না। জমিজমা সংক্রান্ত মামলার বিচারও তাকে করতে হত। ১৭৬৫-তে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করার পর স্বাভাবিকভাবেই দেওয়ানি বিচারের দায়িত্বও পেয়েছিল। হেস্টিংসের আমলে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয় এবং তা চলত ব্রিটিশ আইনের দ্বারা। কিন্তু স্থানীয় আইন-কানুন বা বিচারপদ্ধতি বিলুপ্ত করে ইয়োরোপীয় আইন কানুন প্রবর্তন করা হেস্টিংসের মনঃপূত ছিলনা। তাছাড়া জেলার দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে তা করা তখনই আদৌ সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকেই রাজস্বব্যবস্থার বদলের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানি বিচারব্যবস্থাও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফৌজদারি বিচার যদিও ছিল নবাবের প্রশাসনের হাতে তবু হেস্টিংস উভয়বিধ বিচারব্যবস্থায় সংস্কারে মনোযোগী হন।

ওয়ারেন হেস্টিংস কমিটি অফ সার্কিট-এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় একটি করে দেওয়ানি এবং ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন। এগুলিতে বিচারের ভার যথাক্রমে কালেক্টর ও কাজীর হাতে দেওয়া হয়। এই বিচারালয়গুলির নামকরণ করা হয় মফঃস্বল দেওয়ানি আদালত এবং মফঃস্বল ফৌজদারি আদালত। হেস্টিংসের নির্দেশে দশ জন হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে হিন্দু আইনবিধি সংকলিত হয় ।এছাড়া হেস্টিংস কলকাতায় একটি সদর দেওয়ানি আদালত এবং একটি সদর ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেন। এই বিচারালয় দুটিতে যথাক্রমে মফঃস্বল দেওয়ানি ও মফঃস্বল ফৌজদারি আদালতের পাঠানো আপিলের মামলাগুলির মীমাংসা হত। সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার করতেন গভর্নর এবং তাঁর কাউন্সিলের দু'জন সদস্য। সদর নিজামত আদালতের প্রধান বিচারপতি নবাব কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। তবে এই বিচারালয়ের উপর ইংরেজ বিচারকের পরিদর্শনের অধিকার ছিল। সদর দিওয়ানি আদালত ছিল ফোর্ট উইলিয়ামে।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ছয়টি প্রাদেশিক কাউন্সিল বা পরিষদের বিচার-ক্ষমতা ছয়টি দেওয়ানি আদালতে হস্তান্তরিত করা হয়। প্রতিটি দেওয়ানি আদালতে কার্যভার কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দের উপর ছিল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে এই আদালতগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় আঠারোটি। এছাড়া হেস্টিংস আদালতে কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে রাখা, আদালতে অভিযোগ উপস্থাপনের সময় নির্দিষ্ট করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিল বারো বছরের মধ্যে মামলা না করলে তা বাতিল হওয়া, অত্যধিক পরিমাণ অর্থ জরিমানা নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি। হিন্দু প্রজার ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের এবং মুসলমান প্রজার ক্ষেত্রে ইসলামীয় আইনের প্রয়োগ ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা হয়।

হেস্টিংসের বাণিজ্যিক সংস্কার : ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বোর্ড অফ রেভেনিউ এর নির্দেশ অনুসারে প্রচলিত দস্তক বা ছাড়পত্র প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এর ফলে কোম্পানির কর্মচারীদের ও তাদের দালালদের মধ্যে বিনা শুল্কে বা অবৈধভাবে বাণিজ্য করার সুযোগ অনেক কমে যায়। তাছাড়া হেস্টিংস জমিদারদের যে-সব নিজস্ব বাণিজ্য চৌকী অর্থাৎ শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি ছিল তা বন্ধ করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর হয়। শুধু কলকাতা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, পাটনা এবং ঢাকার শুল্ক ঘাঁটিগুলি তুলে দেওয়া হয়নি; লবণ, সুপারি ও তামাক ছাড়া আর কিছুর উপর কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ছিল না। অর্থাৎ অন্য পণ্যের ব্যবসা করলে ভারতীয় ও ইংরেজ উভয়কেই শুল্ক দিতে হত। হেস্টিংসের বাণিজ্য সংস্কারের ফলে অবস্থার উন্নতি হয়। তিনি জোর করে তাঁতিদের কোম্পানির কাজে নিযুক্ত করার পদ্ধতিও বন্ধ করে দেন।

কর্নওয়ালিসের শাসন সংস্কার : ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হিসেবে পদত্যাগ করে যাওয়ার পরে এক বছর স্যার জন ম্যাকফারসন অস্থায়ীভাবে কাজ পরিচালনা করেন। কর্নওয়ালিসের আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক সংস্কার আবার উল্লেখযোগ্য বিষয়। কর্নওয়ালিসের বহুবিধ সংস্কার সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ভূমি-রাজস্ব বিষয়ে তাঁর আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হবে, তবে এখানে তাঁর বাণিজ্যিক, বিচার বিভাগীয় এবং পুলিশী-ব্যবস্থা আলোচনা করা হলো।

কর্নওয়ালিস ভারতে ছিলেন ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন অত্যন্ত কম হওয়াতে তাঁরা দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। এই কারণে তিনি বেতন বৃদ্ধি করেন। অবশ্য প্রত্যেক কর্মচারীকে নিজ নিজ সম্পত্তির হিসেব দিতে হতো। ইংল্যাণ্ডের অনুসরণে ভারতের শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কার : হেস্টিংসের আমলে কোম্পানির বাণিজ্যব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে বোর্ড অফ ট্রেড গঠিত হয়েছিল তার সদস্য সংখ্যা ছিল এগারো। কর্ণওয়ালিস তা কমিয়ে করলেন পাঁচ। তাছাড়া ভারতবর্ষ থেকে যে-সব পণ্য ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করা হত তা ক্রয় করবার জন্য কোম্পানি নিজেদের কর্মচারীদের সঙ্গেই চুক্তি করত। ইংরেজ কর্মচারীরা এই দায়িত্ব পেয়ে দেশীয় বণিক বা তাদের দালালদের কাছ থেকে মাল কিনে

যথেষ্ট লাভ রেখে আবার কোম্পানির কাছে বিক্রি করত। এরফলে কোম্পানি এক বিরাট পরিমাণ মুনাফা থেকে বঞ্চিত হত। কর্ণওয়ালিস কোম্পানির কর্মচারীদের পরিবর্তে সরাসরি দেশীয় বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে বাজারদরেই কোম্পানি পণ্যদ্রব্য কিনতে সমর্থ হয়। বোর্ড অফ ট্রেড এর সদস্যগণ সহ সকলেই অসদুপায়ে অর্থ রোজগার করতেন। কর্নওয়ালিসের সংস্কার তা কমিয়ে ফেলে। তাছাড়া দেশীয় তাঁতিদের আগে বলপূর্বক সমস্ত বস্ত্র কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করা হত। কর্ণওয়ালিস কেবলমাত্র যে পরিমাণ অর্থ তাঁতিরা দাদন বাবদ কোম্পানির কাছ থেকে নিত সেই পরিমাণ বস্ত্র কোম্পানিকে দিয়ে উদ্বৃত্ত বস্ত্র ইচ্ছামত বিক্রয়ের সুযোগ তাঁতিদের দেয়।

বিচার বিভাগীয় সংস্কার ঃ কর্নওয়ালিস ফৌজদারি এবং দেওয়ানি উভয়বিধ বিচার ব্যবস্থারই সংস্কার সাধন করেন। যেমন— (১) হেস্টিংস কলকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত এবং মুর্শিদাবাদে সদর নিজামত আদালত স্থাপন করেছিলেন। এটাই ছিল সর্বোচ্চ ফৌজদারি বিচারালয়। এতে সভাপতিত্ব করতেন নবাব, বিচার করতেন কাজী, মুফতি প্রমুখ। কর্নওয়ালিস এই আদালতকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন এবং নবাবের জায়গায় গভর্নর জেনারেলকে বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য তাদের দেশীয় আইন-কানুন, রীতি-নীতি, জানাবার জন্য কাজী এবং মুফতি নিয়োগ করা হলো। (২) সদর নিজামত আদালতের অধীনে চারটি ভ্রাম্যমান আদালত স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেকটিতে দু'জন করে ইংরেজ বিচারক নিযুক্ত হন। এখানেও তাদের সাহায্য করবার জন্য কাজী এবং মুফতি থাকত। ভ্রাম্যমান বিচারালয়ের বিচারকগণ বছরে দু'বার করে বিভিন্ন জেলায় যেতেন এবং স্থানীয় ফৌজদারি বিচারকার্যের সমাধা করতেন। (৩) আগে কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর দণ্ড দানের রীতি ছিল, কর্নওয়ালিস তা তুলে দেন। (৪) আগে নরহত্যা রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে পরিগণিত হত না। ফলে হত্যাকারী ভয় দেখিয়ে অথবা নিহত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে অর্থের বিনিময়ে বশ করে মামলা মিটিয়ে নিতে পারত। কর্নওয়ালিস হত্যার অপরাধকে সমাজ-বিরোধী বলে ঘোষণা করেন এবং হত্যাকারীর বিচার মৃতব্যক্তির আত্মীয়দের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয় ঘোষণা করেন। সমাজের উপকার ও দৃষ্টান্তের জন্য হত্যাকারীর শাস্তি প্রয়োজন, একথাও তিনি বলেন। (৫) ইসলামীয় আইন মোতাবেক আগে অ-মুসলমান সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কোনও মুসলমানকেমৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলত না। আবার কোনও কোনও অপরাধের বিচারে দুজন অ-মুসলমান সাক্ষীকে একজন মুসলমান সাক্ষীর সমান বলে ধরা হত। লর্ড কর্ণর্নওয়ালিস বিচারব্যবস্থায় এই সব বন্ধ করে আইনের চোখে সকলকে সমান ঘোষণা করেন।

পূর্বে রাজস্ব অর্থাৎ দেওয়ানির সঙ্গে দেওয়ানি মামলা মোকদ্দমার বিচারের ব্যবস্থা জড়িত ছিল। ফলে রাজস্ব ব্যবস্থার কোনও বিশেষ পরিবর্তন ঘটলে দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন দরকার হত। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানি বিচারব্যবস্থাকে রাজস্ব বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ

পৃথক করেন। (২) দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্নে তিনি সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয়গুলিকে স্থাপন করেছিলেন। এইসব আদালতে সাধারণ ধরনের দেওয়ানি বিচার হত। (৩) সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয়ের উপরে প্রত্যেক জেলায় একটি করে জেলা বিচারালয় একজন করে জেলা জজের অধীনে স্থাপন করা হয়। (৪) জেলা আদালতের উপরে চারটি প্রাদেশিক আদালত স্থাপন করা হয়েছিল— কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনাতে। এগুলিও চালাতেন ইংরেজ জজগণ। জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক কোর্টে আপিল করা যেত। (৫) সমগ্র দেওয়ানি বিচারের সর্বোচ্চে ছিল সদর দেওয়ানি আদালত যাতে বিচার করতেন গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল সদস্যগণ। আগে জেলা কালেক্টর দেওয়ানি মামলা মোকাদ্দমার বিচার করতেন। কর্নওয়ালিস তাদের বিচার ক্ষমতা কমিয়ে দেন এবং শাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তাদের ম্যাজিস্ট্রেটের সমান ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং তারা সাধারণ ফৌজদারি মামলার বিচার করতে পারতেন।

এইসব ছাড়া কোম্পানির কর্মচারিদের কার্যপদ্ধতির জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ঐতিহ্য স্থাপন করলেন। কোম্পানির কর্মচারিদের নিয়মানুবর্তিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হত। এইসব সরকারি নিয়মকানুন 'কর্নওয়ালিস কোড' (Cornwallis Code) নামে অভিহিত হয়। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনবিভাগে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় উভয় জাতির মানুষকেই কর্মচারী হিসাবে নেওয়া হত কিন্তু কর্ণওয়ালিস শুধু ইয়োরোপীয়দের মধ্যে কর্মচারী নিয়োগ সীমাবদ্ধ রাখেন। ভারতীয়রা আইনের চোখে সমান ছিল না। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে পূর্বোক্ত ভ্রাম্যমান দেওয়ানি আদালতের ক্ষেত্রে দু'জনের বদলে তিনজন করে ইংরাজ জজ নিযুক্ত করার কথা সাব্যস্ত হয়।

পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কার ঃ বাণিজ্যিক রাজস্ব বা প্রশাসনিক সংস্কার যা কিছু কর্নওয়ালিস করেছিলেন তার সবই আগে হেস্টিংস শুরু করেছিলেন। কর্ণওয়ালিস তাতে কেবল উন্নতি ঘটান। কিন্তু যে সংস্কারকার্য সম্পূর্ণ তার হাতে শুরু হয় এবং যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শাসকরা আয়ত্তে রাখতেন তা হলো', পুলিশী ব্যবস্থা। কর্নওয়ালিস পুলিশী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে তাকে আধুনিক করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন কলকাতা শহরের দুষ্কৃতীর সংখ্যাধিক্য, সন্ধ্যের পর নানা অসামাজিক কার্যকলাপ, পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দুর্নীতি আর গ্রামের জমিদারীতে পুলিশ বাহিনীর অকর্মণ্যতা। এসব দূর করার জন্য তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা নেন।

(১) কর্নওয়ালিস ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে কতকগুলি রেগুলেশন অর্থাৎ আইন পাস করে পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেন। আইনকানুন যাতে লোকে মেনে চলে তার ব্যবস্থা করা, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের যাতে গ্রেপ্তার করা হয় ইত্যাদি পুলিশের কর্তব্য বলে পরিগণিত হলো (২) পুলিশ যাতে অসদুপায়ে ঘুষ না নেয় সেজন্য তাদের বেতনবৃদ্ধি করা হয়। যেসব পুলিশ চোর-ডাকাত, খুনী ও বেআইনী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের ধরতে পারবে তাদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়। (৩) কলকাতা শহরের জন্য 'সুপারিটেণ্ডেন্ট অফ

পুলিশ' নিয়োগ করা হলো, তার অধীনে অন্য কর্মচারী থাকত। (৪) জমিদারদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনীর পরিবর্তে প্রত্যেকটি জেলা কয়েকটি থানা বা পুলিশ স্টেশনে (Police Station) ভাগ করা হয়। প্রতিটি থানায় একজন করে দারোগা এবং কয়েকজন কনস্টেবল রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এদের ব্যয়ভারের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। (৫) বিভিন্ন শহরে শান্তিরক্ষার ভার 'কোতোয়াল' নামক এক শ্রেণীর কর্মচারীর হাতে দেওয়া হয়।

কর্নওয়ালিসের সর্ববিধ সংস্কারের ছিল দুটি উদ্দেশ্য। এক, ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম করা, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার অনুসরণে এবং দুই শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থেই ভারতের অর্থসম্পদ নিয়োগ করা। অবশ্য ভারতবাসীর পক্ষে তার ফল শুভ হয়নি।

পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সংস্কার (১৭৯৪-১৮২৮ খ্রিঃ) ঃ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিসের পর প্রায় পয়ত্রিশ বছর সময়কাল পর্যন্ত কোম্পানির আমলে কর্নওয়ালিসের শাসনপদ্ধতি আর্দশ হিসেবে বহাল থাকে, যদিও তার ত্রুটিগুলি সংশোধনের চেষ্টা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি সংশোধন এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অন্য ধরণের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত আমরা বর্তমান অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করব। এখানে অন্যবিধ প্রশাসনিক সংস্কার উল্লেখ করা দরকার।

১৭৯৪ থেকে ১৮২৮ এর মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই কারণে জেলা জজদের সংখ্যাবৃদ্ধি, নিম্নতর আদালতগুলির সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য ভারতীয়দের সদর আমিন ও মুনসেফ রূপে নিয়োগ ইত্যাদি পরিবর্তন সাধন করা হয়। অন্যদিকে ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। রাজস্বসংক্রান্ত যে-সব বিবাদ হত তার মীমাংসার জন্য পুনরায় কালেক্টরদের হাতেই বিচারের ভার দেওয়া হয়েছিল। নিম্ন আদালত থেকে পাঠানো আপিলগুলি পাঠানো হত প্রাদেশিক আদালতে। এজন্য প্রাদেশিক আদালতগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। যেমন বিচারকদের সংখ্যা তিন থেকে বাড়িয়ে চার করা, সদর দেওয়ানি আদালতের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। ঐ আদালতের বিচারের ভার স-পারিষদ গভর্নর জেনারেলের পরিবর্তে তিনজন জজের হাতে অর্পণ করা হয়।

পুলিশী ব্যবস্থারও কিছু কিছু সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। গ্রামের থানাগুলির দারোগার ব্যয়ভার বহন করত সরকার কিন্তু চৌকিদারদের ব্যয়ভার বহন করত জমিদারগণ। চৌকিদারগণ তাদের কাজের জন্য থানার দারোগার কাছে দায়ী থাকত। এই ব্যবস্থার আশানুরূপ উন্নতি না হওয়াতে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের 'আমিন' নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের উপর চৌকিদারদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক পুলিশ সুপারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, পরে তা বিলুপ্ত করা

হয় (১৮২৯)। তখন থেকে জেলায় জেলায় এস. পি. বা জেলার পুলিশ সুপারের পদ সৃষ্টি করা হয়।

পরবর্তীকালের প্রশাসনিক সংস্কার (১৮২৯-১৮৫৭) : লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন (১৮২৮-৩৫ খ্রিঃ) ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট পাশ হয় এবং বাংলার গর্ভনর জেনারেল ভারতের এবং বাংলার গর্ভনর হন। ভারতের সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষের নাম হয় 'গর্ভনর জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া-ইন-কাউন্সিল'। বেণ্টিঙ্ক তার আমলে অনেক প্রশাসনিক সংস্কারও করেছিলেন। তিনি উদারপন্থী, এবং সংস্কারকাম ছিলেন। ইঙ্গ -ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে কোম্পানির অর্থনীতির উপর খুব চাপ পড়েছিল। এসময় অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়।

বেণ্টিঙ্ক সামরিক ও বেসামরিক খাতে ব্যয়-সংকোচ করতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি সেনাদের 'অর্ধেক ভাতা' বাতিল করে দেন এবং সামরিক কর্মচারীদের বেতনও কমিয়ে দেন। এর ফলে ইয়োরোপীয় সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোম্পানির পরিচালকবর্গ বেন্টিঙ্কের পিছনে থাকায় তিনি এই বিক্ষোভে অটল ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যাপারেও মনোযোগী হয়েছিলেন। এজন্য তিনি মালবে আফিঙ-এর একচেটিয়া কারবারের উপর কর ধার্য করা, বাংলায় যেসব চাষের জমিকে অবৈধভাবে নিষ্কর বলে দেখানো হয়েছিল তার উপর কর ধার্য করা এবং মাদ্রাজে 'রায়তওয়ারী' প্রথার প্রর্বতন করে, আর আগ্রা অঞ্চলে তিরিশ বছরের মেয়াদে জমি বন্দোবস্তের প্রথা প্রবর্তন করে কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেন। এছাড়া তিনি সিন্ধু প্রদেশের আমীরদের ও রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে সেইসব অঞ্চলে ইংরেজ বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করেন।

অন্যদিকে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত ভ্রাম্যমান বিচারালয়গুলি ও প্রাদেশিক আপিল আদালত গুলি বাতিল করেন। তিনি ফৌজদারী মামলার দায়িত্ব জেলার-বিচারকদের উপরই ছেড়ে দেন। কালেক্টরদের দেন ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা। বেণ্টিঙ্ক কয়েকটি জেলা নিয়ে এক একটি ডিভিশন এবং প্রতিটি ডিভিশনে একজন করে ডিভিশনাল কমিশনারের পদ সৃষ্টি করেন। তার উপর দায়িত্ব ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জজ এবং পুলিশের কাজের তত্ত্বাবধান করা। প্রাদেশিক আপিল আদালতগুলি ও সুপারিনটেনডেন্ট এর পদগুলি বিলুপ্ত করে তাদের ক্ষমতা কমিশনারের হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু একজনের পক্ষে এই বিশাল কাজ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বেণ্টিঙ্ককে পুনরায় রদ-বদল করতে হয়েছিল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উপর আবার ফৌজদারি বিচারের ভার দেওয়া হয় এবং স্থির হয় যে, একই ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হবেন না।

বেণ্টিঙ্কের আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক সংস্কার ছিল গুণানুযায়ী ভারতীয়দের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত। ভারতীয়দের মধ্য থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার নিয়োগ করবার নীতি গৃহীত হয়। প্রধান সদর আমিন নামে একটি নতুন

পদের সৃষ্টি করা হয় এবং আদালতে ফারসি ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারও চালু হয়। বেণ্টিঙ্ক তার পরিষদের নব-নিযুক্ত আইন-সদস্য মেকলের সভাপতিত্বে একটি আইন-কমিশন গঠন করেন এবং মেকলের প্রচেষ্টাতেই বিখ্যাত ভারতীয় দণ্ডবিধি বা 'পেনাল কোড' রচিত হয়।

এরপর উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেছিলেন লর্ড ডালহৌসি তার গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন (১৮৪৮-৫৬)। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে উগ্র সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসি সর্বাধিক উৎসাহী ছিলেন ঠিকই কিন্তু প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি যত্নবান ছিলেন। ডালহৌসি পাঞ্জাবের শাসনভার তিনজন কমিশনারকে নিয়ে গঠিত একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত করেন। এক একজন কমিশনারের উপর এক একটি বিভাগের শাসনভার অর্পণ করা হয়েছিল। তিন বছর পরে এই বোর্ডের বদলে একজন প্রধান কমিশনারের হাতে পাঞ্জাবের শাসনভার অর্পণ করা হয়। বিদেশী সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে পাঞ্জাবের নিরাপত্তার প্রশ্নটি মাথায় রেখে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি দুর্গ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাঞ্জাব সীমান্তবাহিনী নামে এক সৈন্য বিভাগ তৈরি করে তা বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখা হয়েছিল। পাঞ্জাব প্রদেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আগেকার শিখবাহিনী ভেঙে দেওয়া হলো। সব শিখ সর্দার ও জায়গিরদারদের জায়গির বাতিল করা হলো এবং সামরিক পুলিশ বাহিনী গঠন করা হলো। পাঞ্জাবে কৃষি, রাজস্ব, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হলো। পতিত জমি উদ্ধার করে তা চাষের ব্যবস্থা করা, কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা, বহু রকমের আভ্যন্তরীণ শুল্ক বাতিল করা, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করা হয়। ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করাও ডালহৌসির কৃতিত্ব।

এছাড়া ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল ও তার পরিষদের প্রধান দায়িত্ব ছিল বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করা। ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলার প্রাধান্য ছিল বেশি। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে বাংলা, বিহার উড়িষ্যা ও অসমের প্রশাসনের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। সারা ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যাস্ত থাকলেও, কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদ আইন-সংক্রান্ত আলোচনায় প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

ভারতের অন্যান্য এলাকায় প্রশাসনিক সংস্কার ঃ বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রশাসনিক সংস্কার করা হয়েছিল। এ-বিষয়ে মাদ্রাজ এবং বোম্বাই এই দুই প্রেসিডেন্সির কথাই আগে বলা দরকার। বাংলার অনুকরণেই মাদ্রাজের প্রশাসন গড়ে ওঠে। সমগ্র প্রদেশকে কয়েকটি জেলা এবং প্রতিটি জেলাকে কয়েকটি তালুকে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রথমদিকে জেলারজজকে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

পরে এই দায়িত্ব কালেক্টারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ক্রমে কালেক্টারের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হয় এবং রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব তার উপরই অর্পণ করা হয়।

বাংলার অনুকরণেই ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিচার-ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে এর কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। একজন জজের তত্ত্বাবধানে জেলা আদালতগুলি গঠন করা হয়। এই বিচারালয়গুলি থেকে সদর দেওয়ানি আদালতে আপিল করার রীতি প্রচলিত হয় এবং নিম্ন আদালতগুলির দায়িত্ব ভারতীয় বিচারকদের হাতে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে, রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসরণে কলকাতার সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের (১৭৭৪) পর মাদ্রাজ (১৮০১) এবং বোম্বাইতে সুপ্রিম কোর্ট (১৮২৩) স্থাপন করা হয়েছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো গড়ে তোলে তার মূল লক্ষ্য কী ছিল? এককথায় বলা যেতে পারে, উপনিবেশ বজায় রাখা। উপনিবেশ বজায় রাখার অর্থ হলো, (১) ভারতীয়দের পরাধীন করে রেখে শাসন অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রাখা এবং (২) সেই উপনিবেশকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজস্ব এবং অন্যান্য বিষয়ে ভারতবাসীকে শোষণ করে ভারতের সম্পদ ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া। এজন্য আইন, শাসন, বিচার তিন বিভাগেই তারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূল ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম ছিল রাজস্ব সংস্কার। কারণ ভূমিরাজস্ব ছিল আয়ের মূল উৎসগুলির অন্যতম। [আমরা ঔপনিবেশিক অর্থনীতি প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে কোম্পানীর আমলে বিভিন্ন ধরণের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত আলোচনা করব। এখানে অন্য দু'-একটি কথা বলে শাসন কাঠামোর পুনর্গঠন বিষয় আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।]

(১) এখন যা কলকাতা হাইকোর্ট তা হলো কোম্পানির আমলের প্রাচীনতম বিচারালয়। তবে তখন নাম ছিল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিচারালয়ও বটে। ১৭৭৩ খিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করা হয় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। তারপর মাদ্রাজ (১৮০১) এবং বোম্বাইতে (১৮২৩) অনুরূপ সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করা হয়। ১৮৫৩ খ্রিঃ এই আদালতগুলির এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা ভাগ করা হয়। ব্রিটিশ প্রজা, তিন শহরের বাসিন্দা এবং কোম্পানির কর্মচারিদের বিচার হত এখানে। এছাড়া ছিল বিভিন্ন সদর দেওয়ানি আদালত, সদর নিজামত আদালত ইত্যাদি। সুপ্রিম কোর্টগুলিতে প্রথম দিকে ব্রিটিশ আইন অনুসৃত হলেও পরে ভারত সরকারের নানাবিধি অনুযায়ী সেগুলি সংশোধিত হত। এই আদালতগুলির রায়ের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে স-পারিষদ রাজা বা 'কিং ইন কাউন্সিল' এর কাছে আপিল করা যেত। অবশ্য ১৮৩৩ থেকে আপিল (কথাটি এসেছে ইংরেজি Appeal থেকে) করা হত প্রিভি কাউন্সিলের কাছে। এই কমিটিতে একজন সভাপতি, লর্ড চ্যান্সেলার ও কয়েকজন বিচারক থাকতেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাস হয় ভারতীয় হাইকোর্ট আইন। ১৮৬১ খ্রিঃ কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সুপ্রিম কোর্ট ও সদর দেওয়ানি আদালতের বদলে হাইকোর্ট নাম রাখা হয়। জেলার বিচারের ভার ছিল জেলার শাসকদের হাতে।

(২) ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের শাসনব্যবস্থায় আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই শাসনকার্যে কোনও ভারতীয়কে উচ্চ পদে আদৌ নেওয়া হত না। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসানের পরে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে উচ্চপদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি বা সিভিল সার্ভিস কীভাবে গড়ে উঠল তা বোঝা দরকার। যতদিন কোম্পানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রূপে ছিল ততোদিন এর প্রয়োজন হয়নি কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসনভার হাতে পাওয়াতে অবস্থা বদলে যায়। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষ এই প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি নিতেন। পারিবারিক মর্যাদা অনুসারে তাদের নেওয়া হত এবং ইংল্যাণ্ডে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারতে পাঠানো হত। সর্বাধিক কেরানী, তার উপরে ফ্যাক্টর, জুনিয়ার ফ্যাক্টর, সিনিয়ার ফ্যাক্টর, বেতনও ছিল কম; ফলে সবাই ব্যক্তিগত ব্যবসা করতেন।

১৭৭২ এর পর ইংল্যাণ্ডের অভিজাতরাও কোম্পানিতে যোগ দিতে শুরু করে। নতুন প্রশাসনিক কাঠামোতে আইনানুসারে দেশ সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য কোম্পানির কর্মচারীদের পক্ষে ভারতীয় ভাষা, চিরাচরিত দেশীয় হিন্দু-মুসলিম আইন, ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একারণে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কর্নওয়ালিস শাসনে ভারতীয়দের নেওয়া বন্ধ করে দেন (এর আগে সামান্য কিছু নিচু পদে ভারতীয়দের নেওয়া হত)। কোম্পানির কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। ওয়েলেসলির আমলে উচ্চ সরকারি পদ সৃষ্টি করা হয়। এই পদপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের জন্য কলকাতায় 'ফোর্টউইলিয়াম কলেজ' (১৮০০) এবং লণ্ডনে 'হেইলিবেরী কলেজ' (১৮০৬) প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে এক শাসক শ্রেণী তৈরি হতে থাকে। এই আমলারা ছিল শাসনের মেরুদণ্ড। ১৮৫৩ পর্যন্ত এই উচ্চপদে নিয়োগ করতেন কোম্পানি নিজেদের ইচ্ছে মত লোক কিন্তু ১৮৫৩ খিস্টাব্দের আইনে এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে লোক নেওয়ার কথা বলা হয়। তদনুসারে ১৮৫৫ থেকে শুরু হয় আই. সি. এস (Indian Civil Service) পরীক্ষা। ১৮৬১ তে প্রথম এই পরীক্ষা ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

(৩) ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে, বিদেশী সাহেবরা ছাড়াও এক শ্রেণীর ভারতীয় (অধিকাংশই ধনী জমিদার) নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ শাসনকে সাহায্য করে এসেছেন। এই সহযোগী শ্রেণীর সহায়তা ঔপনিবেশিকতার পক্ষে শাসন কার্যে ফলপ্রসূ ছিল। তবে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল।

২। ভারতীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি ঃ বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে ভারতে এসে ঘটনাচক্রে রাজদণ্ড ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে গিয়েছিল। তারা শাসনক্ষমতা এককভাবে যখন প্রয়োগ করতে শুরু করে তখন তাদের অধীনে ভারতে সামান্য অংশই ছিল। কিন্তু ১৭৭২ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তারা সারা ভারতবর্ষকে

নিজেদের অধীনে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিল। তারাই হয়ে ওঠে ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতাবান শক্তি (Sovereign Power)।

আসলে কোম্পানির হাতে প্রথম এসেছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা। ভারতের অন্যান্য এলাকার মধ্যে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে তাদের সামান্য অংশ ছিল। মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে ক্রমে নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠায় সমস্ত ভারতের নানা অঞ্চলে নানা দেশীয়- রাজ্য ক্ষমতাবান ও স্বাধীন হয়ে ওঠে। এই আঞ্চলিক বা দেশীয় রাজ্যগুলিকে একে একে নিজেদের বশ্যতায় নিয়ে আসা, সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রাস করা, সেখান থেকে রাজস্ব আদায় ইত্যাদি ছিল কোম্পানির লক্ষ্য। এই জন্য তারা সাম্রাজ্য বিস্তার বা সম্প্রসারণশীল (Annexation policy) নীতি গ্রহণ করে।

ইতিহাসে দেখা যায় ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দু'রকম নীতি গ্রহণ করেছিল। একদিকে তারা যুদ্ধের দ্বারা অনেক রাজ্য জয় করেছিল। যেমন মহীশূর, মারাঠা এবং শিখদের (পাঞ্জাব) সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের পর ঐ সব এলাকা প্রত্যক্ষ কোম্পানির শাসনাধীনে আসে। আবার কখনও কখনও কোম্পানি কূটনীতির কৌশলে দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিজেদের অধিকারে এনেছে। এই কূটনীতির কৌশলের উদাহরণ— ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' এবং ডালহৌসির 'স্বত্ব-বিলোপ নীতি'। মনে রাখা দরকার, এইসব কূটকৌশল প্রয়োগ করে অনেক সময় কোম্পানি রাজ্য গ্রহণ করে নিয়েছে, আবার অনেক সময় দেশীয় রাজন্যবর্গের হাতেই ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে, তবে সেই রাজন্যবর্গ নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোম্পানির অধীনস্থ করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠান দু-এক দিনের ঘটনা নয়। দীর্ঘ দিনব্যাপী সংগ্রামের ফলশ্রুতি স্বরূপ ভারতে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব রবার্ট ক্লাইভের প্রাপ্য। মাত্র সতেরো বছর বয়সে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামান্য কেরানী হিসেবে এই ভাগ্যান্বেষী মাদ্রাজে আসেন (১৭৪২ খ্রিঃ)। সেখানেই তিনি কেরানী থেকে সৈনিক জীবনে উত্তীর্ণ হন এবং কর্ণাটকের যুদ্ধে তিনি সেনাপতিরূপে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বে ফরাসি বাহিনীকে পরাজিত করেন। সেখানেই ক্লাইভের কর্মদক্ষতা, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এরপর ক্লাইভ কলকাতা পুনরুদ্ধার, আলিনগরের সন্ধি (১৭৫৬), ফরাসি চন্দননগর অধিকার, সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র; অবশেষে পলাশি যুদ্ধের (১৭৫৭) প্রহসনের মাধ্যমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা, এককথায় বাংলাসুবার রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। পলাশির পর বকসার যুদ্ধের জয় ইংরেজের প্রভুত্বকে সুদৃঢ় করল। অতঃপর দেওয়ানি লাভের পর (১৭৬৫) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির সঙ্গে যুক্ত হলো দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু ক্লাইভ কোম্পানির দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সঠিক পথে পরিচালিত না করে দ্বৈত-শাসনের মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে বাংলা সুবার বুকে নেমে এলো দুদৈব মন্বন্তর, মহামারী, সন্ন্যাসী

বিদ্রোহ এককথায় শ্মশানের পরিবেশ। তাই ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত কোম্পানির ডাইরেক্টরদের নির্দেশে ভারতের নবলব্ধ ভূখণ্ডের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২ খ্রিঃ)। সাম্রাজ্যের প্রসার প্রসঙ্গে পরবর্তী পর্যায় এলো ভারতের অন্যান্য অংশ দখলের পালা।

ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল তখন ইংরেজের অনুকূলে। কারণ, প্রথমত, নাদির শাহের আক্রমণে ও লুণ্ঠনে দিল্লির মোগল শক্তি তখন বিধ্বস্ত (১৭৩৮-৩৯ খ্রিঃ)। ঠিক একই ধারায় দিল্লি ও মথুরা পুনরায় লুণ্ঠিত হলো আফগান বীর আহমদ শাহ্ আবদালীর নেতৃত্বে (১৭৫৬-৫৭)। সুতরাং দিল্লিতে মোগল শক্তির অস্তিত্ব ছিল নাম মাত্র। দ্বিতীয়ত, পেশোয়ারদের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির পুনরাবির্ভাব সম্ভব হলেও সে শক্তিও পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রিঃ) আহমদ শাহ্ আবদালির নিকট পরাজয়ের ফলে বিধ্বস্ত হলো। মোগল শক্তির অবসানের সুযোগে যে মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা ধুলিসাৎ হলো। এই সুযোগে ইংরেজ বণিকগণ তাদের সুযোগসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ ও বাণিজ্যের নামে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলো। ইতোমধ্যে অবশ্য ইংরেজ কোম্পানি পলাসি যুদ্ধের (১৭৫৭) মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলে তাদের প্রভুত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। তৃতীয়ত, অযোধ্যা স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও লর্ড ক্লাইভ তাকে বাফার স্টেটের মর্যাদা দিয়ে এবং একাধিক সন্ধির মাধ্যমে ইংরেজের সহায়ক বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। চতুর্থত, দিল্লির মোগল শক্তির সহায়ক হয়েও হায়দ্রাবাদের নিজাম মারাঠা উৎপীড়নে বা বর্গীর হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত। তাঁর দরবারে অনেক দিন হাজির ছিলেন ফরাসি সেনাপতি বুসি। ফরাসি সেনাপতি লালীর আগমনে বুসি হায়দ্রাবাদের দরবার থেকে অপসারিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে হায়দ্রাবাদে ইংরেজের প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হলো।

এছাড়া মহীশূর তখন হায়দর আলির নেতৃত্বে শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত। কাজেই ভারতীয় রাজন্যবর্গের তরফ থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশকে প্রতিহত করার কোনও প্রচেষ্টাই তখন ছিল না। উপরন্তু দেশীয় নরপতিরা নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসীমা বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। এই অবস্থায় দেশীয় নরপতিগণ ইংরেজ কোম্পানির সামরিক সাহায্য গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। ফলে ইংরেজরাও এই সুযোগ গ্রহণ করত।

ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর হয়ে এদেশে এলেন তখন তাকে দ্বৈত-শাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বিধ্বস্ত ও ছারখার হয়ে যাওয়া এক সমস্যা বহুল জীবনধারার সম্মুখীন হতে হলো। তাঁকে রাজস্ব ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার দিকে প্রথমে নজর দিতে হলো। কিন্তু দূরদৃষ্টি বলে হেস্টিংস একথা বুঝেছিলেন যে, বণিক-প্রতিষ্ঠান থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন রাজশক্তির অধিকারী হয়েছে, তখন আরও এগিয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধি তাকে করে যেতে হবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত কোম্পানির পরিচালকগণ ভারতে রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের এক নির্দেশ নামায় ছিল "আমরা চাই যে, বর্তমানে যে-

সব ভারতীয় রাজ্য রয়েছে, তারা থাকুক এবং আমাদের হস্তক্ষেপ ছাড়া তারা তাদের পরস্পরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে রাখুক।'' কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস নিজে জানতেন এবং ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্বকে স্থায়ী করতে হলে ভারতীয় নরপতিদের ব্রিটিশ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে হবে। তাছাড়া তাদের ব্রিটিশ রাজবংশের প্রতি আনুগত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। হেস্টিংস-এর পরবর্তী অনেকেই, যেমন ওয়েলেসলি গ্রহণ করেছিলেন 'অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি', ডালহৌসি গ্রহণ করেন 'স্বত্ব-বিলোপ নীতি' ইত্যাদি। ওয়ারেন হেস্টিংস তাই ব্রিটিশ শক্তির সম্প্রসারণ নীতি থেকে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তবে দেশীয় নরপতিদের ব্রিটিশ সামরিক সাহায্য প্রাপ্তির আগ্রহই ছিল হেস্টিংস-এর সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূলকথা।

ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মহীশূরের সম্পর্ক ঃ অষ্টাদশ শতকে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উত্থানের সময় ভারতের মহীশূরে হায়দর আলির নেতৃত্বে এক শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। বিজয়নগর সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হলে যাদব বংশীয় রাজারা শ্রীরঙ্গপত্তমে রাজধানী স্থাপন করে মহীশূর রাজ্য গঠন করেন। যাদব বংশের পরও এখানে হিন্দু-রাজত্ব চলতে থাকে। শেষ নরপতি উদেয়ার কৃষ্ণরায়ের রাজত্বকালে তাঁর ও সেনাপতি নঞ্জরাজের হাতে ছিল রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা। এই নঞ্জরাজের অধীনে সামান্য 'নায়েক' হিসেবে কাজ আরম্ভ করে ভাগ্যান্বেষী হায়দার আলি সেনাপতির প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি নিরক্ষর হয়েও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সাহসিকতা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিন্দিগুলের ফৌজদার নিযুক্ত হন। এইসময় কর্ণাটকে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি বিদেশী সমর কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এরপর রাজনৈতিক অব্যবস্থা, অপশাসন, সামরিক অসন্তোষ, ক্রমাগত মারাঠা আক্রমণের সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁর আশ্রয়দাতা নঞ্জরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দী নরপতি কৃষ্ণরায়ের পক্ষে মহীশূর অধিকার করেন (১৭৬০ খ্রিঃ)। কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর পর তিনি নিজেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। নৈতিকতার বিচারে তিনি ছিলেন বিশ্বাসঘাতক; কিন্তু সেই যুগে এরূপ ঘটনায় বিশেষ কেউ বিস্মিত হত না। কারণ, যুগটা ছিল ভাগ্যান্বেষীদের ভাগ্য ফেরানোর যুগ। তাই ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত লেখেন, "অষ্টাদশ শতকের ভারতের ইতিহাস হলো ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসিকগণের ক্ষমতা লাভের কাহিনী।'' ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সাম্রাজ্যের অংশ অধিকার করার জন্যে হায়দ্রাবাদের নিজাম, অযোধ্যার সফদর জং, মহীশূরের হায়দর আলি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মত বিদেশী রবার্ট ক্লাইভ, ফরাসি সেনাপতি ডুপ্লে এবং আরও অনেকেই ছিলেন মূলতঃ ভাগ্যান্বেষী ও দুঃসাহসী।

মহীশূরের কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে হায়দরআলি রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি কৃষ্ণানদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলেন। মহীশূরের এই শক্তি বৃদ্ধিতে পার্শ্ববর্তী মারাঠারা (১৭৬১ খ্রিঃ) শঙ্কিত হলো। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর মারাঠারা দক্ষিণ ভারতে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে সচেষ্ট ছিল। মহীশূরের

সম্প্রসারণ নীতি তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিল। তাই পেশোয়া প্রথম মাধব রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠারা তিনবার মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করে হায়দরকে পরাজিত করলেন (১৭৬৪-৬৫ খ্রিঃ) নিরুপায় হয়ে হায়দর সাভনুর ও গুন্টুর নামক স্থানটি এবং ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মহীশূরের মূল অংশের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখলেন। মারাঠারা সাময়িকভাবে তুষ্ট হলো। অপরপক্ষে হায়দ্রাবাদের নিজামও মহীশূরের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত ও ঈর্ষান্বিত হলো। নিজামের সঙ্গে হায়দর আলির সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা লক্ষ্য করে নিজাম ইংরেজদের সঙ্গে এক চুক্তি করলেন। চুক্তির শর্তে ঠিক হয় যে, হায়দর আলির সঙ্গে যুদ্ধ হলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সৈন্য দিয়ে নিজামকে সাহায্য করবে। তার পরিবর্তে নিজাম ইংরেজদের 'উত্তর সরকার' (Northern Sircar) অঞ্চলটি দান করলেন। অন্যদিকে মারাঠারাও হায়দর আলিকে অধিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যগ্র ছিল। তাই সুযোগ বুঝে মারাঠারাও নিজাম ও ইংরেজ পক্ষে যোগদান করল। তাহলে এবার মহীশূরের হায়দর আলিকে মারাঠা, নিজাম এবং ইংরেজ— এই তিন শক্তির এক সমাবেশের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে নামতে হবে—এমন একটা সম্ভাবনা দেখা গেল। ১৭৬৭ খ্রিঃ বস্তুত তা শুরু হয়।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূরের যুদ্ধ (১৭৬৭-৬৯ খ্রিঃ) ঃ হায়দর আলি ছিলেন অনেক বেশি চতুর। তিনি প্রথমেই ত্রিশক্তির জোটটিকে ভেঙে দিলেন। তিনি কৌশলে প্রচুর অর্থ দিয়ে মারাঠাদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। এবার হায়দার রইলেন একদিকে এবং অন্যদিকে রইল নিজাম ও ইংরেজদের মিলিত বাহিনী। হায়দর আলি এবার নিজামকে চতুরতার সহিত সাময়িকভাবে বশীভূত করলেন। আর নিজাম ছিলেন অস্থিরচিত্ত, তাঁকে বিশ্বাস করা বড়ো কঠিন। তবে নিজাম এই সময় হায়দর আলি ও ইংরেজ কোনও পক্ষেই যোগদান না করে নিরপক্ষতা অবলম্বন করলেন। ফলে হায়দরআলি একাই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে হায়দরআলি ম্যাঙ্গালোর পুনরুদ্ধার করে একেবারে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন। বেগতিক দেখে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সন্ধি করতে বাধ্য হলো। সন্ধির শর্ত অনুসারে ঠিক হলো যে, (ক) উভয়পক্ষ পরস্পর বিজিত স্থান প্রত্যার্পণ করবে, (খ) বন্দী বিনিময় অবশ্যই করা হবে, (গ) বহিঃশত্রুর আক্রমণে পরস্পরকে সাহায্য করা হবে। শেষ শর্তটি ছিল হায়দরের নিকট অতি মূল্যবান। কারণ, সেই সময় মারাঠাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ইংরেজের সাহায্য ছিল অত্যাবশ্যক। কিন্তু দেখা গেল পেশোয়া মাধব রাও যখন হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করলেন (১৭৭১ খ্রিঃ) তখন ইংরেজরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। সুতরাং প্রমাণ হলো, তখনকার দিনে রাষ্ট্রনায়কদের অঙ্গীকারেরও কোনও মূল্য ছিল না। হায়দর আলি ইংরেজের এই মিথ্যাচারে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হলেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০-৮৪ খ্রিঃ) ঃ মাদ্রাজের সন্ধির (১৭৬৯ খ্রিঃ) দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি হলো বটে, তবে সে সন্ধিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইতোমধ্যে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্র ধরে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে

বিবাদ উপস্থিত হলো। উক্ত যুদ্ধে ফরাসিরা আমেরিকার পক্ষে ও ইংরেজদের বিপক্ষে যোগদান করে। তাই ভারতে ইংরেজরা ফরাসি উপনিবেশগুলি একে একে দখল করতে শুরু করে। ফরাসিদের মাহে উপনিবেশটি ছিল হায়দরের রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত। হায়দরের বিনা অনুমতিতে ইংরেজরা এই মাহে অঞ্চলটি দখল করে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে হায়দর ইংরেজদের উপর ক্ষুন্ন হলেন। অন্যদিকে ঠিক এই সময় গুণ্টুর জেলার অধিকার নিয়ে হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে ইংরেজদের মনোমালিন্য হয়। এরফলে মহীশূরের হায়দর আলি, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও বিদর্ভের মারাঠা শাসক ভোসলে এবং মহাদজী সিন্ধিয়া একত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিসংঘ গড়ে তুললেন। এবার ইংরাজদের সঙ্গে এই শক্তিসংঘ বা ত্রিশক্তিজোটের লড়াই শুরু হলো (১৭৮০)। যুদ্ধের শুরুতেই হায়দরের বাহিনী ঝড়ের মত কর্ণাটকে প্রবেশ করে আর্কট দখল করল। এই দুর্যোগময় মুহূর্তে ইংরাজের সামরিক শক্তির সঙ্গে কূটনীতিও সক্রিয় হয়ে উঠল। ওয়ারেন হেস্টিংস হায়দ্রাবাদের নিজামকে ঘুষ দিয়ে তাঁকে ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তিগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। গুণ্টুর জেলার অধিকারও তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো। মারাঠা নেতা মহাদজী সিন্ধিয়া ও ভোঁসলেকে প্রচুর অর্থ দিয়ে তাঁদের ওয়ারেন হেস্টিংস বশীভূত করলেন। এবার মহীশূরের হায়দরকে একাই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলো। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে স্যার আয়ার কুট **(Sir Eyre Coote)** এর হাতে পোর্টোনেভোর যুদ্ধে হায়দরআলি পরাজিত হলেন। কিন্তু হায়দর আলির পুত্র টিপুর হস্তে পরাজিত হলেন কর্নেল ব্রেথওয়েট (১৭৮২ খ্রিঃ)। ঠিক এই সময় ফরাসি অ্যাডমিরাল সাফ্রেঁ বিশাল এক নৌবহরসহ ভারতমহাসাগরে উপস্থিত হলেন। দুঃখের বিষয়, এই জয়ের মুহূর্তে হায়দর আলি মৃত্যুমুখে (১৭৮২ খ্রিঃ) পতিত হলেন। পিতার মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র টিপু নির্ভয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। টিপু ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুসকে পরাজিত করলেন। এদিকে ইয়োরোপে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভার্সাই সন্ধিতে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের মীমাংসা হওয়ায় মাদ্রাজ কাউন্সিল টিপুর নিকট সন্ধিভিক্ষা করলেন। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধিতে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটল। সন্ধির শর্ত অনুসারে পরস্পরকে বিজিত রাজ্যখণ্ড ও যুদ্ধ বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

হায়দর আলির চরিত্র ও কৃতিত্ব : মহীশূরের হায়দর আলি ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ক্ষণজন্মা ভাগ্যান্বেষীদের অন্যতম। সামান্য সৈনিক বৃত্তি থেকে তিনি মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করে দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শক্তিরূপে ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে কখনও সংঘর্ষে, কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত হয়েছিলেন। সারাজীবন তিনি ছিলেন শত্রুবেষ্টিত। তবুও তিনি রাজ্য সংগঠনে এবং যুদ্ধপরিচালনায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি আত্মবিশ্বাস হারান নি, তাঁকে কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়নি। কারণ সামরিক অভিজ্ঞতা, পরিচালন কৌশল ও কূটনীতিতে তিনি ছিলেন অনন্য। কূটকৌশলে কখনও মারাঠাদের,

কখনও বা নিজামকে স্বপক্ষে টেনেছেন অথবা ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করা থেকে নিবৃত্ত করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনের ক্ষেত্রে বিশ্বের অনান্য দেশের অধিকাংশ শাসকের মত তিনিও ছিলেন স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপর খবরদারী করার সাহস অন্যের ছিল না। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসাধারণ সাহসিকতা, বিচক্ষণ দূরদর্শিতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করত। শাসকের এসব গুণ আধুনিক ঐতিহাসিক ও ইতিহাস পাঠকের মনেও প্রশংসার উদ্রেক করে। শোনা যায়, তিনি ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু তিনি অশিক্ষিত ছিলেন— একথা বলা চলে না। ইয়োরোপের চার্লস দি গ্রেট, ভারতের মহান আকবরের মত নিরক্ষর হয়েও হায়দর আলি ছিলেন নানা রাজকীয় ও মানবিক গুণের অধিকারী। একাধিক ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন। নঞ্জরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপন করেছে—একথা সত্য। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে , যে এই যুগটা ছিল ভাগ্যান্বেষীদের ভাগ্য ফেরানোর যুগ। তাছাড়া মহীশূরের রাজা এবং মন্ত্রী উভয়েই ছিলেন অযোগ্য ও অকর্মণ্য; তাই হায়দর উচিতকাজ করেছেন। এই ভাগ্যান্বেষী স্বাধীনতাকামী যে তৎকালীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অব্যবস্থা ও লুটপাটের যুগে প্রাচীন ঐতিহ্যময় মহীশূরকে একটা শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। ভারতের এক ক্ষুদ্রতম অংশের স্বাধীনতার জন্যে তাঁর মত বীরেরই প্রয়োজন ছিল। তিনি মুসলমান শাসক হয়েও হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আনুগত্য লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। স্থানীয় কৃষ্টি-সভ্যতা ও আচার-আচরণকে তিনি কখনই অবহেলা করেন নি। তিনি ছিলেন ইংরেজের শত্রু। তাই হয়ত ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁকে ধর্ম, দয়ামায়া বর্জিত অত্যাচারী শাসক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। হায়দরের চরিত্র নিয়ে পক্ষপাতপূর্ণ ভিনসেণ্ট স্মিথ নানা কথা বললেও তিনি তাঁর কর্মশক্তিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তবে ইংরেজের পক্ষ থেকে একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, আচার-ব্যবহারে হায়দর আলির কোনও কপটতা ছিল না। সন্ধিসূত্রে কথা দিয়ে তিনি কথার খেলাপ করতেন না। যাইহোক, যে-যুগে সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেনি সে-যুগের পরিবেশ ও পরিস্থিতিঅনুসারে হায়দর আলির ন্যায় একজন স্বাধীনচেতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দূরদর্শী, ইংরেজ-বিরোধী কর্মবীর নিশ্চয়ই ভারতবাসীর নিকট জাতীয় বীর হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০-৯২ খ্রিঃ) ঃ লর্ড কর্নওয়ালিস পিটের ভারত আইনের শর্তগুলিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রেরিত হন। এই আইনের শর্তানুসারে কেবলমাত্র আত্মরক্ষামূলক প্রয়োজন ব্যতীত পররাজ্য অধিকারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ভারতে আসার পর কর্নওয়ালিস এদেশের রাজনৈতির পরিস্থিতি পর্যালোচনার করে বুঝলেন যে, শিশু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা ও পালন করার তাগিদেই এদেশে যুদ্ধ একপ্রকার অপরিহার্য প্রক্রিয়া। যুদ্ধ ছাড়া ভারতের বুকে ব্রিটিশ অধিকারকে টিকিয়ে রাখা

সম্ভব নয়। তিনি প্রথমত, লক্ষ্য করলেন যে, ১৭৮৪ সনের ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ইঙ্গ-মহীশূর দ্বন্দ্বের স্থায়ী অবসান ঘটাতে পারেনি। এই সন্ধি হায়দরআলির পুত্র টিপুর শক্তি খর্ব করতে পারে নি। তেজস্বী টিপু দক্ষিণ ভারতে ইংরেজের কর্তৃত্ব মোটেই পছন্দ করতেন না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সুস্পষ্ট জানতেন। তাই তারা ম্যাঙ্গালোর সন্ধির সমালোচনাও করতেন। দ্বিতীয়ত, টিপু সুলতানের কাছে ম্যাঙ্গোলোরের সন্ধি ছিল পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতির সুযোগ মাত্র। ইংরেজের প্রাধান্য খর্ব করার উদ্দেশ্যে টিপু সুলতান এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি ইংরেজের পরম শত্রু ফরাসি ও তুর্কিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং কনস্ট্যান্টিনোপল, মরিশাস, কাবুল ইত্যাদি স্থানে দূত প্রেরণ করেন। এদিকে লর্ড কর্নওয়ালিস ছিলেন আমেরিকা স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজপক্ষের এক ইংরেজ সেনাপতি। ফরাসিদের ইংরেজ-বিরোধী ক্ষোভের তীব্রতা তিনি জানতেন। টিপু সুলতান যদি ফরাসিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হন তাহলে ভারতে ব্রিটিশ শাসিত অংশটুকু রক্ষা করা দুরূহ হতে পারে— এ আশঙ্কা তাঁর ছিল। তাই কর্নওয়ালিস কালবিলম্ব না করে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে শক্তিজোট তৈরি করতে সচেষ্ট হলেন। প্রথমত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড কর্নওয়ালিস হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। এই চুক্তিতে এমন কথাও বলা হলো যে, নিজামের সাহায্যার্থে যে ইংরেজ বাহিনী প্রেরিত হবে তাদের ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা চলবে না। এই প্রসঙ্গে কর্নওয়ালিস ইংরেজের মিত্র রাজ্যগুলির নামের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই তালিকায় মহীশূরের টিপু সুলতানের নাম ছিল না। কর্নওয়ালিস এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছিলেন। সংবাদ পেয়ে টিপু সুলতান অপমান বোধ করলেন এবং ইংরেজদের মতলব বুঝতে পারলেন। এরপর টিপু অবিলম্বে ইংরেজদের মিত্ররাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ (১৭৮৯ খ্রিঃ) করায় তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। মাদ্রাজের গভর্নর কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরকে সরাসরি সাহায্য করলেন না। অন্যদিকে টিপু সুলতানের শক্তি বৃদ্ধি নিজাম ও মারাঠা কোনও পক্ষেরই মনঃপুত ছিল না। সুতরাং শঙ্কিত হয়ে তাঁরা অবিলম্বে ইংরেজের পক্ষভুক্ত হয়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। ত্রিবাঙ্কুরের ফৌজও এই নতুন শক্তিজোটে যোগদান করল। যুদ্ধের প্রথম দিকে মাদ্রাজ সরকারের নিকট থেকে উপযুক্ত সাহায্য না আসায় টিপুর নিকট ঐ শক্তিজোট পরাজিত হওয়ার উপক্রম হলো। লর্ড কর্নওয়ালিস তখন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেন। এরপর ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠা বাহিনী মিলিতভাবে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করলে টিপু সন্ধি করতে বাধ্য হলো। শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২ খ্রিঃ) অনুসারে টিপু তিন কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ এবং রাজ্যের অর্ধেক ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। এছাড়া টিপু তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজ দরবারে প্রতিভূস্বরূপ (জামিন) রাখতে বাধ্য হলেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে প্রাপ্ত রাজ্যাংশ ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠা— এই তিন জোটের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হলো। কৃষ্ণা থেকে পেনার নদী পর্যন্ত এলাকা গেল নিজামের হাতে, আর তুঙ্গভদ্রা নদীর পাশাপাশি অঞ্চল মারাঠারা

নিয়ে নিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আরও একটু সম্প্রসারিত হলো। ব্রিটিশের অধিকারে এলো কুর্গ, মালাবার, মাদুরা ও সালেম জেলার কিছু অংশ। সন্ধিতে 'মহীশূর শার্দুল' টিপু সুলতানের পতন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯৯ খ্রিঃ) ঃ ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী হায়দর আলির পুত্র টিপুও ছিলেন বীর, স্বাধীনচেতা, তেজস্বী পুরুষ। তিনি শ্রীরঙ্গপত্তমের অপমানজনক সন্ধির (১৭৯২ খ্রিঃ) কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন নি। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তিনি কালবিলম্ব না করেই তৎপর হলেন। তাঁর হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্যে তিনি প্রথমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে সাহায্য লাভের চেষ্টা করলেন। তিনি জানতেন নেপোলিয়নের আক্রমণে ইয়োরোপে ইংরেজসহ অন্যান্য শক্তি একের পর এক পরাজিত হচ্ছে। সুতরাং টিপু ইংরেজদের দমন করার উদ্দেশ্যে ফরাসি সাহায্যের আশায় ফরাসি ঘাঁটি মরিশাস দ্বীপে দূত প্রেরণ করলেন। মরিশাসের ফরাসি কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রেরণ না করলেও ভারতে অবস্থিত ফরাসি স্বেচ্ছাসেবকদের শ্রীরঙ্গপত্তমে সমবেত হতে ও অনুকূল সাহায্য দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদেরই প্রেরণায় টিপু শ্রীরঙ্গপত্তমে 'স্বাধীনতা স্মারক' প্রতিষ্ঠা করেন ও নিজের সেনাবাহিনীকে উপযুক্ত পাশ্চাত্যের সামরিক কৌশল শিক্ষা দিয়ে শক্তিশালি করার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া টিপু কাবুল, তুরস্ক প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য চেয়ে দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু শেষোক্ত রাষ্ট্রশক্তির নিকট থেকে কোনও সাহায্য এসে পৌঁছায় নি।

অন্যদিকে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ এবং শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩ খ্রিঃ)। লর্ড কর্নওয়ালিসের পর এলেন স্যার জন শোর (১৭৯৪-৯৮ খ্রিঃ) এবং তারপর এলেন লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ)। লর্ড ওয়েলেসলি ছিলেন কঠোর সাম্রাজ্যবাদী এবং তিনি প্রবর্তন করেছিলেন "অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি"। তিনি টিপু সুলতানের যুদ্ধ প্রস্তুতি লক্ষ্য করে তাঁকে দমন করার জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি সুকৌশলে ইঙ্গ-নিজাম-মারাঠা জোটকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে মনোযোগ দিলেন। 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে' আবদ্ধ নিজাম সহজে ইংরেজের পক্ষভুক্ত হলেন। স্বাধীনতাকামী মারাঠা রাষ্ট্রসংঘ এই নীতি গ্রহণ না করায় চতুর ওয়েলেসলি ঘোষণা করলেন যে, টিপু-সুলতানকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্যের একটা অংশ মারাঠাদের দেওয়া হবে। এই প্রলোভনমূলক ঘোষণায় মারাঠারাও ইংরেজদের পক্ষভুক্ত হলো। এবার ওয়েলেসলি টিপুর নিকট 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি'তে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব পাঠালেন। সদর্পে টিপু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে শুরু হলো চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

যুদ্ধে ইংরেজ ও নিজামের সম্মিলিত বাহিনী প্রথমে মহীশূর আক্রমণ করল। পূর্বপ্রান্ত থেকে সেনাপতি হ্যারিস শ্রীরঙ্গপত্তমের দিকে এগিয়ে চললেন; আর পশ্চিমপ্রান্ত অর্থাৎ

বোম্বাইয়ের দিক থেকে এগিয়ে এলেন সেনাপতি স্টুয়ার্ট। শত্রুবাহিনী দ্বারা শ্রীরঙ্গপত্তম অবরুদ্ধ হলো। প্রায় একমাস অবরুদ্ধ থাকার পর টিপু বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয় মনে করলেন। তাঁর পুত্র আত্মসমর্পণ করলেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে অবরুদ্ধ শ্রীরঙ্গপত্তম উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ করে যুদ্ধরত টিপু নিহত হলেন। স্বাধীনচেতা বীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের শ্রেষ্ঠতম শত্রু বিনষ্ট হলো।

বিজয়ী ইংরেজ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সুলতানের প্রাসাদ লুণ্ঠন করল। এখানকার স্বর্ণ, রৌপ্য, মহামূল্যবান কার্পেট, চীনামাটির বাসন, লাইব্রেরীর গ্রন্থাদি ইংরেজের হস্তগত হলো। এছাড়া প্রচুর মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরত, হীরক-খচিত বন্দুক ও তলোয়ার ইত্যাদি চলে গেল ইংরেজের হাতে। দ্বিতীয়ত বিজিত মহীশূর রাজ্যের শ্রীরঙ্গপত্তম, কোয়েম্বাটুর, কানাড়া, মালাবার ইত্যাদি বৃহত্তম অংশ ইংরেজের দখলে এলো। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সামান্য অংশ নিজামকে দেওয়া হলো। তবে কিছুদিনের মধ্যে (১৮০০ খ্রিঃ) সেটিও ইংরেজের দখলে আসে। মারাঠাদের সামান্য একখণ্ড জমি দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সেটা আর দেওয়া হয়নি; কারণ মারাঠারা আনুগত্য স্বীকার করতে পারল না। তাই মহীশূরের হিন্দু রাজবংশ থেকে একজন নাবালককে এখানকার সিংহাসনে বসানো হলো। কিন্তু তিনি 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, স্বাধীনতা বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। তৃতীয়ত টিপুর পুত্র ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে প্রথমে ভেলোরে, পরে কলকাতাতে মোটা অঙ্কের মাসোহারা দিয়ে বন্দী করে রাখা হলো। আজও কলকাতার টালিগঞ্জে ও কালিঘাটের নিকট টিপুর পরিবার বর্গের সমাধি চিহ্ন বিদ্যমান। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে টিপুর শবদেহ নিয়ে মহীশূরের লালবাগে তাঁর পিতা হায়দার আলির পাশে সমাধিস্থ করা হলো।

ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মারাঠাদের সম্পর্ক ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ছিল ক্ষয়িষ্ণু মোগল শক্তির অবর্তমানে ভারতে নতুন নতুন রাজশক্তির উত্থান-পতনের সন্ধিক্ষণ। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ভারতের পূর্বসীমান্তে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ভারতের নতুন শক্তিশালি মারাঠা রাষ্ট্রের পতন ঘটে। সুতরাং ব্রিটিশ পক্ষের বিচারে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে পলাশি যুদ্ধের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করা কোন মতেই যুক্তিবিরুদ্ধ নয়।

নাদির শাহের আক্রমণ ও লুণ্ঠনে মোগল শক্তি শেষ অঙ্কে পৌঁছে গেল। আবার আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা জাতির ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের আশাও শেষ হলো। এবার ভারতে তৃতীয় এক শক্তি এলো এ-শক্তির নাম ব্রিটিশ শক্তি। ব্রিটিশ শক্তি এবার ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করল। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল ব্রিটিশের প্রতিপত্তি। সুতরাং পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত মারাঠা শক্তিকে এবার বিদেশী ইংরেজের সঙ্গে অচিরে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হলো।

মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুত্থান ঃ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর পেশোয়া বালাজী বাজীরাও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র প্রথম মাধব রাও (১৭৬১-৭২ খ্রিঃ) মাত্র

সতের বছর বয়সে পেশোয়ার গদি অধিকার করেন। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে অল্পদিনের মধ্যে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল তার প্রথম প্রয়াস। দক্ষিণ ভারতে তখন তাঁর দুই শত্রু ছিলেন খুবই প্রবল, যথা — হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং মহীশূরের হায়দর আলি। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠাদের গৃহবিবাদের সুযোগ নিযে উভয়েই মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলের কিছু কিছু অংশ গ্রাস করেন। এছাড়া তাঁর ঘরের শত্রু ছিলেন প্রধান সেনাপতি এবং পিতৃব্য রঘুনাথ রাও। মারাঠাদের জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা রঘুনাথ রাওয়ের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল বড়ো। তবে প্রথম অবস্থায় পেশোয়া প্রথম মাধব রাও বিষয়টা পরিষ্কার জানতেন না।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠাদের গৃহ বিবাদের সুযোগ নিয়ে **প্রথমত** হায়দ্রাবাদের নিজাম মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেন (১৭৬২ খ্রিঃ)। প্রধান সেনাপতি এবং পিতৃব্য রঘুনাথ রাও সহজে নিজামকে পরাজিত করে উদার শর্তে সন্ধি করলেন। পেশোয়া মাধব রাও এই সন্ধির শর্তে আপত্তি করলে প্রধান সেনাপতি তা অগ্রাহ্য করেন। তখনই পিতৃব্যের উপর তিনি ক্ষুব্ধ হন। **দ্বিতীয়ত** মহীশূরের হায়দর আলিও মারাঠাদের গৃহবিবাদের সুযোগে তাদের রাষ্ট্র সীমায় প্রবেশ করেন। তখন মহীশূরের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মারাঠা বাহিনী প্রেরিত হয়। প্রথম দুটি যুদ্ধে (১৭৬৪-৬৫ খ্রিঃ) হায়দর আলি পরাজিত হন। কিন্তু রঘুনাথ রাও এক্ষেত্রেও উদার শর্তে সন্ধি করলেন। এবার মাধব রাও পিতৃব্যের এরূপ ক্রিয়া-কলাপের জন্যে তার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করলেন। এরপর মাধব রাও নিজেই হায়দর আলির বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করলেন (১৭৬৬-৬৭ খ্রিঃ) এবং শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে হায়দরকে পরাজিত করলেন। তবে মাধব রাও নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ায় উদার শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলের উপর থেকে মারাঠা প্রভাব বিলুপ্ত হয়। তাই দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধ পরিচালনার সময় উত্তর ভারত পুনরুদ্ধারের জন্যে প্রথম মাধব রাও চেষ্টা করেন। এর ফলে মালব ও বুন্দেলখণ্ডে মারাঠা প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাজপুত নরপতি ও জাঠ নেতারা মারাঠাদের চৌথ প্রদান করতে বাধ্য হন। এই সময় দিল্লির মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ছিলেন ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণাধীনে। মারাঠা বাহিনী সম্রাটকে মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে সক্ষম হয়। এইভাবে পেশোয়া প্রথম মাধব রাও স্বীয় চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যে মারাঠা শক্তি পুনঃস্থাপন করলেন। কিন্তু তার অকাল মৃত্যু (১৭৭২ খ্রিঃ) মারাঠা শক্তিকে সুদৃঢ় করার সুযোগ দিল না। তিনি যেভাবে মারাঠাদের হারানো শক্তি উদ্ধার করলেন, আরও কিছুকাল জীবিত থাকলে হয়ত মারাঠারাই ভারতে একটি অজেয় শক্তিতে পরিণত হতে পারত। কিন্তু পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় মারাঠাদের যে ক্ষতি হয়েছিল পেশোয়া প্রথম মাধব রাও-এর অকাল মৃত্যু যেন তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করল।

পেশোয়া প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর (১৭৭২ খ্রিঃ) তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তাঁর পিতৃব্য রঘুনাথ রাও ছিলেন স্বার্থপর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি পেশোয়ার গদি দখলের আশা পোষণ করতেন। তাঁরই চক্রান্তে গুপ্ত ঘাতক পেশোয়া নারায়ণ রাওকে হত্যা করে (১৭৭৩ খ্রিঃ) এবং নিজে পেশোয়ার পদ অধিকার করেন। এদিকে নারায়ণ রাও-এর মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন সন্তানসম্ভবা। অল্পদিনের মধ্যে নারায়ণ রাও-এর এক পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তখন অন্যান্য মারাঠা নেতাদের সহযোগিতা নিয়ে কূটনীতিবিশারদ নানা ফড়নবিশ সেই শিশুকেই দ্বিতীয় মাধব রাও নামকরণ করে মারাঠা সিংহাসনে বসালেন। মারাঠাদের মধ্যে এই সময় ছিলেন দুজন সর্বাধিক প্রভাবশালি ব্যক্তি — একজন সমরবিদ মহাদজী সিন্ধিয়া এবং অন্যজন হলেন কূটনীতিবিদ নানা ফড়নবিশ। এরা সবাই নারায়ণ রাও-এর পিতৃব্য রঘুনাথ রাও-এর (রাঘোবা) উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। শিশু দ্বিতীয় মাধব রাওকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁরা রঘুনাথ রাওকে বিতাড়িত করলেন। অগত্যা রঘুনাথ রাও ইংরেজের সাহায্য গ্রহণ করলেন। ইতোমধ্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে ব্রিটিশ শক্তি স্থায়ী প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে। ভারতের রাজন্যবর্গের দুর্বলতা বা ঘরোয়া বিবাদের সুযোগ পেলে তারা আরও ভারতীয় ভূভাগ অধিকার করবে। মারাঠা শিবির থেকে বিতাড়িত রঘুনাথ রাও ইংরেজের কৃপাপ্রার্থী হওয়ায় বোম্বাই কাউন্সিল তাঁর সঙ্গে সন্ধি করল। এটি সুরাটের সন্ধি (১৭৭৫ খ্রিঃ) নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তে ঠিক হলো যে, ইংরেজ সলসেট ও বেসিন অধিকার করবে এবং ভারুচ ও সুরাটের রাজস্বের একাংশ উপভোগ করবে। তার বিনিময়ে ইংরেজ বাহিনী রঘুনাথকে পেশোয়া বলে স্বীকার করবে এবং সামরিক বাহিনী দিয়ে সাহায্য করবে। এই প্রসঙ্গে মারাঠা কর্তৃপক্ষকে ইংরেজ সৈন্যের মাসিক ব্যয় বাবদ বোম্বাই কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে দেড় লক্ষ টাকা, আর আমানত হিসেবে জমা রাখতে হবে ছ'লক্ষ টাকা। এই শর্তে রঘুনাথ রাও ব্রিটিশ বাহিনী নিয়ে পুনা আক্রমণ করলেন এবং শিশু দ্বিতীয় মাধব রাও-এর মারাঠা বাহিনীকে পরাজিত করলেন।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৯-৮২ খ্রিঃ) ঃ সুরাটের সন্ধি (১৭৭৫ খ্রিঃ) থেকে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সন্ধির শর্ত অনুসারে ব্রিটিশ বাহিনীর সাহায্য নিয়ে রঘুনাথ রাও যখন পুনা আক্রমণ করলেন তখন শিশু দ্বিতীয় মাধব রাও-এর পক্ষে মারাঠা কূটনীতিবিদ নানা ফড়নবিশ কলকাতা কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কলকাতাতে তখন ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর থেকে ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে উন্নীত (১৭৭৩-এর রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে)। তিনি কলকাতা কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে উপরোক্ত *সুরাটের সন্ধিকে* (১৭৭৫ খ্রিঃ) বাতিল করে দিলেন। তিনি কর্ণেল আপটনকে পাঠিয়ে শিশু দ্বিতীয় মাধব রাও-এর সঙ্গে *পুরন্দরের সন্ধি* (১৭৭৬ খ্রিঃ) স্বাক্ষর করলেন।

এই শেষোক্ত সন্ধির শর্তে বলা হলো যে, ইংরেজরা রঘুনাথ রাওকে আর সাহায্য করবে না। তবে মারাঠা সরকার রঘুনাথকে উপযুক্ত 'ভাতা' প্রদান করবেন এবং সলসেট, বেসিন প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ইংরেজের অধিকারে থাকবে। ইতোমধ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত সুরাটের সন্ধিটিকে অনুমোদন করে পাঠালেন। কাজেই পুরন্দরের সন্ধি (১৭৭৬ খ্রিঃ) অকেজো হয়ে গেল। ইংরেজগণ এবার রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ সমর্থন করে পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফলে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ পুনরায় তীব্রতর হয়ে উঠল।

এই যুদ্ধের দুটি অংশ ছিল। প্রথম অংশে ইংরেজদের ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে শিশু পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও-এর পক্ষে মারাঠা নেতারা মহীশূরের হায়দর আলির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। জোটবদ্ধ মারাঠা ও মহীশূর বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল (জানুয়ারি, ১৭৭৯ খ্রিঃ)। জলগাঁও-এর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। এরপর ওয়াড়গাঁও নামক স্থানে বোম্বাইয়ের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এবং মারাঠাদের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে রঘুনাথ রাও-এর সঙ্গে দুজন ইংরেজকে মারাঠা নেতার হাতে তুলে দিতে হলো এবং ইংরেজরা যেসব স্থান দখল করেছিল সেগুলিকেও তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হলো।

এই সন্ধির শর্তে ইংরেজদের অপমানজনক অবস্থার পরিচয় ছিল। তাই গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস বললেন, "সন্ধির শর্ত পড়ে আমার লজ্জায় মাটির মধ্যে ডুবে যেতে ইচ্ছা করে।" সুতরাং তিনি এই সন্ধি নাকচ করে সেনাপতি গডার্ডকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। ফলে শুরু হলো যুদ্ধের দ্বিতীয় অংশ। সুযোগ বুঝে রঘুনাথ রাও মহাদজী সিন্ধিয়ার জিম্মা থেকে পালিয়ে এসে ইংরেজ পক্ষে যোগদান করলেন। ইংরেজরা গুণ্টুর জেলাটিকে নিজামকে দিয়ে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখল। গদির লোভ দেখিয়ে ভোঁসলে এবং ফতে সিং গায়কোয়াড়কে ইংরেজরা দলে টেনে নিল। এবার সেনাপতি গডার্ড আহমেদাবাদ দখল করলেন (১৭৮০ খ্রিঃ), কয়েক মাসের মধ্যে কল্যাণ ও বেসিন ইংরেজদের হাতে এলো। কিন্তু পরের বছর তিনি পুনার দিকে এগিয়ে যেতেই (১৭৮১ খ্রিঃ) মারাঠাদের হাতে পরাজিত হলেন। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন পপ্‌হাম গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করলেন, সেনাপতি ক্যামাক সিপ্রির যুদ্ধে মহাদজী সিন্ধিয়াকে পরাজিত করলেন। এই অবস্থায় মারাঠা এবং ইংরেজ উভয় পক্ষই পুরোপুরি জয়লাভ সম্পর্কে সন্দিহান হলো। তাই ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা ও ইংরেজের মধ্যে সলবাই নামক স্থানে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো। সন্ধির শর্তে ঃ (১) রঘুনাথ রাওকে মাসে পঁচিশ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো, (২) দ্বিতীয় মাধব রাও পেশোয়া বলে স্বীকৃতি পেলেন, (৩) সিন্ধিয়া ও গায়কোয়াড় স্ব-স্ব অঞ্চল ফিরে পেলেন, (৪) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সলসেট লাভ করল। শর্তগুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, যুদ্ধের পূর্বে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাটাই রয়ে গেল। ঐতিহাসিক

স্মিথ এই ঘটনাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিষয়টিও জোরের সঙ্গে বলেছেন। তবে এই যুদ্ধে ইংরেজের মনে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল— এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহের স্থান নেই। কারণ পরবর্তী কুড়ি বছর ইংরেজরা আর মারাঠাদের ঘাটাতে সাহস পায়নি। তবে ইংরেজ তার সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি পরিত্যাগ করেনি। বরং এই কুড়ি বছরের মধ্যে ইংরেজরা হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মহীশূরের হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের শক্তি খর্ব করে তাদের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করেছে। অন্যদিকে মারাঠা নায়কদের পারস্পরিক বিবাদ এই সময় প্রকট হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮০২-০৩ খ্রিঃ) ঃ পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও-এর আমলে (১৭৭০-৯৫ খ্রিঃ) মারাঠা শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মাধব রাও অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন রঘুনাথ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৯৫-১৮১৮ খ্রিঃ) নাম ধারণ করে পেশোয়ার গদি অধিকার করেন। ফলে মারাঠাদের মধ্যে পুনরায় আত্মকলহ দেখা দিল। এই সময় মারাঠারা একটা যৌথ সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল। পাঁচজন প্রধান এই সাম্রাজ্যের অংশীদার ছিলেন। এঁরা ছিলেন পুনার পেশোয়া, বরোদার গায়কোয়াড়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার এবং নাগপুরের ভোঁসলে। পেশোয়া ছিলেন এই পাঁচজনের নেতৃস্থানীয়। মারাঠাদের এই যৌথ সাম্রাজ্যকে বলা হয় মারাঠা-সংঘ **(Maratha Confederacy)**। মারাঠা সংঘের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য এই যে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ মারাঠা নেতাদের মধ্যে তার বিশেষ কেউ জীবিত ছিলেন না। তুকোজী হোলকার, অহল্যাবাঈ, মহাদজী সিন্ধিয়া, পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও প্রমুখ, এমনকি বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে যিনি মারাঠাদের প্রাণে শক্তি ও বিবেক সঞ্চার করেছিলেন সেই কূটনীতিবিদ নানা ফড়নবিশ সহ সকলেই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইহকাল থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বাজীরাও-এর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন নানা ফড়নবিশ। তাঁর অবর্তমানে মারাঠাদের মধ্যে হিংসা,দ্বেষ, বাদ-বিসম্বাদ বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। ভোঁসলে, গায়কোয়াড়, হোলকার সিন্ধিয়া ইত্যাদি স্ব-স্ব অঞ্চলে প্রধান হয়ে শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগলেন। অথচ বিদেশী আগ্রাসী শক্তি যে দ্রুত গতিতে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে, বিপদ যে সুনিশ্চিত একথা জেনেও তাঁরা ঘরোয়া বিবাদে উন্মত্ত হলেন। দৌলতরাও সিন্ধিয়া এবং যশোবন্তরাও হোলকার পেশোয়ার দরবারে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য প্রকাশ্যে সংঘর্ষ শুরু করলেন। দুর্বল পেশোয়া নিরুপায় হয়ে সিন্ধিয়াকে সমর্থন করলেন। কিন্তু পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার মিলিত বাহিনী যশোবন্ত রাও হোলকার কর্তৃক পরাজিত হলো। অগত্যা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজের দ্বারস্থ হলেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে বেসিনের সন্ধি অনুসারে তিনি লর্ড ওয়েলেসলির (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করে নিজের দেশকে বিদেশী ইংরেজের হাতে তুলে দিলেন। সন্ধির শর্তানুসারে

(১) পেশোয়া এখন থেকে ইংরেজের অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ হলেন, (২) ইংরেজ-বিরোধী কোনও শক্তির সঙ্গে তিনি আর কোনও যোগাযোগ রাখতে পারবেন না, (৩) ইংরেজ ফৌজের তত্ত্বাবধানে পেশোয়া পুনাতে প্রত্যাবর্তন করবেন, (৪) ইংরেজ বাহিনী এখন থেকে পেশোয়ার দরবারে থাকবে এবং তার ব্যয়ভার পেশোয়াকেই বহন করতে হবে, (৫) মারাঠা নেতাদের সঙ্গে বিবাদ হলে ইংরেজের মধ্যস্থতায় তা মীমাংসা করতে হবে।

বেসিনের সন্ধির পর লর্ড ওয়েলসলি লিখলেন (২৪শে ডিসেম্বর ১৮০২ খ্রিঃ) "ঘটনাস্রোত যে পথে চলেছে তাতে মনে হচ্ছে মারাঠা সাম্রাজ্য কোনও সংগ্রাম না করেই ব্রিটিশের স্বার্থ দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার শুভমুহূর্ত সমাগত।" তবে বিজয়ের প্রথম উল্লাস কেটে যাওয়ার পর ওয়েলেসলি বুঝেছিলেন যে, বেসিনের সন্ধি মূলত "শূন্যের সঙ্গে চুক্তি"। মারাঠা নায়কদের মধ্যে শক্তিশালি সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলের সঙ্গে এখনও বোঝাপড়া শেষ হয়নি। এঁরা কেউ ইংরেজের অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ফাঁদে পা দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন নি। বরং অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি তাঁদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের বহুদিনের বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে তাঁরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। পেশোয়ার উপরোক্ত অধঃপতনে মারাঠা নেতাগণ নিজেদের অনৈক্য ভুলে একতাবদ্ধ হলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এই ঐক্যের সংবাদ পেয়ে তাঁর কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হলেন এবং গোপনে মারাঠা সংঘের সমর্থক হলেন। নবগঠিত মারাঠা সংঘের সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে একত্রে সরাসরি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়লেন। শুরু হলো দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩ খ্রিঃ)।

এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন লর্ড ওয়েলেসলির ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেসলি। আর্থার ওয়েলেসলি ছিলেন পরবর্তীকালের নেপোলিয়ন বিজেতা ডিউক অফ ওয়েলিংটন। তিনি আসাই এবং আরগাঁও-এ সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করলেন। এই সময় আহম্মদনগর অধিকৃত হলো। ইংরেজ পক্ষের অন্যতম সেনাপতি লর্ড লেক উত্তর ভারতে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি দিল্লি ও লাসোয়ারীর যুদ্ধে সিন্ধিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে আলিগড়, দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করলেন। ইংরেজ বাহিনী উত্তর ভারতে উড়িষ্যা, বুন্দেলখণ্ড, গুজরাট প্রভৃতি স্থানেও জয়লাভ করল। এরপর ক্রমে ক্রমে কয়েকটি সন্ধির শর্তে ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া ইংরেজের আধিপত্য পরোক্ষে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। যেমন, **প্রথমত**.দেওগাঁয়ের সন্ধি (১৮০৩ খ্রিঃ) অনুসারে ভোঁসলে কটক, বালেশ্বর ও মধ্যভারতের কিছু অংশ ইংরেজের হাতে তুলে দিলেন। নাগপুরে ইংরেজ রেসিডেন্ট বসানো হলো। স্থির হলো, ভোঁসলের সঙ্গে অন্য কারও বিবাদ হলে ইংরেজরাই তার মীমাংসা করে দেবে। **দ্বিতীয়ত**,সুরজী-অর্জুনগাঁও-এর সন্ধি (১৮০৩ খ্রিঃ) দ্বারা সিন্ধিয়া বাধ্য হয়ে আহম্মদনগর, গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল, ভারুচ, অজন্তা পাহাড়ের সংলগ্ন অঞ্চল ও কয়েকটি সুরক্ষিত দুর্গ ইংরেজের হাতে তুলে দিলেন। ভোঁসলের মত সিন্ধিয়ার দরবারেও

একজন ইংরেজ রেসিডেণ্টকে স্থান করে দেওয়া হলো। দিল্লি ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় মোগল বাদশাহ্ শাহ্ আলম মারাঠা-বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ইংরেজের বৃত্তিভোগী হলেন। ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া ইংরেজের অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির আশ্রয়ভুক্ত হলেন।

এতদিন যশোবন্ত রাও হোলকার নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এবার তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ওয়েলেসলিও হোলকারকে যথোচিত শক্তি প্রদানের প্রয়াস শুরু করলেন। যুদ্ধ কৌশল হিসেবে যশোবন্ত রাও সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে গেরিলা কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রথমদিকে হোলকার বাহিনী কোটা নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করল। কিন্তু যশোবন্ত রাও 'দিগে'র (Dig) যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। অন্যদিকে হোলকারের মিত্র রাজ্য ভরতপুরের জাঠ রাজা ইংরেজ সেনাপতি লেকের আক্রমণ প্রতিহত করলেন। শেষোক্ত দুটি যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃপক্ষের আদেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন (১৮০৫ খ্রিঃ)। ঠিক এই সময় নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সমগ্র ইয়োরোপে ত্রাসের সঞ্চার করলেন। ইংল্যাণ্ড সর্বদা নেপোলিয়নের আগ্রাসী নীতির প্রতিরোধে ব্যতিব্যস্ত। ভারতসহ ইয়োরোপে ইংরেজদের যুদ্ধঋণ ক্রমশ মাত্রা অতিক্রম করে যাচ্ছে। তাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে রাজ্যবিস্তার না করার নীতি ঘোষণা করল। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল জর্জ বার্লো অগত্যা হোলকারের সঙ্গে রাজঘাটের সন্ধিতে (১৮০৬ খ্রিঃ) শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। হোলকারকে তাঁর রাজ্যের অধিকাংশ অংশ প্রত্যার্পণ করা হলো। কোম্পানির নির্দেশে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল জর্জ বার্লো (১৮০৫-০৭ খ্রিঃ) এবং লর্ড মিণ্টো (১৮০৭-১৩ খ্রিঃ) ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি বর্জন করেন। ফলে উক্ত সাত বছর যাবৎ মারাঠা আর ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি।

৪। ব্রিটিশ সম্প্রসারণবাদ

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৮ খ্রিঃ) ঃ লর্ড মিণ্টোর পর এদেশে কোম্পানির পক্ষে গভর্নর জেনারেল রূপে এলেন লর্ড ময়রা (Lord Moira, 1813)। প্রকৃতপক্ষে তিনি ''মারকুইস অফ হেস্টিংস' বা লর্ড হেস্টিংস নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ওয়েলেসলির অসমাপ্ত কর্মসূচিকে পূর্ণ করে ভারতে ইংরেজের শাসনকে আরও ব্যাপক করেছিলেন। তাঁর আমলেই মারাঠাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের শেষ সংগ্রামে নামতে হলো।

বেসিনের সন্ধি (১৮০২ খ্রিঃ) এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ মারাঠা শক্তিকে এক প্রকার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। কিন্তু মারাঠাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েনি। ইংরেজ রেসিডেন্টের কঠোর নিয়ন্ত্রণে থেকেও মারাঠা নায়করা তাঁদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন। এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও স্বয়ং। হোলকার, ভোঁসলে আর সিন্ধিয়ার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করলেন পেশোয়ার সুদক্ষ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী ত্রিম্বকজী। ত্রিম্বকজীর চলাফেরার উপর নজর রেখেছিলেন পুনার ইংরেজ রেসিডেন্ট এলোফিনস্টোন। অন্যদিকে পেশোয়ার ও বরোদার

গাইকোয়াড় ইংরেজের অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ ছিলেন না। আবার গাইকোয়াড় ছিলেন পেশোয়ার সামন্ত। পেশোয়া যখন মন্ত্রী ত্রিম্বকজীর সাহায্যে ইংরেজবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখন গাইকোয়াড়ের সঙ্গে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মধ্যে খাজনার ব্যাপারে গোলমাল হয়। এই বিবাদ মামাংসার জন্যে গাইকোয়াড়ের প্রধান দেওয়ান গঙ্গাধর শাস্ত্রী পুনাতে আসেন। সেখানে গঙ্গাধর শাস্ত্রী হঠাৎ এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন। এই হত্যার পেছনে পেশোয়ার মন্ত্রী ত্রিম্বোকজীর হাত আছে মনে করে রেসিডেন্ট এলোফিনস্টোন তাঁকে বন্দী করেন। কিন্তু ত্রিম্বকজী বন্ধী অবস্থা থেকে পালাতে সক্ষম হন। এই অবস্থায় ত্রিম্বকজীকে ইংরেজের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে ইংরেজরা পেশোয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের কাছে নতি স্বীকার না করায় পেশোয়া ও ইংরেজের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এদিকে লর্ড হেস্টিংস পিণ্ডারী দস্যু দমনের নামে এক যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পিণ্ডারীদের সঙ্গে মারাঠা নায়কদের এক গোপন ষড়যন্ত্র ছিল। পিণ্ডারীদের সঙ্গে একত্রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে মারাঠা স্বাধীনতা ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার এক ষড়যন্ত্র করেছিল। তাই ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস যখন পিণ্ডারী দস্যু দমনে ব্যস্ত তখন পেশোয়া, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে, হোলকার একত্রে ইংরেজ-বিরোধী লড়াই শুরু করলেন। পেশোয়া পুনার নিকটবর্তী ইংরেজ দুতাবাস আক্রমণ করে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ভোঁসলে ও হোলকার যথাক্রমে নাগপুর ও মাহীদপুরে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। ইতোমধ্যে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে শেষ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু করিগাঁও ও অস্তিনামক স্থানের দুটি যুদ্ধেই পরাজিত হয়ে ইংরেজদের নিকট আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হলেন। তিনি এবার ইংরেজের বৃত্তি গ্রহণ করে কানপুরের বিঠুর নামক স্থানে অবশিষ্ট জীবন কাটাতে বাধ্য হলেন। চতুর ইংরেজ শিবাজীর জনৈক বংশধরকে মারাঠা রাজ্যের সামান্য একটি অংশ দান করে মারাঠা জাতিকে খুশি রাখার চেষ্টা করল। এর পরিবর্তে মারাঠা রাষ্ট্রের অধিকাংশই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। ফলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আয়তন বৃদ্ধি পেল। হোলকার ও ভোঁসলেকে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যখণ্ডে ব্রিটিশ বাহিনী পোষণ করতে বাধ্য করা হলো। অন্যান্য ছোট ছোট মারাঠা নায়কগণ একে একে ব্রিটিশের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে শিবাজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মারাঠা সাম্রাজ্যের অবসান ঘটল।

মারাঠা শক্তির ধ্বংসের কারণ : মারাঠা শক্তির উত্থান ঘটে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল শক্তির চরম উৎকর্ষের যুগে। অথচ সেই শক্তির পতন ঘটল বিদেশী ব্রিটিশ শক্তির উত্থানের যুগে। তবে মারাঠা শক্তির পতনের মূলে তাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও ঘরোয়া বিবাদই ছিল প্রবল, ব্রিটিশ শক্তির প্রাচুর্য নয়। বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে মারাঠা শক্তির পতনের কারণ হিসেবে যেসব বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি হলো :

প্রথমত, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রিঃ) পরাজয়ের ফলে পেশোয়ার নেতৃত্বাধীনে চালিত মারাঠা শক্তি ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। মারাঠা সাম্রাজ্যের সীমান্ত তখন সঙ্কুচিত হয়ে

পড়ে। রাজপুত, জাঠ, নিজাম, হায়দর আলি প্রমুখ অনেকেই সুযোগ বুঝে মারাঠা সাম্রাজ্যের অধিকৃত অঞ্চলে দখল করেন।

দ্বিতীয়ত, শিবাজী প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে শাহুর রাজত্বকাল থেকে পেশোয়া পদ উত্তরাধিকার সূত্রে গৃহীত হতে থাকে। পেশোয়ার পুত্র ঠিক পেশোয়ার উপযোগী দক্ষতা ও ক্ষমতা লাভ করবেন এমনটি মনে করা অযৌক্তিক। এর ফলে অপুত্রক অবস্থায় কেউ মারা গেলে যেমন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি নাবালক অবস্থায় অনেকেই পেশোয়র গদিতে বসাবার ফলে কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয় ঘটেছে।

তৃতীয়ত, পেশোয়া বাজীরাও-এর আমলে (১৭২০-৪০ খ্রিঃ) গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড়, মালবের ধার অঞ্চলে পাওয়ার বংশ ও নাগপুরের ভোঁসলে বংশের উপর বিস্তৃত মারাঠা ভূখণ্ডের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। বাজীরাও-এর যুগে এই পঞ্চনায়ক তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতেন। পরবর্তীকালে এই রাজ্যপঞ্চকের নায়কগণ ক্ষমতালোভী হয়ে মারাঠাদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করেন। লক্ষ্য করা যায়, মারাঠা নায়কগণ পরবর্তীকালে এত ক্ষমতালোভী স্বার্থপর হয়ে উঠেছিলেন যে আগ্রাসী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা একতাবদ্ধ হয়ে মারাঠা সংহতি রক্ষা করতে পারেন নি। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে যখন ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে রত সেই সময় হোলকার এবং গাইকোয়াড় ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। এ-ধরণের দৃষ্টান্তের কোনও অভাব নেই।[১]

চতুর্থত, মারাঠাগণ চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করতে ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহানুভূতি হারিয়েছিল। ফলে বিপদের সময় কেউ তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় নি। আহমদ শাহ আবদালির সঙ্গে যুদ্ধের সময় মারাঠারা অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড ইত্যাদি কোনও রাজ্যের সাহায্য পায়নি। এই ঘটনা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সময় যেমন ঘটেছিল তেমনি ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামেও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির থেকে সাহায্যের পরিবর্তে এসেছিল বিরোধিতা। জবরদস্তি চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করে এবং সেই সম্পদকে মূলধন করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মারাঠা নায়কগণ মনোযোগ দেননি। পক্ষান্তরে উক্ত লুণ্ঠন প্রবৃত্তি থেকে মারাঠাদের একটা বিশেষ অংশ অন্যায় ও অনাচারে আসক্ত হয়ে উঠেছিলেন। মারাঠাদের আয় ছিল অনিশ্চিত, তাই জোর জবরদস্তি করে আদায় করা চৌথ ও সরদেশমুখীর উপর তাঁদের নির্ভর করতে হত। এর ফলে তাদের আর্থিক উন্নতির পরিবর্তে এলো অধঃপতন এবং পরিণতিতে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হলো।

পঞ্চমত, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পূর্বে যেমন শিবাজী ও পেশোয়া বাজীরাও তেমনি পরবর্তী যুগে দ্বিতীয় মাধবরাও, মহাদজী সিন্ধিয়া, তুকোজী হোলকার, অহল্যাবাঈ, নানা ফড়নবিশ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতারাই মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রাণসঞ্চালক ছিলেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর এঁরা সবাই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তখন

মারাঠাদের অবস্থা পরিচালকহীন জাহাজের মত হলো। অবশেষে ইংরেজদের আগ্রাসী নীতির প্রবল তরঙ্গে সবাইকে ডুবে যেতে হলো।

ষষ্ঠত, মারাঠাদের সামরিক দুর্বলতা ও সংহতির অভাব ছিল তাদের পতনের অপর একটি অপরিহার্য কারণ। প্রথম স্তরে মারাঠা বাহিনী মারাঠাদের নিয়ে সংগঠিত হত। তখন তাদের বাহিনীতে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটে। পরে পেশোয়ার ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ভাড়াটিয়া সৈন্য ব্যবহার করতে শুরু করেন। ফলে সেনাবাহিনীতে জাতীয় ভাবধারা ও প্রেরণা বিনষ্ট হলো। এক সময় গেরিলা যুদ্ধরীতি ছিল তাদের সামরিক কৌশল ও যুদ্ধজয়ের মূলসূত্র। পরে তারা গেরিলা যুদ্ধরীতি ত্যাগ করল কিন্তু পাশ্চাত্য রীতি সম্পূর্ণ বা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করতে পারে নি। ফলে তাদের সামরিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া প্রথম স্তরে মারাঠা নৌবাহিনী ইয়োরোপীয় বণিকদের পর্যুদস্ত করার ক্ষমতা রাখত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপদের সময় সেই বাহিনীর অস্তিত্বই আর দেখা গেলনা। ফলে মারাঠা শক্তির বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে পলাশির প্রান্তরে বণিক ইংরেজদের যে প্রাধান্য সূচিত (১৭৫৭ খ্রিঃ) হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম দু'দশকের মধ্যে তা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো। ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলেসলি, অবশেষে লর্ড হেস্টিংস (ময়রা)-এর চেষ্টায় ইংরেজের প্রধান প্রধান ভারতীয় শত্রু যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। এমনিকরে দক্ষিণ ভারতের নিজাম, টিপু সুলতান, ও মারাঠা শক্তিসংঘ ধ্বংস হলো। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস যখন দেশে (ইংল্যাণ্ডে) প্রত্যাবর্তন করেন তখন দক্ষিণের সমগ্র ভূখণ্ডসহ পাঞ্জাবের শতদ্রু নদী পর্যন্ত ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রধান অংশগুলিতে ইংরেজের কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়েলেসলি এবং অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ঃ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করেন ইংরেজ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রবার্ট ক্লাইভ। মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর (১৭৬৫ খ্রিঃ) এই ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে সামান্য বল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি পলাশির যুদ্ধে জয়ী হন (১৭৫৭ খ্রিঃ) আর কূটনীতির মাধ্যমে তিনি বিজিত রাজ্যের আইন মাফিক অধিকার লাভ করেন। এরপর সুদীর্ঘ একশ বছর ধরে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস চলেছে। এই প্রয়াসের দুটি ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয়— একটি হলো যুদ্ধ, আর অন্যটি হলো কূটকৌশল। এই দুটি ধারার কার্যকরী প্রয়োগ ব্রিটিশ জাতি ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব ঃ ইংরেজ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে এসেছিল মূলত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে। কালক্রমে এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি তাদেরকে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারে অনুপ্রাণিত করে। পলাশির প্রহসনের পর সেই উদ্যোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তবে প্রথম স্তরে বিলাতে অবস্থিত কোম্পানির কর্তৃপক্ষ রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে

নিষেধাজ্ঞা পাঠাতেন। তখন নির্দেশ ছিল, "আমরা চাই যে বর্তমানে যেসব দেশীয় রাজ্য ভারতে রয়েছে তারা থাকুক এবং আমাদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তারা পরস্পরের শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করুক।" প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মনে করতেন যে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থায়ী করতে হলে এদেশের রাজাদের ব্রিটিশ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে হবে এবং তাঁদের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজবংশের প্রত্যক্ষ আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ভারতের কেন্দ্রীয় মোগলশক্তির পতনের যুগে ভারতে সেসব শক্তিশালি রাজ্যের উদ্ভব ঘটে তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল কোম্পানির রাজ্য বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা। আর ইংরেজ কোম্পানির ভারতীয় শত্রুরূপে গণ্য মারাঠা রাজ্যসংঘ এবং মহীশূর ছিল শক্তিশালী। এরা যাতে কোম্পানির রাজ্য আক্রমণ করতে না পারে, সেদিকে নজর রেখেই ওয়ারেন হেস্টিংস সীমান্তের অযোধ্যা, নিজাম প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তবুও ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলে (১৭৭২-৮৫ খ্রিঃ) যুদ্ধও হয়েছে অনেকগুলি, যেমন— ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-৮২ খ্রিঃ), প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭-৬৯ খ্রিঃ), দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০-৮৪ খ্রিঃ) ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধগুলিও ছিল আত্মরক্ষামূলক। মারাঠা ও মহীশূর সম্পূর্ণ অধিকার করার উদ্দেশ্যে আগ্রাসী নীতি নিয়ে এসব যুদ্ধ হয়নি। অনেক সময় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কর্তৃপক্ষের ভুলের জন্যে হেস্টিংসকে যুদ্ধে নামতে হয়েছে। পিট-এর ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪ খ্রিঃ)-এর মুখবন্ধে ঘোষণা করা হলো যে, ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করা ইংরেজের উদ্দেশ্য নয়, এটা জাতির ইচ্ছা, নীতি ও মর্যাদার পরিপন্থী। পিটের ভারত আইনের এই ধারা ভারতে কার্যকরী হয়নি। গভর্নর জেনারেলের পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে কখনও যুদ্ধ, কখনও বা চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছে। এই নীতিকে স্যার উইলিয়াম লি ওয়ার্নার বলেছেন "বেড়াজাল নীতি" (Policy of ring fence)। পিটের ভারত আইনকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রেরিত হয়েও লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬- ৯৩ খ্রিঃ) তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ এবং প্রাসঙ্গিক চুক্তি অর্থাৎ শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২ খ্রিঃ) করতে বাধ্য হলেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের পর স্যার জন শোর (১৭৯৪-৯৮ খ্রিঃ) ভারতে যুদ্ধ বর্জন করে শান্তির নীতি অবলম্বন করেন। অবশ্য এই সময় ইংল্যাণ্ড সহ সমগ্র ইয়োরোপের নজর ছিল ফরাসি বিপ্লবের বিচিত্র প্রক্রিয়ার দিকে। উপনিবেশগুলিতে শান্তি বজায় রাখাই ছিল ইংরেজ কোম্পানির বিশেষ লক্ষ্য।

পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ) এমন সময় ভারতে এলেন যখন সমগ্র ইয়োরোপে নেপোলিয়ন ত্রাসের সঞ্চার করেছেন। তিনি যে কোনও উপায়ে ভারতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধনীতি ছাড়াও কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টির নীতি অবলম্বন করলেন। তাঁর কূটনৈতিক চাপের নীতিটি ইতিহাসে 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি'(Subsidiary Alliance) নামে পরিচিত। এই নীতির মূল বিষয় হলো : (১) যে কোনও ভারতীয় নরপতি

ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে পারেন। (২) মিত্র রাজ্যগুলি ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং দেশী বা বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ, সন্ধি বা মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে না। (৩) মিত্র রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যে ইংরেজ সরকার দায়ী থাকবে এবং মিত্র রাজ্যের খরচে ঐ রাজ্যে একদল ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন থাকবে। (৪) ব্রিটিশ ভিন্ন অন্য কোনও জাতির সামরিক কর্মচারী দ্বারা মিত্ররাজ্যের সৈন্য-সামন্তকে সামরিক শিক্ষণ দেওয়া চলবে না। (৫) এছাড়া যেসব দেশীয় রাজ্যের আয়তন একটু বড় তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে ইংরেজের পরিচালনায় যে সৈন্যদল রাখা হবে তার ব্যয় সঙ্কুলানোর জন্যে উপযুক্ত পরিমান এলাকা ইংরেজকে ছেড়ে দিতে হবে। আর ছোট ছোট রাজ্যগুলি থেকে সরাসরি কর আদায় করে ইংরেজ বাহিনী পোষা হবে। ক্লাইভ বা ওয়ারেন হেস্টিংস যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তাকেই আরও নগ্নভাবে অথচ নীতির আকারে দেশীয় রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করে ব্রিটিশের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বকে এগিয়ে নিয়ে চললেন লর্ড ওয়েলেসলি।

ওয়েলেসলির পাতা ফাঁদে প্রথম পা দিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম (১৮০০ খ্রিঃ)। ব্রিটিশ সৈন্যপোষার জন্য ইংরেজ কোম্পানীকে দিয়ে দিতে হলো তুঙ্গভদ্রা আর কৃষ্ণা নদীর মাঝখানের এলোোকা। দক্ষিণের তাঞ্জোর (১৭৯৯ খ্রিঃ), সুরাট (১৭৯৯ খ্রিঃ) পরপর কোম্পানির অধীনতামূলক মৈত্রী রাজ্যে পরিণত হলো। কুশাসনের অজুহাতে কর্ণাটক ও আর্কটকে সরাসরি ইংরেজের অধীনে আনা হলো। ইতিমধ্যে আহমদ শাহ আবদালির নাতি জামান শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণে আসছেন---এই সংবাদের অজুহাতে মিত্ররাজ্য অযোধ্যাকে অধীনতামূলক মিত্র রাজ্য করে নেওয়া হলো (১৮০১ খ্রিঃ)। সেই সঙ্গে রোহিলাখণ্ড, গোরক্ষপুর এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল সম্পূর্ণ ইংরেজের অধিকারে এলো। অবশেষে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ওয়েলেসলির ফাঁদে পা দিলেন (১৮০২ খ্রিঃ)। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির অনৈক্য আর পারস্পরিক বিদ্বেষের যে কঠিন ব্যাধি ভারতকে পঙ্গু করেছিল, তারই সুযোগ নিয়ে ওয়েলেসলি ব্রিটিশ ভারতীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দেওয়াল গেঁথে তুললেন।

লর্ড ওয়েলেসলি, জর্জ বার্লো (১৮০৫-০৭ খ্রিঃ) নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করলেন। লর্ড মিন্টো (১৮০৭-১৩ খ্রিঃ) নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি করে (১৮০৯ খ্রিঃ) শিখ দরবারে মেটকাফকে দূত হিসাবে প্রেরণ করলেন। দ্বিতীয়ত, অজয়গড় ও কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করে ঐ দুটি স্থানে ব্রিটিশের স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করলেন। এরপর এলেন নতুন সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-২৩ খ্রিঃ)। তিনি প্রথম দিকে ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলির কর্মধারার বিরোধী। কার্যক্ষেত্রে তিনি হয়ে পড়লেন তাঁর উত্তরসূরী। ওয়েলেসলির আরব্ধ নীতিকে সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যেন তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথমত, তিনি গোর্খাদের সঙ্গে সগৌলির সন্ধিতে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে রেসিডেন্ট বসালেন। তিনি ব্রিটিশের অধিকারে আনলেন

গাড়ওয়াল ও কুমায়ুন অঞ্চল দুটিকে। দ্বিতীয়ত, পিণ্ডারী দস্যুদের দমন করে তিনি অত্যাচারিত দেশীয় রাজাদের সহানুভূতি কুড়িয়ে নিলেন। তৃতীয়ত, শেষ মারাঠা যুদ্ধে (১৮১৭-১৮ খ্রিঃ) তিনি সমগ্র মহারাষ্ট্র দখল করলেন। অধীনতামূলক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করলেন মারাঠা নায়কদের এবং প্রত্যেকের রাজ্যখণ্ডে রেসিডেন্ট সহ ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করা হলো। চতুর্থত, রাজপুতনার প্রত্যেকটি রাজ্যের নরপতিকে ইংরেজের অনুগত মিত্রে পরিণত করা হলো। এভাবে ইংরেজ রেসিডেন্ট রইলেন সর্বত্র।

লর্ড ওয়েলেসলির আমল থেকে দেশীয় রাজ্য ও কোম্পানির সম্পর্কের পরিবর্তন সূচিত হয়। অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি গ্রহণ করল যেসব দেশীয় রাজ্য তাদের রাজাদের হাতে রইল ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। অন্যদিকে কোম্পানির হাতে চলে গেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। এর ফলে দেশীয় রাজারা কোম্পানির হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। প্রকৃত ক্ষমতা না থাকায় দায়িত্ব পালনের স্পৃহা তাঁদের রইল না। ক্রমে তাঁরা বিলাস-ব্যসনে মত্ত হলেন। দেশে এলো কুশাসন, অত্যাচার, অনাচার, অরাজকতা। অন্যদিকে এইসব রাজ্যে বসবাসকারী ইংরেজ রেসিডেন্ট সর্বদা রাজার কার্যে হস্তক্ষেপ করতেন। প্রভুত্বের আস্ফালন দেখাতেন, অথচ শাসনের প্রকৃত দায়িত্ব পালন তাঁরা করতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পদ শোষণের উদ্দেশ্যে রেসিডেন্টরা নানা অজুহাতে রাজাদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতেন। দেশীয় রাজ্যে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্য পোষার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজার নিকট থেকে যেমন অর্থ আদায় করা হত তেমনি প্রশাসনিক খরচ সঙ্কুলানোর নামে রাজ্যের অংশও কোম্পানির অধিকারভুক্ত করা হত। ফলে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং নাগরিকদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো ভেঙে পড়ল।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতেই ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। পলাশি (১৭৫৭ খ্রিঃ) ও বকসারের যুদ্ধের (১৭৬৪ খ্রিঃ) পর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাই হয়ে দাঁড়াল ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট থেকে দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫ খ্রিঃ) পর এই ভিত্তিভূমি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক এই সময় ভারতে ইংরেজের শত্রু হিসেবে ছিল দুটি প্রধান শক্তি— (১) মহীশূর ও (২) মহারাষ্ট্র। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে মহীশূরের ক্ষেত্রে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯৯) এবং মহারাষ্ট্র বা মারাঠা সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা (১৮১৭-১৮) যুদ্ধে উক্ত দুই শত্রুর অবসান ঘটল। এসবের ফলে ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু এছাড়াও ছোট-বড়ো আরও কিছু অঞ্চল ছিল যেসব অধিকার করা বা যে সব অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজদের কখনও যুদ্ধ, কখনও বা কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। এসব ব্যাপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেলদের ভূমিকা ছিল প্রধান।

(১) মোগল সম্রাট ও অযোধ্যার নবাবের উপর প্রভাব বিস্তার ঃ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের সময় (১৭৬৫ খ্রিঃ) লর্ড ক্লাইভ মোগল সম্রাট শাহ্ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুত হন এবং অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কারা ও এলোহাবাদ জেলা দুটিকে উপঢৌকন হিসেবে শাহ্ আলমের হাতে তুলে দেন। মোগল দরবারের অনেকেই বাদশাহের এই কাজটিকে পচ্ছন্দ করেন নি। ফলে দিল্লির পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় বাদশাহ্ এলোহাবাদেই বসবাস করতে থাকেন। বাস্তবত শাহ্ আলম ছিলেন ইংরেজের নিয়ন্ত্রণাধীনে। এই সময় প্রথম মাধব রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠারা আবার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে তারা দিল্লি দখল করে বাদশাহকে অনেক বুঝিয়ে এলোহাবাদ থেকে দিল্লিতে নিয়ে আসে ও মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে সক্ষম হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হিসেবে ভারতে আসার পর শাহ্ আলমের উপর মারাঠা প্রভাবকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাছাড়া বাংলার পশ্চিম সীমান্তে মারাঠাদের আবির্ভাবকে ইংরেজদের নিকট বিপজ্জনক বলে মনে করলেন। তাই বাদশাহ্ যখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট বার্ষিক কর দাবি (পূর্বশর্ত) করলেন তখন ওয়ারেন হেস্টিংস তা প্রত্যাখ্যান করলেন (১৭৭২ খ্রিঃ)।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নতুন করে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে সন্ধিতে (বারানসীর সন্ধি) স্বাক্ষর করলেন। সেই চুক্তির শর্তে হেস্টিংস বার্ষিক ৫০ লক্ষ (পঞ্চাশ) টাকার বিনিময়ে কারা ও এলোহাবাদ নবাবকে দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়ত, স্থির হলো যে অযোধ্যার নবাব প্রয়োজন হলেই ইংরেজ বাহিনীর সাহায্য পাবেন। কিন্তু তার যাবতীয় খরচ তাঁকে বহন করতে হবে।

উপরোক্ত কর্মের জন্যে ওয়ারেন হেস্টিংসকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত হেস্টিংস ইংরেজের স্বার্থেই মোগল বাদশাহের মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি কারা ও এলোহাবাদ যে অযোধ্যার নবাবের অধিকারে ছিল অথবা যাঁর নিকট থেকে ইংরেজরা ছিনিয়ে নিয়েছিল তাঁর নিকট বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পুনরায় দিয়েদিলেন। এই ঘটনার জন্যে হেস্টিংস-এর পক্ষে যে সব যুক্তি দেখানো হয় তা হলো ঃ (ক) দুর্দান্ত মারাঠা অভিযান প্রতিরোধের জন্য অযোধ্যাকে বাফার স্টেট হিসেবে খাড়া করার দরকার ছিল। (খ) মোগল বাদশাহের হাতে কর দেওয়ার অর্থ হলো পরোক্ষভাবে মারাঠাদের সাহায্য করা, কারণ বাদশাহ্ শাহ্ আলম ছিলেন মারাঠা শক্তির নিয়ন্ত্রণে। (গ) ওয়ারেন হেস্টিংস ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে যে ব্যয় সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ করেন তার জন্যে তিনি বাদশাহ্ ও অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হন। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী অযোধ্যার সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখাই ছিল তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম অঙ্গ।

(২) রোহিলা যুদ্ধ (১৭৭৩-৭৪ খ্রিঃ) ঃ ওয়ারেন হেস্টিংস অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে নতুন চুক্তি সম্পাদন করার (১৭৭৩ খ্রিঃ) পরই রোহিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর ও শস্য-শ্যামল অঞ্চলটিকে বলা হত রোহিলাখণ্ড। আদিতে এখানে হিন্দুদের বসবাস থাকলেও পরবর্তীকালে আফগান রোহিলারাই এখানে বসবাস আরম্ভ করে। হাফিজ রহমৎ খাঁ নামক এক রোহিলার নেতৃত্বে এই অঞ্চলটি ছিল স্বাধীন ও সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলটির উপর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার প্রলোভন ছিল খুব বেশি। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সময় থেকে বার বার মারাঠা আক্রমণে এই অঞ্চলটি বিধ্বস্ত হতে থাকে। তাই অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে মিত্রতা না থাকলেও হাফিজ রহমৎকে সর্বদাই অযোধ্যার উপর নির্ভর করতে হত। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত ঠিক হলো যে বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোধ্যা রোহিলাখণ্ডকে সামরিক সাহায্য দেবে। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রোহিলাখণ্ড মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু বাস্তবত যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। কারণ (ক) অযোধ্যা এই সময় ব্রিটিশ বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে রোহিলাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। (খ) পুনাতে পেশোয়া নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সংবাদে মারাঠারা বিচলিত হয়ে পড়ে ও রোহিলাখণ্ড ছেড়ে চলে যায়।

এবার অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের নিকট প্রতিশ্রুত চল্লিশ লক্ষ টাকার দাবি করলেন। কিন্তু রোহিলা নায়ক সেই টাকা দিতে পারল না। ফলে সুজাউদ্দৌলা ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নিকট থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে রোহিলাদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে লড়াই শুরু করলেন। এই সামরিক সাহায্যের জন্যে নবাবের সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর একটা রফা হয়েছিল। ঠিক হলো যে, যুদ্ধের ঠিক পরেই নবাব সুজাউদ্দৌলা সামরিক সাহয্যের জন্যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে দেবেন চল্লিশ লক্ষ টাকা, আর তারপর একাধিক কিস্তিতে আরও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। এই চুক্তিতে ব্রিটিশ বাহিনীর সাহায্যে নবাবের সঙ্গে রোহিলাদের তুমুল লড়াই হলো। যুদ্ধরত অবস্থায় নেতা হাফিজ রহমৎ খাঁ মৃত্যু বরণ করলেন। বিজয়ী পক্ষ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিল। বিশ হাজার রোহিলা গঙ্গা পার হয়ে এসে প্রাণে বাঁচল। রোহিলাখণ্ড অযোধ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো।

রোহিলাদের পরাজয় সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেই বলেছেন, "মারাঠারা তখন অনুপস্থিত, আর রোহিলারা ছিল দুর্বল; তাই সহজে তাদের পরাজিত করা সম্ভব ছিল।" কিন্তু এই রোহিলাদের সঙ্গে ইংরেজ বা অযোধ্যার নবাবের কোনও বিবাদ ছিল না। সমকালীন ভারতের বহু রাজ্যের মত রোহিলাখণ্ডে পৃথক শাসন পরিচালিত ছিল। এখানকার হিন্দুরাও শাসকদের বিরোধিতা করে নি। সুতরাং তাদের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য করা, জয়লাভের পর রোহিলাদের উপর অত্যাচার করা ও তাদের অর্থ-

সম্পদ লুণ্ঠন করা মোটেই সমর্থনযোগ্য কাজ নয়। ইংরেজ লেখক টমসন ও গ্যারেটের কথায় বলা যায়, "যে সমালোচক নীতির ধার ধারেন, তার কাছে আজ নিশ্চয়ই রোহিলা যুদ্ধ কোনওক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।" তবে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে, রোহিলা যুদ্ধ সম্পর্কে লজ্জাকর কিছু ঘটেনি। কিন্তু পার্লামেন্টে হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে যত অভিযোগ উঠেছিল তাদের মধ্যে রোহিলা যুদ্ধের কথা ছিল অন্যতম।

(৩) রোহিলাখণ্ড ও অযোধ্যার পরিণতি ঃ অযোধ্যা ছিল ইংরেজ কোম্পানির একটি আশ্রিত রাজ্য। উনিশ শতকের সূচনাতে এই অবস্থার রূপান্তর ঘটল। লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ) তখন গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভারতে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগ করতে ব্যস্ত। ঠিক এই সময় জানা গেল কাবুলের অধিপতি জামান শাহ ভারত অভিযানের আয়োজন করছেন। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার অজুহাতে ওয়েলেসলি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার নবাবকে এক সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করলেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে ব্রিটিশ বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে অযোধ্যা রাজ্যের অধিকাংশ স্থান, যেমন— গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল, গোরক্ষপুর, রোহিলাখণ্ড ইত্যাদি স্থান ইংরেজের অধিকারভুক্ত এলোকা হিসেবে গণ্য করতে হলো। এরফলে ইংরেজদের হাতে যে ভূখণ্ড এলো সেখানকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো, তেমনি নবাবের অংশটুকুতেও কুশাসনের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। এরূপ কুশাসনের অজুহাতে 'স্বত্ব-বিলোপ নীতি'র প্রবর্তক লর্ড ডালহৌসি অযোধ্যা রাজ্যটিকে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারিত করেন।

নিজাম ঃ সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সূচনা কাল থেকে যতগুলি শক্তিশালি সুবা স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনার প্রয়াস পায় তাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ ছিল প্রধান ও শক্তিশালী। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে হায়দ্রাবাদের নিজাম বার বার মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। এরূপ আক্রমণে নিজাম ছিলেন ভীত ও সন্ত্রস্ত। সিন্ধিয়া, হোলকার ও ভোঁসলের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা ফড়নবিশ ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে নিজামকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এরপরই লর্ড ওয়েলেসলি তাঁর অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি নিয়ে ভারতে উপস্থিত হলেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নিজামের সঙ্গে তাঁর নতুন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি ছিল সেই অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি। হায়দ্রাবাদের নিজামই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি দ্বারা আবদ্ধ হন। এই নীতির সূত্র অনুসারে নিজাম ইংরেজ সেনাবাহিনী পোষণ করার ব্যয়বরাদ্দ বাবদ তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ উপকূলের রাজ্যাংশ ইংরেজ কোম্পানির হস্তে সমর্পন করলেন। ফরাসিদের দ্বারা শিক্ষপ্রাপ্ত নিজামের নিজস্ব সামরিক বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হলো। নিজামের মৃত্যুর পর (১৮০৩ খ্রিঃ) তাঁর উত্তরাধিকারী সিকন্দর আলি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের

সঙ্গে অন্য একটি সন্ধির মাধ্যমে ইংরেজ আনুগত্য স্বীকার করেন এবং হায়দ্রাবাদ ক্রমে ইংরেজদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ (১৮১৪-১৮১৬ খ্রিঃ) : ইয়োরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন সর্বত্র পরাজয়ের মুখে, তখন (১৮১৩ খ্রিঃ) লর্ড ময়রা ভারতে এলেন গভর্নর জেনারেল হয়ে। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি লর্ড ওয়েলেসলির কর্মধারার বিরুদ্ধে কিছু কিছু সমালোচনাও করতেন। কিন্তু ভারতে এসে তিনি এমনভাবে কাজ আরম্ভ করলেন যেন তিনি লর্ড ওয়েলেসলির অসমাপ্ত কার্যকে শুধু সমাপ্ত করার জন্যে প্রেরিত। লর্ড ওয়েলেসলি অসমাপ্ত কর্মকে তিনি সমাপ্ত করার চেষ্টা করতে পেরে ব্রিটিশ শাসনকে আরও সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করলেন। ভারতের অভ্যন্তরে তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ইংরেজের কর্তৃত্বাধীনে আনার দিকে মন দিলেন। প্রথমে তার দৃষ্টি পড়ল উত্তর খণ্ডের পার্বত্যঅঞ্চলের দিকে। বিখ্যাত গোর্খা নেতা পৃথ্বীনারায়ণ ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে নেপাল দেশ জয় করে একটি শক্তিশালী হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপন করেন। উত্তরবঙ্গের তিস্তা থেকে শুরু করে পাঞ্জাবের শতদ্রু পর্যন্ত এই রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত ছিল। পার্বত্য অঞ্চল বলেই এই রাষ্ট্রের যথাযথ সীমানা নির্দেশ করা তখনকার দিনে দুরূহ ছিল। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে যখন অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে গোরক্ষপুর অঞ্চল ইংরেজরা লাভ করে তখন থেকে মাঝে মাঝে গোর্খাদের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ হত। কারণে-অকারণে গোর্খারা ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করে হামলা করত। ক্রমে তারা দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। শেষে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে গোর্খা ও ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে সংগ্রাম শুরু হলো।

গোর্খাদের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে লর্ড ময়রা লক্ষ্ণৌতে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। নেপালের কোনও গোলন্দাজ বাহিনী ছিল না। তবুও তারা তাদের ক্ষিপ্রতার দ্বারা কিছুকাল ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে সেনাপতি ডিলেস্লি প্রাণ হারালেন। এরপর সেনাপতি অক্টরলোনীর উপর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। অক্টরলোনীর নিকট গোর্খা সেনাপতি অমর সিংহ পরাজিত হন। কিছুকাল যুদ্ধের পর ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে সগৌলির সন্ধিতে গোর্খা ও ইংরেজের মধ্যে স্থাপিত হয়। এই সময় কাঠমুণ্ডুতে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে সিমলা, মুসৌরী, নৈনিতাল, আলমোড়া ইত্যাদি অঞ্চল সমেত গাড়ওয়াল ও কুমায়ুন অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হলো। যথেষ্ট অনিচ্ছায় সন্ধিটি মেনে নিয়েও নেপালীরা পরবর্তী যুগে ইংরেজদের আর বিরক্ত করেনি। এই জয়লাভের পর লর্ড ময়রা লর্ড হেস্টিংস উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়া গোর্খাবিজয়ী স্যার ডেভিড অক্টরলোনীর নামে কলকাতার গড়ের মাঠে 'মনুমেন্ট' স্থাপিত হয়। ভারত স্বাধীন হলে পরে সেই মনুমেন্ট 'শহীদমিনার' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

এখানে মনে রাখা দরকার, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত এবং পদানত করে ফেলার পরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে 'সাবভৌম' শক্তিতে পরিণত

হয়। অর্থাৎ কোম্পানির কোনও প্রতিপক্ষ ছিল না। ভারতে তাদের সম্প্রসারণশীল নীতি (Annexation Policy) সাফল্য লাভ করেছিল যেমন, তেমনি ভারতের সীমান্তেও তারা বিস্তার নীতি অবলম্বন করেছিল। ১৮১৮ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানির উগ্র সাম্রাজ্যবাদী এবং সম্প্রসারণশীল নীতি অব্যাহত থাকে। আদি যুগের মতন দ্বিতীয় পর্বেও কোম্পানি ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্য বিস্তারের বা প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য দু'রকমের নীতি গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয় এবং কূটকৌশলে প্রভুত্ব বিস্তার। প্রথমটির উদাহরণ পাঞ্জাবের শিখরাজ্যে জয় এবং দ্বিতীয়টির উদাহরণ লর্ড ডালহৌসির 'স্বত্ব বিলোপ নীতি'। আবার ভারত বহির্ভূত রাজ্যগুলির মধ্যে আফগানিস্তান থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত অনেক শক্তিরই তাদের সম্মখীন হতে হয় এবং কোথাও কোম্পানি সফল, কোথাও বিফল। এবার সেই দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে।

৫। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (১৮১৮-১৮৫৭ খ্রিঃ)

সীমান্ত নীতি— ব্রহ্মদেশ ও আফগান যুদ্ধ ঃ লর্ড ওয়েলেসলির (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-২৩ খ্রিঃ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লর্ড হেস্টিংসের আমলেই ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও সুবিশাল ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশ শক্তি নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। পূর্ব-সীমান্ত ছিল আসাম, মণিপুর, আরাকান, ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিম সীমান্তে শিখ, পাঠান, আফগান, বেলুচ, সিন্ধী ইত্যাদি। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮ খ্রিঃ)-এর আমলে সীমান্ত সম্প্রসারণের কাজ সূচিত হয়।

পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঃ ব্রিটিশ ভারতের পূর্ব সীমান্তে ছিল আসাম, মণিপুর, আরাকান ও ব্রহ্মদেশ। প্রথম দিকে এই রাজ্যগুলি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ব্রহ্মদেশের রাজা বোদোপায়া (১৭৭৯-১৮১৯ খ্রিঃ) বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করেন। তাঁর আমলে বিজিত আরাকান (১৭৮৪ খ্রিঃ) এবং মণিপুর পর্যন্ত (১৮১৩ খ্রিঃ) ব্রহ্মদেশের সীমা সম্প্রসারিত করে। এর ফলে ব্রহ্মদেশের সীমা ইংরেজ শাসিত ভারত-সীমার প্রায় কাছাকাছি এসে যায়। অন্যদিকে ঠিক এই সময় লর্ড হেস্টিংস পূর্ব সীমান্তে সাম্রাজ্য বিস্তারে নজর দেন। তাঁর পরিচালনায় মালয়ের অন্তর্গত সিঙ্গাপুর বন্দর দখল করা হয় (১৮১৯ খ্রিঃ)। ভারতের উপকূল ভাগ রক্ষা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইংরেজের বাণিজ্য বিস্তার করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি অবিলম্বে সিঙ্গাপুরে একটি ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করেন। তবে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ব্রিটিশের নৌবাণিজ্য অনেক আগে থেকে চালু ছিল। কিন্তু তবুও মূল্যবান সেগুণ কাঠ ও অন্যান্য কাঁচামালের জন্যে ব্রিটিশ এ দেশের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের আশা পোষণ করত। ব্রহ্মদেশ কর্তৃক আরাকান ও মণিপুর দখলের পর কোম্পানির সঙ্গে এদেশের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং একটা শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হয়ে

পড়ে। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ-সরকার ব্রহ্ম সরকারের নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু দূতগণ ব্রহ্ম সরকারের নিকট থেকে দুর্ব্যবহার পেয়ে ফিরে আসে। এদিকে যেসব বাস্তুহারা আরাকান ও মণিপুর থেকে ব্রিটিশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের ফেরৎ দেওয়ার জন্যে ব্রহ্ম সরকার ভারতের কোম্পানি সরকারকে চাপ দিতে লাগল। কিন্তু কোম্পানি সরকার সেদিকে কর্ণপাত করল না। এদিকে ইংরেজরা যখন ভারতে পিণ্ডারী দমনে ব্যস্ত (১৮১২-১৬ খ্রিঃ) সেই সময় সুযোগ বুঝে ব্রহ্ম সরকার চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চল ব্রহ্মদেশের অধীন এই দাবি জানিয়ে দূত প্রেরণ করল। ব্রহ্ম সরকারের যুক্তি হলো, এই অঞ্চলগুলি এক সময় আরাকান সরকারের মিত্ররাজ্য ছিল। আরাকানের মগেরা এখান থেকে রাজস্ব আদায় করত। এখন যেহেতু আরাকান ব্রহ্মদেশের অধীন সেজন্যে উপরোক্ত স্থানগুলিও ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত। গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস দূতের হাতের পত্রখানাকে জাল মনে করে দূতকে ফেরৎ পাঠালেন। সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্রহ্মরাজ পগিদোয়ার (বেদোপায়ার পুত্র) সেনাবাহিনী প্রেরণ করে অবিলম্বে আসাম জয় করলেন (১৮২১-২২ খ্রিঃ)। তাছাড়া ব্রহ্মসৈন্য চট্টগ্রামের নিকটস্থ ইংরেজ কোম্পানির শাহপুরী (১৮২৩ খ্রিঃ) ও ডাডপটলি অধিকার করে বাংলাদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। ফলে নবাগত গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮ খ্রিঃ) ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন (১৮২৪ খ্রিঃ)। **প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ** শুরু হলো। লর্ড আমহার্স্ট মোটামুটি তিনটি ধারায় প্রায় একই সময় ব্রহ্ম সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। (১) প্রথম অবস্থায় একদল ব্রিটিশ সৈন্য আসাম থেকে স্থলপথে ব্রহ্ম বাহিনীকে বিতাড়িত করে সীমান্ত নিরাপদ করল। (২) এরপর দ্বিতীয় একদল আরাকানে প্রেরিত হলো। এই দল ব্রহ্ম সেনাপতি বান্দুলার হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। (৩) তৃতীয় একদল ব্রিটিশ বাহিনী সেনাপতি ক্যাম্পবেলের অধীনে বাষ্পীয় জাহাজ যোগে জলপথে রেঙ্গুনে প্রেরিত হলো। এই দল আধুনিক অস্ত্রাদির সাহায্যে সহজে রেঙ্গুন দখল করল। নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মরাজ আরাকান সীমান্ত থেকে সেনাপতি বান্দুলাকে স্বদেশে আনয়ন করলেন। কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বান্দুলা পরাজিত ও নিহত হলেন। ইংরেজ বাহিনী তখন প্রোম দখল করে নিম্নব্রহ্মে (Lower Burma) রাজধানীর নিকটবর্তী হলো। নিরুপায় হয়ে এবার ব্রহ্মরাজ ইংরেজের নিকট সন্ধি ভিক্ষা করলেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ান্দাবু নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হলো। সন্ধির শর্তানুসারে (১) ব্রহ্মরাজ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক কোটি টাকা ইংরেজকে দিয়ে দিলেন। (২) আসাম, কাছাড় ও জয়ন্তিয়ায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য ব্রহ্মরাজ প্রতিশ্রুতি দিলেন। (৩) আরাকান ও টেনাসেরিম ইংরেজদের হস্তে অর্পিত হলো। (৪) মণিপুর স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি লাভ করল। (৫) ব্রহ্মরাজের রাজসভায় একজন ইংরেজ প্রতিনিধির অবস্থান স্বীকৃত হলো। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-বহ্ম যুদ্ধের অবসান ঘটল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮৫২ খ্রিঃ) : প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করলেও পূর্বসীমান্তে ব্রিটিশের কার্যকরী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রথমত ব্রহ্মদেশের নতুন রাজা থ্যারাবদ্দি (১৮৩৭-১৮৪৫ খ্রিঃ) পূর্বেকার ইয়ান্দাবুর সন্ধি (১৮২৬ খ্রিঃ) অস্বীকার করলেন। ঐ দেশের শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুসারে পূর্বতন সন্ধি বা চুক্তি তিনি মানতে বাধ্য ছিলেন না। এর দ্বারা ব্রহ্মদেশের রীতি অবমাননা করা হলো না ঠিকই, কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলো। ব্রহ্মদেশের রাজ দরবার ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে যথোচিত সম্মান দিল না। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের পদ উঠিয়ে দেওয়া হলো। দ্বিতীয়ত এদেশের কাঁচামাল নিয়ে ইংরেজ বণিকগণ বিশেষ লাভবান হত। ইয়ান্দাবুর সন্ধির পর এই সুযোগ খুব বেশি বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ বণিকদের ইচ্ছা ছিল ব্রহ্মদেশ থেকে কাঁচামাল নিয়ে এটিকে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারে পরিণত করা। কিন্তু নতুন রাজা থ্যারাবদ্দির আগমনে ইংরেজ বণিকদল বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হতে থাকে। এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ইংরেজ বণিকগণ ভারতের গভর্নর জেনারেলের নিকট অভিযোগ পেশ করল। অবিলম্বে লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-৫৬ খ্রিঃ) সেনাপতি কমডোর ল্যামবার্ট ব্রহ্মরাজের নিকট বণিকদের উপর অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ ও রেঙ্গুনের শাসনকর্তার অপসারণ দাবি করলেন। এই দাবি প্রতিপালিত হলো। এবার রেঙ্গুনের নতুন শাসনকর্তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ইংরেজ প্রতিনিধি প্রেরিত হলেন। রেঙ্গুনের শাসনকর্তা তখন নিদ্রামগ্ন, তাই ইংরেজ প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি। এই তুচ্ছ কারণে অপমানিত নৌসেনাপতি কমডোর ল্যামবার্ট রেঙ্গুন বন্দর অবরোধ এবং ব্রহ্মদেশের একখানি জাহাজ আটক করলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ চলল। এরপর লর্ড ডালহৌসি ব্রহ্মরাজের নিকট একলক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে ঐ দাবি পূরণ না করায় ইংরেজরা ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ব্রিটিশ সৈন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে রেঙ্গুন, পেগু, প্রোম প্রভৃতি নিম্নব্রহ্মের অঞ্চলগুলি অধিকার করল। পরিণতিতে উত্তর ব্রহ্ম সামুদ্রিক অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। উত্তর ব্রহ্মের স্বাধীনতা তখনও বজায় ছিল।

তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮৮৫-৮৬ খ্রিঃ) : নিম্নব্রহ্মে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও উত্তরাংশ ছিল স্বাধীন। ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের শাসনকালে (১৮৮৪-৮৮ খ্রিঃ) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে পুনরায় ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ হয়। এটাই তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ নামে খ্যাত। ব্রহ্মদেশের তৎকালীন রাজা মিণ্ডনের মৃত্যুর পর (১৮৭৮ খ্রিঃ) তাঁর অপদার্থ পুত্র থিবো সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হন। ঠিক এই সময় বোম্বে-বার্মা ট্রেডিং কর্পোরেশন নামক ইংরেজ কোম্পানিকে এক বে-আইনি কর্মের অপরাধে ২৩ লক্ষ পাউণ্ড জরিমানা করা হয়। ফলে লর্ড ডাফরিন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করে ও রাজা থিবো বন্দী অবস্থায় আত্মসমর্পণ করেন। তখন তাকে সপরিবারে ভারতে নির্বাসনে পাঠানো হলো। এইভাবে সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম (Upper Burma) ব্রিটিশের অধিকারে আসে। তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হলো।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তনীতি ও আফগানিস্তান : মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের আক্রমণে (১৭৩৮-৩৯ খ্রিঃ) ভারত বিধ্বস্ত হয়। নাদির শাহের মৃত্যুর পর আহমদ শাহ আবদালি আফগানিস্তানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালির নিকট মারাঠারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় (১৭৬১ খ্রিঃ)। ইতোপূর্বে পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রিঃ) ইংরেজ পূর্বাঞ্চলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায়— এক কথায় বাংলাসুবায় প্রভাব বিস্তার করেছে। দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫ খ্রিঃ) সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের প্রভাব এই অঞ্চলে পূর্ণতা লাভ করল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, আফগান আক্রমণের সম্ভাবনার সংবাদ পেয়ে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা ক্লাইভের সঙ্গে আলিনগরের সন্ধি (১৭৫৬ খ্রিঃ) করেছিলেন। আবার আবদালির পৌত্র জামান শাহ (১৭৯৩-১৮০০ খ্রিঃ) কর্তৃক পুনরায় আফগান অভিযান শুরু হতে পারে— এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকায় গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ) সীমান্ত রাজ্য অযোধ্যায় সৈন্য সমাবেশ করেন এবং এক দূতের মাধ্যমে পারস্য সম্রাটকে আফগানিস্তান আক্রমণের জন্যে প্ররোচিত করেন। অবশ্য ওয়েলেসলির এই কৌশল ব্যর্থ হয়নি। পারস্য সম্রাট আফগানিস্তান আক্রমণ করায় আফগান বাহিনীকে ভারত সীমান্ত ছেড়ে দেশে ফিরতে হয়েছিল।

আফগানিস্তানের আমীর জামান শাহের রাজত্বের শেষদিকে এই রাষ্ট্রে আফগানদের মধ্যে গৃহবিবাদের সূচনা হয় (১৮০০ খ্রিঃ) এবং তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। এর পর থেকে পরবর্তী পঁচিশ বছর ধরে বারাকজাই উপজাতির নেতৃত্বে বার বার শাসক বদল চলতে থাকে। অবশেষে উক্ত উপজাতীয় নেতা দোস্ত আহমদকাবুল দখল করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন কর্মঠ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও শাসনকার্যে দক্ষ নরপতি। তাঁর আমলে পুনরায় ইংরজেদের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত হয়।

প্রথম আফগান যুদ্ধ-১৮৩৬ : ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পর্বতসঙ্কুল আফগানিস্তান ছিল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সমকালীন ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক পরিবেশের বিচারে আফগানিস্তানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের মধ্যে ছিল পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের স্বাধীন শিখরাজ্য। তবে সীমান্ত রক্ষার বিচারে শিখরাজ্যের অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। অতীতে ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইংরেজরা ফ্রান্সের নেপোলিয়ানের ভয়ে ভীত ছিল। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়ানের নির্বাসন দেওযার পর ইংরেজরা স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজদের মনে রুশ প্রভাব আতঙ্ক সৃষ্টি করল। এই সময় তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তানে রাশিয়ার প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী পামারস্টোন রুশ-প্রভাব বিস্তারের ভয়ে ভীত হয়ে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতকে রক্ষার জন্য চিন্তিত হলেন। এদিকে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬-৪২ খ্রিঃ) একইভাবে চিন্তিত ছিলেন। পামারস্টোন রুশভীতি থেকে ভারতকে রক্ষার জন্য লর্ড অকল্যাণ্ডকে যথাযথ নির্দেশ দিলেন। ঠিক এই সময় (১৮৩৭-৩৮ খ্রিঃ) রাশিয়ার সাহায্যপুষ্ট হয়ে পারস্য আফগানিস্তানের হিরাট আক্রমণ করায় ভারতের নিরাপত্তা বজায় রাখা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। লর্ড অকল্যাণ্ড অবিলম্বে পারস্যে ইংরেজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংরেজ দূত আলেকজাণ্ডার বার্নেসকে প্রেরণ করেন। বার্নেস ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কাবুল পৌঁছালেন। এই সময় কাবুলের শাসনকর্তা দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে তাঁর দাবি ছিল যে, ইংরেজের মিত্র রণজিৎ সিংহের অধিকৃত পেশোয়ার অঞ্চলটিকে আফগানিস্তানকে দিয়ে দেওয়ার জন্যে ইংরেজরাই যেন রণজিৎ সিংহকে বাধ্য করে। ইতোপূর্বে ইংরেজ ও রণজিৎ সিংহের মধ্যে যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত (অমৃতসর চুক্তি ১৮০৯ খ্রিঃ) হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে রণজিৎ সিংহের উপর পেশোয়ার পরিত্যাগ করার জন্য চাপ দেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং বার্নেসের দৌত্য কর্ম সফল হলো না। তিনি কাবুল পরিত্যাগ করে ফিরে এলেন (১৮৩৮ খ্রিঃ)। ঠিক এই সময় দোস্ত মহম্মদ রাশিয়ার দূতকে সাদরে আপ্যায়িত করলেন। এর ফলে অকল্যাণ্ডের রুশভীতি আরও প্রকট হলো। ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা চাইল যেকোন একটা অজুহাতে আফগানিস্তান আক্রমণ করা হোক্। তবে ইংল্যাণ্ডে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই চরম ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। এদিকে অকল্যাণ্ড যুদ্ধের জন্যে কৃতসঙ্কল্প। অবিলম্বে তিনি স্থির করলেন যে, কাবুলের সিংহাসনচ্যুত, বিতাড়িত ও ইংরেজ-আশ্রিত শাহসুজাকে ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করতে হবে। তবে এ বিষয়ে রণজিৎ সিংহের পরামর্শ ও সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তাই অকল্যাণ্ড তাঁর সেক্রেটারী ম্যাকনাটেনকে লাহোরে প্রেরণ করলেন। সেখানে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি, শাহসুজা ও রণজিৎ সিংহের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হলো। চুক্তি সম্পাদনের পরই ব্রিটিশ ও শিখ সৈন্যদল একে একে কাবুল, কান্দাহার,গজনী অধিকার করল। দোস্ত মহম্মদ প্রথমে পলায়ন করলেন। তখন কাবুলের সিংহাসনে শাহসুজাকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো (১৮৩৯ খ্রিঃ)। কিছুদিন পর দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করলে তাঁকে রাজবন্দী হিসেবে কলকাতাতে আনা হলো (১৮৪০ খ্রিঃ)। কিন্তু স্বাধীনতা প্রিয় আফগানগণ ব্রিটিশের তাবেদার শাহসুজার শাসন মোটেই পছন্দ করল না। তাছাড়া ইংরেজ ফৌজের আচার-আচরণ তাদের ক্ষুব্ধ করে তুলল। তাই এবার দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর নেতৃত্বে আফগানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা

করল। বিদ্রোহীরা ক্যাপ্টেন বার্নেস, তাঁর ভ্রাতা চার্লস এবং লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ব্রডফুটকে হত্যা করল। তখন বাধ্য হয়ে ম্যাকনাটেন ইংরেজের পক্ষে এক অপমানকর সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন (১১ ডিসেম্বর, ১৮৪১ খ্রিঃ)। এই চুক্তির শর্তে দোস্ত মহম্মদকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং আফগানিস্তান থেকে ব্রিটিশ ফৌজ সরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হলো। শাহসুজা সম্পর্কে বলা হলো যে, তাঁকে ভাতা নিয়ে আফগানিস্তানে থাকতে হবে অথবা ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে তাঁকে ভারতে ফিরে যেতে হবে। এই ঘটনার পর আফগানরা লক্ষ্য করল যে, ম্যাকনাটেন উপরোক্ত সন্ধির শর্ত অনুসারে কাজ করতে ইতস্তত করছেন। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে আফগানরা ম্যাকনাটেন, তার দুজন সহকর্মী লরেন্স এবং ম্যাকেঞ্জিকে হত্যা করল। বাদবাকি সর্বসমেত ১৬,৫০০ জন ইংরেজ সৈনিক ও কর্মচারী অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে ভারতে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করে। পথিমধ্যে শীতে ও পার্বত্য উপজাতিদের আক্রমণে এবং তাদের নৃশংসতায় অধিকাংশই প্রাণ হারাল। এর মধ্যে ১২০ জন আকবর খাঁর রক্ষণাধীনে বন্দী রইল। জালালাবাদে ফিরে এলেন শুধু ডঃ ব্রাইডন (Dr. Brydon) নামক জনৈক ইংরেজ। ভারতে প্রশাসন ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ইংরেজদের ভাগ্যে অতীতে এত বড় বিপর্যয় কখনই ঘটেনি।

এই শোচনীয় পরাজয়ের পর লর্ড অকল্যাণ্ডকে পদত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হলো। তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে এবার এলেন লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-৪৪ খ্রিঃ)। ইংরেজের হারানো গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করাই ছিল তাঁর প্রথম কর্তব্য। তাই তিনি সেনাপতি পোলক ও নট্‌কে সসৈন্যে জালালাবাদে অবরুদ্ধ ইংরেজদের উদ্ধার করার জন্যে প্রেরণ করলেন। ব্রিটিশ বাহিনী গজনী শহরে প্রবেশ করে সেখানে সবকিছু পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপ তৈরি করল; কাবুলে প্রবেশ করে তোপের মুখে বাজার উড়িয়ে দিল। ইতোমধ্যে কররাণী বংশীয় শাহসুজাকে আফগানরা হত্যা করল। দোস্ত মহম্মদ ইংরেজের তাবেদারীতে থাকবেন এই শর্তে মুক্তি পেয়ে কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের মূল্যায়ণ ঃ প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সূচনা থেকে ফলশ্রুতি পর্যন্ত বিচার বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, ইংরেজ পক্ষের গৌরব ও মর্যাদা বলতে আর কিছুই রইল না। যুদ্ধের কারণ প্রসঙ্গে বলা যায়, রুশ-ভীতি ছিল যুদ্ধের একমাত্র কারণ। কিন্তু এই রুশ-ভীতি ছিল ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ শক্তির নিকট অমূলক। স্বাধীন রাষ্ট্র আফগানিস্তানের পক্ষে দোস্ত মহম্মদ নিশ্চয়ই যে কোনও দেশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে পারেন। তবে এই মৈত্রী সংঘ যে পরিণামে ভারত আক্রমণ করতে পারে—এমন আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পারস্যের সীমা থেকে কোম্পানির অধিকারভুক্ত ভারতের সীমানার মধ্যে ছিল দুস্তর ভূখণ্ডের ব্যবধান। সুতরাং অকারণে অতিরিক্ত আতঙ্কের কোনও হেতু ছিলনা। আবার এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের

মন্ত্রিসভার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কোম্পানির নিয়ন্ত্রণসভার সায় ছিল না; কলকাতার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর তেমন ইচ্ছা ছিল না। তবুও শাহসুজাকে সামনে রেখে লর্ড অকল্যাণ্ড যুদ্ধের অজুহাত তৈরি করেছিলেন। সুতরাং অকল্যাণ্ডের পক্ষে সাফাই গাওয়ার মত কোনও সুনির্দিষ্ট যুক্তি এক্ষেত্রে ছিল না।

যুদ্ধের প্রথম স্তরে ইংরেজরা বিপুল সাফল্য অর্জন করল। দ্বিতীয় স্তরে ইংরেজদের মর্যাদাহানি ঘটল। তৃতীয় স্তরে জয় করে ইংরেজ ভাবল যে তার মর্যাদার পুনরুদ্ধার হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে পররাজ্য লোলুপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জনকল্যাণের নামে ভণ্ডামি করে যত কিছু বলুক না কেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজ যে কত হীন ও নৃশংস হতে পারে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ মিলে গেল। তাই ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথকে বলতে হলো ঃ "মন্ত্রিসভা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে প্রথম আফগান যুদ্ধের অপরাধকে গোপন করতে। এই জঘন্য ঘটনাকে যে ভাষায় নিন্দা করা উচিত ইংল্যাণ্ডের ঐতিহাসিকরা সর্বদা তা করেন নি।"

যুদ্ধের ফলশ্রুতি বিচার করলে বলা যায়, (ক) কররাণী বংশীয় শাহসুজা স্বাধীনতাপ্রেমী আফগানদের হাতে নিহত হলেন। বারাকজাই বংশীয় দোস্ত মহম্মদ ইংরেজের তাবেদারী স্বীকার করে কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। (খ) লোকক্ষয় ও অর্থক্ষয় করে ইংরেজ তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল বটে কিন্তু যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হলো ভারতবাসীকে। (গ) স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, সাহসী আফগানদের শায়েস্তা করতে গিয়ে ইংরেজদের মর্যাদা আরও মসীলিপ্ত হলো। অকল্যাণ্ড স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। পূর্বদিকে রাশিয়ার আগ্রাসী নীতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। পরবর্তীকালে এই আগ্রাসী নীতি ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে নিজ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হতে হয়েছিল।

ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক ঃ খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় জাগরণ দেখা দিয়েছিল। সেই সময় পাঞ্জাবের গুরু নানক (১৪৫৯-১৫৩৮ খ্রিঃ) শিখ ধর্ম প্রচার করেন। গুরু নানকের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিখগণ ধর্মীয় ঐক্যের সূত্রপাত করেন। গুরু অমর দাসের আমলে (১৫৫২-১৫৭৪ খ্রিঃ) সম্রাট আকবরের দেওয়া একখণ্ড ভূমির উপর গড়ে ওঠে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির। এরপর সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে গুরু অর্জনের মৃত্যুদণ্ড ও হর গোবিন্দের কারাবাস, সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে তেগ বাহাদুরের মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি ঘটনার ভিতর দিয়ে ধর্মীয় ঐক্যে আবদ্ধ শিখরা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। গুরু গোবিন্দ সকল শিষ্যকে হতে বললেন 'সিংহ' আর ধারণ করতে বললেন "কেশ, কঙ্গ (চিরুণী), কড়া, কচ্ছ এবং কৃপাণ"— এইপঞ্চ "ক" ব্যবহারে তারা প্রতিশ্রুত। তাঁর ধর্মীয়, প্রশাসনিক, সাংগঠনিক ও সামরিক নির্দেশে শিখ ভ্রাতৃসংঘের মনে এমন প্রেরণা সঞ্চারিত হলো যে শিখ

সম্প্রদায় যেন পতনোন্মুখ মোগলশক্তির সমকক্ষ একটি সামরিক জাতিতে উত্তীর্ণ হলো। গুরু গোবিন্দের পর শিখ জাতিকে নেতৃত্ব দিলেন বান্দা (১৭০৮-১৭১৬ খ্রিঃ)। তাঁর আমলে শিখদের কিছু রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিপত্তি বিস্তৃত হলো। তবুও তাঁর হত্যার পর (১৭১৬ খ্রিঃ) শিখদের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে; কিন্তু তাদের সামরিক শক্তি তখনও ধূলিসাৎ হয়নি। শিখগণ সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলশক্তি দ্রুতগতিতে অবক্ষয়ের পথে চলতে থাকে। দিল্লি থেকে দূরবর্তী প্রাদেশিক শাসনকর্তারা পরপর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পর নাদির শাহের ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন (১৭৩৯ খ্রিঃ) এবং আহমদ শাহ্ আবদালির ক্রমাগত ভারত অভিযান (১৭৪৮-৫২ খ্রিঃ) মোগল শক্তিকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে। এই সুযোগে শিখগণ তাদের নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তৎপর হলো। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর (১৭৬১ খ্রিঃ) আহমদ শাহ্ আবদালি যখন লাহোর পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (১৭৬২ খ্রিঃ) তখন শিখগণ লাহোর পুনরুদ্ধার করে ঝিলম থেকে শতদ্রু পর্যন্ত ভূখণ্ড অধিকার করতে সক্ষম হয়। এরপর শিখগণ আহমদ শাহ্ আবদালির দুর্বল পুত্র তৈমুর শাহের নিকট থেকে তাঁর ভারতীয় অংশ অধিকার করে। পরবর্তী ছ'বছরের মধ্যে (১৭৬৭-৭৩ খ্রিঃ) পূর্বে শাহরানপুর থেকে পশ্চিমে আটক এবং উত্তরে কাংড়া ও জম্মু থেকে দক্ষিণে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে শিখ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীন শিখ নেতাগণ এই সময় বারোটি মিসল বা দলে বিভক্ত ছিলেন। তারা নিজ নিজ এলোাকায় স্বাধীন হলেও শিখরাজ্য এই সময় আদি গ্রন্থের বিধান অনুসারে 'ধর্মীয় রাজ্যসমবায়' রূপে শাসিত হত। বহুকাল শিখ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলকে একতাবদ্ধ করে একটি মাত্র রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করার মত নেতার আবির্ভাব হয়নি। অবশেষে আবির্ভূত হলেন পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ। শিখ নেতা রণজিৎ সিংহ রাজ্য সমবায় ভেঙে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে শিখদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন।

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯ খ্রিঃ) ঃ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ২রা নভেম্বর রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মানসিংহ ছিলেন সুকর চাকিয়া মিসলের বা দলের নায়ক এবং মাতা ছিলেন ঝিন্দ পরিবারের কন্যা। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পিতার মৃত্যুর পর মাত্র বারো বছর বয়সে মিসলের সর্দার নিযুক্ত হন। তাঁর মুখে ছিল বসন্তের দাগ। বসন্ত রোগের জন্য তাঁর বাম চক্ষুটি অকেজো ছিল। বাল্যে তিনি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না পেলেও কিশোর বয়সেই তার মনে উচ্চাশা জেগেছিল। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সামরিক প্রতিভা

ছিল অসাধারণ। তিনি কাবুলের অধিপতি জামান শাহের ভারত অভিযানে (১৭৯০-৯৮ খ্রিঃ) সাহায্য করে পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ও 'রাজা' উপাধি লাভ করেন (১৭৯৮ খ্রিঃ)। এর কিছুকাল পরে রণজিৎ সিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করে লাহোরে আফগান আধিপত্য অস্বীকার করেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি শিখদের তীর্থস্থান অমৃতসর অধিকার করে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হন। এর ফলে তাঁর পক্ষে শিখদের অন্যান্য দলকে বশীভূত করার বিশেষ কোনও অসুবিধা রইল না। সমকালীন ইংরেজদের আগ্রাসী নীতি এবং তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সম্পর্কে রণজিৎ সিংহের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে কোনওরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাই ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে যশোবন্ত রাও হোলকার যখন দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়ে রণজিৎ সিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করেন তখন রাজনৈতিক দূরদর্শী রণজিৎ সিংহ তাকে আশ্রয় দেন নি। বরং ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোর সন্ধিতে হোলকার পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কৃত হলে রণজিৎ সিংহ স্বীয় রাজ্য বিস্তারে ও শিখদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে উঠলেন।

অতঃপর রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর তীরবর্তী শিখ রাজ্যগুলি একে একে জয় করতে আরম্ভ করলেন। ১৮০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি লুধিয়ানা অধিকার করলেন। যারা রণজিৎ সিংহের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন তারা এই সময় দিল্লির ইংরেজ রেসিডেন্ট মিঃ সেটন-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এই সংবাদ গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর (১৮০৭-১৩ খ্রিঃ) নিকট পৌঁছালে তিনি যুদ্ধের পরিবর্তে রণজিৎ সিংহের সঙ্গে অমৃতসর সন্ধির (১৮০৯ খ্রিঃ) মাধ্যমে মিত্রতা স্থাপন করলেন। সন্ধির শর্তে ঠিক হলো যে (১) পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের দরবারে মেটকাফ নামে এক দূতকে প্রেরণ করা হবে। (২) রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে তাঁর রাজ্য বিস্তার করতে পারবেন না। বস্তুত বাস্তববাদী রণজিৎ সিংহ আমরণ এই শর্ত পালন করেছিলেন।

লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে অমৃতসর সন্ধির পর পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে রাজ্য বিস্তারে অসমর্থ হয়ে রণজিৎ সিংহ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হলেন। তিনি ১৮০৯-১৮১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গোর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাংড়া দুর্গ অধিকার করেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে আফগানদের পরাজিত করে তিনি আটক দুর্গ অধিকার করেন। একাধিকবার চেষ্টার পর ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে রণজিৎ সিংহ মুলতান ও পরের বছর কাশ্মীর এবং ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়ার অধিকার করে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। আফগানরা বারবার চেষ্টা করেও পেশোয়ার পুনরাধিকার করতে পারেনি। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে খাইবার গিরিপথের কাছে বিখ্যাত জামরুদ কেল্লাটি তিনিই নির্মাণ করেন। সিংহ বিক্রমে রাজত্ব করে রণজিৎ সিংহ ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ২০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় শিখরাজ্য সমগ্র পাঞ্জাব, পেশোয়ার, কাংড়া ও কাশ্মীর জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

রণজিৎ সিংহের চরিত্র ও কৃতিত্ব : পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ যেন নেতৃত্ব সুলভ গুণাবলি সঙ্গে নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমত দক্ষ প্রশাসক হিসেবে তিনি বিজিত রাজ্যখণ্ড থেকে শিখ সর্দারদের উচ্ছেদ করেন নি। তাঁরা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে বড়ো বড়ো জমিদার ও জায়গিরদারে পরিণত হয়েছিলেন মাত্র। মোগল আমলে যে রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল রণজিৎ সিংহ সেই ব্যবস্থাকেই বহাল রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যে তিনি ইয়োরোপীয় সমরবিদদের নিয়োগ করে আধুনিক ধাঁচের বাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর নবগঠিত বাহিনীতে শিখ ছাড়াও গোর্খা, পাঠান, ডোগরা, বিহারী, পাঞ্জাবী, মুসলমান ইত্যাদি সকল স্তরের সুদক্ষ সৈনিকদের নেওয়া হত। লাহোরে তিনি আধুনিক ধাঁচের কামান তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। এটির পরিচালনায় ছিলেন মুসলমান গোলন্দাজরা। তৃতীয়ত রাজকর্মচারী ও মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর বিচক্ষণতা ও নির্বাচনী দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তাঁর মন্ত্রী ও সেনানায়কদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু অথবা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এই প্রসঙ্গে তাঁর অমাত্য ফকির আজিজউদ্দীন, অর্থমন্ত্রী দেওয়ান দীননাথের নাম উল্লেখযোগ্য। চতুর্থত ধর্ম ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান একজন শিখ, অথচ অন্য ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান ও উদার। কর্মচারী নিয়োগে, রাজকার্য পরিচালনায় সামরিক তৎপরতায় ধর্ম কখনই কোনও বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। দরবারে কোনও ফকির বা ধর্ম গুরুর উপস্থিতিতে তিনি সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন। অবশেষে বলা যায়, সমকালীন রীতি অনুসারে নিজের হাতে সকল দিকের সমুদয় ক্ষমতা রেখেও তিনি স্বেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন না। শিখদের খালসায় প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। দেশ-কালের ধারায় রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচারে রণজিৎ সিংহ 'পাঞ্জাব কেশরী' নামে আখ্যায়িত। তাঁর নেতৃত্বে শিখ রাষ্ট্রশক্তি সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছিল। সামান্য একটি শিখ মিসলের নেতা হয়েও তিনি সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য শিখ জাতিকে সংঘবদ্ধ করে পাঞ্জাব থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই ভিক্‌তর জাক্‌মঁ নামে একজন ফরাসি পর্যটক ও লেখকের মতে তিনি ছিলেন "অনন্য সাধারণ ব্যক্তি— নেপোলিয়ানের একটি সংস্করণ"। ইংরেজের অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসী নীতি ও তার প্রশাসনিক ও সামরিক কার্যকারিতা সম্পর্কে রণজিৎ সিংহের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। তাই তিনি মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "সব লাল হো জায়গা" (অর্থাৎ সারা ভারত ইংরেজের দখলে যাবে)। তাই তিনি অমৃতসরের সন্ধির শর্ত কখনই লঙ্ঘন করেন নি। অন্যদিকে তিনি শিখ জাতিকে স্বদেশ প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করে একটি ঐক্যবদ্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত করেছিলেন। লেখাপড়া তিনি জানতেন না সত্য, কিন্তু বাদশাহ আকবরের মত সবকিছু জানবার ইচ্ছা ছিল তাঁর

প্রবল। এই প্রসঙ্গে ফরাসি জাক্‌মঁ বলেন, "ভারতবর্ষ, ইংরেজ, ইয়োরোপ, নেপোলিয়ান, পুনর্জন্ম, স্বর্গ, মর্ত্য, নরক, আত্মা, ঈশ্বর, শয়তান এবং আরও লক্ষ্য বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করতেন।" ইংরেজ প্রতিনিধি চার্লস মেট্‌কাফও একথা স্বীকার করেছেন। যুদ্ধ প্রসঙ্গে তাঁর সাহস, দক্ষতা, সাংগঠনিক প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি যেমন ছিল তেমনি প্রশাসনিক ব্যাপারে তাঁর শ্রমক্ষমতা, ব্যুৎপত্তি ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রখর ও তীক্ষ্ণ। সমসাময়িক ইংরেজ লেখক ও প্রশাসকরাও রণজিৎ সিংহকে প্রশংসা না করে পারেন নি। মেধায়, বীরত্বে, সামরিক ও প্রশাসনিক প্রতিভায়, অক্লান্ত কর্মদক্ষতায়, বাঞ্ছনীয় আচার-আচরণে তিনি সত্যই ছিলেন ভারতের অন্যতম বীর সন্তান।

বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে লক্ষ্য করা যায়, রণজিৎ সিংহের সাফল্য ছিল তাঁর জীবনকালের সীমায় সীমিত। তাঁর অবর্তমানে অল্পদিনের মধ্যে শিখরাষ্ট্র ব্রিটিশের অধিকারে চলে গেল। এই ঘটনার পশ্চাতে রণজিৎ সিংহের দায়িত্ব নিশ্চয়ই কিছু কম ছিল না। যেমন— (ক) স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি শিখরাষ্ট্রে যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনা করেন তার প্রভাব থেকে সামরিক বিভাগ মুক্ত ছিল না। খালসা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনও ব্যবস্থা তিনি করেন নি। ফলে তাঁর অবর্তমানে খালসা বাহিনী নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে এবং এই অবস্থা শিখশক্তির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (খ) লক্ষ্য করা যায়, অমৃতসর সন্ধির মাধ্যমে তিনি বাস্তববাদিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এটাও সত্য। কারণ ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম এড়ানোর এটাই ছিল পন্থা। তবে এই সঙ্গে সাম্রাজ্যটিকে সুরক্ষার ব্যবস্থা তিনি করে যান নি। আফগান অভিযান প্রতিরোধের জন্যে তিনি অনেকগুলি কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন না থাকায় শতদ্রু নদীতীরকে সুরক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করেন নি। তাঁর অবর্তমানে তাই দুর্ঘটনা ঘটতে বিলম্ব হয়নি। (গ) অমৃতসরের চুক্তি দ্বারা ইংরেজের যতটুকু লাভ হলো সে তুলনায় শিখ শক্তিকে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও স্থায়ী লাভ হয়নি। ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মতে ইঙ্গ-শিখ চুক্তির ফলে ইংরেজ শক্তি সহিসের ভূমিকায় গেল কিন্তু রণজিৎ সিংহকে হতে হলো ঘোড়া। সহিসের নির্দেশ ভিন্ন ঘোড়াকে এগিয়ে চলার কোনও উপায় রইল না। অবশেষে বলা যায়, যে যুগে বিদেশী ইংরেজ ভারতের বুকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি সকল দিক থেকে এগিয়ে চলেছিল সেই একই সময় রণজিৎ সিংহ শিখশক্তির উত্থান ঘটিয়েও অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে শিখ শক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি।

রণজিৎ সিংহের পর ঃ শিখনেতা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর (১৮৩৯ খ্রিঃ) পর শিখরাজ্যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। রণজিৎ সিংহের পুত্রদের মধ্যে কেউ তাঁর মত প্রতিভাবান ছিলেন না। তাই পিতার মৃত্যুর পর যথাক্রমে খড়্গ সিংহ ও নাহাল

সিংহের রাজত্বকাল ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী (১৮৩৯-৪০ খ্রিঃ)। দুর্ঘটনায় নাহাল সিংহের মৃত্যুর পর (১৮৪০ খ্রিঃ) রণজিৎ সিংহের অন্য এক পুত্র শের সিংহ সিংহাসন দখল করেন। তবে তাঁর আমলেও (১৮৪০-৪৩ খ্রিঃ) রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না। তিনিও অবিলম্বে আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন (১৮৪৩ খ্রিঃ)। উপযুক্ত নেতার অভাবে রণজিৎ সিংহের খালসা বাহিনী উচ্ছৃঙ্খল ও ক্ষমতালোভী হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় রণজিৎ সিংহের পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুপুত্র সলিপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করে (১৮৪৩ খ্রিঃ) রাণীমাতা ঝিন্দন, মন্ত্রী মানসিংহ এবং তেজসিংহ শাসন পরিচালনা করতে শুরু করেন।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬ খ্রিঃ) ঃ শিখ দরবারে যখন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ইংরেজরা আফগান যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। ইংরেজ বাহিনী আফগানদের নিকট বারে বারে নাজেহাল হতে থাকে। অথচ এই আফগানদের সঙ্গে একাধিক যুদ্ধে খালসা বাহিনী জয়লাভ করেছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খালসা বাহিনী ভাবল যে ইংরেজদের যুদ্ধে পরাজিত করা সহজ হবে। আবার, সীমান্তের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের পক্ষে পাঞ্জাব জয় করার প্রয়োজন ছিল। তাই গভর্নর জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড (১৮৩৭-৪২ খ্রিঃ) বলতেন, "পাঞ্জাব জয়ের জন্য কোম্পানির সেনা ও কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।" লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-৪৪ খ্রিঃ) সীমান্তের নিরাপত্তার জন্যে শিখরাষ্ট্র জয় করা একান্ত প্রয়োজন বলে মন্তব্য করতেন। তাছাড়া এদিকে এই সময় খালসা সৈনিকের ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলা এত বৃদ্ধি পেল যে বাধ্য হয়ে রাণীমাতা ঝিন্দন তাদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তিনি ভাবলেন, সৈনিকরা পরাজিত হলে জব্দ হবে ও তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হ্রাস পাবে— অন্যদিকে বিজয়ী হলে শিখ রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হবে। তাই রাণীমাতার আদেশে খালসা দল শতদ্রু পার হয়ে ব্রিটিশের অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করল (১৮৪৫ খ্রিঃ)। তখন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জও সেনাপতি স্যার হিউ গফকে নিয়ে অবিলম্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ফিরোজপুর, আম্বালা ও লুধিয়ানার দিক থেকে ইংরেজ বাহিনী অনেক আগে থেকে প্রস্তুত ছিল। খালসা বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের তুমুল লড়াই হলো লুধিয়ানা, ফিরোজশ, মুদ্‌কি, আলিওয়াল এবং সোব্রাঁও নামক স্থানে (ডিসেম্বর, ১৮৪৫— ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬ খ্রিঃ)। এর মধ্যে একমাত্র লুধিয়ানার যুদ্ধে শিখদের জয় হয়েছে বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে শিখদের পরাজয় হলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খালসাদের পরাজয়ের কারণ ছিল লাল সিংহ, তেজ সিংহ প্রমুখ শিখ নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা। খালসাদের জব্দ করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। অবশেষে লাহোরের সন্ধিতে (১৮৪৬ খ্রিঃ) প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

গর্বিত ইংরেজ লাহোরে উপস্থিত হয়ে খুশিমত সন্ধির শর্ত নির্ধারণ করল। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে (১) শিখদের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরেজ কোম্পানিকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে হলো। (২) জম্মু, কাশ্মীর এবং বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে হলো। (৩) শিখ দরবারে শিখ সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো। (৪) শিখ দরবারে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা গৃহীত হলো। হেনরি লরেঞ্জ হলেন পাঞ্জাবের ব্রিটিশ অধিকৃত অংশের শাসনকর্তা। এই সন্ধির ফল হলো সুদূর প্রসারী। শিখশক্তির অবক্ষয় ক্রমশ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় বলেছিলেন, "আগামী সাত বছরে ভারতে একবারও কামান দাগতে হবে না।" এই ভবিষ্যৎ বাণী সঠিক না হলেও শিখ শক্তির পতন অবশ্যম্ভাবী হলো।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খ্রিঃ) ঃ প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের অবসানে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে সম্পাদিত লাহোরের সন্ধি (১৮৪৬ খ্রিঃ) বেশি দিন স্থায়ী হলো না। ইংরেজ প্রভাবাধীন সলিপ সিংহ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। খালসা বাহিনী পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। স্বাধীনচেতা শিখ দলপতিগণ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইংরেজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হলেন। ইংরেজ সরকারের কাছে এ-সংবাদ সহজেই পৌঁছে গেল। তখন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাণী ঝিন্দনকে লাহোর থেকে চুনার দুর্গে নির্বাসিত করা হলো। এই ঘটনায় শিখদের আত্মসম্মানে দারুন আঘাত লাগল ও সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। অন্যদিকে মুলতানের (পাঞ্জাবের অধীন) শাসনকর্তা মূলরাজ স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। ইংরেজ রেসিডেন্ট হেনরী লরেন্স মূলরাজের নিকট পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দাবি করায় তিনিও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন দু'জন ইংরেজ কর্মচারীসহ মান সিংহ মুলতান দুর্গের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মূলরাজ ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করলেন ও শিখ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হলেন। ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ আরও জোরদার হলো। ঠিক এই সময় পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের আশায় আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদ শিখদের পক্ষে যোগদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সূচনা হলো (এপ্রিল, ১৮৪৮ খ্রিঃ)।

দারুন গ্রীষ্মের দিনে অসুবিধার কথা চিন্তা করে ইংরেজ সেনাপতি হিউ গফ্ যুদ্ধ পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা সম্ভব হলোনা। যুদ্ধে ইংরেজদের তিনটি বাহিনী যথাক্রমে বোম্বাই, সিন্ধু ও কলকাতা এই তিন দিক থেকে এসে উপস্থিত হলো। বহু গোলাবারুদ ব্যয় করে তুমুল যুদ্ধের পর মুলতান শহর সহ দুর্গটি প্রথমে ইংরেজের দখলে এলো (জানুয়ারী, ১৮৪৯)। অন্যদিকে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হাতে ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বিজয়ী মিত্র বাহিনীর উল্লাসও কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কারণ ইংরেজরা কিছুদিনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে

এবং গুজরাটের যুদ্ধে শিখদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করে রাওয়ালপিণ্ডিতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। বিজয়গর্বে ডালহৌসি কোম্পানি কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকৃত বলে ঘোষণা করলেন (১৮৪৯ খ্রিঃ)। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে জয়লাভ করে ডালহৌসি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা আফগান সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করলেন।

পাঞ্জাব বিজয়ের পর লর্ড ডালহৌসি দিলীপ সিংহকে প্রথমে সিংহাসনচ্যুত করলেন। পরে তাঁকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে রাণীমাতা ঝিন্দনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। রাণীমাতা ইংল্যাণ্ডেই মারা যান। সলিপ সিংহ পরে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে বহুকাল ইংল্যাণ্ডে বসবাসের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে এসেই সলিপ সিংহ পুনরায় শিখধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু পূর্ব ক্ষমতা আর ফিরে পান নি। এদিকে পাঞ্জাব বিজয়ের পর ইংরেজ সরকার এখানে জন্ লরেন্স, হার্বার্ট লরেন্স, রিচার্ড টেম্পল, নিকল্সন প্রমুখ অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ প্রশাসকদের নিয়োগ করলেন। পাঞ্জাব যেহেতু আফগান সীমান্তে অবস্থিত তাই সীমান্তের নিরাপত্তার জন্যে এখানে অনেকগুলি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করা হলো। আবার জনকল্যাণকর কার্যসূচী নিয়ে ইংরেজ সরকার এখানকার কৃষির উন্নয়ন, পথ ঘাট নির্মাণ, খাল-খনন ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। যে-কোনও মূল্যে এখানকার সাধারণ অধিবাসীদের খুশি করাই ছিল ইংরেজ সরকারের লক্ষ্য। লক্ষ্য করা যায়, জনকল্যাণকর কার্যসূচীর জন্যে পাঞ্জাবীরা বিদেশী শাসকদের উপর খুশিই হলো এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থান ও অন্যান্য অনেক ঘটনায় শিখরা ইংরেজদের সাহায্য করল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডার পুরুকে পরাজিত করেন কিন্তু বিদেশী শাসকের ব্যবহারে খুশি হয়ে তিনি সেই বিদেশী বীরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। আর উনিশ শতকে ইংরেজের হাতে পরাজিত হয়েও পাঞ্জাবীরা ঠিক একইভাবে বিদেশীর সুশাসনে খুশি হয়ে তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। পাঞ্জাবীদের আনুগত্য নিঃসন্দেহে ইংরেজ রাজত্বের সীমান্ত-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ছিল।

সিন্ধু বিজয় ঃ উনিশ শতকের প্রথম দিকে খয়রাপুর, মীরপুর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকরা আফগানদের আধিপত্য স্বীকার করতেন। এই শাসকরাই আমীর বলে পরিচিত ছিলেন। সীমান্তের নিরাপত্তার জন্যে লর্ড বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খ্রিঃ) পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ এবং সিন্ধুদেশের আমীরদের সঙ্গে মিত্রতার নীতি অবলম্বন করেন। তাছাড়া বেণ্টিঙ্ক আলেকজাণ্ডার বার্নেসকে প্রেরণ করে সিন্ধুনদে ও স্থল পথে বাণিজ্য করার অধিকার আদায় করেন এবং সেই সঙ্গে বার্নেস প্রতিশ্রুতি দেন যে, ঐ এলোকায় কোনও সামরিক সাজসরঞ্জাম পাঠানো হবে না। এরপর আফগান যুদ্ধের প্রাক্কালে লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৭-৪২ খ্রিঃ) সিন্ধুদেশের উপর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করেন। কারণ ইংরেজদের মনে হয়েছিল যে, ইরান অথবা আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে

রুশেরা ভারত আক্রমণ করতে পারে। ইতোপূর্বেই ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হওয়ায় এই আশঙ্কার কারণ ঘটেছিল। লর্ড অকল্যাণ্ড হায়দ্রাবাদে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখার ব্যাপারে আমীরদের রাজি করান (১৮৩৮ খ্রিঃ)। কিন্তু আফগান যুদ্ধের সময় পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ইংরেজরা সিন্ধুদেশের উপর দিয়ে সৈন্য প্রেরণ করে ও আমীরদের নিকট থেকে জবরদস্তি টাকা আদায় করে। এরপর লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-৪৫ খ্রিঃ) আফগান যুদ্ধে এবং সীমান্তের নিরাপত্তার জন্যে সিন্ধু নদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সিন্ধুদেশ জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সিন্ধুর আমীরদের মধ্যে বিবাদ বাধাবার জন্যে অথবা যে-কোনও উপায়ে সিন্ধুদেশ জয়ের জন্যে চার্লস নেপিয়ার নামক এক নীচাশয় সেনাপতিকে প্রেরণ করা হলো। নেপিয়ার আমীরদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করলেন। তাদের মুদ্রা প্রচলনের অধিকার হরণ করলেন এবং ইমামগড় দুর্গটি ধ্বংস করে বেলুচদের উত্যক্ত করলেন। নিরুপায় হয়ে সিন্ধুবাসীরা ইংরেজ প্রতিনিধির আবাসস্থল আক্রমণ করল। এইবার নেপিয়ার প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মিয়ানী ও দারো-এর যুদ্ধে সেনাপতি নেপিয়ার আমীরদের পরাজিত করলেন (১৮৪৩)। বন্দী আমীরদের একে একে নির্বাসিত করা হলো। নির্দোষ আমীরগণ সাম্রাজ্যবাদী নীতির শিকার হলেন। সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হলো। আমীরদের প্রাধান্যকে উপেক্ষা করা, পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরা, চাতুরীর দ্বারা আমীরদের উপর দোষ চাপানো ইত্যাদি নিঃসন্দেহে ইংরেজ জাতির কলঙ্ক।

লর্ড ডালহৌসি, স্বত্ববিলোপ নীতি ও সাম্রাজ্যবাদ ঃ চরম সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল রূপে ভারতে আগমন করেন। তিনি তাঁর শাসনকালের (১৮৪৮-৫৬ খ্রিঃ) মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ভারতে আসার পূর্বে তিনি কিছুকাল ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তাই যথেষ্ট মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, "ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ সুনিশ্চিত, তবে সেটা কিছুটা সময় সাপেক্ষ মাত্র।" সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চরম সম্প্রসারণ ঘটানোই হয়ে দাঁড়াল তাঁর সামরিক লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, মঙ্গল-অমঙ্গল বিচারের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল তাঁর কাছে নিতান্ত গৌণ বিষয়। অবশ্য জনহিতকর কর্ম হিসেবে তাঁর কর্মসূচির যে অংশটুকু (রেল, তার, ডাক, রাস্তাঘাট) গণ্য হলো তারও পশ্চাতে ছিল চরম সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। মনে রাখা দরকার, ইতোমধ্যে ইংল্যাণ্ডে ঘটে গেছে শিল্প-বিপ্লব। এই শিল্পকে সম্প্রসারিত করার জন্য দরকার ছিল কাঁচামাল, শিল্প-সামগ্রীর বাজার আর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। আবার এই সাম্রাজ্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন ছিল দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান, সৈন্য ও সামরিক সাজসরঞ্জামের দ্রুত সরবরাহ এবং বাণিজ্যিক সামগ্রী আদান-প্রদান। রেল, ডাক, তার আর সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থাই এসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। এগুলি ছিল 'ধ্বংসের মাধ্যমে সৃষ্টি'। তাই এসব

জনহিতকর কর্ম হয়েও তিনি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের রক্ষক। দ্বিতীয়ত লর্ড ডালহৌসি মনে করতেন দেশীয় রাজন্যবর্গের শাসনব্যবস্থার চেয়ে ব্রিটিশ ভারতের শাসক অনেক উন্নত। দেশীয় রাজ্যগুলিতে চলছে প্রজা-পীড়ন, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ— এক কথায় অরাজকতা। সুতরাং অবিলম্বে এই রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত ইংল্যাণ্ড এখন শিল্প-বিপ্লবের দেশ। সেখানে সস্তায় উৎপন্ন হচ্ছে নতুন নতুন সামগ্রী— যা আধুনিক যুগের উপযোগী। তাই ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি করতে হলে দেশীয় রাজ্যগুলি জয় করে সেখানে আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। ব্রিটিশ পণ্য সরবরাহ এবং এদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ডাক, তার, রাস্তাঘাটের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ-ভারতের যোগাযোগ সুদৃঢ় করা আবশ্যক। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি অতীতে এ-ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করেছে। এবার সেই দেশীয় আশ্রিত বা মিত্র রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশের অধিকার ভুক্ত করা প্রয়োজন। তাই তিনি লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, ওয়েলেসলি, লর্ড হেস্টিংস-এর তুলনায় ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য চরম সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করলেন। ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতিকে মোটামুটি তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা— (ক) যুদ্ধ নীতি, (খ) স্বত্ববিলোপ নীতি ও (গ) ছলনার নীতি।

(ক) যুদ্ধ নীতি *(War Policy)* ঃ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে লর্ড ডালহৌসি যুদ্ধকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খ্রিঃ) এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৫২ খ্রিঃ) ছিল ডালহৌসির সময়কালের বড় আকারের যুদ্ধ। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পরেই তাঁকে হিমালয়ের পাদদেশের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হলো। হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল ও ভুটানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল সিকিম রাজ্য। সেখানে বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু দুজন ইংরেজ কোনও ক্রমে সেখানে হাজির হলে তাদের বন্দী করা হয়। এই ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে লর্ড ডালহৌসি সিকিমের একাংশ দখল করেন (১৮৫০ খ্রিঃ)।

(খ) স্বত্ববিলোপ নীতি *(Doctrine of Lapse)* ঃ লর্ড ডালহৌসি সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বিতীয় নীতিটির নাম স্বত্ববিলোপ নীতি। এই নীতির প্রধান তাৎপর্য হলো, (i) ইংরেজের আশ্রিত বা অনুগৃহীত কোনও দেশীয় নরপতি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হবে। (ii) ইংরেজের অনুমতি ভিন্ন কোনও আশ্রিত অপুত্রক নরপতি দত্তকপুত্র গ্রহণ করতে পারবেন না। অবশ্য স্বত্ববিলোপ নীতির উদ্ভাবক হিসেবে ডালহৌসিকে চিহ্নিত করা হলেও অনুরূপ চিন্তাধারার উদ্ভব অনেক আগেই ঘটেছিল। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির ডাইরেক্টর বোর্ড থেকে জানানো হয় যে, দেশীয় নরপতিদের যেন দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি না দেওয়া হয়। আবার ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে অন্য এক হুকুমনামায় জানানো হয় যে, যদি অন্যায় না হয় তাহলে যেকোন সম্পত্তি

যেন কোম্পানি সরকার অধিকার করেন। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীর সাম্রাজ্য বিস্তারই যখন একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হলো তখন কালবিলম্ব না করে অতীতের নির্দেশগুলিকে সংকলন করে সরকারি নীতি হিসেবে গৃহীত হলো। অপুত্রক নরপতিরা দত্তকপুত্র গ্রহণ করবেন এটাই ছিল ভারতীয় নীতি। আশ্রিত নরপতিরা ইংরেজের অনুমতি নিয়েই দত্তকপুত্র গ্রহণ করতেন। কিন্তু ডালহৌসি সকল নীতি বাতিল করে দিয়ে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করলেন।

নীতি ঘোষণার পরই লর্ড ডালহৌসি তার প্রয়োগের জন্য তৎপর হলেন। (১) মারাঠাদের খুশি রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজরাই সাতারা রাজ্যটি স্থাপন করে সেখানে শিবাজীর এক বংশধরকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে (১৮১৮ খ্রিঃ)। অপুত্রক অবস্থায় রাজা দত্তকপুত্র গ্রহণ করেছিলেন। ডালহৌসি দত্তক গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করে সাতারাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন। (২) ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার সম্বলপুরের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ডালহৌসি রাজ্যটিকে ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করলেন। (৩) একই অজুহাতে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে নাগপুর অধিকৃত হলো। তবে এখানকার ভোঁসলে বংশীয় রাজারা ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট ছিল না। (৪) ঐ একই বছর (১৮৫৩ খ্রিঃ) ঝাঁসীর রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ঝাঁসীও ইংরেজ প্রভুত্বে অধিকারভুক্ত হলো। ঠিক একই অজুহাতে (৫) শতদ্রুর পাশে ভগৎরাজ্য, (৬) মধ্য প্রদেশের উদয়পুর এবং (৭) রাজস্থানের করৌলি রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত হলো।

আবার স্বত্ববিলোপ নীতির নামে জবরদস্ত রাজ্য দখলের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। লর্ড ডালহৌসি দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র ধন্ধুপন্তের (পরবর্তীকালে নানা সাহেব নামে পরিচিত) ভাতা বন্ধ করে দিলেন। কারণ তিনিও ছিলেন দত্তকপুত্র। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে কর্ণাটক ও তাঞ্জোরের রাজাদের রাজ্যচ্যুত করে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লর্ড ডালহৌসি নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে উক্ত দুই নরপতির ভাতা বন্ধ করেও খুশি হতে পারেন নি, তিনি তাঁদের "রাজা" উপাধিও বাতিল করে দিলেন।

(গ) ছলনার নীতি *(Pretence Policy)* ঃ লর্ড ডালহৌসি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তৃতীয় যে পন্থা অবলম্বন করেন তাকে বলা যেতে পারে ছলনার নীতি। যেমন, অযোধ্যা অধিকারের ক্ষেত্রে ছিল কুশাসনের অজুহাত। লর্ড ওয়েলেসলির সময় অযোধ্যা অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির আওতায় ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে (১৮০১ খ্রিঃ। এই রাজ্যটি অধিকার করার ইচ্ছা লর্ড ডালহৌসির ছিল না। তবে তিনি এই রাজ্যের কুশাসন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এটাও জানতেন যে, এই রাজ্যের কুশাসনের জন্যে ইংরেজ সরকারও অংশত দায়ী। তবুও কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এটিকে অধিকার করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কারণ এখানকার তুলো ছিল ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র শিল্পের প্রসারের

পরমসহায়ক। তাই এখানকার কুশাসনের অজুহাতটিকে সামনে রেখে ডালহৌসি অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলিকে সিংহাসচ্যুত করে রাজ্যটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন এবং নবাব ও তাঁর পরিবারবর্গকে কলকাতার নিকট মেটিয়াবুরুজে বসবাসের ব্যবস্থা করা হলো। তাঁর ভাতা ধার্য হলো বার্ষিক বার লক্ষ টাকা (১৮৫৬ খ্রিঃ)। তাছাড়া লক্ষ্য করা যায়, নেপাল ভুটানের মধ্যবর্তী সিকিম রাজ্যের রাজা দু-জন ইংরেজকে বন্দি করেছিলেন— এই অজুহাতে ডালহৌসি যুদ্ধের মাধ্যমে সিকিমের একাংশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে যুদ্ধনীতি গৃহীত হয়েছিল। আবার, হায়দরাবাদের নিজাম প্রথম থেকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির দ্বারা ইংরেজদের অনুগত ছিলেন। তবুও কুশাসনের অজুহাতে নিজামের নিকট থেকে বেবার (বিদর্ভ) প্রদেশ কেড়ে নেওয়া হলো। এটিও ছিল তুলো সরবরাহের একটি অন্যতম কেন্দ্র। এইভাবে লর্ড ডালহৌসি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কোম্পানি সরকারের শেষ গভর্নর জেনারেল হয়েও সাম্রাজ্য-বাদী শাসক হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে সম্ভবত প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

অধ্যায় ৮

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ঃ প্রথম পর্ব (১৭৬৫-১৮৫৭ খ্রিঃ)

***Syllabus** : The Colonial Economy, The First Phase.*

১। অর্থনীতির রূপান্তর ঃ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

চিরাচরিত কৃষি অর্থনীতির রূপান্তর ঃ ভারতীয় অর্থনীতির উপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট, গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। ভারতীয়দের সমাজ জীবন, উৎপাদন পদ্ধতি, সামাজিক সম্পর্ক সহ অর্থনৈতিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ শাসনের আগে পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি এবং তা আঠারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইংরেজ শাসকদের নীতি ভারতের এই চিরাচরিত অর্থনীতির কাঠামো ধ্বংস করে দেয়। ভারতীয় অর্থনৈতিক চিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হওয়ার মূল কারণ ছিল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রবর্তন।

এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ভারতের জন্য নয়, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের স্বার্থ লক্ষ্য রেখেই তা গড়ে তোলা হয়েছিল। এই অর্থনীতির প্রকৃতি ও গঠন ছিল ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয় ভারতবর্ষকে সাধের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তোলার পিছনে ছিল এক লুণ্ঠনের মনোবৃত্তি। পরবর্তীকালে তা অব্যাহত থাকে। একদা জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা একে বলেছেন 'সম্পদের বহির্গমন'। সম্প্রতি আধুনিক মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকগণও আর্থিক নিষ্ক্রমনের কথাটির সারবত্তা প্রমাণ করেছেন এবং একথা মেনে নিয়েছেন অধুনা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরাও। পলাশির যুদ্ধের পর যে প্রচুর পরিমাণ সোনা, রূপা ও অর্থ বাংলা থেকে আহরণ করেছিল তাকে ব্রুকস্ অ্যাডামস অনেক আগেই 'পলাশির লুণ্ঠন' (Plassey Plunder) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত পলাশির পর থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেসরকারি ইংরেজ বণিকেরা বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আহরণের নেশায় মেতে উঠেছিল। রাজা বদলের পালায় নেপথ্যে তারাই ছিল চালক, সুতরাং নজরাণা ও পারিতোষিক তো ছিলই। তদুপরি ছিল কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রয়োগের ফলে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ। আরও ছিল দুর্নীতি ও ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে অর্থাৎ অসাধু উপায়ে অর্জিত আয়। সর্বোপরি ১৭৬৫তে দেওয়ানি লাভের পর যুক্ত হয়েছিল রাজস্বের মাধ্যমে বাংলাকে শোষণ করার সীমাহীন

লোভ। সবমিলে দেশীয় অর্থনীতির নাভিশ্বাস ওঠে। আধুনিক ইংরেজ ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পিয়ার পর্যন্ত একে স্বল্পভাষায় 'সোজাসুজি ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ' (Age of open and unashamed plunder) বলেছেন।

সোনার ডিম একসঙ্গে পাওয়ার লোভে হাঁসকে মেরে ফেললে যে ভুল হয় ধূর্ত অথচ লোভী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজেরা শাসনভার হাতে নিয়ে সেই ভুল করেনি। হাঁসকে বাঁচিয়ে রেখে প্রতিটি সোনার ডিম নিয়ে যেতে তারা আগ্রহী ছিল। এই কারণে ১৭৭২ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর্বে তারা গ্রহণ করেছিল ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। মাঝে মাঝে তার রূপ বদল হয়েছে তবে মূলনীতির পরিবর্তন হয়নি।

এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সাধারণ বা মূল বৈশিষ্ট্য সহজ কথায় বলা চলে। (১) ভারতবর্ষ থেকে রাজস্ববৃদ্ধির ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় কৃষির ক্ষতি (২) রায়ত বা চাষীদের সমূহ ক্ষতি। (৩) ভারতে শিল্পবাণিজ্যের ঔপনিবেশিক চক্র প্রবর্তন, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে কাঁচামাল সংগ্রহের দেশে পণ্য করা। আর সেই কাঁচামাল ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া। এই কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন শিল্পজাত পণ্য আবার ভারতে নিয়ে ভারতের বাজারে বিক্রি করা। আবার সেই বিক্রি থেকে প্রাপ্ত মুনাফা স্বদেশে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে পাচার করা। (৪) ভারতের শিল্পজাত পণ্যের পরিবর্তে কৃষিজাত কাঁচামাল ব্রিটেনে রপ্তানি ও সেখান থেকে ভারতে শিল্পজাত পণ্য ভারতে আমদানির ফলেই ভারতে শুরু হয় অবশিল্পায়নের ধারা। এই অবশিল্পায়নের (De-industrialization) সবচেয়ে বড়ো স্বাক্ষর ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস। ১৮১৩ থেকে অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে এটি আরও বাড়ে। ভারতীয় চাষীদের মতন তাঁতি, শিল্পী, কারিগরদের সামনেও আসে সমস্যা। এককথায় ব্রিটেনে বাণিজ্য পুঁজির সাহায্যে বলীয়ান 'মার্কেন্টাইল বুর্জোয়া' শ্রেণী যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গ্রহণ করে, পরে শিল্পপুঁজি কাজে লাগিয়ে শিল্পবিপ্লবের পরে নতুন ঔপনিবেশিক নীতি গৃহীত হয়।[১] তাই ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায় 'দ্য ফিউচার রেজাল্টস্ অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে কার্ল মার্ক্স লিখেছিলেন যে, কোম্পানি ছিল ভারতীয় দেশীয় সমাজের ধ্বংসকারী। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে এক নতুন সমাজ বিপ্লবের সূচনা হয়।

নতুন রাজস্ব বন্দোবস্ত কৃষিক্ষেত্রের চিত্র আমূল বদলে দেয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গ্রহণ করেছিল। আমরা পরে সেদিকে দৃষ্টি দেব। তবে আপাতত বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক সরকারের নীতি ভারতের চিরাচরিত অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিয়েছিল। এই দুর্দশায় প্রকৃত কারণ তিনটি :

(১) রাজস্বের ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি

(২) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন। বিশেষত বস্ত্রশিল্পের অবনতি।

(৩) ভারতবর্ষকে উপনিবেশে পরিণত করা। অর্থাৎ শাসনের সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের কাঁচামাল ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া, সেখানে শিল্প বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে শিল্পপণ্য উৎপাদন, তারপর উৎপন্ন পণ্য আবার ভারতে নিয়ে আসা এবং ভারতের বাজারে তা বিক্রি করা এবং সেই বিক্রিজাত মুনাফা ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভারতের দারিদ্র্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। মধ্যযুগে ভারত দরিদ্র থাকলেও সাধারণ মানুষদের অবস্থা এমন করুণ ছিল না। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রুশ ইতিহাসবিদগন লিখেছেন ঃ

"ব্রিটিশ ভারতের বিজয়ের ফলে শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনই নয় দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও ব্যাপক রদবদল ঘটে। প্রাক্তন অভিযানকারীদের মতো এদেশে স্থায়ী বসবাস ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে আত্তিভূত হওয়ার বদলে পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের পথযাত্রী ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে সম্পদহরণ এবং তা তাদের মাতৃভূমিতে পাঠানোর উৎস হিসাবে দেখেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতশোষণের বহুবিধ রকমফের সত্ত্বেও ভারতবর্ষ সর্বদাই তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ছিল।

ভারত বিজয়ের সময় থেকেই এদেশের সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করা শুরু হয়েছিল। এই অবাধ অর্থনৈতিক শোষণ ভারতকে নিরক্ত ও নিঃস্বতায় পর্যবসিত করেছিল। পনেরো শতকের পর্যটক আফানাসি নিকিতিন ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক পর্যায়ে এই দারিদ্র্য প্রকটতর হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ আসার পর ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এতে প্রায় ১ কোটি লোক প্রাণ হারায়। তারপর দুর্ভিক্ষ এবং আনুষঙ্গিক কলেরা, প্লেগ ও অন্যান্য রোগের মহামারী ভারতীয় জীবনের নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে"।[১]

বস্তুত ঔপনিবেশিক ভারতের জনগণের পক্ষে তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোনও মৌলিক পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর ছিল না। এজন্য দরকার ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের। সে ভিন্ন কাহিনী।

ইতিহাসবিদ হোল্ডেন ফারবার তার 'জন কোম্পানি অ্যাটওয়র্ক' গ্রন্থে হিসেব করে দেখিয়েছেন যে ইংরেজ কোম্পানির 'ইনভেস্টমেন্ট' এবং চীনে সোনা রূপো (বুলিয়ান) রপ্তানির মাধ্যমে ১৭৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯২-৯৩-এর মধ্যেই বাংলা থেকে বছরে ১.৭৮ মিলিয়ন পাউণ্ড সম্পদের নিষ্ক্রমণ হয়েছিল। এই আর্থিক নিষ্ক্রমণ বাড়তেই থাকে।[২] মার্ক্সবাদী লেখক রজনীপাম দত্ত তাঁর India Today বইতে লিখেছেন ভারত থেকে অপহৃত সম্পদের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক ইংলাণ্ড গড়ে উঠেছিল, তা ভুল নয়।

২। বিভিন্ন ধরনের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন ঃ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভ করার পর থেকেই ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিব্রত ছিল। ভূমিরাজস্ব ছিল আয়ের প্রধান উৎস। স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সম্পদ লুণ্ঠনের প্রয়োজনে সুষ্ঠু ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। আঠারো শতকেই মহীশূর ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, প্রশাসনের বর্ধিত ব্যয়ভার এবং কোম্পানির সম্প্রসারিত বাণিজ্য রক্ষা ইত্যাদি কারণে এই প্রয়োজন আরও বাড়ে। তবে ১৭৬৫ থেকে ১৭৮৬ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে কোম্পানির লাভ হয়নি, করভারে জর্জরিত প্রজাদেরও ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছিল। গ্রামীণ সমাজে নানা হিংসাত্মক ঘটনা পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। কোম্পানির লণ্ডনের পরিচালকমণ্ডলীর বাংলার গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল খুবই সীমিত। কোম্পানির কলকাতা কর্তৃপক্ষ অবশ্য নিজেদের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করে যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য বাংলার জমিদারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন জরুরি। এই পরিস্থিতিতে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এসে লর্ড কর্নওয়ালিস সম্পূর্ণ কোম্পানির স্বার্থসুরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত **(Permanent Settlement)** প্রবর্তন করলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত নানা ধরনের পরীক্ষার পর কর্নওয়ালিস নিজেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বেছে নিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমিকা ঃ লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক হলেও চিরস্থায়ী সংক্রান্ত ধারণা বা তত্ত্বের তিনি উদ্ভাবক নন। ১৭৭০ থেকেই ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃপক্ষের অনেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নেন ইংল্যাণ্ডে মার্কেন্টাইলবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাসী আলেকজাণ্ডার ডাও যিনি বাণিজ্যের উন্নতির জন্য জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে একটি যুক্তি নির্ভর কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পরে এ ব্যাপারে আরও উৎসাহ দেখান ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিতে বিশ্বাসী তাত্ত্বিকেরা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হেনরি পাটুল্লো। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফিলিপ ফ্রানসিস এই দলভুক্ত। তিনিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চেয়েছিলেন। তিনি ১৭৭৬ থেকেই বাংলার জমিদারদের সঙ্গে ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তোলার স্বপক্ষে তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন।[১] ফিলিপ ফ্রানসিস অবশ্য চেয়েছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় রাজস্ব না চাপিয়ে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্তিগ্রাহ্য একটি রাজস্বের হার ধার্য করা। পিট-এর ভারত আইনেও পাই জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী আইন প্রণয়নের কথা।

লর্ড কর্নওয়ালিস যখন গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সম্ভব ভূমিরাজস্ব খাতে সরকারি আয় বৃদ্ধি করা। এই কারণে ১৭৮৭ এবং ১৭৮৮ এই দু'বছরের রাজস্ব বাৎসরিক ভিত্তিতেই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তবে সেই সঙ্গে তিনি জেলার কালেক্টরগণকে রাজস্বের পরিমাণ, কাদের নিকট জমি বন্দোবস্ত দেওয়া উচিত, জমিদারদের অত্যাচার থেকে রায়ত অর্থাৎ প্রজাদের রক্ষা করার জন্য কী কী বন্দোবস্ত অবলম্বন করা উচিত ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। এই তথ্যাদি হাতে পাওয়ার পর ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জমিদারদের সঙ্গে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে এক দশসালা বন্দোবস্ত গড়ে তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হলো যে এই পরিকল্পনা দশবছরের জন্য গৃহীত হবে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স অনুমোদন করলে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে কর্নওয়ালিসের যুক্তির বিরোধিতা করেন জন শোর, যিনি ছিলেন রাজস্ব বোর্ড (Board of Revenue)-এর সদস্য।

শোর কর্নওয়ালিস বিতর্ক হলেও তাদের মধ্যে মিলও ছিল। শোর দশ বছরের জন্য বন্দোবস্তে আপত্তি করেন নি। কিন্তু দশ বছর পর ভবিষ্যতে তাই চিরস্থায়ী করা হবে এই প্রস্তাব তার মনঃপূত ছিল না। তার বক্তব্য ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধীর পদক্ষেপে নেওয়া উচিত। রেভেনিউ বোর্ডের অপর সদস্য জেমস্ গ্র্যান্ট বরং জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেন। কর্ণওয়ালিশের মূল যুক্তি ছিল এই যে, এই ব্যবস্থার ফলে বাংলার জমিদাররা সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে, তারা ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করবে এবং রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে কোম্পানি নিশ্চিত হতে পারবে। ইংল্যাণ্ডে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের হেনরি ডাণ্ডাস এই মত সমর্থন করেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ কর্নওয়ালিসের মত অনুমোদন করেন, ১৯ সেপ্টেম্বর সে সংবাদ ভারতে পৌঁছয় এবং ১৭৯৩-এর ২২ মার্চ কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য এবং দোষত্রুটি ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমত, কোম্পানি ভূমিরাজস্ব খাতে একটি স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, কোম্পানি জমিদারদের ভূসম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নেওয়াতে তারাই হয়েছিল জমির মালিক। প্রজা বা কৃষকরা হয়েছিল বঞ্চিত। জমির উপর কৃষকদের অধিকার চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়। তৃতীয়ত, জমিদার নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে ইংরেজ শাসকদের সহযোগী শ্রেণীতে পরিণত হলো। চতুর্থত, শাসকশ্রেণী মনে করেছিল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে দিলে কৃষির অগ্রগতি ও সম্প্রসারণ হবে। পঞ্চমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সময় নিয়ম করা হয়েছিল যে

জমিদারদের রাজস্ব দেবার নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে রাজস্ব জমা দিতে হবে। নচেৎ তার জমি নিলাম করা হবে ও হস্তান্তরিত হবে। ষষ্ঠত, অসংখ্য রায়তের বদলে মুষ্টিমেয় সংখ্যক জমিদারের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকলে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া সহজ হবে বলে কোম্পানি মনে করেছিল।

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আশানুযায়ী ফল ফলায়নি। বরং এর নানাবিধ ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। রাজস্ব নির্ধারণ ক্রটি, খাজনা অনাদায়ে জমিদারি নিলাম, রায়তদের উপর অত্যাচার, জমির উপর চাপ বৃদ্ধি, কৃষকদের দুর্দশা, জমির উন্নয়ন ব্যাহত, জমিদারদের নায়েব-গোমস্তাদের ভূমিকা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই কোম্পানির সুনির্দিষ্ট স্থায়ী আয় যেমন হয়নি, তেমনি প্রজাদের দুর্দশাও চরমে পৌঁছায়। বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে এক মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হলো কিন্তু বাংলার ঐতিহ্যশালী অনেক জমিদার পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। কোম্পানিকে এজন্য পরবর্তীকালে ভারতের অন্যত্র অন্য ধরণের ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্তের কথা যেমন ভাবতে হয়, তেমনি প্রজাস্বত্ব আইনের কথাও।

বাংলার সমাজ ও অর্থনীতির উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া ঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর 'দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া'.গ্রন্থে সুদক্ষ ভূমিরাজস্ব হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রশংসা করেছেন। তার ভাষায় "লর্ড কর্নওয়ালিসের ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছিল ভারতে ব্রিটিশ জাতি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ ও সফল পদক্ষেপ"।[১] এই বক্তব্য আদৌ সমর্থন করা যাচ্ছে না। কেননা এই বন্দোবস্ত ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থে আংশিক সাফল্য আনলেও এই ব্যবস্থা বাংলার রায়তদের বা সার্বিকভাবে বাংলার কৃষি অর্থনীতির উন্নতিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। ঔপনিবেশিক স্বার্থে কোম্পানির রাজনৈতিক অধিকারকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অর্থবহ করে তোলার জন্য এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল বলে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম মন্তব্য করেছেন।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই বন্দোবস্তের ফলে (১) কৃষি কার্যের অবনতি ঘটে(২) জমির অধিকার থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করা হয়, (৩) প্রজাদের উপর রাজস্ববৃদ্ধির চাপে কুফল ফলে এবং (৪) বাংলার অর্থনীতির নানা দিক বিপর্যস্ত হয়। আর সামাজিক দিক থেকে বাংলার সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন, মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব, অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে যে সম্পত্তি-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তাই এক সমাজ বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল বলে কার্ল মার্ক্স মন্তব্য করেছেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, জমিদার এবং রায়তদের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যথাসম্ভব উচ্চহারে রাজস্ব সুনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করা সহজ হয়েছিল। তারা বার্ষিক আয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পেরেছিল। ফলে বাৎসরিক বাজেট তৈরির সুবিধে হয়েছিল। আগেকার নানা ধরনের

পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করে তারা একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পেরেছিল। দ্বিতীয়ত, বাজার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর তারা শাসন ও বিচারের ব্যাপারে মনোযোগী হতে পেরেছিল। তৃতীয়ত, আগে নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে যে অপচয় হত তা বন্ধ হয়েছিল। চতুর্থত, কোম্পানির আয় নির্দিষ্ট হলেও জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকায় ভবিষ্যতে জমি ও ফসলের মূল্য বৃদ্ধি হলেও আনুপাতিক হারে কোম্পানির আয় বাড়েনি। পঞ্চমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে নানাধরনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থাকার জন্য কোম্পানি ভারতের অন্যত্র অন্য ধরনের ভূমি বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হয়েছিল।

জমিদার শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সরকার রায়তদের পরিবর্তে কেবলমাত্র তাদের সঙ্গে রাজস্বের বন্দোবস্ত করার ফলে তারা লাভবান হয়েছিল। কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা মিটিয়ে দিয়ে তারা প্রভূত পরিমাণ অর্থের মালিক হতে পারতেন। তাছাড়া আপন-আপন এলাকার শান্তি রক্ষার দায়িত্ব থেকেও তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, এই লাভবান হওয়ার কারণেই জমিদার শ্রেণী পূর্বভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনের এক নির্ভরযোগ্য সমর্থক ও সহযোগী শ্রেণীতে পরিণত হন। তৃতীয়ত, জমিদাররা জঙ্গলাকীর্ণ জমি পরিষ্কার করে কৃষির উন্নয়নে মনোযোগী হন। কৃষি-বাণিজ্যকরণ ঘটে। জমি ও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। চতুর্থত কৃষি স্বার্থ অনেক সময় প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, অনেক সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হত না এবং ফলত জমিদারগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা বলপূর্বক আদায় করতে পারতেন না। অথচ সূর্যাস্ত আইনের ফলে বহু সাবেকী জমিদার পরিবার ঠিকমতন রাজস্ব দিতে না পারার কারণে তাদের জমিদারি হারিয়ে ছিলেন। পঞ্চমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে জমির মালিক বলে স্বীকৃতি পেলেন জমিদাররা। তারা যতদিন সরকারকে দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জমা দিতে পারতেন, তাদের কোনও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু তারা অনেক সময় অর্থসংকটে পড়ে জমিদারীর একাংশ কোনও কোনও বিত্তশালী ব্যক্তিদের পত্তনী দিতেন। এইভাবে মধ্যস্বত্ত্বভোগী এক পত্তনীদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। এই পত্তনীদাররা আবার অন্যকে ইজারা দিতেন। এই আবর্তে জমিদার প্রথাই নতুন মোড় নেয়। ফলে শুধু জমিদার নয়, জোতদার সর্বস্বত্ত্বভোগী ধনী ভূস্বামী শ্রেণী গড়ে ওঠে। ষষ্ঠত, যে সব জমিদারী নিলাম হয়ে গিয়েছিল কলকাতার একশ্রেণীর ধনী মুৎসুদ্দি বানিয়া সেগুলি কিনে নেয়। এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জমির সম্পর্ক ছিল না। তারা শহরে বসেই জমিদারী চালাতেন। তাদের বলা হত, 'অনুপস্থিত জমিদার' (Absentee Landlord)— এদের হয়ে নায়েব গোমস্তারা জমিদারী চালাতেন এবং সেই সুযোগে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করতেন। সপ্তমত, জমিদারী ব্যবস্থার ফলে কৃষির আশানুরূপ উন্নতি ঘটেনি, কেননা জমিদারগণ যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ কৃষিক্ষেত্রে করেন নি।

রায়ত বা চাষীদের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্বাধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সর্বাধিক। প্রথমত, রায়তরা জমির মালিকানা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়। জমির উপর প্রজাদের কোনও স্বত্ব নির্দিষ্ট না হওয়াতে বহু ক্ষেত্রে জমিদারগণ কারণে-

অকারণে চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করতে দ্বিধা করতেন না। দ্বিতীয়ত, রায়তদের অধিকার দশ বছরের জন্য পাট্টায় লিপিবদ্ধ করে দেবেন জমিদাররা, এমন ব্যবস্থার কথা সরকারী তরফে বলা হলেও কার্যত তা আদৌ হয়নি। তৃতীয়ত, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী জমিদার রায়তকে খাজনা আনাদায়ের জন্য দৈহিক নির্যাতন বা সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবেন না বলা হলেও খাজনা বকেয়া পড়লে যথেষ্ট অত্যাচার হত। চতুর্থত, নতুন জমিদারগণ পূর্বতন সাবেকী জমিদারদের চেয়ে আদৌ উদার ছিলেন না। বরং আগে জমিদার-প্রজার সামান্য মানসিক সম্পর্কের বদলে সবটাই অর্থকরী সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াত। পঞ্চমত, সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী রায়তদের কাছ থেকে খাজনার অতিরিক্ত কোনও অর্থ জমিদার দাবি করতে পারবে না, একথা থাকলেও খাজনার উচ্চ হার ছাড়াও প্রায়ই অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হত। এর মূল কারণ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী, নায়েব-গোমস্তা ও অনুপস্থিত জমিদারদের শোষণ। ষষ্ঠত, কর্নওয়ালিস যেমন আশা করেছিলেন জমিদাররা কৃষকদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং কৃষির উন্নতিতে মন দেবেন, তা আদৌ হয়নি। সব মিলে প্রজাদের অবস্থা দিন দিন দুর্দশাগ্রস্ত হতে থাকে।

ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের মতে এটি ছিল বাংলার ইতিহাসে 'প্রথম কালা কানুন।'

রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নানা রকম ত্রুটি থাকার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের অন্যত্র কয়েক ধরনের ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত চালু করেছিল। যেমন, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত। আঠারো শতকের শেষ দিকে কোম্পানি ঐ অঞ্চলে একটি সুবিন্যস্ত ভূমিবন্দোবস্ত গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। প্রত্যেক রায়তের নিজস্ব জমি জরিপ করা হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জমির উৎপাদিকা শক্তি পরীক্ষা করে ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত করা হয়। জমিদার বা কোনও মধ্যবর্তী শ্রেণীকে বাদ দিয়ে কোম্পানি সরাসরি রায়তদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই বন্দোবস্তকেই বলে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার পিছনে আলেকজাণ্ডার রীড এবং টমাস মানরো নামক দুই ইংরেজ কর্মচারীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। মাদ্রাজ, মহীশূর (টিপুর কাছ থেকে জিতে নেওয়ার পর) এবং নিজাম কর্তৃক ছেড়ে দেওয়া অঞ্চলে কোম্পানি এই ভূমিরাজস্ব নীতি প্রয়োগ করে। তবে এই বন্দোবস্তের পিছনেও ছিল কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি। তবে এই বন্দোবস্তের ফলে প্রকৃত উৎপাদক বা কৃষকদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের মতন বিভিন্ন স্তরের জমিদার ও ভূমিস্বত্বভোগীদের দ্বারা উৎপীড়িত না হয়েও রাজস্ববৃদ্ধির চাপে এবং কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে চাষীদের হাল ছিল একই রকম।[১]

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এবং ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের পর মারাঠাদের কাছ থেকে পাওয়া অঞ্চলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত চালু করেন। মাদ্রাজ এবং বোম্বাই উভয় অঞ্চলেই রাজস্ব নির্ধারিত হত তিরিশ বছরের জন্য। কোনও রায়ত ভূমিরাজস্ব দিতে না পারলে তার জমি বাজেয়াপ্ত হত। এই বন্দোবস্তেও কৃষকদের স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে দুর্দশা বৃদ্ধি পায়।

মহলওয়ারী বন্দোবস্ত ঃ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গ্রাম বা মহল ভিত্তিক যে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলে তাকে বলা হয় মহলওয়ারী বন্দোবস্ত। এই ব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে সরকার এক একটি গ্রাম বা মহলের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় করত। যে মহলে যেরকম অর্থাৎ জমিসংক্রান্ত যেরকম স্বার্থ জড়িত ছিল, যেমন তালুকদার ও গ্রামীণ সমাজের স্বার্থ, জমিদার ও গ্রামীণ সমাজের স্বার্থ সেক্ষেত্রে সরকার ইচ্ছে মতন এদের যে কারুর সঙ্গে রাজস্বচুক্তিতে আবদ্ধ হত। উত্তর ভারতে জমিদারদের সংখ্যা ছিল কম, তাই তালুকদারদের সঙ্গে, তালুকদার না থাকলে রাজস্বের জমি ইজারাদারদের মধ্যে ভাগ করে, তাদের সঙ্গে রাজস্ব নির্ধারণ ও রাজস্ব আদায়ের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হত। গোরক্ষপুর, কানপুর, এলাহাবাদ, আলিগড়, বেরিলী, মোরাদাবাদ, এটাওয়া, আগ্রা, বুন্দেলখণ্ড সর্বত্র মহলওয়ারী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কোম্পানি চেয়েছিল রাজস্বের হারের ক্রমবৃদ্ধি। এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন হল্ট ম্যাকেঞ্জি, রবার্ট বার্ড এবং জেমস টমসন। এই বন্দোবস্তেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষকদের স্বার্থ।

৩। কৃষিক্ষেত্রে কোম্পানির শাসনের প্রভাব

কৃষিক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রভাব এককথায় ছিল ভয়াবহ ধরনের। কোম্পানির অর্থনৈতিক লোভ এবং রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবণতার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের ভূমি রাজস্ব প্রবর্তন করেছিল। যেমন বাংলায় ও আরও কিছু অঞ্চলে চিরস্থায়ী, দক্ষিণ ভারতে ও বোম্বাইতে রায়তওয়ারী, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে মহলওয়ারী ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটিই ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির ক্ষতিসাধন করেছিল, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করেছিল। ইংরেজদের ও তাদের সহযোগী দেশীয় দালাল-জমিদার-মহাজনদের লাভবান করেছিল, কৃষকদের অধিকার খর্ব করেছিল। সেই কারণেই বলা হয় কৃষিক্ষেত্রে কোম্পানির শাসনের কুপ্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সুপরিচিত *The Economic History of India* গ্রন্থে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করেছেন। কারণ এর ফলে ১৭৯৩-র পর বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়নি। তাঁর মতে, "Lord Cornwallis's Permanent settlement of 1793 is the wisest and the most successful measure which the British

Nation has ever adopted in India'. ইতিহাসের তথ্যের নিরিখে কিন্তু বক্তব্যটি আদৌ সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থে কোম্পানির আংশিক সাফল্য এসেছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তা ভারতীয় রায়তদের বা সার্বিকভাবে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে নি।

রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন আই সি এস। বহু পরে স্বাধীনভারতে সাবেক আই সি এস, অশোক মিত্র আদমসুমারি বিষয়ক প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক পটভূমিকা প্রসঙ্গে জানান যে, কোম্পানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে একটি কৃষি নির্ভর দেশ হিসেবে রেখে দিতে চেয়েছিল। এই বন্দোবস্তের পিছনে যতই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাক, ইংরেজরা শিল্প ও বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছে একথা ভুল। তাই অশোক মিত্রের বক্তব্যকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ইতিহাসবিদ বিনয় ভূষণ চৌধুরী।

একথা সত্য যে ক্রম বর্ধমান গণ-বিদ্রোহের আঘাত থেকে একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক শাসনকে রক্ষা করার জন্য একদল কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন নিজেদের সমর্থক তৈরি করবার জন্য জমিদার শ্রেণীর হাতে রাজস্বের ভার তুলে দেয়। এর ফলে নতুন রাজনৈতিক মিত্র লাভ করাও হলো আবার নিজেদের কৃষক শোষণ এবং রাজস্ব থেকে আয়ও স্থায়ী হলো। এই ফলাফল স্বীকার করেছেন রজনীকান্ত দত্ত, সুপ্রকাশ রায়, বদরুদ্দিন উমর প্রমুখ।

সুতরাং রমেশচন্দ্র দত্ত যে মন্তব্য করেছেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যের সর্বাধিক দৃষ্টান্ত হলো ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তা ভ্রান্ত। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "If the prosperity and happiness of a nation be the criterion of wisdom and success, Lord Cornwallis's permanent settlement of 1793 is the wisest and most successful measure, which the British Nation has ever adopted in India"।[১] কিন্তু জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মানে কি শুধু জমিদারদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য? অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ দেখিয়েছেন যে, প্রজারা এই ব্যবস্থার ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অনেক আগেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে মধ্যবর্তী ভূস্বামীদের শোষণের ব্যাপারে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় পল্লী-গ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণনা করেছেন। সম্প্রতি সিরাজুল ইসলাম কিংবা রণজিৎ গুহের মতন পণ্ডিতদের গবেষণা ঐ বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। কৃষিক্ষেত্রে লাভবান যদি হয়ে থাকেন তো জমিজারগণ। ডঃ সুগত বসু তাঁর কেমব্রিজের গবেষণায়[২] হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকা আর ১৮৭৬ খ্রিঃ তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৩ কোটি টাকায়। এর ফলে রায়ত বা কৃষকরাই— যার বিপুল সংখ্যাধিক্য দেশের জনগণের প্রধান অংশ— তারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাহলে কি একে 'most successful measure' বলা যায়? আদৌ নয়।

মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যে রাজস্ব বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল, অর্থাৎ রায়তওয়ারী তা কি চরিত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চেয়ে খুব উন্নত ছিল? এই প্রশ্নেরও ইতিবাচক উত্তর দেওয়া যাবে না। অধ্যাপক নীলমণি মুখোপাধ্যায় তাঁর বিস্তারিত গবেষণায় দেখিয়েছেন যে মাদ্রাজে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রচলন করেছিলেন টমাস মানরো, যিনি জেলাশাসকের পদ থেকে মাদ্রাজের গভর্নর পর্যন্ত হয়েছিলেন। এই প্রচলন করার পিছনে মূল কারণ ছিল কোম্পানির রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। এটাই ছিল আসল কথা। জমিদার শ্রেণীর বদলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানি সরকারের সঙ্গে রায়তদের সরাসরি চুক্তি হওয়ার ফলে রায়তদের আদৌ লাভ হয়নি।

কেন? প্রথমত, রাজস্ব নির্ধারণের পদ্ধতি ছিল জটিল। উৎপাদনের ব্যয় বাদ দিয়ে কৃষকদের হাতে যা থাকত তার অধিকাংশই রাজস্ব দিতে চলে যেত। দ্বিতীয়ত, দ্রুত পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রের চাহিদা মেটাতে রায়তরা অপারগ ছিল। তৃতীয়ত, নগদে রাজস্ব দিতে গিয়ে নিজেদের শস্য বিক্রি করে দিতে হত। তাছাড়া অধ্যাপক এরিক স্টোকস্ লিখেছেন যে, পতিত জমি পর্যন্ত বন্দোবস্তের আওতায় আনা হয়। তাছাড়া, বন্দোবস্তের মধ্যেও তারতম্য ছিল।[১] শ্রীমতী ধর্মা কুমারের মতে কৃষি পণ্যের মূল্য মাঝে মাঝেই অত্যধিক হারে হ্রাস পাবার ফলে (যেমন ১৮২৫-২৬ খ্রিঃ, আবার ১৮৫৩-৫৪ খ্রিঃ) কৃষকদের নগদ মূল্যে কর দিতে খুবই অসুবিধা হয়েছিল।[২] রাজস্বের বোঝা তাদের কাছে ছিল দুঃসহ। সুতরাং রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের দ্বারা প্রকৃত উৎপাদক বা রায়তদের অবস্থা ভালো হয়েছিল, একথা বলার মতন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

বাকি রইল মহলওয়ারী। এখানেও একই চিত্র। রমেশচন্দ্র লিখেছেন ঃ "It (Mahalwari settlement) swept away virtually the whole of the rental of the country leaving landlords and cultivators equally impoverished. It made accumulation of wealth and any improvement in the material condition of the people impossible."।[৩] এই পদ্ধতিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে জমির বন্দোবস্ত হওয়াতে প্রচলিত গ্রামীণ সংগঠনগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে সত্য তবে রাষ্ট্রের চাহিদা হয় লাগামছাড়া। ফলে অনতিকালের মধ্যে শুধু কৃষক নয়, ভূস্বামীগণও দারিদ্র্যের কবলে পড়ে। বৈষয়িক উন্নতি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। গোরক্ষপুরে, এলাহাবাদে, কানপুর সর্বত্রই জমি বিক্রির ক্ষেত্রে দুর্নীতি দেখা দেয়। ডঃ আশিয়া সিদ্দিকি উত্তর প্রদেশে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক অবনতির চিত্র এঁকেছেন।[৪]

তাহলে কৃষিক্ষেত্রে কোম্পানির শাসনের প্রভাব কেমন? এর উত্তরে বলা চলে যে, ইংরেজদের নীতির একটিই উদ্দেশ্য ছিল। ভূমিরাজস্ব থেকে কীভাবে সরকারের আয় যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা যায়। এই আয় বাড়াতে গিয়ে রাজস্বের ক্রমবৃদ্ধি। এর ফলে সার্বিকভাবে ভারতীয় জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত হলেও সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দরিদ্র কৃষকসমাজ। ফলে চাষীদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যেমন জমিদারদের মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার দেখা যায়, অন্যত্র তা নেই। কিন্তু অন্য বন্দোবস্তের পিছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনমত রাজস্ব বৃদ্ধি করার অধিকার নিজেদের হাতে রাখা। কারণ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং লোভও বাড়ছিল। ফলে যেখানে অস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সেখানে রাষ্ট্রই রায়তদের উপর রাজস্বের বোঝা চাপাত। সুতরাং ভারতের সব যায়গাতেই করভারে জর্জরিত কৃষকদের হাল ছিল শোচনীয়। ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছিল।

৪। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কোম্পানির শাসনের প্রভাব

কৃষির মতন ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, দেখা যায় কারিগরী ও কুটির শিল্পের উপরেও। বাংলা তথা ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানির একাধিপত্য স্থাপিত হলে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের পতন হয়। কোম্পানির শাসনের সুযোগ নিয়ে বাংলা তথা ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজ কোম্পানি এবং তাদের কর্মচারিদের সম্পূর্ণ হস্তগত হয়। তাছাড়া আরও দুটি কথা ধর্তব্য। (১) শুধু কোম্পানির অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য নয়, সমুদ্র বাণিজ্যও বিদেশীদের হাতে চলে যায়। একই সময়ে ভারতীয় শিল্পেরও ধ্বংস সাধনের পালা চলতে থাকে। (২) কোম্পানি তাঁর শুল্কনীতি এমনভাবে করেছিল এবং তাঁর ঔপনিবেশিক নীতি এমন ছিল যে, প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কারিগর এবং বণিকরা এঁটে উঠতে পারেনি। এর ফল ছিল কৃষির মতন শিল্প-বাণিজ্যেও ভয়াবহ। অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস, ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের পতন। শিল্পের ধ্বংস বা অবশিল্পায়ন আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। আপাতত ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কোম্পানির শাসনের প্রভাব আলোচনা করা যেতে পারে।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ভারতের অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে তিন ধরণের বণিকেরা কর্মরত ছিলেন। (১) ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগুলির মতো ইয়োরোপীয় বণিক প্রতিষ্ঠাসমূহ; (২) আর্মেনিয় বণিকদের মতো বিদেশী এশিয় বণিকেরা এবং (৩) ভারতীয় বণিকেরা। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত মোগল সম্রাট ফারুখশিয়ারের ফরমান বা আদেশ অনুসারে ইংরেজ কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে পারত। শুল্ক ছাড়ের বিশেষ দলিল (দস্তক) তারা লাভ করেছিল। ফলে অন্যান্য বণিকদের চেয়ে তাদের সুবিধা ছিল বেশি। প্রাগুক্ত ফরমানে বলা হয়েছিল যে, ইংরেজ কোম্পানি মোগল সম্রাটকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার বদলে বৎসরে ৩০০০ টাকা নজরানা দেবে। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে গেলেও দস্তক নিয়ে কোম্পানি বিনা শুল্কে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছিল।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে কীভাবে বাণিজ্য বাড়াচ্ছিল, তার একটা পরিসংখ্যান দিলে তা স্পষ্ট হবে। ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন ৪, ৯৩, ২৫৭ পাউণ্ডের ভারতীয় পণ্য ব্রিটেনে আমদানি করে, ১৭৩০ খ্রিঃ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,০৫১,৭৫৯ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য এবং ১৭৪৮ খ্রিঃ তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১০৯৮৭১২ পাউণ্ড মূল্যের ভারতীয় পণ্য। একই সময়কালে কিন্তু ভারতের পণ্য রপ্তানি হয়েছে বেশি। ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। ব্রিটেন সোনা-রূপো বা বুলিয়ন দিয়ে এই ঘাটতি মেটাতো। তৎসত্ত্বেও তারা ১৭১০ থেকে ১৭৪৫-এর মধ্যে লাভ করেছে ১৭,০৪৭,১৭৩ পাউণ্ড। এই অবস্থা আরও বদলে যায় আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তখন লাভ হয় বহু গুণ। এ জন্য অনেক কিছু দায়ী। শুধু লাভ হলেই একরকম হত। সেই সঙ্গে অবৈধ ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে শুরু করে নির্লজ্জ লুণ্ঠন কিছুই বাকী রইল না। কীভাবে অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য চলত? অনেক পথে। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ফরমানের অপব্যবহার করা হত। যেমন যে- সব পণ্য নিয়ে ব্যবসা করা নিষিদ্ধ তার ব্যবসা; নবাবের কর্মচারীদের উৎকোচ দিয়ে অবৈধ কাজ। কোম্পানির কাজ করতে এসে ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং শুল্ক ফাঁকি, নিজেদের দস্তক বা বিনা শুল্কে ব্যবসার ছাড়পত্র বেশি টাকায় অন্য ব্যবসায়ীদের বেচে দেওয়া ইত্যাদি। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভ করার পর কোম্পানির ক্ষমতা হয় অপ্রতিহত। তারা রাজস্ব আদায়ের ভার হাতে পেয়ে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। একদিকে ব্রিটেন থেকে টাকা বা সোনা-রূপো না এনে কোম্পানি ভারতের আয় থেকেই তাদের বাণিজ্য এবং শাসন ব্যয় মেটাতে শুরু করে। আবার ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করে একচেটিয়া অধিকার (Monopoly)। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের এ এক চমৎকার দৃষ্টান্ত।

এর ফলে ভারতীয় উৎপাদকেরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো। ভারতীয় বণিকরা নিজেদের পণ্য নির্দিষ্ট দামে কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের বিক্রি করতে বাধ্য অথচ সেই পণ্যের দাম ঠিক করে দিত কোম্পানি। এভাবেই মার খেতে থাকে বাংলার তাঁতিরা, রেশমের কারিগর বা লবণের লবঙ্গীরা।

কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কর্নওয়ালিসের রাজত্ব শেষ হওয়ার আগেই উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এই সব ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত লাভ কোম্পানির কর্মচারীরা দেশে পাঠাতেন হুণ্ডি বা অন্য দেশীয় কোম্পানির লোকেদের হাত দিয়ে। লবণ, তামাক, সুপুরি ছিল নগরের একচেটিয়া ব্যবসা। সেগুলি কোম্পানির হাতে চলে যায়। কোম্পানির কর্মচারারা দস্তক জাল করত অথবা প্রকৃত দস্তক ভারতীয়দের প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বেচে দিত। কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের গোমস্তা ও দালালদের মাধ্যমে শহরে ও গ্রামে তেল, মাছ, বাঁশ, ধান, সুপুরি, লকা, তামাক, শিল্পজাত পণ্য সবই উৎপাদকের কাছে থেকে কিনে (যথেষ্ট কম দামে) চড়া দরে বিক্রি করত। ফলে ভারতীয় বণিকরা পিছু হঠতে থাকে। এর আরেকটি কারণ দেশী ও আর্মেণীয় বণিকদের উপর শুল্কের বোঝা।

দস্তকের সুযোগ নিয়ে বিনা শুল্কে ব্যবসা করত কোম্পানি। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য এভাবেই শুকিয়ে গেল। রমেশচন্দ্র দত্তের ভাষায় — "The springs of their industry were stopped,the sources of their wealth were dried up."

আঠারো শতকের শেষ দিকে ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, অন্যান্য ইয়োরোপীয় কোম্পানি এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা। বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে কোম্পানির যে সব কর্মচারী ব্যক্তিগত ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা করেছিল তারা অনেকেই কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দেয়। ক্রমে তারা তাদের নিজস্ব বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তোলে। এগুলিকে বলা হত, 'এজেন্সি হাউস'। ১৭৯০ নাগাদ বাংলায় এরকম অন্তত ১৫টি এজেন্সি হাউসের কথা জানা যায়। এই এজেন্সি হাউসের সংখ্যা উনিশ শতকে আরও বাড়তে থাকে। মনে রাখা দরকার, ইংরেজ কোম্পানি তথা ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিকদের এজেন্সি হাউসগুলি মারফৎ বিনিয়োগকৃত মূলধনের বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ভারতীয় বণিকদের মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়।

এজেন্সি হাউসগুলি ছিল একাধারে বাণিজ্য কুঠি, ব্যাঙ্ক, হুণ্ডির দালাল, বীমার দালাল, জাহাজের মালিক ও পণ্য সরবরাহকারী সংস্থা। ১৮০৯ খ্রিঃ ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এজেন্সি হাউসগুলি ব্যাঙ্কের কাজ করত। অর্থাৎ ইংরেজ বণিক ও আবাদকারীদের টাকা নিরাপদে গচ্ছিত রাখা, বাণিজ্যে পুঁজি লগ্নী করার জন্য ঋণ দেওয়া, এমনকি নোট ছাপানো, বিভিন্ন দেশে জাহাজ পাঠানো সবই করত। মনে রাখা দরকার যে, ১৭৮০-৯০ থেকেই বাংলায় নীলচাষ শুরু হয়। ইংরেজ বণিকদের চীনে আফিঙ বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া হয়। জাহাজ শিল্পের বিকাশ ঘটে। এজেন্সি হাউসগুলির ভূমিকা প্রতি ক্ষেত্রেই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রেও তাই।

বাংলা থেকে যে-সব পণ্য রপ্তানি হত তার মধ্যে ছিল আফিঙ, কাঁচা তুলো, শস্য এবং সুতিবস্ত্র আর রপ্তানি করা হত সোনা-রূপো, চা, চিনি, মশলাপাতি। এজেন্সি হাউসগুলির কিছু ব্যবসায়ী শুধু এই সব কারবার নয়, তার সঙ্গে মদ তৈরির ভাটিখানা, ট্যানারি বা চর্ম শিল্পে, কয়লা খনিতে এবং নীলচাষে পুঁজি ঢেলেছিল। নীলচাষের ক্ষেত্রে এবং আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে অনেক কোম্পানির ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। প্রায় একচেটিয়া কারবার এবং তারা সরকারি সাহায্যও পেত। দেখা যায় যে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র দুটি এজেন্সি হাউস কলকাতা বন্দরের যাবতীয় বাণিজ্য জাহাজের ৬৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ তো করতই, কয়লাখনি, বাংলায় একমাত্র বস্ত্র কারখানা এবং পোতাশ্রয় সবই তাদের হাতে। ঘাটতি বাজেট সত্ত্বেও কোম্পানির সরকার এজেন্সি হাউসগুলিকে ঋণ দিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৮১১ থেকে ১৮৩৫ খ্রিঃ পর্যন্ত এজেন্সি হাউসগুলি সরকারের কাছ ১.৪৭ কোটি টাকার ঋণ পেয়েছিল। বস্তুত দুটি কথা ভুললে চলবে না। এক, এজেন্সি হাউসগুলির বণিকদের স্বার্থের সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের স্বার্থে জড়িত ছিল এবং দুই, সরকারি

রাজস্ব যা হত আফিঙ শুল্ক ও আবগারী শুল্ক থেকে তা অনেকটাই নির্ভর করত ইংরেজ বণিকদের সাফল্যের উপরে।

ইংরেজ বণিকদের অতিরিক্ত লোভএবং ফাটকাবাজির ফলে এত সুবিধা সত্ত্বেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি এজেন্সি হাউসগুলির দৈন্য শুরু হয়। এই ফাটকার কারবারের একটা বড়ো ব্যাপার ছিল বণিকরা অনেকেই অতিরিক্ত লাভের আশায় নীলচাষে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে নীলে আশানুরূপ লাভ হয়নি। ব্যাঙ্কগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিখ্যাত ভারতীয় বণিক প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'কার, টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি'ও ভেঙে পড়ে।

যাইহোক, কোম্পানির আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সরকারি নীতির ফলে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারেনি। মনে রাখা দরকার ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইনে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা কতকগুলি সুবিধে আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৭৯৮-এর পর ওয়েলেসলি তাদের আরও সুবিধে করে দেন। সুবিধে পেয়ে ইংরেজ বণিকগণ বাংলা থেকে নীল, কাঁচা রেশম, সুতি, রেশমী বস্ত্র, কাঁচাতুলো, চিনি, শস্য, সোরা ইত্যাদি ইয়োরোপের বাজারে বেশি করে রপ্তানি শুরু করে। ভারতীয় বণিকরা একাজে ছিল না। এরপর যুক্ত হলো চীন থেকে চা আমদানি, চীনে আফিঙ রপ্তানি।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া (Monopoly) বাণিজ্যিক অধিকার ছিল। ইয়োরোপীয় বণিক এবং এজেন্সি হাউসগুলির অর্থাৎ এককথায় সমগ্র ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের চাপে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইনে এই একচেটিয়া তুলে দিয়ে অবাধ বাণিজ্যের (Free Trade) নীতি গৃহীত হয়। ১৮১৩ পর্যন্ত কোম্পানির পরিচালক বর্গের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্য যত বেশি সম্ভব ভারতে রপ্তানি করা। এসব পণ্যের মধ্যে ছিল কাঁচ, ছুরি, কাঁচি, মদ, স্পিরিট, বই, টুপি ইত্যাদি। ১৮১৩তে একচেটিয়া কারবার উঠে যাবার পর বেসরকারি বণিকদের মুনাফার অঙ্ক বেড়ে গেল। আসলে একচেটিয়াই হোক, আর অবাধ বাণিজ্যই হোক, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতি নির্ধারিত হত বণিকতন্ত্রবাদ (Mercantilism)-এর নীতি দ্বারা। এর ফলে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

প্রথমত, মার্কেন্টাইল মতবাদ বা বণিকতন্ত্রবাদে উপনিবেশের পরিবর্তে নিজদেশের ব্যবসায়ে নিযুক্ত বণিক পুঁজির (Mercantile Capital) স্বার্থ রক্ষার্থে নীতি নির্ধারিত হয়। শুল্ক, ঋণদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় কোম্পানিগুলি যে সুবিধা পেত, ভারতীয় বণিকরা তা পেত না।

দ্বিতীয়ত, কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের ফলে চিরাচরিত ভারতীয় কারিগরী ও কুটির শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। সুতরাং এরফলে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যের প্রধান পথ বন্ধ হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ভারতীয়রা বাজার সম্প্রসারণের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিল না। ভারতীয় পুঁজিপতিগণ মূলধন শিল্পে তো নয়ই, এমনকি ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে পর্যন্ত নিয়োগ করার চাইতে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করত।

চতুর্থত, ভারতীয় উৎপাদকের কাছ থেকে ভারতীয় বণিকদের সরাসরি পণ্য ক্রয় বন্ধ হয়ে যায়। অর্থনৈতিক ও নানাবিধ অর্থনীতি বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ইংরেজগণ সরাসরি ভারতীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে পণ্য কিনে নিত। ফলে কাঁচা তুলো বা রেশম পর্যন্ত ভারতীয়রা কিনতে পারত না।

পঞ্চমত, ভারতীয় নৌশক্তির দুর্বলতাও ভারতীয় বণিকদের পক্ষে বিরূপ হয়েছিল। জাহাজ নির্মাণ শিল্প, জাহাজের মালিকানা, পোতাশ্রয় সবই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বিদেশীদের হাতে ছিল।

ষষ্ঠত, ভারতীয় বণিকদের কোনও শিল্প সংগঠন বা শিল্প জাতীয় সংস্থা না থাকাতে ঔপনিবেশিক শত্রুভাবাপন্ন সরকারের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত প্রতিরোধ সম্ভব ছিল না।

সপ্তমত, এই সব কারণে কোম্পানির শাসনে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্পক্ষেত্রের অবনতির সঙ্গে এটি ছিল সঙ্গতিসূচক।

অধ্যায় ৯

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ঃ দ্বিতীয় পর্ব (১৮৫৭-১৯৪৭)

Syllabus : The Colonial Economy : The Second phase.

১। ধন নিঃসরণ ও অবশিল্পায়ন

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর এবং নিজেদের হাতে শাসনভার গ্রহণের পর, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল— 'ধননিঃসরণ' ও 'অবশিল্পায়ন'। এই দুটির ধারার মধ্যে ধন-নিঃসরণ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এমনকি ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 'অবশিল্পায়ন' অবশ্য কোম্পানির আমল (১৭৭২-১৮৫৭) শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন ভারতের শাসনভার প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে, সেই নয়া ঔপনিবেশিক আমলে পরিবর্তিত হয়। শুরু হয় শিল্পায়ন। সেই সম্রাজ্যবাদী শাসনপর্বে শিল্পের উদ্যোগগুলির মধ্যে বিদেশী এবং দেশী উভয়বিধ উদ্যোগই ছিল। শিল্পায়নের এই ধারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নতুনভাবে আবর্তিত হয়। যাই হোক, শিল্পায়ন নয়, অবশিল্পায়নই আমাদের আপাতত আলোচ্য। অবশ্য তার আগে ধন নিঃসরণ প্রসঙ্গ।

ধন নিঃসরণ এবং অবশিল্পায়ন আলোচনা করার আগে এ দুটি কথার সংজ্ঞা জেনে নেওয়া দরকার। **ধন নিঃসরণ** বলতে এককথায় বোঝায় দেশের সম্পদ দেশের বাইরে চলে যাওয়া। একে ইংরিজিতে বলা হয় Drain of Wealth। ড্রেন বা নর্দমা দিয়ে যেমন জল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বেরিয়ে চলে যায়, তেমনি দেশের সম্পদ বেরিয়ে যাওয়াকে বলে ধন নিঃসরণ। একে **সম্পদের বহির্গমনও** বলা যেতে পারে। এককথায় এর চরিত্র হলো, **আর্থিক নিষ্ক্রমণ।** এই সম্পদের বহির্গমন ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। বলা বাহুল্য, দেশের সম্পদ ও অর্থ ক্রমে ক্রমে দীর্ঘদিন ধরে বহির্গমন হওয়ার ফলে ভারতবর্ষ ক্রমেই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধি এবং মুক্তি আন্দোলনের গোড়ার পর্বে দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই আর্থিক নিষ্ক্রমণ এর বাংলা প্রতিশব্দ বোঝাতে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অম্লান দত্ত 'অপহার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

যাই হোক, ধন নিঃসরণ বা সম্পদের বহির্গমন বলতে কী বোঝায়? একটি উপনিবেশের সম্পদ যখন ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ শাসন ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের দেশে নিয়ে যায় এবং বিনিময়ে উপনিবেশকে কিছুই দেয় না তখনই ধননিঃসরণ ঘটে, যা ঘটেছিল ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে। তাছাড়া উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত পুঁজি যখন উপনিবেশের অনুৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয় যা কখনোই সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হয় না তখনও

তা আর্থিক নিষ্ক্রমণ হিসেবে গণ্য। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের একটা বড়ো ভূমিকা থাকে। অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য লিখেছেন "খাস ঔপনিবেশিক আমলে, বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ ভাগে, রাষ্ট্রের আর একটা বড় ভূমিকা ছিল এদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডে ধন নিঃসরণের (Drain of Wealth) ব্যাপারে।"[১] অবশ্য এই নিঃসরণ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নয়, একশো বছরেরও বেশি আগেই শুরু হয়েছিল।

অবশিল্পায়ন কাকে বলে? এককথায় অবশিল্পায়ন বলতে বোঝায় শিল্পায়নের বিপরীত, শিল্পের অধোগতি। অর্থাৎ শিল্প গড়ে ওঠার বদলে শিল্পের ধ্বংস। সাধারণভাবে উনিশ শতকে ভারতীয় কারিগরী ও কুটির শিল্পের বিপর্যয়কে ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়ন বলেছেন। এটির দিকেও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ যেমন, মহাদেব গোবিন্দ র‍্যানাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁদের মতে হস্তশিল্পের বিপর্যয় ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছিল। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে তা দেখিয়েছেন।[২] রজনীপাম দত্ত, ধনঞ্জয় রামচন্দ্র গ্যাডগিল, সারদা রাজু, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, অমিয়কুমার বাগচী প্রমুখ আধুনিক লেখক এই অবশিল্পায়ন মেনে নিলেও, পণ্ডিতদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। সে প্রসঙ্গ পরে। আপাতত অবশিল্পায়নের সংজ্ঞা নিয়ে আরও আলোচনা করা যেতে পারে।

ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "শিল্পায়নের লক্ষণ হল কৃষিকার্য থেকে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের অংশের তুলনায় শিল্পকর্ম থেকে উৎপন্ন অংশ অনুপাতে বাড়ে, শিল্পকর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যা কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীত যদি হয়, অর্থাৎ যদি দেশের মানুষ শিল্পকর্ম ছেড়ে চাষ আবাদে জীবিকা অর্জন শুরু করে, অথবা জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বাড়তে থাকে আর শিল্পজ অংশ কমতে থাকে তা অবশিল্পায়ন (de-industrialisation) বলা চলে।"[৩] সুতরাং অবশিল্পায়ন শুধু শিল্পের ধ্বংস বা শিল্পের অধোগতি নয়, জীবিকা হিসেবে কৃষির তুলনায় শিল্পের নগণ্য ভূমিকা, জাতীয় আয় মূলত কৃষিক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন হওয়া।

সুতরাং, উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে পরিষ্কার যে ধননিঃসরণ এবং অবশিল্পায়নের যা চরিত্র, তা ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে লাভজনক এবং স্বার্থপন্থী হলেও, ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল। দাদাভাই নওরোজী তাঁর Poverty and Un-British Rule in India গ্রন্থে সে-বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন।

ধন নিঃসরণ : সম্পদের বহির্গমনের যে সংজ্ঞা আমরা আগে দেখেছি তদনুসারে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন এবং বহির্গমন শুরু হয় আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই, পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই। তদানীন্তন ইংরেজ কর্মচারীদের এবং আধুনিক ইংরেজ লেখকদের রচনাতে

পর্যন্ত এ স্বীকৃত। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক কোম্পানির আমলে "Perpetual drain from India"-র কথা উল্লেখ করেছিলেন।[১]

বস্তুতপক্ষে পলাশির পর ক্লাইভের আমল থেকেই শুরু হয়ে যায় লুট আর লুণ্ঠন, বিষয়টিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কার্ল মার্ক্স লিখেছেন যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ ভারতীয় সভ্যতার ধ্বংসকারী। সত্যি কথা। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের 'হাউস অফ কমন্স'-এ ক্লাইভ স্বীকার করেছিলেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি "শুধু বর্তমান দেখেছে, ভবিষ্যত দেখেনি" এবং সেজন্য তাদের নীতি ছিল "immediate division of the loaves and fishes"। অর্থাৎ সেই মূহূর্তে যা পাওয়া যায় লুটে নেওয়াই তাদের লক্ষ্য ছিল।

শুধু ক্লাইভ নয়, হেনরি ভেরেলেস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, জনশোর প্রমুখ কোম্পানির নেতৃবর্গ সম্পদ নিষ্ক্রমণের ব্যাপারে মতামত জানিয়েছিলেন। যেমন, জন শোর তার "Notes on Indian Affairs" গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষ একদা যে বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিল তার একটা বড়ো অংশই বাইরে চালান করে দেওয়া হয়েছে। উপঢৌকন, উৎকোচ, নবাবকে চাপ দিয়ে অর্থ আদায়, অবৈধ ব্যবসা, শুল্ক ফাঁকি, ব্যক্তিগত ব্যবসা দিয়ে পলাশির পর লুটের (Plunder) যে রাজত্ব কোম্পানি শুরু করে, ১৭৬৫-র পর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সেই শোষণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ থেকে দ্রুত সম্পদ আহরণের ফলেই ১৭৭০ এর (বঙ্গাব্দ ১১৭৬) মন্বন্তর দেখা দেয়। সংঘবদ্ধভাবে ধননিঃসরণ শুরু হয় ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে।[২] আবার ১৮৩৪-৩৫ থেকে ১৮৫৭-৫৮ অর্থাৎ কোম্পানির আমলের শেষ পর্বে দেখা যায় ভারত থেকে নিঃসরণ হওয়া সম্পদের মূল্য ১৫১, ৮৩০, ৯৮৯ পাউণ্ড।[৩]

বাংলা থেকে অর্থনিষ্ক্রমণ হত প্রধানত দুটি ধারায়— (১) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক অনুসৃত অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে এবং (২) ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বেসরকারি এবং সরকারি বণিকদের মাধ্যমে। ১৭৭২ এর আগে কোম্পানির কর্মচারীবর্গ প্রভূত অর্থ অর্জন করে দেশে নিয়ে যান। এক কথায় বলা যায়, ইংরেজ বণিকদের, এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মচারিবৃন্দের চরম অর্থ লালসা বাংলার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে আমাদের দেশের অর্থের এক বিরাট অঙ্ক ইংল্যাণ্ডে চালান করেছিল। এক্ষেত্রে উপঢৌকন, পারিতোষিক বা নজরানার চেয়ে বেসরকারী ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিপুল অর্থের গুরুত্ব অনেক বেশি বলে ইতিহাসবিদ ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মনে করেন। তবে ক্লাইভ, জনস্টন, সিনিয়র, লিসেষ্টার, সাইকস্, ভেরেয়েল, বার প্রমুখ প্রায় সকলে কপর্দকহীন অবস্থায় এসে দেশে ফিরে যাবার সময় লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে 'হাউস অফ

কমন্স' এর 'সিলেক্ট কমিটি'র কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ক্লাইভ লজ্জাহীনভাবে তা স্বীকারও করেছেন। এই ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে উত্তরকালে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "It never struck Clive that the treasure belonged neither to the company not to him, but to the country, and should have been devoted to the people". (অর্থাৎ ক্লাইভের এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের একথা মাথায় আসেনি যে, এই সম্পদ কোম্পানির নয়, তাদের নিজেদেরও নয়, এই অর্থ এ দেশের এবং এ দেশের জনগণের জন্য তা ব্যয় করা উচিত ছিল)।

এভাবেই শুরু হয় ধননিঃসরণ। রজনীপাম দত্ত লিখেছেন যে, এভাবেই কোম্পানির বণিকদের প্রিয় স্বপ্ন পূরণ হলো ভারত থেকে সম্পদ বের করে নিয়ে যাওয়া এবং বিনিময়ে কিছু না দেওয়া[১]। ১৭৬৫-র আগে বা ১৭৬৫-১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যুগেই যে ধননিঃসরণ সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর তখনও তিনি অবৈধ চুক্তির দ্বারা তার নিজের প্রিয়পাত্রদের বিপুল অর্থ পাইয়ে দিয়েছিলেন। এরা পণ্য সরবরাহ করত। এই এজেন্টরা পণ্য সরবরাহ করার সময় দেশীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে সেলামী নিত, কম দামে জিনিস কিনত এবং মুনাফা তো ছিলই। সরকারি-বেসরকারি কর্তাব্যাক্তিরা সকলেই দেশে টাকা চালান দিত। এ জন্য তারা নানা পন্থা অবলম্বন করেছিল। কোম্পানির উচ্চপদস্থ অনেকে পাঠাতেন মূল্যবান পাথর বা হীরের মাধ্যমে। বেসরকারি ইংরেজ বণিকরা অনেক সময় এখানে কোম্পানির তহবিলে টাকা রেখে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ' মারফৎ ভাঙিয়ে নিত। এতে সুবিধে না হওয়াতে তারা হয় পণ্য ইয়োরোপে দেশীয় কোম্পানির মাধ্যমে এবং শেষে নানা এজেন্সি হাউসের মাধ্যমে পাঠাত। ১৭৭০-১৭৮০ থেকে ১৮০০-র মধ্যে বহু সমসাময়িক নথিপত্রে এই ধন নির্গমনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারি নীতি বা 'পাবলিক পলিসি' ভারত থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আবার এ দেশ থেকে অর্জিত অর্থ এ দেশের পণ্য ক্রয় করার জন্য বিনিয়োগ করে সেই পণ্য ইয়োরোপে রপ্তানি করে মুনাফা লুটত। সুতরাং, পণ্যের মাধ্যমেও সম্পদের বহির্গমন ঘটে।[২] সমসাময়িক জেমস গ্র্যান্ট থেকে আধুনিক ইতিহাসবিদ হোল্ডেন ফারবার পর্যন্ত সকলেই একথা স্বীকার করেছেন।[৩] এইভাবে ১৮০০-১৮৫৭ পর্বে ধন নিঃসরণ চলেছে। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে মন্টগোমারি মার্টিন লিখেছেন যে, বিগত তিরিশ বছর ধরে এই নির্গত সম্পদের পরিমাণ বার্ষিক ৩০

লক্ষ পাউণ্ড এবং তা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত দাড়ায় ৭২৩,৯৯৭,৯১৭ পাউণ্ড। এই সম্পদ ইংল্যাণ্ড থেকে চলে গেলে ইংল্যাণ্ডবাসী না খেয়ে মরে যেত। ভারত ছিল সমৃদ্ধ দেশ; তবু দেশের ধন নিঃসরণের কুপ্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সম্পদের বহির্গমন এত বেশি পরিমাণে হয়েছিল যে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশকে তা দারিদ্রে পরিণত করত। ভারতবর্ষকে তা দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করে। কোনও কোনও আধুনিক লেখক, যেমন থিওডর মরিসন, পিটার মার্শাল প্রমুখ বলার চেষ্টা করেছেন যে, সম্পদ নির্গমন একতরফা হয়নি, প্রতিদানে ভারত বীমা, ব্যাঙ্কিং, প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিষেবা পেয়েছিল। এই সব যুক্তি আদপেই গ্রহণ যোগ্য নয়। জঙ্গলের রাজত্বে পরিষেবা? জঙ্গলের রাজত্বের কথা আঠারো শতকেই ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপকার স্বয়ং কর্নওয়ালিসের মুখে শোনা গেছে ঃ "I may safely assert that one third of the Company territory in Hindusthan is now a jungle inhabited only by wild beasts."

এই লুণ্ঠন প্রধানত হয়েছে বাংলায়। তবে রামকৃষ্ণ মুখার্জী সঠিকভাবে দেখিয়েছেন যে, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত, বোম্বাই-দাক্ষিণাত্য কিছুই লুটের আওতা থেকে বাদ যায় নি।[১] আবার এই সম্পদের বহির্গমন কোম্পানির আমলেই শেষ হয়ে যায় এমন নয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যক্ষভাবে ভারত শাসনভার হাতে নিয়েও অবস্থা বদলায়নি। "ব্রিটিশ ভারতের সরকার বিদেশে ধন চালান করার যে কল বসিয়েছিল" তার কারণগুলি দেখিয়েছেন অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য।[২] সুতরাং ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে আর্থিক নিষ্ক্রমণ (Economic Drain), তা সন্দেহাতীতভাবে আজ প্রমাণিত।

অবশিল্পায়ন ঃ ধননিঃসরণের মতন, কোম্পানির আমলে দেশীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসসাধন এবং করিগরদের সর্বনাশও ঐতিহাসিক সত্য। অবশিল্পায়নও তাই সন্দেহের উর্ধে। এ বিষয়ে কিছু সাম্রাজ্যবাদী ও পশ্চিমী লেখক অযথা বিতর্কের অবতারণা করেছেন। অবশিল্পায়ন কাকে বলে তা আমরা আগেই দেখেছি। কোম্পানির আমলে প্রাচীন কুটির শিল্পের অবনতি, বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস এবং ভারতবর্ষকে ইংল্যাণ্ডের কৃষিখামারে (Agricultural Farm of England) পরিণত করার ব্যাপারটি যেহেতু অস্বীকার করা যায় না, তাই অবশিল্পায়নের তত্ত্ব মেনে নিতে হয়। জাতীয়তাবাদী নেতারা, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক অনেকেই তা মেনেছেন। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা এ নিয়ে চর্চা করেছেন। যেমন আমেরিকান লেখক মরিস ডেভিড মরিস, জাপানী ইতিহাসবিদ তরু মাৎসুই এবং ভারতীয় পণ্ডিত ডঃ তপন রায়চৌধুরী, ডঃ বিপান চন্দ্র প্রমুখ এই তর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৩] তবে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অবশিল্পায়ন অস্বীকার করা হলেও তার ঐতিহাসিকতা স্বীকার্য। তবে বিষয়টি

বিতর্কিত।[১] তবে ধনঞ্জয় রামচন্দ্র গ্যাডগিল থেকে অমিয়কুমার বাগচী পর্যন্ত অবশিল্পায়ন মানেন।[২]

জাতীয়তাবাদী লেখকবৃন্দ (যেমন রমেশচন্দ্র দত্ত, র‍্যানাডে, মালব্য প্রমুখ) সমসাময়িক ইংরেজ আমলাদের প্রতিবেদন, বিদেশীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সরকারি অর্থনৈতিক তদন্ত ইত্যাদির ভিত্তিতে আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কুটির শিল্পের ক্রমাবনতি দেখিয়েছেন। উনিশ শতকের শুরু থেকে আমদানি রপ্তানির হিসেব থেকে দেখা যায় যে কুটির শিল্পজাতপণ্যের রপ্তানি একদিকে কমেছে, অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের শিল্প দ্রব্যের আমদানি বেড়েছে। ১৮৫৮-র পরেও অবস্থা বদলায় নি যদিও তখন শিল্পায়ন প্রচেষ্টা ভারতে স্বদেশী ও বিদেশী উদ্যোগে শুরু হয়েছে।

এককালে ভারতীয় সূতির বস্ত্র বিপুলভাবে রপ্তানি হত সর্বত্র অথচ ১৮৬০ এ সূতির কাপড় আমদানি হয়েছে ৯৬ লক্ষ পাউণ্ডের, ১৮৮০-তে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড আর ১৯০০ খ্রিঃ নাগাদ ২৭ কোটি পাউণ্ড। বস্তুত ভারত স্বকীয় শিল্পকর্ম হারিয়ে ইংল্যাণ্ডে শিল্পদ্রব্যের বাজারে পরিণত হলো। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ গবেষণা করে দেখিয়েছেন অবশিল্পায়নের সবচাইতে বড়ো দৃষ্টান্ত বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস। মুক্ত বাণিজ্যের হোতা ইংল্যাণ্ডের প্রতিভু ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, তবু তারাই একচেটিয়া শুরু করে এবং রাজনৈতিক জোরখাটিয়ে বস্ত্রশিল্পকে সংকটাপন্ন করে তোলে। মাদ্রাজের ক্ষেত্রে শারদা রাজু, অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে রমন রাও, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আর. ভি. চোকসি এবং বাংলার ক্ষেত্রে হরিরঞ্জন ঘোষাল গবেষণা করে এই অবশিল্পায়নের চিত্র দেখিয়েছেন। মনে রাখা দরকার, ঐ সময় ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব হয় এবং সেই কারণে উপনিবেশ হাতে থাকাতে, কোম্পানি ভারতকে কাচাঁমাল সংগ্রহের দেশ এবং একইসঙ্গে সেই কাঁচা মাল সংগ্রহ করে নিজেদের দেশে এনে, শিল্প পণ্য উৎপাদন করে, আবার উপনিবেশে রপ্তানি করে মুনাফা দেশে নিয়ে আসা শুরু করে। এই ঔপনিবেশিক চক্রের সঙ্গে অবশিল্পায়ন জড়িত ছিল।

অবশিল্পায়নের বিপক্ষে যে সব গবেষক যুক্তি পেশ করেছেন, সেগুলি নানারকম। প্রথমত একদল মনে করেন অবশিল্পায়ন হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, কিন্তু তারপর ভারতে বহু কলকারখানা গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের গোড়ায় অবশিল্পায়নের প্রমাণ নেই। এই মতের প্রবক্তাদের অন্যতম ড্যানিয়েল থর্নার[৩]। এই মতের প্রবক্তাদের বক্তব্য

এই যে, ১৮৮১ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে ভারতীয় জনগণনার হিসেবে কৃষি ও শিল্পকর্মে নিয়োজিত মানুষের হিসেব থেকে প্রমাণ হয় না যে অবশিল্পায়ন চলছিল। একথা যদিও সত্য যে অবশিল্পায়ন মূলত ঘটেছিল ১৮০০-১৮৬৫ সময়ের মধ্যে, তবু একথাও মানতে হবে "কেবল শিল্প বা কৃষিকর্মে ক'জন জীবিকা অর্জন করছে এই আদমসুমারি অবশিল্পায়ন তর্কের শেষ কথা নয়।" জন প্রতি উৎপাদন বাড়ে-কমে কারিগরী (Technological) পরিবর্তন অনুযায়ী এবং এইভাবে কৃষি বা শিল্পের উৎপাদন বাড়তে বা কমতে পারে, কর্মী সংখ্যার হিসেব যখনই হোক না কেন; এই উৎপাদনের হিসেবটা অর্থাৎ জাতীয় আয়ে শিল্পজ বা কৃষিজ আয়ের অংশ না জানলে পরে অবশিল্পায়ন সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না।[১]

দ্বিতীয়তঃ, একদল মনে করেন অবশিল্পায়ন আদৌ হয়নি। এই মতের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা আমেরিকান ঐতিহাসিক মরিস ডেভিড মরিস[২], এদের যুক্তি হলো ঃ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা শিল্পদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন ভেবে ভুল করেছেন। যদি জনসংখ্যা আর জাতীয় আয় বাড়ে তবে দেশীয় শিল্প অক্ষুন্ন রইলো—আমদানিও বাড়লো। তাছাড়া শিল্পদ্রব্যের আমদানিতে যেমন এক দেশীয় শিল্প ক্ষতি হতে পারে তেমনি অন্য শিল্পের বৃদ্ধি হতে পারে। আরও বলা যায় যে, বিলিতি উৎপন্ন পণ্য আমদানি সত্ত্বেও অনেক প্রাচীন কুটির শিল্প টিকে ছিল নিজস্ব বাজার থাকার জন্য। এই যুক্তিগুলি একটিও তথ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয় না বলে সব্যসাচী ভট্টাচার্য মনে করেন।[৩] আগেই অবশ্য বিপান চন্দ্র, তপন রায়চৌধুরী প্রমুখ মরিস ডি মরিসের যুক্তির সারবত্তা খণ্ডন করেছিলেন।[৪]

তৃতীয়ত, একদল লেখক মনে করেন অবশিল্পায়ন হয়েছিল বটে কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ (division of labour) কৃষিপ্রধান ভারত ও শিল্প প্রধান ব্রিটেনের মধ্যে হওয়াটা স্বাভাবিক ও উভয়ের পক্ষেই লাভজনক। এই মতের প্রবক্তা রিচার্ড কবডেন, জন ব্রাইট, থিয়োডর মরিসন প্রমুখ। এই দৃষ্টিভঙ্গির সারকথা হলো অর্থনৈতিক অগ্রগমনের রাস্তা শ্রমবিভাজন। তাই ইংল্যাণ্ড শিল্পপ্রধান এবং ভারতীয় উপনিবেশ কৃষিপ্রধান হওয়াতে উভয়ের মঙ্গল ও লাভ। বলা বাহুল্য এই মতও গ্রহনীয় নয়। প্রাক্ ঔপনিবেশিক গ্রামের স্বনির্ভরতা, গ্রামীণ অর্থনীতিতে শিল্প ও কৃষির মিলন, ভারতীয় শিল্প পণ্যের বিদেশে চাহিদা, বিশেষত সূতিবস্ত্রের—এগুলি অনস্বীকার্য এবং ব্রিটিশ আমলে তার ধ্বংসও আমরা মানতে বাধ্য। ব্রিটেন শিল্প বিপ্লবের, ভারত থেকে কাঁচামালের, ভারতের বহির্গত সম্পদের অর্থাৎ মূলধনের এবং ভারতীয় বাজারে বিক্রির সুযোগ সদ্ব্যবহার করেছিল।

কার্ল মার্ক্স তার Captial গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে ভারত থেকে বহির্গত সম্পদ ব্রিটেনে গিয়ে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারত থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া সম্পদ ব্রিটেনের

এক শ্রেণীর মানুষকে অর্থশালী করে তোলে এবং তারা সেই সঞ্চিত অর্থ ব্রিটেনে শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে। সুতরাং ভারতের অবশিল্পায়ন,ধননিঃসরণ এবং ব্রিটেনের উন্নতি একসূত্রে বাঁধা। তবে ১৭৫৭—১৮১৩ পর্বে ধননিঃসরণ হলেও তখন ছিল কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য, তবে ১৮১৩-র পর অবাধ বাণিজ্য নীতি গৃহীত হবার পরই অবশিল্পায়ন এবং ধননিঃসরণ দুটোই বৃদ্ধি পায়। ভারত থেকে কাঁচামাল পাঠাও, বিলেত থেকে মিলের কাপড় আনো এই নীতিতে তাঁতিদের সর্বনাশ, কোম্পানির পৌষমাস। মনে রাখতে হবে, ১৮১৩-তে ইংল্যাণ্ডের সরকার বাংলার মসলিনের উপর ৪৪% এবং ক্যালিকো ও 'ডিমিটি' কাপড়ের উপর ৮৫% আমদানি শুল্ক ধার্য করে। ক্রমে ম্যানচেষ্টারের বিলিতি মিলের কাপড় ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলল। দামও ভারতের কাপড়ের চেয়ে সস্তা। ব্যস্, ভারতীয় বাজার চলে গেল আর বিদেশে রপ্তানি তো আগেই বন্ধ। সুতরাং জাতীয়তাবাদী নেতারা ঠিকই দেখিয়েছিলেন যে, একদিন সেই সোনার সময় ছিল যখন— 'বাংলার মসলিন বাগদাদ, রোম, চীন / কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন', তা ধ্বংস হয়ে গেল। রমেশচন্দ্র দত্ত এই সূতিবস্ত্র শিল্পের অবলুপ্তিকেই চিহ্নিত করেছেন সবচেয়ে দুঃখজনক অধ্যায় বলে।

২। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

উনিশ শতকে, বিশেষত ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পর অর্থাৎ ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আমূল রূপ বদল ঘটে।[১] এ কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক বিপান চন্দ্র লিখেছেন ঃ "....India took big strides forward in its foreign trade which virtually ushered in a commercial revolution in the country. Imports and exports increased considerably in both volume and value; they also underwent dramatic changes in their scope and character".[২]

কিন্তু এই 'বাণিজ্য বিপ্লব' বা Commercial Revolution ভারতীয়দের আদৌ লাভজনক হয়নি বরং ক্ষতিকারক হয়েছিল। ব্যাপ্তিতে মূল্যে বৈদেশিক বাণিজ্য যতই স্ফীত হোক, তার মুনাফা ভারতীয়দের হাতে আসেনি। উনিশ শতকের শেষদিক থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, "সাধারণভাবে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্য কতটা ছিল উনিশ শতকের শেষ ভাগে, ভাবা যায় না। যেমন, ১৮৭৪-৭৯ সালে ভারতের গড় আমদানির ৮২ শতাংশ আসত ইংল্যাণ্ড থেকে, ভারত থেকে রপ্তানির ৪১ শতাংশ যেত ইংল্যাণ্ডে। ত্রিশ বৎসর পর ১৯০৪-০৯ সালে দেখা যায়, ইংল্যাণ্ডের অংশ কমে দাঁড়িয়েছে

আমদানির ৬৬ শতাংশে এবং রপ্তানির ২৬ শতাংশ। আরও ত্রিশ বৎসর পর ১৯৩৪-৩৭ সালে ঐ সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ৩৯ এবং ৩২ শতাংশ। বিশের দশক থেকে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে আমদানি কমতে শুরু করে দ্রুত গতিতে, কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধিটাও ইংলণ্ডের স্বার্থের উপযোগী ছিল।"[১]

আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশীয় সওদাগরদের হাতে অন্তর্বাণিজ্য ছিল কিন্তু তখন থেকেই ইংরেজ কোম্পানির ধাক্কাটা জোরদার হয়ে ওঠে। বহির্বাণিজ্যের মধ্যে সমুদ্র বাণিজ্যে ১৭৫০ এর আগেই বিদেশীদের প্রাধান্য। ১৭৫০ থেকে বহির্বাণিজ্যে এবং সংশ্লিষ্ট কারবারে প্রতিযোগিতাভিত্তিক ব্যবসা থেকে একচেটিয়াতে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়ার ফলে অন্তর্বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্য দুইয়েতেই দেশীয় বণিকদের প্রাধান্য খর্ব হয়। সওদাগরি পুঁজির (Commercial Capital) লাভ ও বৃদ্ধির রাস্তা হলো সস্তায় কেনা ও বেশি দামে বেচা। বহির্বাণিজ্যে দেশীয় বণিকদের ভূমিকা ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অধ্যাপক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, অমলেশ ত্রিপাঠী প্রমুখ দেখিয়েছেন কীভাবে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয়বিধ বাণিজ্যেই দেশীয় বণিকরা সরে গেল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেই চেহারা স্পষ্ট রূপ নেয়।

১৮১৩ পর্যন্ত ভারত ছিল মূলত উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানিকারক এবং দামি পাথর-ধাতু বিলাসী দ্রব্যের আমদানিকারক। অথচ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত হলো মূলত কৃষিজ কাঁচামাল এবং খাদ্য শস্যের রপ্তানিকারক এবং উৎপাদিত পণ্যের আমদানিকারক। এই চরিত্র বদল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আমদানী রপ্তানী প্রায় সর্বাংশে (কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে) বিদেশীদের হাতে, এটিও গুরুত্বপূর্ণ।

বিপান চন্দ্র লিখেছেন, "Cotton and silk textiles and other traditional staples of export were gradually replaced by a variety of agricultural products"[২] ভারত থেকে যেত রকটন বা কাঁচাতুলো, পাট, চা, কফি, আফিঙ, তৈলবীজ, গম এবং চাল। ১৮৮১-৮২ তে মোট রপ্তানির ১৭ শতাংশই গম-চাল আর ১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে গম-চাল হলো মোট রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ২৬ ভাগ। আমদানি করা হত সূতিবস্ত্র, সুতো (সেলাই করার), ধাতুজদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, চিনি এবং তেল। লক্ষ্যণীয় যে, ১৮৮১-৮২ তে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির ২৪% হলো সূতির জিনিস যা ১৯০৪-০৫ খ্রিঃ বেড়ে হয় ৩৯ শতাংশে।

উনিশ শতকের বৈদেশিক বাণিজ্যে কতকগুলি নতুন প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, (ক) লৌহ-ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতির আমদানি বেশি তবে পাট এবং পরে সূতিবস্ত্রও রপ্তানি হতে শুরু করে; (খ) রপ্তানি বেশি, আমদানি কম। (গ) বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্রুত বৃদ্ধি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মতে ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর, যে মতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন, রমেশচন্দ্র

দত্ত, দীনেশ ওয়াচা, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ। বিশেষত দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে খাদ্যশস্য রপ্তানি দেশের মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল অবশ্যই। নরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

৩। শিল্পায়ন (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের আগে)

এক সময় ভারতে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ছিল বিশ্বজোড়া। সূতি-রেশমী-পশমী বস্ত্র, লোহার জিনিস, কাগজ, কাঁচ, চীনামাটির সামগ্রী, মশলা, আফিম ইত্যাদি শিল্পজাত সামগ্রীর কদর ছিল এশিয়া ও ইয়োরোপের বাজারে। তারপর এলো কোম্পানির আমল। কোম্পানি এসব সামগ্রীর ন্যায্য মূল্য না দিয়ে ভারত থেকে সংগ্রহ করে ইয়োরোপের বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে মুনাফা লুটে নিত। ভারতীয় কারিগর এবং উৎপাদকগণ এর ফলে শোষিত হয়েছে। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঘটে গেল শিল্প-বিপ্লব। এর ফলে সেখানে কল-কারখানায় অল্প সময়ে উৎকৃষ্ট মানের প্রচুর সামগ্রী উৎপন্ন করা সম্ভবপর হলো। এই সব শিল্পজাত পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের অধিকাংশ পাওয়া যেত ভারতীয় উপনিবেশ থেকে। আবার ঐ সব উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করবার বাজার হিসেবে ভারতই ছিল একটি উপযুক্ত দেশ। সুতরাং ভারতের শিল্প সামগ্রী যাতে বাইরে যেতে না পারে তার জন্য ভারতীয় শিল্পপণ্যের উপর অধিক রপ্তানি শুল্ক বসানো হলো। আর ইংল্যাণ্ডের মিলে তৈরি সামগ্রীর উপর নামমাত্র আমদানি শুল্ক ধার্য করা হলো। ক্রমে ভারতীয় শিল্প ধ্বংস হলো আর ইংল্যাণ্ডের কারখানা জাত পণ্য সামগ্রীতে দেশ ছেয়ে গেল। ভারতীয় শিল্পী, কারিগরের জীবিকা ধ্বংস হলো। শিল্পী ও কারিগররা কৃষির উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হলো। এর ফলে কৃষির উপর অসাধারণ চাপ সৃষ্টি হলো।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের এক কমিটিতে মন্টগোমারি মার্টিন বলেছিলেনঃ "আমি মনে করিনা যে ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ; কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের দিক থেকেও ভারতবর্ষ উন্নত। এখন তাকে জোর করে কৃষি নির্ভর দেশে পরিণত করা অত্যন্ত অন্যায় হবে।" কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর কলকারখানা গড়ে উঠেছে ইংল্যাণ্ডে। সেই সব কারখানার রসদ হিসেবে চামড়া, তেল, রঙ, পাট, তুলো প্রভৃতি রয়েছে ভারতে— এই কাঁচামাল সরবরাহ করবার দায়িত্ব পড়ল ভারতের উপরে। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা এ দেশের কোম্পানির সরকারের নিকট থেকে জমির মালিকানা নিয়ে কারখানা প্রতিষ্ঠার অনুমতি পেল। তাই ইংল্যাণ্ডের মালিক এদেশের মাটিতে ধীরে ধীরে নীল, চা, কফি, রবার প্রভৃতি উৎপাদনের জন্যে বেশ জাঁকিয়ে বসল। ইংরেজের স্বার্থে দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে এলো। একেই বলা হয় অবশিল্পায়ন।

এরপর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবস্থার বদল ঘটলো। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের ভাষায়, "ঔপনিবেশিকতার অন্তুতায় প্রথম ঘটেছিল শিল্প বিনষ্টি বা অবশিল্পায়ন উনিশ শতকের প্রথম দিকে। এরপর একটা নবশিল্পায়ন গোছের শুরু হল নতুন কলকারখানায় বিদেশী

যন্ত্রবিদ্যার দৌলতে। প্রথম পর্যায়ে শিল্প পিছু হটেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে চলল খুঁড়িয়ে।"[১] কোম্পানি শাসনের শেষ দিকে এদেশে লর্ড ডালহৌসির চেষ্টায় যখন রেলপথ স্থাপিত হলো তখন থেকেই বলা চলে, এদেশে আধুনিক শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ সূচিত হয়। বিদেশী ও ভারতীয় উভয় বণিক ও শিল্পগোষ্ঠী ভারতেই যন্ত্রযুগের সূচনা করল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই শহরে কাওয়াসজি নানাভাই দাভার সর্বপ্রথম কাপড়ের কল স্থাপন করেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নিকট রিষড়ায় প্রথম চটকল স্থাপিত হলো। এরপর ধীরে ধীরে ঐ দুটি শিল্পের উন্নতি ঘটতে থাকে। বাংলায় পাট বেশি উৎপন্ন হয়। সুতরাং পাট শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটলো বাংলায় এবং মহারাষ্ট্রে তুলো বেশি উৎপন্ন হয়, তাই সুতোকলগুলি বোম্বাইকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পর কোম্পানির শাসনের পরিবর্তে এলো ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন। এই সরকার ভারতকে কৃষি প্রধান দেশে পরিণত করে রাখার ব্যবস্থা করল। চালু হলো অবাধ বাণিজ্য নীতি। অল্প শুল্কে ইংল্যাণ্ডজাত সামগ্রী অবাধে ভারতে প্রবেশ করার সুযোগ পেল। এদেশ থেকে স্বল্পমূল্যে কেনা কাঁচামাল ইংল্যাণ্ডের কলকারখানার জন্য আমদানি করার ব্যবস্থা গৃহীত হলো। সুতরাং শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি ঔদাসীন্য বহাল রইল। কিন্তু অবাধ বাণিজ্য নীতির সূত্রে দেশী ও বিদেশী বণিকেরা হতাশ হননি। এই যুগেই ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। তাই ভেরা এনেস্টি লিখেছেন ঃ "উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতের মোট উৎপাদন ও ব্যবসা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল— কিন্তু এই পরিবর্তন ভারত ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত পরস্পর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করলো। এর মধ্য দিয়ে ভারত মূলত কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানি এবং ইংল্যাণ্ডজাত শিল্প-সামগ্রী আমদানির দিকে এগিয়ে গেল।"[২]

উদ্যোগের বিচারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার (১৯১৪) আগে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়— ইয়োরোপীয় উদ্যোগ ও ভারতীয় উদ্যোগ। ভারতে শিল্পায়নে ব্রিটিশ শিল্পপতিদেরই পর্যাপ্ত প্রাধান্য ছিল। তারাই ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করেন। তবে শিল্পের বিকাশ সুষম হয়নি। আবার পূর্ব ভারতের মানুষদের স্বদেশী উদ্যোগ কম, তুলনায় পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলের পার্শি, গুজরাটি, মারওয়াড়িদের উদ্যোগ অনেক বেশি। শিল্পায়নের দ্বারা আপামর ভারতবাসীর বিশেষ উপকারও হয়নি। অর্থনীতিবিদ ডঃ অমিয় কুমার বাগচী দেখিয়েছেন যে, বিদেশী পুঁজির আধিপত্য ঠিক তার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল ছিল না। এই আধিপত্যের মূল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির গঠন ও শাসনব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। ডঃ বাগচীর মতে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসননীতিই ভারতীয় উদ্যোগের বিকাশের পক্ষে ছিল সবচেয়ে বড়ো বাধা।[৩]

ইয়োরোপীয় শিল্প-উদ্যোগ : বিদেশী পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষকে আধুনিক শিল্পায়িত দেশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এদেশে মূলধন লগ্নী করেনি। তারা মূলধন বিনিয়োগে করেন এদেশে কাঁচামালের প্রাচুর্য, স্বল্প পরিবহণ ব্যয়, শস্তা জমি, শ্রমিকদের কম মজুরি এবং প্রতিযোগিতাহীন বাজার— এসবই মূলধন বিনিয়োগ আর্থিক মুনাফা অর্জনের সহায়ক ছিল বলে। তাই ভারতে ও ব্রিটেনে রেজিস্ট্রীকৃত বিভিন্ন কোম্পানিতে টাকা লগ্নী করে, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে, রেলপথের সাহায্যে (রেল নির্মাণ শিল্পেও টাকা ঢেলে), আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ও ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি শাসনবর্গের সহায়তায় ভারতে ব্রিটিশ-শিল্প উদ্যোগ গড়ে ওঠে।

চটকল ও পাটশিল্প মূলত ব্রিটিশদেরই হাতে ছিল। স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি নামক জায়গায় প্রথম যন্ত্রের সাহায্যে পাট থেকে পাটজাত দ্রব্য তৈরি করার জন্য পাটকল স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার হুগলি জেলায় রিষরায় প্রথম পাটকল স্থপন করেন জর্জ অকল্যান্ড নামে এক ব্রিটিশ নৌবাহিনীর প্রাক্তন কর্মী। ধীরে ধীরে গঙ্গার দু'পাশে অসংখ্য চটকল স্থাপিত হয়। ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত চটকলের সংখ্যা ছিল ৬৪। 'কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' (২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৮) অনুযায়ী পাটশিল্প তখন একটি আমেরিকান ছাড়া সবই ব্রিটিশদের পরিচালনাধীন। পাটশিল্প সুসংগঠিত করবার জন্য মালিকদের সংগঠন 'ইণ্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে।[১]

কয়লাশিল্পেও পাটের মতন প্রভূত ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। সংগঠিতভাবে কয়লা তোলার কাজ প্রথম শুরু হয় ১৮২০ থেকে বাংলার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে। কয়লার দ্রুত চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে শিল্পের প্রসার হয়। ১৮৫৪তে খনির সংখ্যা যেখানে তিন, ১৮৭৯-৮০তে তা হয় ৫৬টি। এগুলির প্রায় সবই বাংলা-বিহারে। কোম্পানিগুলির মধ্যে আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোং, বরাকর কোল কোম্পানি, বেঙ্গল কোল কোম্পানি, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চা ও কফি শিল্প ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপীয় মালিকদের অধীনে 'অসম টি কোম্পানি'-এর পথিকৃৎ। এর আগে পরীক্ষামূলকভাবে অসম কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অঞ্চলে চা-চাষ শুরু হয়। পরে দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স এলাকাতে চা উৎপাদন আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে অজস্র চা-বাগান গড়ে তোলা হয়। কফি চাষও বাংলায় শুরু হয়, তবে দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণে কফি চাষের সমৃদ্ধি ঘটে। এর আগে নীল (Indigo) চাষ করে ইয়োরোপীয়গণ প্রভূত আয় করেন। পরে রাসায়নিক ক্রিয়ায় নীল উৎপাদন শুরু হলে এই শিল্পের পতন ঘটে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় অপেক্ষাকৃত কম। বিদেশী মালিকরা প্রথম লৌহ কারখানা স্থাপন করেন ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার ঝড়িয়া

কয়লাখনি অঞ্চলে। নাম বরাকর আয়রন ওয়ার্কস্। ১৮৮৯তে এর মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করে বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি। কোম্পানির সদর দপ্তর ছিল ইংল্যাণ্ডে। এরপর আসানসোলের কাছে হীরাপুর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করে বার্ণ অ্যাণ্ড কোং। এছাড়া ইয়োরোপীয় উদ্যোগে যে সব শিল্পের বিনিয়োগ হয় সেগুলির মধ্যে কাগজ, জাহাজ নির্মাণ, কাঁচ, চর্ম ইত্যাদি শিল্প উল্লেখযোগ্য। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে বালি মিলস স্থাপনের পরেই ভারতে যন্ত্রোৎপাদিত কাগজ তৈরি শুরু হয়। তারপর ক্রমে টিটাগর পেপার মিলস্ (১৮৮২), ডেকান পেপার মিল (১৮৮৫), বেঙ্গল পেপার মিল (১৮৮৯), ইম্পিরিয়াল পেপার মিল (১৮৯২) ইত্যাদি স্থাপিত হয়।

স্বদেশী শিল্প উদ্যোগ ঃ কোম্পানির আমলে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ সাফল্য লাভ করেনি মূলত ব্রিটিশ শাসকদের নীতির ফলে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতন উদ্যোগী পুরুষ সিংহ নীল, চিনি, কয়লা, ব্যাঙ্ক, চা, জল পরিবহণ প্রমুখ নানা শিল্পে নেমেও সফল হননি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়।

বস্ত্রশিল্পে ভারতীয় উদ্যোগ ছিল সর্বাধিক। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হাওড়ার কাছে বাউরিয়াতে এবং পরের বছর কলকাতায় সুতি বস্ত্রের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন ব্রিটিশ মালিকরা। অনুরূপ চেষ্টা হয় পণ্ডিচেরী এবং গুজরাটের ব্রোচ শহরে। তবে সেগুলি তেমন সফল হয়নি। পশ্চিম ভারতের কালো মাটির অঞ্চলে তুলো প্রচুর হত বলেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আধুনিক বস্ত্রশিল্পের প্রসার হয়। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রথমত পার্শিরা, পরে গুজরাটি, বোহরা মুসলমান এবং মারওয়াড়িগণ। ব্রিটিশদের কাঁচামাল সংগ্রহের চাপ এবং ম্যানচেষ্টার ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপাদিত সুতি বস্ত্রের বিক্রির বাজার তৈরি করা সত্ত্বেও ভারতীয় বণিকরা দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগ করেন। বোম্বাইতে প্রথম সুতোকল স্থাপন করেন পার্শি শিল্পপতি কাওয়াসজি নানাভাই দাভার (১৮৫৪ খ্রিঃ)। এরপর মানেকজি পোটিট একটি কারখানা স্থাপন করেন (১৮৫৮)। আমেদাবাদে প্রথম কারখানা স্থাপন করেন রনছোড়লাল ছোটেলাল (১৮৫৯)। ক্রমে নাগপুর, শোলাপুর, আমেদাবাদ সহ মহারাষ্ট্রের নানাস্থানে বস্ত্রশিল্প প্রসারিত হয়। জামসেদজী টাটা প্রথম কাপড়ের কল খোলেন ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। বস্ত্রশিল্প দু'চারটি ইয়োরোপীয়দের হাতে থাকলেও ভারতীয়দেরই প্রাধান্য ছিল।[১] ১৮৬১তে সুতোকল ছিল মাত্র ১৩টি, ১৮৭৭-এ তা হয় ৫১টি এবং ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ১৬৭টি। ১৯০০তে যেখানে ১৯৩টি ছিল মিলের এবং শ্রমিকের সংখ্যা ১৬১,১৮৯ সেখানে ১৯১৮-তে মিলের সংখ্যা ২৬২ এবং শ্রমিকের সংখ্যা হলো ২,৮২,২২৭।

লৌহ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রথম কারখানা করেন এক বাঙালি-কিশোরীলাল মুখার্জী (১৮৬৭ খ্রিঃ), হাওড়ার শিবপুরে। এরপর বিখ্যাত বাঙালি প্রযুক্তিবিদ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার মার্টিনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন মার্টিন অ্যান্ড কোং

(১৮৭২)। এটি অবশ্য পরিচালনা করত বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানি। লক্ষ্ণৌতে 'লক্ষ্ণৌ আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন নওয়োল কিশোর। এরপর বিখ্যাত পার্শি শিল্পপতি জামসেদজী নাসেরওয়ানজী টাটা লোহা ও ইস্পাতের শিল্প গড়ার পরিকল্পনা নেন। তিনি আমেরিকায় গিয়ে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তার মৃত্যুর (১৯০৪) পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দোরাবজী টাটা বিহারের সিংভূমের সাকচিতে (এখন নাম জামশেদপুর) 'টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানি' স্থাপন করেন (১৯০৭)। এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে পার্শি, হিন্দু, শিখ, জৈন, মুসলমান, ব্রিটিশ প্রমুখ নানা সম্প্রদায়ের লোক ছিল।

জাহাজ শিল্পে মাদ্রাজে চিদাম্বরম্ পিল্লাই চেষ্টা করেও সফল হতে পারেন নি। একমাত্র ভারতীয় উদ্যোগ ছিল 'ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটিভ স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি' (১৯০৫)। ১৯১৯-এ প্রতিষ্ঠিত হয় সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি, এটি স্থাপন করেন ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ নরোত্তম মোরারজী। প্রথম চা কোম্পানি হলো জয়কৃষ্ণ সান্যাল প্রতিষ্ঠিত 'জলপাইগুড়ি টি কোম্পানি' (১৮৭৮)। বিহারে বহু অভ্র খনি ভারতীয়দের হাতে ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগের দেশীয় শিল্পের উপর ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। ক্রমে চামড়া, সাবান, তেল, চিরুনি, দেশলাই, ওষুধ, সুতো, সিমেণ্ট, চিনি ইত্যাদি শিল্পে দেশীয় উদ্যোগ লক্ষ্য কবা যায়।

১৮৮০ এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশন দুর্ভিক্ষের হাত থেকে ভারতকে বাঁচাবার উপায় হিসেবে শিল্পের সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে ভারতের শিল্প বিষয়ে এতদিন সরকারের যে উপেক্ষার ভাব ছিল সেটা অনেকখানি পরিবর্তিত হলো। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন শিল্পের কথা মনে রেখেই প্রতিষ্ঠা করলেন সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ (Imperial Department of Commerce and Industries)। ঠিক এই সময় ছিল স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। বিদেশী সামগ্রী বয়কট করে যখন স্বদেশী সামগ্রী ব্যবহারের আন্দোলন চলছে তখন দিকে দিকে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পুনরায় সেই পুরাতন অবাধনীতি (Laissez-faire policy) গ্রহণ করল। ভারত-সচিব লর্ড মর্লি এক নির্দেশে সরকারকে শিল্পের উন্নয়নে অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন (১৯১০)। এরপর শুরু হলো মহাযুদ্ধ (১৯১৪)।

৪। শিল্পায়ন (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের পরে)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকার এদেশের শিল্পে অনগ্রসরতার জন্যে অনেক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ স্বদেশী তাঁত বস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়ার সামগ্রী উৎপাদনের জন্য বহু কারখানা গড়ে ওঠে; অন্যদিকে ভারতের নেতারা আধুনিক শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। জনমতের চাপে সরকার ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে এদেশে শিল্প সম্ভাবনার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য শিল্প কমিশন (Industrial Commission) নিয়োগ করল। ১৯১৮

খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলো সেই কমিশনের প্রতিবেদন। কমিশনের মূল কথা হলো— শিল্পের সম্প্রসারণের তাগিদে সরকারপক্ষ থেকে উৎসাহমূলক হস্তক্ষেপের নীতি গ্রহণ করা উচিত। এর জন্যে সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী চাকরিগুলির যথাযোগ্য সংগঠন, শিল্প ও কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য দান, শিল্প সমবায় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ সঞ্চার, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ইত্যাদি ছিল অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ। অবিলম্বে সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেন ও কার্যকর করতে সচেষ্ট হন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের শাসন সংস্কারের পর 'শিল্প' বিষয়টি হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। তখন থেকে শিল্পের উন্নতি সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব ভারতীয় নেতাদের উপর বর্তায়।

১৯১৪-১৯৪৭ পর্বে ভারতীয় শিল্পপতিদের মধ্যে উদ্যোগ বেড়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মন্দার সুযোগ নিয়ে ভারতীয়রা অনেক বেশি করে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। ১৯১৪-৪৭ পর্বে তাই বিদেশী পুঁজির সঙ্গে বিপুল স্বদেশী পুঁজির বিনিয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তবে সর্বভারতীয় চিত্রের দিকে তাকালে মানতেই হবে যে, বিদেশী পুঁজির আধিপত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কায়েম ছিল। সব্যসাচী ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, তখন একটা দোতলা অর্থনীতি তৈরি হয়েছিল— "উপরের তলায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলি, শেয়ার বাজার ম্যানেজিং এজেন্সি, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি, বিলিতি জাহাজ, আমদানি-রপ্তানির সওদাগরি অফিস, ডবল এন্ট্রি হিসেব, বণিক সমিতি, গভর্নরের বাড়ি ভোজ, সাদা চামড়াদের ক্লাবে সিফারিস অনুগ্রহের আদান-প্রদান— এই এলাকায় ইংরেজ পুঁজির আধিপত্য। নীচের তলাটা দিশি ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট ব্যবসা, ব্যাঙ্কের জায়গায় মহাজন ও অন্যান্য কুসীদজীবী, ম্যানচেস্টরের কাপড় ও সুতো বিক্রী, কাঁচামালের রপ্তানির খুচরা ও পাইকারি কারবার, পাইকার-ফড়ে-আড়ৎদারের ভীড়, মোদী অক্ষরে হিসেব আর রোকড় বহি, বেনে পঞ্চায়েত, আর সাহেবদের কাছে পিটিশন।"

অবশ্য অমিয়কুমার বাগচী, ক্লদ মার্কোভিৎস্, বি. আর. টমলিনদন, ওঙ্কার গোস্বামী প্রমুখ আধুনিক গবেষকদের গবেষণায় শিল্পায়নের ধারা, তাতে বিদেশীর পাশাপাশি স্বদেশী উদ্যোগ, কখনও যৌথ উদ্যোগ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সুযোগে স্বদেশী শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে। তবে পুঁজিবাদের অসম বিকাশের মধ্যেই ভারতীয় শিল্পপতিদের বড়ো বড়ো নামী হাউসগুলির উত্থান। যেমন টাটা, বিড়লা ইত্যাদি। প্রথমোক্ত গোষ্ঠী পার্শি, দ্বিতীয় গোষ্ঠী মারওয়াড়ি। টম টিমবার্গ বিস্তৃত গবেষণা করে দেখিয়েছেন কীভাবে মারওয়াড়িগণ বানিয়া বা ব্যবসায়ী থেকে শিল্পপতিতে পরিণত হয়।[১] ১৮৫৭তে রাজস্থানের পিলানি থেকে উটের পিঠে গুজরাটের আমেদাবাদে পৌঁছে রেলে বোম্বাইয়ে পা রাখেন শিবনারায়ণ বিড়লা। এই পরিবারের প্রথম উদ্যোগী। ১৮৬৩-৬৪তে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের ফলে তুলোর বাজার যখন তেজী তখন তিনি তুলো, সার, আফিঙ-এর দালালি

করে প্রচুর লাভ করলেন। ১৮৯৮-১৯০১ পর্বে তারা কলকাতায় এসে ঢুকল পাটের ব্যবসায়। শিবনারায়ণের ছেলে বলদেও দাস এবং পৌত্রদ্বয় যুগলকিশোর এবং ঘনশ্যামদাস পুঁজি বাড়িয়ে ফেললেন। তাদের প্রথম কোম্পানির প্রতিষ্ঠা ১৯১৮-তে। ঘনশ্যামদাস বা জি. ডি বিড়লা বহু কারখানা কিনে নিলেন। ১৯৪৮-এ স্বাধীনতার পর তাদের হাতে ১২টি কোম্পানি, সংগৃহীত পুঁজি ২০৬ কোটি টাকা। তারপর অফুরন্ত বাড়-বাড়ন্ত, সে কাহিনী ভিন্ন। তবে শিল্পে মারওয়াড়ি উদ্যোগ এসেছিল ধীরে ধীরে।

অপরপক্ষে পার্শিদের উদ্যোগ ছিল দ্রুত। তারা কারখানা কেনেননি, নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন নসেরওয়ানজী টাটা এবং কল্যাণদাসের দালালি ও রপ্তানি-আমদানির ব্যবসা ছিল। নসেরওয়ানজীর ছেলে জামসেদজী এবং জামসেদজীর পুত্র দোরাবজীর আমলে শিল্প ও ইস্পাত সবেতেই উদ্যোগ বাড়ে।[১] রাধেশ্যাম রুংটা ভারতে এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর উত্থান তথ্যসহ দেখিয়েছেন, যা ঘটেছিল ১৮৫০-১৯০০ পর্বে।[২] তারপর বেসরকারি শিল্পদ্যোগের চিত্র অমিয়কুমার বাগচী যেমন দেখিয়েছেন,[৩] তেমনি পাভলভ, লেভভস্কি প্রমুখ রুশ ঐতিহাসিক ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ আলোচনা করেছেন।[৪]

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের পর মহাযুদ্ধের ফলে বিদেশী আমদানি কমে যাওয়ায় বোম্বাই-মহারাষ্ট্র-গুজরাটের কাপড়ের বাজার দখল করে নেয় ভারতীয়রা। ১৯২২ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে তাদের উত্তরণের কাহিনী। বয়ন শিল্প এরপর ভারতীয়দের হাতে এলেও শিল্পায়নের গতি সর্বত্র বেড়েছিল এমন নয়। তবু ১৯১৪-১৯৪৭ পর্বে পাট, চা, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট, দেশলাই, ওষুধপত্র, ইস্পাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে গতি বাড়ে।

তবে শিল্পায়ন দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রই ছিল। ১৯০০-০৪ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র জাতীয় আয়ের (National Income)-এর ১৩ শতাংশেরও কম শিল্প থেকে আয়, ১৯৪০-৪৪-এর সময়ে তা বেড়ে মাত্র ১৭ শতাংশ হয়। প্রযুক্তিও তেমন এগোয়নি। ডঃ বিপান চন্দ্র দেখিয়েছেন ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সারা দেশে মাত্র সাতটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল। ১৯১৪-এর পর সরকার কিছু রক্ষামূলক করের সুযোগ দিলেও শিল্পায়ন দ্রুত হয়নি। এর জন্য অনেক অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল দায়ী।

সপ্তম পর্ব

অধ্যায় ১০

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (১৭৬৫-১৮৫৭খ্রিঃ)

Syllabus : Early Resistance to Colonial Rule (1765-1857).

১। আদি পর্বের প্রতিরোধ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তার ও সম্পদ লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণ ক্ষমতাকেও বাড়াতে থাকে। তারা ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো তৈরি করে এবং ব্রিটেনের স্বার্থে গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক নীতি। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের সময় থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত কোম্পানির আমল হলো নিকৃষ্টতম রাজ্য শাসনের নমুনা। ঐ সময়ের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে যে কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন তা হলো রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা ও কৃষির বাণিজ্যকরণের মাধ্যমে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের কাঠামোকে ভেঙে গ্রামভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির বনিয়াদকে ধ্বংস করা। স্বাভাবিকভাবে সমাজে এই নতুন শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের চাপ ভারতীয় জনগণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে, তাদের অন্তহীন দুর্দশা রূপ পায় নানা বিদ্রোহের মধ্যে। সুপ্রকাশ রায় ঠিকই লিখেছেন যে "...পরাধীন ভারতের কালিমা লিপ্ত ইতিহাস এবার পরিণত হইল কৃষকের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের রক্ত-রঞ্জিত ইতিহাসে"। বস্তুতপক্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে শুধু শাসক কোম্পানি নয় তাদের সহযোগী দেশীয় জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার, মহাজন ও নানা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর অত্যাচারও চরমে ওঠে। নিম্নবর্গের মানুষেরা এই অত্যাচারের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল নানা আদিম ধরণের বিদ্রোহের মাধ্যমে।

আদি পর্বের প্রতিরোধ বলতে এককথায় বোঝায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতীয় জনগণের স্বতস্ফূর্ত অথচ অ-সংগঠিত আন্দোলন ও সংগ্রাম। নেতৃত্ব, প্রকৃতি কিংবা চেতনার স্তর সব দিকেই এই সংগ্রাম ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের। তবে একদিকে বিদেশী শোষণ ও উপনিবেশবাদ এবং অন্যদিকে দেশীয় জমিদার-মহাজন, এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে আদি পর্বের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল।

কোম্পানির আমলে তাদের শোষণমূলক রাজনীতি, চিরাচরিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, দেশীয় বিচারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, দেশের জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ হলো বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ। বলা বাহুল্য, রাজস্ব বৃদ্ধি ও তা আদায়ের জন্য সর্বাধিক চাপ পড়েছিল সমাজের সবচেয়ে নিচের তলার

কৃষক সমাজের উপরে। তেমনি কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য, রাজস্বের অর্থলালসা আদিবাসী জনজাতি বা উপজাতির জীবনেও নিয়ে এসেছিল অন্ধকার। ফলে বহু উপজাতি বিদ্রোহও ঘটে। তবে উপজাতি বিদ্রোহগুলিও আসলে কৃষক বিদ্রোহই, কারণ কৃষি ছিল তাদের জীবিকা। কোম্পানির আমলে ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যেও বিপুল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল এবং তাই দুটি ধর্মীয় আন্দোলন রূপান্তরিত হয়েছিল অর্থনৈতিক তথা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে। এগুলি হলো ওয়াহাবি আন্দোলন এবং ফরাজি আন্দোলন। তবে কোম্পানির আমলে এইসব গণ বিদ্রোহের চূড়ান্ত রূপ এবং ব্যপ্তিতে সবচেয়ে বড়ো বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহে। এই মহাবিদ্রোহ কোম্পানির শাসনের ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল।

২। কৃষক বিদ্রোহ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল।[১] আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহের কথা বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করব। কৃষক বিদ্রোহগুলির কারণগুলির মধ্যে কোম্পানির কৃষক স্বার্থ-বিরোধী ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত, বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহের প্রতিক্রিয়া, ব্যক্তিগত আওতায় কৃষক শোষণ, জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ, মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব ও শোষণ, জমির বাঁটোয়ারা ইত্যাদি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা চলে।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার শিকার হয়ে বাংলা-বিহারের কৃষকেরা যখন বিপর্যস্ত তখন ইংরেজদের শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন সন্ন্যাসী ও ফকিররা। এই বিদ্রোহ **সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ** নামে পরিচিত। সন্ন্যাসী ও ফকির উভয় গোষ্ঠী যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষদের ধর্মীয় নেতা কিন্তু এই বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা ছিল গৌণ। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বিদ্রোহের ইতিহাস লিখতে গিয়ে যামিনীমোহন ঘোষ ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে ঠিক কাজ করেন নি। ফকির ও সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে ক্ষুধার্ত চাষী, সম্পত্তিচ্যুত জমিদার ও কর্মচ্যুত সৈনিকগণ ছিলেন। বিশেষত হাজার হাজার কৃষক। এই বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ শুরু হয় ১৭৬৩-তে ঢাকায়, পরে অবশ্য তা দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ে বগুড়া, মালদা, রংপুর, দিনাজপুর থেকে কোচবিহার পর্যন্ত। ফকির বিদ্রোহের চিরাগ আলি, মুসা শাহ, ও মজনু শাহ এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহে ভবানী পাঠক ও দেবীচৌধুরাণী স্মরণীয়। প্রায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। বিদ্রোহীরা কোম্পানির কুঠি, রাজস্ব দপ্তর,

ধনী জমিদারদের কাছারী এবং বণিকদের শস্যভাণ্ডার আক্রমণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার অভাব, যোগাযোগের দুর্বলতা ও নেতৃত্ব-আদর্শের অভাবে কোম্পানি বলপূর্বক বিদ্রোহ দমন করে।[১]

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের রাজস্ব-ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। এটি **রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ** নামে পরিচিত। দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলের কৃষকরা বাড়তি খাজনা, দেবী সিংহের অনুচরদের অত্যাচার, মহাজনদের শোষণ এবং শস্য লুঠ ইত্যাদি কারণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নুরুলউদ্দিন ও দিরাজিনারায়ণের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ করেছিল। হিন্দু-মুসলমান যৌথ উদ্যোগ সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের মতন রংপুর কৃষক বিদ্রোহও স্মরণীয়।[১] ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজের মতে এই বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তর্নিহিত নির্লজ্জ শোষনকেই প্রকাশ করেছিল।

আঠারো শতকের শেষ দিকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষক বিদ্রোহ ছিল **চুয়াড় বিদ্রোহ**। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল মেদিনীপুরে, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল জঙ্গলমহল, মানভূম, ধলভূম ইত্যাদি অঞ্চল। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর এবং ১৭৬৫তে জঙ্গলমহল কোম্পানির হাতে চলে যায় এবং ইংরেজরা রাজস্ববৃদ্ধির চাপ দিতে থাকে। ঐ অঞ্চলের ভূমিজীবী আদিবাসী বা চুয়াড়গণ স্থানীয় জমিদারদের বা রাজাদের সৈন্য বা পাইক হিসেবেও কাজ করত। কোম্পানি, নিষ্কর জমি দখল এবং অতিরিক্ত রাজস্বের চাপে জর্জরিত কৃষকরা চুয়াড় বিদ্রোহে সামিল হয়। ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধর ১৭৬৮তে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। এই চুয়াড় বিদ্রোহ পরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত জমিদারবর্গও যোগ দেয়। যেমন রাণী শিরোমণি। কোনও কোনও ইংরেজ ঐতিহাসিক বা সরকারি দলিলে চুয়াড়দের অপরাধপ্রবণ জাতি বলে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা সত্য নয়। বস্তুত চুয়াড়গণ ছিলেন 'ভূমিজ' অর্থাৎ কৃষিজীবী জাতি। তবে তারা পাইক-বরকন্দাজের কাজ করত জমিদারীতে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চুয়াড় বিদ্রোহ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। মাঝে মাঝেই এই বিদ্রোহ ঘটত। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে সিংভূমের গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে বিদ্রোহের সময়ও চুয়াড়রা সক্রিয় ছিল। ইংরেজ কোম্পানি শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল।

১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতের **বেরিলীতে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে**। পুলিশী অত্যাচার ও অতিরিক্ত কৃষি খাজনার ফলে মুফতি মহম্মদ আইওয়াজের নেতৃত্বে মুসলিম কৃষকগণ এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। কানপুর, মীরাট, মথুরা অঞ্চল থেকে ইংরেজ বাহিনী

গিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে **উড়িষ্যার পাইক বিদ্রোহ** ঘটে খুর্দা রোড এলাকায়। এখানেও বহু জমিদার অতিরিক্ত রাজস্ব মেটাতে না পারার ফলে জমিদারীচ্যুত হন। ফলে তাদের সৈন্যবাহিনীর পাইকগণ, যারা ছিল কৃষক পরিবারের সন্তান তারাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এদের নেতা ছিলেন বিদ্যাধর মহাপাত্র।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর অঞ্চলে এক বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহ ছিল **পাগলপন্থী কৃষকবিদ্রোহ**। পাগলপন্থীরা ছিলেন এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ; প্রবর্তক ছিলেন করিম শাহ। তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র টিপু পাগলার নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীর কৃষিজীবী মানুষজন বিদ্রোহ করেন। অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরীর মতে ১৮২৪-এর পর এই বিদ্রোহ ছিল 'সম্মিলিত জমিদার ও ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে'।

বস্তুতপক্ষে কোম্পানির আমলে অজস্র কৃষক বিদ্রোহের কথা জানা যায়। ডঃ শশিভূষণ চৌধুরীর সবিস্তার প্রাথমিক গবেষণা থেকে সুপ্রকাশ রায়ের সহজ ও স্বচ্ছন্দ আলোচনার মধ্যে তার বিবরণ ছড়িয়ে আছে। লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলার সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ থেকে মাদ্রাজের পলিগার বিদ্রোহ, উড়িষ্যার পাইক বিদ্রোহ থেকে পূর্ববাংলার শেরপুর বিদ্রোহ ইত্যাদি বিদ্রোহ মূলত আদিপর্বের কৃষক বিদ্রোহেরই দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত, যে কথাটি বলা দরকার, কোম্পানির আমলে যে-সব উপজাতির সংগ্রাম বা **জনজাতীয় বিদ্রোহ** (Tribal Revolt) ঘটেছিল সেগুলিও প্রায়শই চরিত্রের দিক থেকে কৃষক বিদ্রোহের অন্তর্গত। উপজাতি বিদ্রোহগুলি আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব। এইখানে বলা দরকার যে, আদিবাসী বা উপজাতির অধিকাংশের কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। অনেক সময় কৃষি-বিদ্রোহ ও আদিবাসী সংগ্রাম মিলেমিশে গেছে।

তৃতীয়ত, কৃষি বিদ্রোহে মূল স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা কৃষকদের মধ্য থেকে এলেও অনেক সময় ভূস্বামী শ্রেণী, বা ক্ষমতাচ্যুত সামন্তবর্গীয় মানুষজন এই সব ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা থেকে মহীশূর পর্যন্ত নানা অঞ্চলে এমন নিদর্শন আছে। দক্ষিণ ভারতে 'পলিগার' শব্দটি ধনী ভূস্বামী ও সাময়িকভাবে ক্ষমতাবান শ্রেণীর প্রতিশব্দ।

চতুর্থত, এই সব কৃষক বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা নিয়েও ঐতিহাসিকরা আলোচনা করেছেন। বিনয়ভূষণ চৌধুরী দেখিয়েছেন, কৃষক চৈতন্যে ধর্মের ভূমিকা কখনো তাৎপর্যপূর্ণ, কখনও গৌণ।[১] ধর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা আমরা দেখি ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহে।[২] বস্তুত গৌতম ভদ্র দেখিয়েছেন যে "অর্থনীতি, রাষ্ট্রশক্তি ও ধর্মভাবের এক জটিল সম্পর্ক এই বিদ্রোহে ধরা পড়ে।" ১৮১০ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায়

যেমন প্রধানত বর্ধিত খাজনার দাবি ও বলপূর্বক নীল চাষের কারণে অনেক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে তেমনি ভারতের অন্য অঞ্চলেও কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। যেমন ১৮৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে মহীশূরে, ১৮৩৫-৩৭ খ্রিঃ অন্ধ্রপ্রদেশে, ১৮১৮তে মহারাষ্ট্রে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কৃষক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিদ্রোহগুলির মধ্যে। ধর্ম এই সব বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও প্রায় সব বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে সংগ্রামে অংশ নেয়। প্রতিটি বিদ্রোহই ছিল সশস্ত্র। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, রাজস্বের চাপ ও জমিদার-তালুকদার-মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই কৃষকসংগ্রাম অসংগঠিত হলেও ছিল স্বতস্ফূর্ত। কোম্পানি সেগুলি দমন করতে সমর্থ হলেও গণ-অসন্তোষ আদৌ নির্বাসিত হয়নি।

৩। উপজাতি সংগ্রাম ও সাঁওতাল বিদ্রোহ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী বা উপজাতির মানুষদের (Tribal People) মধ্যেও বহু বিদ্রোহ ঘটেছিল। নানা উপজাতির (অনেকে বলেন 'জনজাতি') মানুষরা মূলত ছিলেন কৃষিজীবী এবং এরা শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে পাহাড়ে-জঙ্গলে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করলেও কোম্পানির আমলে কোম্পানির আগ্রাসী নীতি, তাদের উপর রাজস্ব চাপিয়ে দেওয়া, বিপুল সংখ্যক পরদেশীর তাদের এলাকায় প্রবেশ, মহাজন-জমিদার ও তাদের দালাল (আড়কাঠি) শ্রেণীর অত্যাচারের ফলে উপজাতির মানুষজন সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়। তবে উপজাতীয় বিদ্রোহে নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষকরা ও মুসলমান চাষীরাও যোগ দিয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে। যেমন পূর্বোল্লিখিত চূয়াড় বিদ্রোহের ক্ষেত্রে। জঙ্গলমহলের চূয়াড়, সিংভূমের হো, রাজমহল ও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল, ছোটনাগপুর ও মহারাষ্ট্রের কোল, মধ্যমারতের ভীল, ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, মালভূমের ভূমিজ, অসমের খাসিয়া এবং উড়িষ্যার খোন্দ ইত্যাদি উপজাতির মানুষদের বিদ্রোহ ইতিহাসে মুক্তিসংগ্রামের অমর কাহিনী।

উপজাতীয় বিদ্রোহগুলির মধ্যে চূয়াড় বিদ্রোহের কথা আমরা কৃষক বিদ্রোহ প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করেছি। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে সিংভূমের হোজ সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা বিদ্রোহ করেছিল। গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে বিদ্রোহীগণ সরকারি অফিস আক্রমণ করে সাময়িকভাবে বরভূম দখল করে নেয়। অনুরূপ বিদ্রোহ ঘটেছিল ছোটনাগপুর, সিংভূম, মালভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ ইত্যাদি অঞ্চলেও।

এর আগেই ১৮১৬-১৮ পর্ব থেকেই পশ্চিমঘাট অঞ্চলে **ভীল অভ্যুত্থান তীব্ররূপ নিয়েছিল**। অধিকাংশ ভীল বাস করতেন খান্দেশ অঞ্চলে যা ১৮১৮তে কোম্পানি অধিকার করে নেয়। ১৮১৯ থেকে ভীলরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন চিল নায়েক, হিরিয়া,

শিউরাম প্রমুখের নেতৃত্বে। এই বিদ্রোহ বহুদিন চলেছিল। কঠোর নির্মম ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সরকার বিদ্রোহ দমন করে।

রামোসী বিদ্রোহ ঃ পেশওয়া শাসনতন্ত্রের যুগে পুলিশের নিচুপদে কাজ করতেন রামোসীগণ। তারা তাদের কাজের বদলে বংশানুক্রমিক জমিভোগ করতেন। কোম্পানি মারাঠা জয় (১৮১৮) করার পরে তাদের জমির উপর রাজস্ব চাপানোর ফলে রামোসীরা বিদ্রোহ করে (১৮২৬)। সরকার কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করে। তিন বিদ্রোহী নেতা উমাজী নায়েক, ত্রিম্বকজী সাওয়ান্ত এবং দাদাজী দৌলতরাও ঘোড়পাড়েকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

১৮৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকদের ও দেশীয় জমিদার-ঠিকাদার-মহাজন শ্রেণীর সম্মিলিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে **কোল বিদ্রোহ** ঘটে বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বুদ্ধু ভগত ও জুয়া জগত। কোলরা ছিল সংঘবদ্ধ। ঐতিহাসিক জগদীশচন্দ্র ঝা লিখেছেন যে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে এরা খড়্গহস্ত ছিলেন। কোম্পানি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করে।

খোন্দ উপজাতিদের বাসস্থান ছিল উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চলে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে গুমসুর স্থানের রাজা ধনঞ্জয় ভারি ও ইংরেজদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয় এবং ১৮৩৫ খ্রিঃ কোম্পানি খোন্দমহল দখল করে নেয়। ডোরা বিষয়ী নামক নেতার নেতৃত্বে **খোন্দ বিদ্রোহ** শুরু হয়। ইংরেজরা প্রথমে তা দমন করলেও চক্র বিষয়ীর নেতৃত্বে ১৮৪৬ খ্রিঃ পুনরায় বিদ্রোহ ঘটে এবং অঙ্গুল রাজ্যও এই বিদ্রোহে সামিল হয়। শেষপর্যন্ত ১৮৪৮ খ্রিঃ এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতে অসমে খামতি, সিংপো, মণিপুরি, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি উপজাতির মানুষজন ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের পর বিদ্রোহ করে। এখানে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও স্বাধীনতা হরণের রাজনৈতিক প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

তবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে উপজাতিদের গণসংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় **সাঁওতাল বিদ্রোহ** (১৮৫৫-৫৭)। বাস্তবিকপক্ষে এই বিদ্রোহ ছিল উপজাতীয় সামাজিক সংহতি এবং বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদে আঞ্চলিকতার চেতনার সংগ্রামী বহিঃপ্রকাশ। সাঁওতালদের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য ও স্বাধীন জীবনযাপনের জন্য 'খেরওয়ারী' নামে এক আদর্শ ছিল, ইংরেজ আমলে সমস্ত শোষণের নাগপাশ থেকে তারা স্বপ্ন দেখেন বিপ্লবের, যা তাদের ভাষায় 'হুল'।

বিহারের ভাগলপুর জেলা 'দামিন-ই-কো' অর্থাৎ পাহারের প্রান্তদেশ থেকে বাংলার বিরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সাঁওতালরা কৃষি-নির্ভর যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। ঔপনিবেশিক নীতি ও সামন্ত শাসনের অত্যাচার ও মহাজনদের শোষণ তাতে বাধ সাধে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর ইংরেজ সরকারের ক্রমবর্ধমান খাজনার দাবি

ও জমিদারদের প্রয়াসে জঙ্গল পরিস্কার করে উপজাতিদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। তারা কৃষিজমি হারিয়ে 'ভিক্ষু' অর্থাৎ পরদেশী মহাজনদের কাছে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন। উপরন্তু ছিল নীলকর, রেললাইনের ঠিকাদার ও শিল্পের কারণে মজুর তৈরির জন্য দালালদের অত্যাচার। এই কারণে তাদেব স্বার্থে আঘাত লাগে। প্রশাসন ছিল একপেশে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় সাঁওতাল বিদ্রোহ। নেতা ছিলেন সিধ্হো (সিধু) এবং কানহু (কানু)। সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গরীব সাধারণ মানুষ এবং চাষীরাও এই বিদ্রোহে যুক্ত হন। শেষপর্যন্ত ইংরেজ সরকার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করে। তবে বিদ্রোহ দমন করলেও এই বিদ্রোহের পরিণতিতে ইংরেজ সরকার একটি পৃথক সাঁওতাল পরগনা গঠন করেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ব্রিটিশ-বিরোধী গণ অভ্যুত্থানে উপজাতিদের এক গৌরবময় ভূমিকা ছিল। নৃতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক কুমার সুরেশ সিং মন্তব্য করেছেন যে উপজাতীয় মানুষজন ভারতীয় কৃষক সহ আদিপর্বের অন্য যে-কোনও গোষ্ঠী থেকে অনেক বেশি জঙ্গী। এর প্রমাণ সাঁওতাল বিদ্রোহের মধ্যে স্পষ্ট। সাঁওতালরা যে জমিদার মহাজনদের দ্বারা অত্যাচারিত ছিলেন তা অনেক আগেই দেখিয়েছিলেন ডঃ কালীকিংকর দত্ত। ব্রাডলি-বার্ট তো মনে করেন এদের ক্রীতদাসের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছিল। তবে তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল কোম্পানির স্বার্থ, লোভ এবং ঔপনিবেশিক নীতি। এর বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সাঁওতাল 'হুল', যাকে তথাকথিত 'সুসভ্য' ইংরেজরা বর্বোরচিতভাবে দমন করে।[১]

৪। ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন

ওয়াহাবি আন্দোলনের পটভূমিকা ঃ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ মানুষদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়ার কারণ একাধারে রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক। ভারতে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘকালের ভারত-ব্যাপী মুসলিম শাসন ও প্রভুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি মোগল যুগের পর যে সব আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছিল তার অনেকগুলিই যেমন, বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি, ছিল মুসলমান শাসকদের অধীনে। সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ধীরে ধীরে কোম্পানি

দখল করে নেয়। এই পরাধীনতার জন্য সাধারণ মুসলমান ইংরেজদের দায়ী মনে করত। অন্যদিকে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা কমে যায়। এমনকি ফারজী ভাষা যা ছিল সরকারি ভাষা তার পরিবর্তে ইংরেজির প্রচলন এবং সরকারি কার্যে তা গ্রহণের ফলে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মুসলমানরা মনে করত ইংরেজরাই ভারতের প্রভু। তারা সাধারণ প্রজা মাত্র এবং এর জন্য বিদেশী শাসকরাই দায়ী। ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিক্রিয়া এই ক্ষোভ ও হতাশারই বহিঃপ্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশের রূপ আমরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে লক্ষ্য করি ওয়াহাবি এবং ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে।

এই আন্দোলন দুটি ব্রিটিশ-বিরোধী চরিত্র নেওয়ার আগে অবশ্য শুরু হয়েছিল ধর্মীয় সংস্কারপন্থী আন্দোলনের মাধ্যমে। তারও এক পটভূমিকা ছিল। ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রচলন করার পর কয়েক শত বছর কেটে গেলেও ভারতে ইসলামধর্মের মধ্যে নানারকম বিচ্যুতি দেখা দেয় যা মূল ধর্মের থেকে আলাদা। ধর্মের নামে নানা সংস্কার, লোকাচার ইত্যাদি যেমন ঢুকে পড়ে, তেমনি অন্য ধর্মের প্রভাবও ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের আচরণে পরিলক্ষিত হয়। ওয়াহাবি এবং ফরাজি আন্দোলন দুটিই ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে বিশুদ্ধতাবাদী প্রচেষ্টারূপে সূত্রপাত হয়। ধর্মসম্মত ভাবে ধর্মের মৌলনীতির উপর ভিত্তি করে সমাজকে গড়ে তোলাই ছিল এগুলির উদ্দেশ্য। তবে অচিরেই ধর্মীয় চরিত্রের সীমানা অতিক্রম করে আন্দোলন দুটি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক চরিত্রলাভ করে। এর কারণ পূর্বোক্ত হতাশা, ক্ষোভ ও বিদ্বেষ যা মুসলমানদের মনের মধ্যে ছিল। তেমনি সাধারণ দরিদ্র মুসলমান এবং কৃষকদের উপর দেশীয় জমিদার-মহাজন-তালুকদার প্রমুখ ভূস্বামীদের অত্যাচারের ফলে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ শ্রেণী ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগী হওয়া আন্দোলন দুটি অর্থনৈতিক সংগ্রামেও রূপান্তরিত হয়। ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে তাই আমরা ওয়াহাবি-ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে কৃষক সংগ্রামের রূপও লক্ষ্য করি।

ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা ঃ ওয়াহাবি কথাটির অর্থ নবজাগরণ। এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল কিন্তু আরবদেশে। সেখানে মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২ খ্রিঃ) ইসলাম ধর্মের সংস্কার, মূলনীতি পুনঃপ্রবর্তন এবং হজরত মহম্মদের আদর্শ ফিরিয়ে আনার জন্য আঠারো শতকে যে আন্দোলন শুরু করেন, তাই সাধারণত ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। আবদুল ওয়াহাব ছিলেন এক ধর্মজ্ঞানী। তিনি নেজদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন। তাঁর মতবাদ ও আদর্শের অনুসরণকারী মুসলমানগণ সকলেই ইসলাম ধর্মের নবজাগরণ ও বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনতে চাইতেন। তাদের এই আন্দোল তাই ওয়াহাবি বা নবজাগরণের আন্দোলন রূপেই পরিচিতি লাভ করে।

সাধারণত ধরে নেওয়া হয়ে থাকে যে আরবের ওয়াহাবি আন্দোলন থেকেই ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলন প্রেরণা লাভ করেছিল। ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবর্তক

ছিলেন উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমেদ (১৭৮৬-১৮৩১)। কথাগুলি মোটামুটি সত্যি হলেও সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে অনেক বিস্তারিত তথ্য জানা গেছে। যার কিছু কিছু এখানে আলোচনা করা দরকার।

প্রথমত, ভারতে যখন ইসলামধর্মের বিশুদ্ধতাবাদী আন্দোলন শুরু হয় তখনও এর সঙ্গে ওয়াহাবি আন্দোলনের যোগ ছিল না। এই আন্দোলনের সূত্রপাত ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এবং আন্দোলনের নাম ছিল 'তারিক-ই-মহম্মদীয়া' বা মহম্মদের পথ। **দ্বিতীয়ত**, এই আন্দোলনের আগে দিল্লির প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্বজ্ঞ **শাহ ওয়ালিউল্লাহ** (১৭০৩-১৭৬৩) ইসলাম ধর্ম সংস্কারের এক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা ছিল উদার, এর ফলে তা বিশুদ্ধতাবাদী ছিল না। তাছাড়া ভারতে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের অনেক ব্যক্তির প্রবেশের ফলে মুসলিম সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলাম ধর্ম-সম্মত নয় এমন বহু আচার-আচরণ প্রবেশ করে। ফলে ইসলামের ধর্মীয়, সংস্কারপন্থী ও বিশুদ্ধতাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। **তৃতীয়ত**, এই কাজ শুরু করেন ওয়ালিউল্লাহের পুত্র আবদুল আজিজ এবং দৌহিত্র শাহ ইসমাইল এবং আবদুল আজিজের শিষ্য সৈয়দ আহমেদ। তারাই ভারতের হজরত মহম্মদ প্রচারিত বিশুদ্ধ ইসলাম ধর্মমত পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ভারতবর্ষকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র বাসস্থানে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট হয়। পয়গম্বর প্রদর্শিত পথ (তারিকা) অনুসরণ করার জন্য এই আন্দোলন শুরু করেন। **চতুর্থত**, আবদুল আজিজ মনে করতেন ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্ব শত্রুর দেশ (দার-উল-হারব); তাই এখানে বিধর্মী ইংরেজদের তাড়িয়ে মুসলমানদের দেশ (দার-উল-ইসলাম) করতে চেয়েছিলেন। **পঞ্চমত**, ১৮১৮-তে শুরু করার পর ১৮২২-২৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সৈয়দ আহম্মদ মক্কা-মদিনা সহ আরব দেশ ভ্রমণ করে, আবদুল ওয়াহাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতে এসে আবার আন্দোলন শুরু করলে ক্রমে তা ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে।

সৈয়দ আহমেদ ও ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলন ঃ সৈয়দ আহমেদ ভারতের যুক্ত (উত্তর) প্রদেশের রায়বেরিলীর লোক। তিনি ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পবিত্র আচরণের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেন ১৮১৮ থেকে তাতে ওয়ালিউল্লাহ আবদুল আজিজ, শাহ ইসমাইল প্রমুখের প্রভাব ছিল, বিশেষত আবদুল আজিজের। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কা যাত্রা করেন। হজ যাত্রা করেছিলেন জাহাজে। পাটনা এবং কলকাতা হয়ে যাওয়ার সময় উভয় স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। কলকাতায় ছিলেন কিতাবউদ্দিন সরকারের মসজিদে। আরব যাওয়ার আগেই তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলন উত্তর প্রদেশ থেকে বাংলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে আরব থেকে ফিরে এবং আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ও প্রেরণা লাভ করে তিনি ভারতের বোম্বাইতে নামেন। সেখান থেকে প্রচার শুরু করেন। তারপর বিভিন্ন প্রদেশে যান। কলকাতাতেও আবার এসেছিলেন ও

ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি ধর্মযুদ্ধের (জেহাদ) ডাক দেন। তিনি দার উল্ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বাংলায় কোম্পানির এবং পাঞ্জাবে শিখদের শাসন উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ বণিকদের তিনি ভারতের স্বাধীনতার শত্রু মনে করতেন। তার শিষ্য বাংলার মীর নিশার আলি, যিনি **তিতুমীর** নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিতুমীর ডাক দিয়েছিলেন জমিদার-মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের। তাই ধর্মীয় আন্দোলন-রূপে শুরু হয়েও ওয়াহাবি আন্দোলন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র লাভ করে।

ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতে মুসলমানদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। বহু মুসলমান তাঁর শিষ্য হন। ইংরেজ ও শিখদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করার জন্য তিনি অনুরাগীদের নানাপ্রকার অস্ত্রচালনায় প্রশিক্ষণ দিতে যত্নবান হন। ওয়াহাবি সৈন্যবাহিনী গঠন, 'ফাণ্ড' গঠন, প্রচার অভিযান চালানো— এসবই করা হয়। অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সৈয়দ আহমেদ একটি দস্তুরমত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা গঠন করেন। এই কাজে তিনি চারজন 'খলিফা' নিযুক্ত করেন। দল পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জেলা কমিটি, প্রাদেশিক কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি গড়া হয়। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। চার বছর পর তিনি স্বয়ং বালাকোটের যুদ্ধে (১৮৩১) মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ আহমেদের মৃত্যু হলেও ওয়াহাবি আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং তার প্রসার ঘটে। পাটনার এনায়েব আলি ও বিলায়েত আলি, জৌনপুরের কেরামত আলি, হায়দ্রাবাদের জৈনুদ্দিন প্রমুখ নেতাদের পরিচালনায় ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ইত্যাদি অঞ্চলে ওয়াহাবিগণ সক্রিয় ছিলেন। বেরিলিতে নেতৃত্ব দেন ইমাতা জিমামি। পাঞ্জাব রাজ্য পরে ইংরেজ কোম্পানির অধিকারে চলে গেলেও মুলতানকে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবিদের লড়াই অব্যাহত থাকে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সীতানা ছিল তাদের প্রধান ঘাঁটি। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) ওয়াহাবিগণ কোম্পানির বিরুদ্ধে যোগ দেয়। ১৮৫০ খ্রিঃ থেকেই ইংরেজ শাসকরা বহু হাজার সৈন্য নামিয়ে নানাপ্রান্তে এই আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপক ধর-পাকড়, ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও কারাবন্দী করে ওয়াহাবিদের দমন করা হয়।

তিতুমীর ও বাংলার কৃষক আন্দোলন ঃ বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান নায়ক মীর নিশার আলি ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগণা চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মীর হাসান আলি এবং মায়ের নাম রুকাইয়া খাতুন। বাল্যকালে তার নাম হয় তিতুমীর। তিনি নিকটবর্তী হায়দারপুর গ্রামে (বর্তমান বাদুরিয়া থানা) বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। ক্রমে আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষায় রীতিমত বুৎপত্তিলাভ করেন। বিহারে গিয়ে ইসলামধর্ম শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর মনে এক গভীর ধর্মভাব জাগ্রত হয়।

হজযাত্রায় মক্কায় গিয়ে তার সঙ্গে সৈয়দ আহমেদের পরিচয় ঘটে। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ফিরে সৈয়দ আহমদের শিষ্য তিতুমীর ওয়াহাবি আদর্শ অনুসারে আন্দোলন শুরু করেন।

চব্বিশ পরগণার বারাসত অঞ্চলে আন্দোলন শুরু করলেও ক্রমে তিতুমিরের আন্দোলন চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোর জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে তিতুমীর ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। বাঙালি মুসলমানদের হিন্দুয়ানির প্রভাব থেকে মুক্ত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। সুবক্তা তিতুমীরের প্রভাবে বহু মুসলমান তাঁর আন্দোলনের শরিক হন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমানদের দরিদ্র হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে জমিদার, নীলকরদের, সুদখোরদের ও মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির ফলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁতি ও চাষীদের উপর তার প্রভাব বাড়ে। তিতুমীরের আন্দোলন এক সার্বিক গণ অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। অবশ্য ধনী হিন্দু ও মুসলমানরা তার আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই এক সার্বিক নিম্নবর্গীয় গণ অভ্যুত্থানে সন্ত্রস্ত ধনী জমিদার, মহাজন ও নীলকর একত্রিতভাবে তিতুমীর ও কৃষকসমাজকে নির্যাতন করতে শুরু করে। এই জমিদারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়। তিনি তাঁর জমিদারী এলাকায় যে-সব ব্যক্তি ওয়াহাবি আান্দোলন যোগ দিয়েছিল তাদের খাজনা বৃদ্ধি করেন, নানারকম কর বসান। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর পুঁড়া গ্রাম আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেন। ক্রমে তারাপুনিয়া, কুড়াগাছি, নুরনগর, গোবরডাঙ্গা, টাকি, রানাঘাট, বসিরহাট অঞ্চলের জমিদারগণও তিতুমীরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হন। ক্রমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জমিদার নীলকরদের রক্ষার্থে এগিয়ে আসে। তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ তো ছিলই। তারা সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী পাঠায়। আত্মরক্ষার্থে তিতুমীর বারাসতের কাছে নারিকেলবেরিয়াতে তার বিখ্যাত 'বাঁশের কেল্লা' তৈরি করে প্রধান ঘাঁটি গড়েন। বহু সৈন্য জড়ো করে তিতুমীরের ভাগ্নে মাসুম খাঁ অস্ত্র সংগ্রহ করল ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করেও তিতুমীর নিহত হন (নভেম্বর, ১৮৩১)। বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয়, প্রধান অনুচর গোলাম রসুল সহ প্রায় ৩৫০ জন সহকর্মী বন্দী হন। তবে তিতুমীরের মৃত্যুর পরে বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনের ঢেউ স্তব্ধ হয়নি, বরং চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী থেকে সুদূর রাজমহল ও অন্যদিকে ঢাকা পর্যন্ত তা প্রসারিত হয়।

ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলাফল, ব্যর্থতার কারণ ও প্রকৃতি : ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সাফল্য লাভ না হলেও এর ফলাফল কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকেই লক্ষ্য করা যায়। এই আন্দোলন মুসলমান জনগণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল এবং তাদের ধর্মবোধ জাগ্রত করেছিল। তবে এই

আন্দোলনে সেই সময় সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ না করলেও এই বিশুদ্ধতাবাদী আন্দোলন উত্তরকালের বিচ্ছিন্নতা ও মৌলবাদের ভিত্তি তৈরি করে। ক্রমে মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধর্মীয় নেতাদের হাতে চলে যায়। তবে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের স্মৃতি মহাবিদ্রোহে ও পরে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যোগায়। বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন মুসলমান-হিন্দু মিলে দরিদ্র কৃষকদের সার্বিক গণ-আন্দোলনের প্রভাবও উত্তরকালে নীল আন্দোলনে প্রতিভাত হয়েছিল। সারা ভারতে এই আন্দোলনের ফল মুসলিম সমাজের চেতনা নতুনভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করে। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিক থেকে ভারতে ওয়াহাবি প্রভাব কমে আসে।

ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমত**, সৈয়দ আহমেদের চিন্তা তথা ওয়াহাবি আদর্শ ছিল আধুনিক যুগ-বিরোধী। ডঃ তাঁরাচাঁদ লিখেছেন, "উনিশ শতকের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করায় পরিশেষে আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।" **দ্বিতীয়ত**, ওয়াহাবিদের রাজনৈতিক চেতনার অভাব ছিল এবং অনবরত দলত্যাগ তাদের ক্ষতি করেছিল। **তৃতীয়ত**, সীমান্তের উপজাতিরা তাদের পক্ষে ছিল না। **চতুর্থত**, ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামা ছিল নির্বুদ্ধিতা। **পঞ্চমত** অস্ত্র, অর্থ, রশদ ইত্যাদি বস্তুগত প্রতিটি দিকেই ইংরেজদের শক্তি ছিল অনেক বেশি। **ষষ্ঠত**, হিন্দু-মুসলমান ধনী ও মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত শ্রেণী এই আন্দোলনের পক্ষে ছিল না। শান্তপ্রিয় ভদ্র শ্রেণীর কাছে আন্দোলন ছিল 'হাঙ্গামা'।

ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃতি বলতে গিয়ে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ধরণের মত দিয়েছেন। অনেকের মতে এটি পুনরুজ্জীবনবাদী (Revivalist) মৌলবাদী ও পশ্চাদমুখী আন্দোলন। কোনও কোনও অঞ্চলে হিন্দুদের সমর্থন পেলেও মূলত এটি ছিল মুসলমান সমাজের আন্দোলন।[১] এই মতবাদ সর্বাংশে সমর্থনীয় নয়। বস্তুত ওয়াহাবি ভারতের সর্বত্র এক ধরণের আন্দোলন ছিল না। সৈয়দ আহমেদের আন্দোলন পাঞ্জাবের আন্দোলন অবশ্যই ধর্মীয় চরিত্রের কিন্তু বাংলায় তা ছিল ধর্মীয় চরিত্র অতিক্রম করে কৃষক বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম, এইমত অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরীর। অধ্যাপক রণজিৎ গুহ মনে করেন এটি ছিল নিম্নবর্ণের মানুষদের ইজ্জত রক্ষার সংগ্রাম। ডঃ কেয়ামুদ্দিন আহমদ তাঁর 'দ্য ওয়াহাবি মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে সঠিকভাবেই লিখেছেন, "ওয়াহাবি আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল সামাজিক-ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক। প্রথমটির সঙ্গে জড়িত ছিল মুসলিম সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন, আর দ্বিতীয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই"।[২] ইংরেজ ইতিহাসবিদ উইলফ্রেড ক্যাণ্টওয়েল স্মিথের

মতে, "এই আন্দোলন ধর্মীয় চরিত্রের ছিল তবে সাম্প্রদায়িক ছিল না"।[১] এককথায় বলা যায় ওয়াহাবি ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরিত্রের মিলিত সংগ্রাম।

ফরাজি আন্দোলন : ওয়াহাবি আন্দোলনের সমসাময়িক ফরাজি আন্দোলনের মধ্যেও আমরা মুসলমান সমাজের ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই। বস্তুত একই পটভূমিকায় উদ্ভূত এই আন্দোলনও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হলেও অনতিকালের মধ্যেই রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়।[২] তবে ফরাজি আন্দোলন ওয়াহাবির মতন ছড়িয়ে পড়েনি, এটি ছিল বাংলায় সীমাবদ্ধ। এছাড়াও ওয়াহাবির সঙ্গে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। তবে ফরাজি আন্দোলনও ছিল একাধারে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন।[৩]

হাজি শরিয়তউল্লাহ ও ফরাজি আন্দোলনের সূচনা : ফরাজি কথাটি ফরাজী বা ফরাইজী নামেও উচ্চারণ করা যায়। ফার্জ বা ফরাজ কথাটি আরবি, তার অর্থ হলো ঈশ্বরের সেনাপতি। তার বহুবচনে ফরাজি অর্থাৎ আল্লার সেনাপতিগণ যাদের কাজ হলো ইসলাম নির্দিষ্টপথে 'বাধ্যতামূলক কর্তব্য' পালন করা। ভারতে হাজি শরিয়ত উল্লাহ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কর্তব্য বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবার জন্য যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তাই **ফরাজি আন্দোলন**। সুতরাং ওয়াহাবির মতন এই আন্দোলনও শুরুতে ছিল ধর্মীয়; শুদ্ধতাবাদী বা মৌলবাদী চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য ফরাজিরা চেষ্টা করেন। কিন্তু শরিয়ত উল্লাহর পুত্র দুদু মিঞার আমলে শুধু সংস্কারকামী এবং ধর্মের বিশুদ্ধতাপন্থী চেতনার সঙ্গে নিম্নবর্গীয় কৃষক সম্প্রদায়ের চেতনা যুক্ত হয়ে এটিও জমিদার-নীলকর বিরোধী অর্থনৈতিক এবং ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ফরাজি ছিল ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত এক কৃষক বিদ্রোহ।

শরিয়তউল্লাহ পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার সামাইন গ্রামে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বারো বছর বয়সে কলকাতায় পালিয়ে এসে কোরাণ শিক্ষা, হুগলিতে আরবি-ফারসি শিক্ষালাভ করেন এবং আঠারো বছর বয়সে হজ করবার জন্য মক্কা যাত্রা করেন। প্রায় কুড়ি বছর আরব ও মিশরে থেকে তিনি ইসলামের ধর্ম, দর্শন ও আইন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে ১৮১৮-১৯ নাগাদ দেশে ফিরে আসেন। তিনিও আরবে আবদুল ওয়াহাব ও ওয়াহাবিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ভারতে ফিরে ফরিদপুর জেলাতেই মুসলিম সমাজের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে তিনি-ফরাজি আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর সারল্য ও পবিত্র জীবন-যাপন

অচিরেই বাংলার গ্রামের মুসলমানদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। শারিয়তউল্লাহ্‌র মনে হয়েছিল বাঙালি-মুসলমানগণ ইসলামের মূল আদর্শ ও পাঁচটি অবশ্য করণীয় মূলনীতি (কলমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ) থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং বহু অ-ইসলামিয় প্রথা মুসলমান সমাজে ঢুকে পড়েছে। এসব দূর করে কোরান অনুযায়ী পবিত্র আচরণ ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে পালনের জন্য এবং ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ফরাজি আন্দোলনের সূচনা এবং ক্রমে তার প্রসার ঘটে।

ক্রমে শরিয়তউল্লাহ্‌র আদর্শ নিম্নবর্গীয় মুসলমান সমাজে বিশেষত কৃষক ও কারিগরদের মধ্যে এসে পড়ে। তিনি তাদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করেন। কৃষকরাও সংঘবদ্ধ হয়ে গ্রামের জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে দাড়াতে শেখে। এরপর শরিয়তউল্লাহ ধর্মপ্রাণ মুসল- মানদের ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে আহ্বান করেন।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে শরিয়তউল্লাহ্‌র মৃত্যু হলে তার পুত্র মহম্মদ মহসিন আলাউদ্দিন আহমদ বা দুদু মিঞা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুদু মিঞা (১৮১৯-১৮৬২) পিতার মতন মক্কায় গিয়ে শিক্ষালাভ করে এসেছিলেন। তিনি ফরাজি আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন। দুদু মিঞা অবশ্য ধর্মীয় উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করেন নি। তিনি ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার কথাও বলেন। তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অহেতুক আড়ম্বর পরিহার করার, সামাজিক অনুষ্ঠানে অযথা অপব্যয় না করা, পীর বা ফকিরদের সমন্বয়বাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া, কোরানের নির্দেশ অনুসরণ করে সমস্ত রকম পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বর্জন ও ব্যক্তিপুজা পরিহার ইত্যাদি তাঁর প্রচারের অঙ্গ ছিল।

তবে এগুলিকে ছাপিয়ে দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটি তার কাছে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। ফলে ফরাজি আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি চেয়েছিলেন ইয়োরোপীয় নীলকর ও দেশীয় জমিদারদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে এবং সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর মতে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, তাদের মধ্যে উচু-নিচু ভেদ নেই। ঈশ্বর তার প্রিয় মানুষদের জমি দান করেছেন; সেই দান গ্রহণ করার অধিকার সকলেরই আছে এবং জমির মালিক স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং জমিদারগণের খাজনা আদায় করার কোনও অধিকার নেই। জমিদার কর্তৃক চাষীদের শোষণ ভয়ানক অপরাধ, কেননা জমি যারা চাষ করে জমির মালিক তারাই। এইভাবে জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার ফল পূর্ববঙ্গে কৃষক সমাজের এক বড়ো অংশ তার ভাবধারায় আকৃষ্ট হয় এবং দেশীয় জমিদার ও বিদেশী নীলকরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। জমি সংক্রান্ত বিবাদ তিনি নিজে নিষ্পত্তি করতেন এবং কৃষক সম্প্রদায়কে ইংরেজদের আদালতে যেতে নিষেধ করতেন।

শরিয়তউল্লাহ্‌র আন্দোলন এভাবে এক ব্যাপক কৃষক সংগ্রামের রূপ নেয়। ফরাজি আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র প্রাধান্য পায়। দুদু মিঞা এক সুশৃঙ্খল প্রশাসন গড়ে তোলেন যা ফরাজি খিলাফত নামে পরিচিত হয়। তার সংগঠনের

সর্বাধিনায়ককে বলা হত 'ওস্তাদ' এবং তার প্রশাসনকে সাহায্য করতেন 'খলিফা'। তিনি পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি এলাকায় অর্থসংগ্রহের জন্য খলিফাদের দায়িত্ব দেন। তারা চাষীদের মধ্যে ফরাজি আদর্শ ও প্রচার করতেন। বিস্তৃর্ণ এলাকায় ফরাজি প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দুদু মিঞা অধিকাংশ হিন্দু অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন। ফরাজি সামরিক বাহিনীও গড়ে তোলা হয়। ফলে জমিদার, নীলকর এবং ব্রিটিশ সরকার ফরাজিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। প্রভাবশালী মুসলিম জমিদার এবং শহরের অভিজাত মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে ছিলেন বলে অধ্যাপক মইনুদ্দিন অহমদ খান মন্তব্য করেছেন। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত হয়ে বন্দী হন। পরে অবশ্য সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে মুক্তিলাভ করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থ দুদু মিঞার মৃত্যু হয়। তার গ্রেপ্তারের পর ফরাজি আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

এরপর ফরাজি আন্দোলন চালিয়ে যান দুদু মিঞার পুত্র আবদুল গফুর বা নোনা মিঞা (১৮৫২-১৮৮৩)। তবে তিনি আন্দোলন চালিয়ে গেলেও তার প্রভাব অনেক হ্রাস পায়। ফরাজি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলি সহজেই চিহ্নিত করা যায়। **প্রথমত**, নোনা মিঞার পিতা দুদু মিঞা বা পিতামহ শরিয়তউল্লাহ্‌র মতন যোগ্যতা ছিল না। **দ্বিতীয়ত**, তিনি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কর্মসূচির গুরুত্ব না দিয়ে ধর্মীয় কর্মসূচির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়াতে ফরাজি আন্দোলনের গণ-ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়। ফরাজিরা এক সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। **তৃতীয়ত**, ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে বরাবরই এক ধর্মীয় চেতনা বিরাজমান ছিল। অথচ মুসলমান সমাজের এক প্রভাবশালী অংশ এর বিপক্ষে ছিলেন। **চতুর্থত**, ফরাজি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার অভাব ছিল। যথার্থ সংগ্রামের অভিজ্ঞতাও ছিল না। ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাও ছিল না। এইসব দুর্বলতার ফলে দুদু মিঞার গ্রেপ্তারের পর জমিদার, নীলকর ও ইংরেজদের মিলিত শক্তির কাছে তারা পর্যুদস্ত হয়। তবে ব্যর্থতা সত্ত্বেও পরবর্তী কৃষক সংগ্রামের উপর এই আন্দোলনের প্রভাব অনস্বীকার্য।

৫। শিক্ষিত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার প্রসার

উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতে যে জাগরণের সৃষ্টি হয় তার কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ঐ জাগরণের পিছনে অন্যতম কারণ হিসেবে যেমন ছিল নানা ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন, তেমনি পাশ্চাত্য তথা আধুনিক শিক্ষার সূচনা ও প্রসার। এই জাগরণের ফলেই আমাদের দেশে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি। এই শিক্ষিত অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে পাশ্চাত্যের নানা রাজনৈতিক আদর্শ ও ভাবধারার সংযোগ ঘটে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির সংস্পর্শে। এর ফলে ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ হয়। উনিশ শতকের

প্রথমার্ধে এই শিক্ষিত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার প্রসার আমরা লক্ষ্য করি তাদের কার্যকলাপের মধ্যে।

আরও মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষিত শ্রেণীর অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। **প্রথমত**, এই শ্রেণীর মধ্যে অভিজাত ও ধনীরাই ছিল প্রথমদিকে সক্রিয়, পরে মধ্যবিত্তরা নেতৃত্বে আসে। তবে তা মহাবিদ্রোহের পরের ঘটনা। ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতীয় বা বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জমিদার বা ভূস্বামী শ্রেণীরই ছিল প্রাধান্য। **দ্বিতীয়ত**, এই শ্রেণীর অধিকাংশই ছিলেন শহুরে এবং হিন্দু। গ্রামীণ সমাজের ও অহিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা তেমন উল্লেখযোগ্য নন। **তৃতীয়ত**, শিক্ষিত শ্রেণীর মনে ছিল ইয়োরোপের নানা সমকালীন ঘটনাবলীর প্রভাব। যেমন ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী বা প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু তারা সেই কারণে স্বৈরাচারের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক সরকার চাইতেন। ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ তাদের তখনই কাম্য ছিল না। ব্রিটেনে প্রচলিত আইনের শাসনের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় প্রশাসন তাঁরা চাইতেন। চাইতেন প্রশাসনে ভারতীয়দের নিয়োগ, কালা-আইনের প্রত্যাহার এবং নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ অনুযায়ী দাবি দাওয়া নিবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার হোক।

তবে এই সব ক্রুটি বা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের গোড়া থেকে মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত যুগটি মূল্যহীন আদৌ নয়। **প্রথমত**, তা ছিল সদ্য চেতনা জাগ্রত হওয়ার কাল। প্রতিবাদের প্রথম পর্ব। তাই সীমাবদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক। **দ্বিতীয়ত**, ঐ যুগেই কিছু সংবাদপত্র ও সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি তৈরি হয়। **তৃতীয়ত**, ঐ প্রাথমিক পর্ব উত্তরকালকে প্রেরণা যোগায়।

রামমোহন রায় ঃ ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তেমন তার কর্মকান্ড থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাই লিখেছেন, "As the history of Western political thought practically begins with the name of Aristotle, the history of political thought in modern India begins with the revered name of Raja Rammohan Roy."

রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূলকথা ছিল স্বাধীনতা স্পৃহা, দেশপ্রেম এবং মানুষের মুক্তি। বন্ধু সাংবাদিক জেমস্ সিল্ক বাকিংহামকে তিনি লিখেছিলেন যে, স্বাধীনতার যারা শত্রু এবং স্বৈরতন্ত্রের যারা বন্ধু, তারা কোনও দিনও সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।" বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করে ক্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা করেছিলেন। তবে রামমোহন ভারতের অগ্রগতি এবং পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে মধ্যযুগীয় পশ্চাদ্‌গামিতা কাটিয়ে আধুনিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তখনই রাজনৈতিক মুক্তির কথা ভাবেন নি, বরং ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ শাসন চেয়েছিলেন। তবে ভবিষ্যৎ মুক্তির স্বপ্ন তাঁর মনে ছিল। তাঁর

প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল কোম্পানির শাসনের দোষত্রুটি দূর করে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাদের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি আদায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক অভাব অভিযোগ দূর করার পদ্ধতি ও আন্দোলনেরও তিনি সূচনা করেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার খর্ব করার যে আদেশ জারি হলো রামমোহন ও তার কয়েকজন সহযোগী তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের কাছে এক স্মারকলিপি এবং ইংল্যাণ্ডে স-পার্ষদ রাজার কাছে এক আর্জি পাঠান। এটি এক যুগান্তকারী ঘটনা। জনমতের চাপে পরে এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়েছিল। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে বিচারকার্যে ভারতীয় জুরিদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন আইন হলে রামমোহন তারও প্রতিবাদ করেন।

রামমোহন ভারতে অবাধ ঔপনিবেশিকতা বা কলোনাইজেশন চাইতেন না। তিনি কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিপক্ষে ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংলাণ্ডে চার্টার আইন পাসের আগে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দান কালে তিনি ভারতের রায়তদের পক্ষে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটির সমালোচনা করে বক্তব্য পেশ করেন। তিন আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

রামমোহন রায় যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও মুক্তিকামী মানসিকতার সূচনা করেন তার মৃত্যুর পর তা ধীরে ধীরে আরও ব্যাপ্তি লাভ করে। রাজনৈতিক আন্দোলনেরও বৃদ্ধি ঘটে। তাছাড়া জনমতের প্রকাশ ঘটে নানা সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মধ্যে। রামমোহনের পরে এই কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে *ডিরোজিওর ছাত্রমণ্ডলী* বা ইয়ংবেঙ্গল দলভুক্ত অনেকেই। এই নব্যবঙ্গ দলের 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (১৮২৮) থেকে ''সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮) পর্যন্তঅনেক সভাসমিতিতেই রাজনীতি আলোচিত হত। এই দলের রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এ ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলেন। অনস্বীকার্য যে, বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা যুবসম্প্রদায়ের মনে বাড়তে থাকে। ঐ একই সময়ে 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার', ' রিফর্মার', 'পার্থেনন', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রমুখ পত্র পত্রিকাতেও রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হত।

সংগঠিত জনমতের মাধ্যমে শিক্ষিত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এসময় সংগঠন, সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র ছাড়াও ছিল নানা জনসভা। যেমন ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের অনুরোধে কলকাতার শেরিফ টাউন হলে এক জনসভা ডেকেছিলেন। সেখানে বক্তারা ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের কিছু ধারার সমালোচনা এবং ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের সংবাদপত্র সেনসরশপ আইনের সমালোচনা করা হয়। উনিশ-শতকের তিরিশ এবং চল্লিশের দশক থেকে এরকম অনেক সভার বিবরণ

সমসাময়িক সূত্র থেকে জানতে পারা যায়। বক্তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নব্যবঙ্গ দলভুক্ত। অনেকে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সদস্য।

৬। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ

ভূমিকা ঃ বাংলার বুকে পলাশির যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রিঃ) ভিতর দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের সূত্রপাত হয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গের অনৈক্য, জনসাধারণের জাতীয় ভাবের অভাব, সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবক্ষয় ইত্যাদি ইংরেজদের ভারতে প্রবেশ, বাণিজ্য বিস্তার, রাজ্য স্থাপন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। পলাশি থেকে পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে ইংরেজ ভারতের বুকে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করল।

আবার এই একশো বছরের মধ্যে ভারতীয় সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। দেশের রাজন্যবর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিপুঞ্জের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, মর্যাদা, সম্ভ্রম সবকিছু ধূলুণ্ঠিত হলো। ভারতীয় শ্রেষ্ঠীদের বাণিজ্য ইংরেজ বণিকদের হাতে সীমাবদ্ধ হলো। শুধুমাত্র জীবন ও জীবিকা নিয়ে যারা চিন্তা ও কর্মে ব্যস্ত সেই মেহনতী মানুষ বুঝল যে ইংরেজের রাজত্বে সোয়াস্তি নেই, আছে যন্ত্রণা এবং সেই যন্ত্রণা দিনে দিনে বেড়েই চলছে ও চলবে। তাই সুযোগ পাওয়ায় বা উপযুক্ত নেতৃত্বের নির্দেশ পেয়ে তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, রক্ত দিয়েছে। কিন্তু জাতীয় চেতনার অভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। সুতরাং বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের আগুন সাময়িকভাবে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেছে। তবে অদৃষ্টবাদী ভারতবাসী নিশ্চয়ই ভেবেছিল 'পাপের পসরা' পূর্ণ হলে দুর্দৈব দূর হবে, ইংরেজের পতন ঘটবে।

অন্যদিকে ইংরেজও জানত এদেশ তাদের নয়, এদেশ থেকে নিয়ে যেতে হবে সবকিছু, দেওয়ার যদি কিছু থাকে তা তো শুধু নেওয়ার জন্য দেওয়ার। সামরিক বাহিনী দ্রুত চলাচল ও অর্থনৈতিক শোষণের জন্যে রেল, ডাক, তার, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা ইংরেজ করেছে। সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষক তৈরির জন্যে ইংরাজদের মাধ্যমে এদেশে এলো পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান খুশি করার মাধ্যমে শুষে নেওয়ার জন্যে গভর্নর জেনারেলদের অনেকেই সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। ধ্বংসের লক্ষ্যে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু সৃষ্টিমূলক কাজ তাদের করতে হয়েছে। এসবের দ্বারা যে ইংরেজদের রাজত্ব চিরস্থায়ী হতে পারে না তা অনেক ইংরেজই বিষয়টা অনুধাবন করেছিলেন। যেমন দূরদর্শী মেটকাফ ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে বললেন, "ভারতে আমাদের অবস্থা সর্বাধিক সঙ্গীণ, এদেশের ভূমিতে আমাদের শিকড় নেই, ঝড় এলে এখনই আমাদের উড়িয়ে দেবে।" পিণ্ডারী দস্যুসহ মারাঠাদের পরাজয়ের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখলেন (১৮২০ খ্রিঃ) "আমরা কি কখনও এদেশবাসীকে আমাদের অনুগত করতে পারব? উচ্চশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ জড়িত করে কি তা করা সম্ভব? এর উত্তর হলো—না।" দূরদর্শী মেটকাফ

প্রকৃতই অনুধাবন করেছিলেন, "সারা দেশটাই সর্বদা আমাদের সর্বনাশের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। আমাদের শক্তি ধ্বংস হলে তারা উল্লসিত হবে।" দেশবাসীর বিক্ষুব্ধ মনের সন্ধান ইংরেজ শাসকরা অনেক আগেই পেয়েছিলেন। পলাশির (১৭৫৭ খ্রিঃ) একশ বছর পর (১৮৫৭ খ্রিঃ) সেই বৈচিত্র্যময় বিক্ষোভ যেন বিস্তৃত এলাকায় একটু সংঘবদ্ধ-ভাবেই দেখা দিল।

বিদ্রোহের কারণ ঃ উৎপত্তিগত বিচারে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ সামরিক বিক্ষোভের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাই ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এটিকে সিপাহী বিদ্রোহ (Sepoy Mutiny) নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ঘটনাটি এমন একটি সময় ঘটলো যখন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় নানা বিক্ষোভ একত্রে দানা বেঁধে উঠল। বিদ্রোহী সিপাহীরাও স্বার্থানুসন্ধানী অভিযানকারীদের সঙ্গে যোগদান করল ও বিদ্রোহকে তাদেরই পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করল। তবে বিদ্রোহের বহুবিধ কারণকে বিশ্লেষণ করে মোটামুটি চারটি স্তরে ভাগ করা যায়, যথা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সামরিক ও মিশ্র।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনাতে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের উপর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। লর্ড হওয়ার পূর্বেই রবার্ট ক্লাইভ এসবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংস অবৈধভাবে রাজ্যগ্রাস ও অর্থশোষণের চেষ্টা করেন। মহীশূরের অধিপতি হায়দার আলির নেতৃত্বে মহীশূর, হায়দ্রাবাদ ও মহারাষ্ট্র— এই তিনটি রাজ্যকে নিয়ে ইংরেজ-বিরোধী রাষ্ট্রজোট তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কূটকৌশলে উক্ত ত্রিশক্তি জোট ভেঙে গেল। এরপর টিপুসুলতানের প্রচেষ্টায় কাবুলের অধিপতি জামান শাহ, সিন্ধিয়া ও অযোধ্যার অধিপতিদের একটি শক্তিজোট গঠিত হয়। কিন্তু এই শক্তিসংঘের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। লর্ড ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির' ফাঁদে অনেকে পা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অযোধ্যার নবাব ও হায়দরাবাদের নিজাম প্রথম স্তরেই এই নীতির কবলে আবদ্ধ হন। ওয়েলেসলির এই নীতি পরিণতি লাভ করে লর্ড ডালহৌসির 'স্বত্ববিলোপ ও ছলনার নীতি'তে। ডালহৌসির নীতিতে মিত্ররাজ্য অযোধ্যার নবাবকে রাজ্যচ্যুত করা হলো। কর্ণাটক ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তকপুত্র এবং পেশোয়ার দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানা সাহেব রাজ্যলাভ এবং সেই সঙ্গে ইংরাজ কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি ও রাজা উপাধি থেকে বঞ্চিত হলেন। কুশাসনের অজুহাতে এবং দত্তকপুত্র গ্রহণের ভারতীয় চিরাচরিত প্রথাকে অস্বীকার করে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসী, সম্বলপুর ইত্যাদি রাজ্য লর্ড ডালহৌসি অধীকার করলেন। শুধু রাজ্যচ্যুতি নয়, রাজপরিবারের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে নাগপুরের প্রাসাদ ও অযোধ্যার কোষাগার নির্লজ্জভাবে লুণ্ঠিত হয়। লর্ড ডালহৌসি ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের কথা চিন্তা করে নামমাত্রা মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের উপাধি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু এই সংবাদটি

ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মনে চরম অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার ভিতর দিয়ে সাধারণ ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ রাজত্ব সম্পর্কে বিশেষ বিতৃষ্ণা ও বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেল। কারণ, ভারতীয় প্রথা অনুসারে যে-কোনও রাজা-বাদশাহের হাতে বহুজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব থাকত। দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকত বহু প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যক্তিবর্গ। যেমন, এক্ষেত্রে অযোধ্যার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। অযোধ্যা ছিল সীমান্তের মিত্ররাজ্য। আফগান ও মারাঠা আক্রমণের ভীতি থেকে প্রথম স্তরে অযোধ্যাই ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। অযোধ্যার সিপাহী রাই সর্বাধিক সাহায্য দিয়েছিল ইংরেজদের। ওয়েলেসলির আমলে মিত্র রাজ্য থেকে এটি হলো অধীনতামূলক মিত্র রাজ্য। লর্ড ডালহৌসি তাঁর স্বত্ববিলোপ নীতি ও কুশাসনের অজুহাতে সেটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নবাব ও তাঁর পরিবারবর্গকে কলকাতার টালিগঞ্জে ইংরেজের বৃত্তি নির্ভর করে রাখলেন। এর ফলে অযোধ্যার নবাব-দরবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ দিশাহারা হলেন, সিপাহীরা বেকার হয়ে পড়ল, দরবারের সাহায্যপুষ্টরা সহায়-সম্বলহীন হলেন। ইংরেজ লেখকদের লেখা থেকে জানা যায়, উচ্চ পরিবারের অসূর্যস্পশ্যা মহিলাদেরও রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে ভিক্ষা করতে হলো। সর্বস্তরের মানুষের মনে বিক্ষোভের অগ্নিপিণ্ড তৈরি হলো। ঠগী দমনের নায়ক শ্লিম্যান তাই লর্ড ডালহৌসিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "আরও দশটা রাজ্য হারিয়ে অযোধ্যা অধিকারের মূল্য দিতে হতে পারে, আর সেখানে সিপাহীদের মধ্যে অনিবার্যভাবে বিদ্রোহ ঘটবে।" শ্লিম্যানের বক্তব্য বাস্তবে পরিণত হলো ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে। অযোধ্যার এই দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিল বঞ্চিত সকল রাজ্যখণ্ডে।

ইংরেজ এদেশে এসেছিল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রাপ্তির (১৭১৭ খ্রিঃ) পর থেকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুনাফা শোষণের সূত্রপাত ঘটে। ক্রমে ক্রমে দস্তকের অপব্যবহার এই মুনাফা লুণ্ঠনের ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করে। তাহলে লক্ষ্য করা যায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্তির বহু পূর্ব থেকে বেনিয়া ইংরেজ এদেশকে নানাভাবে শোষণ করেছে। এরপর শুরু হলো শাসনের অছিলায় শোষণ। **প্রথমত**, রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়ে লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস নির্মমভাবে শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলার অছিলায় এদেশকে সর্বস্বান্ত করেন। সেই সঙ্গে স্বার্থপর কর্মচারিবৃন্দ ব্যক্তিগত ব্যবসা বিস্তার করে ঘুষ, নজরানা, উপঢৌকন ইত্যাদির নামে এদেশের আর্থিক কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে দিল। **দ্বিতীয়ত**, ইংরেজের মাতৃভূমি ছিল শিল্প-বিপ্লবের কেন্দ্র। ইংরেজ শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করেছে ভারত থেকে। নতুন নতুন শিল্পের সম্প্রসারণের জন্যে যেমন— প্রয়োজন কাঁচামাল তেমনি প্রয়োজন শিল্পজাত পণ্য-সামগ্রী বিক্রয়ের বাজার। ভারতের সোনা, রূপা ও মূল্যবান ধাতুদ্রব্যসহ অন্যান্য কৃষিজাত কাঁচামাল, যেমন তুলো, পাট, নীল ইত্যাদি সরবরাহ করেছে ভারত। আর

ইংল্যাণ্ডে আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি, বাষ্প ও বিদ্যুতের সাহায্যে সস্তায় স্বল্প সময়ে উৎপাদিত হয়েছে বহুল পরিমান শিল্পজাত পণ্য-সামগ্রী। ইংরেজের কৌশলে ভারতবাসী তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের নিজস্ব শিল্প রসাতলে গেল, ভেঙে পড়ল গ্রামীণ অর্থনীতি, বেকার হল তাঁতি, কারিগর, শ্রমিক। **তৃতীয়ত,** ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ছিল নিতান্ত একমুখী, সেই শিক্ষা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়নি। নতুন শিক্ষায় শিক্ষিতরা সরকারি উচ্চপদ প্রাপ্তির আশা পোষণ করতেন; কিন্তু সেইসব পদ ছিল ইংরেজ তথা ইয়োরোপীয় যুবকদের জন্যে একচেটিয়া। সরকারি ও বেসরকারি পদে নিয়োজিত ভারতীয়দের বেতন ছিল অতি সামান্য। **চতুর্থত,** লর্ড ডালহৌসির সময় এলো স্বত্ববিলোপ আইনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের দত্তক পুত্ররা ইংরেজের প্রতিশ্রুত বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন। কোম্পানির স্বার্থে সরকারি ব্যয় হ্রাস পেল ঠিকই, কিন্তু বৃত্তিভোগীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হলো। **পঞ্চমত,** রাজ্যচ্যুত রাজন্যবর্গের কর্মচারী, সৈন্য-সামন্ত, পারিবারিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের নিয়ে একটা বিরাট সংখ্যক মানুষকে আর্থিক দুর্যোগের মধ্যে নিক্ষেপ করল। ইংরেজ ঐতিহাসিক জন কে স্পষ্টই বলেছেন, "সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা, যাঁরা এক সময় বিলাস-ব্যসনের মধ্যে জীবন যাপন করতেন তাঁরা হঠাৎ বঞ্চিত হয়ে .... রাতের অন্ধকারে অপরের গৃহে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন।" বঞ্চিত এই মানুষদের ক্ষেত্রে ইংরেজ বিরোধী গোষ্ঠীর হাতে হাত মেলানো ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। **ষষ্ঠত,** সমসাময়িক যুগে ইংরেজ সরকার বহু নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করে বহু তালুকদারকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। অযোধ্যায় প্রচলিত নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় বহু তালুকদারকে সমূহ বিপদে পড়তে হলো। বোম্বাই অঞ্চলে 'ইনাম কমিশনের" রায় অনুসারে প্রায় বিশ হাজার মালিক জমির উপর থেকে তাদের দখল ছাড়তে বাধ্য হল। সুতরাং আর্থিক সঙ্কট জড়িত ব্যক্তিবর্গ ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের জন্যে উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। **সপ্তমত,** এই যুগে প্রশাসনের নীচু স্তরে ছিল ব্যাপক দুর্নীতি ও শোষণ। পুলিশ, ছোটখাটো রাজকর্মচারী, নিম্নতম আদালতগুলি ছিল দুর্নীতি ও শোষণের কেন্দ্র। মহাবিদ্রোহের কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে উইলিয়াম এড্ওয়ার্ডস নামক এক ইংরেজ কর্মচারী লিখেছেন, "পুলিশ জনসাধারণের কাছে রীতিমত 'বিভীষিকাজনক বস্তু', আমাদের গভর্নমেন্টের উপর জনসাধারণের বিরাগের একটা মুখ্য কারণ হলো তাদের উপর পুলিশের অত্যাচার ও শোষণ।" এযুগে গরীব কৃষক-প্রজা বা একটু ধনী জমিদার-তালুকদারদের ভয় দেখিয়ে অথবা তাদের কার্যোদ্ধারে সাহায্য করা১র অজুহাতে তাদের কাছ থেকে অর্থ শোষণ করা সহজ ছিল। এরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সাধারণ মানুষ মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মুক্তির আশায় তারা মহাবিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

বিজেতা ও বিজিত, শাসক ও শাসিতের সমাজ, সংস্কার প্রথাগত আচার-আচরণ, ধর্ম ও কৃষ্টির বিচারে যে দুস্তর ব্যবধান ছিল সেই বৈষম্যও বিদ্রোহের অনুকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। (১) ভারতবাসী বহুকাল যাবৎ একটা নির্দিষ্ট সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল। কোম্পানি শাসনের প্রথম স্তরে হেস্টিংস প্রমুখ কয়েকজন গভর্নর জেনারেল নবজাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষাকল্পে ভারতবাসীর সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রসঙ্গে উদার নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তবে কোম্পানির সাধারণ প্রশাসকদের মধ্যে উক্ত উদারতার নিতান্তই অভাব ছিল। অষ্টাদশ শতকের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ "সিয়ার-উল-মুতাখ্‌রিন" থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশ শাসকের দল এদেশের মানুষকে ঘৃণা করত এবং এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। লর্ড কর্ণওয়ালিস সরকারি উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছিলেন। উদারপন্থী নামে খ্যাত লর্ড বেণ্টিঙ্কের আইন সচিব লর্ড মেকলে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ক্ষমতার অযোগ্য মন্তব্য করেছেন। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সামাজিক বিধিবিধান ও আচার-নিষ্ঠায় অভ্যস্ত ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ বিরূপ মন্তব্য ছিল সহ্যের অতীত। (২) খ্রিস্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতেন। তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের দেবদেবী, ফকির-বোষ্টমদের নামে কুৎসা রটনা করতেন। এ ব্যাপারে সরকারি নিষেধাজ্ঞা (১৭৫৭-১৮১৩ খ্রিঃ) থাকলেও শ্রীরামপুরের মিশনারীরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের উপর আঘাত দিয়ে পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ নবীকরণের পর ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে খ্রিশ্চান মিশনারীদের নগ্ন প্রয়াস আরও বৃদ্ধি পায়। এর উপর লর্ড ডালহৌসির আমলে আইন করা হলো যে, ধর্মত্যাগী সন্তানও পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। সুতরাং ধর্মভীরু ভারতবাসীর মনে ইংরেজ-বিরোধী ক্ষোভ জমে উঠল। (৩) ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের ফলে এদেশে এমন মানসিক আবহাওয়া তৈরি হলো যে, ইংরেজ কর্তৃক গৃহীত যে কোনও উন্নয়নমূলক কর্মের মধ্যেও ভারতের মানুষ দুরভিসন্ধি খুঁজে পেয়েছে। যেমন— ডাক, তার, রেলপথ, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকলেও এ-সবের মধ্যে যে ইংরেজ বেনিয়ার স্বার্থ, বাণিজ্য এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও সঞ্চালনের আয়োজন আছে তা বুঝতে ভারতবাসীর বিলম্ব হয়নি। শুধু উন্নয়নমূলক কর্ম নয়, সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণের মধ্যেও ভারতবাসী ইংরেজের দুরভিসন্ধির ইঙ্গিত পেয়েছে। তাই সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, রাজপুত কন্যা হত্যা, সমুদ্রে সন্তান বিসর্জন নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদিকেও এদেশের সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই লক্ষ্য করা যায়, ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পূর্বেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমাজ ও ধর্মকেন্দ্রিক আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-৮০ খ্রিঃ), ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮২০-৪৭ খ্রিঃ), দক্ষিণ ভারতে মোপালা বিদ্রোহ (১৮৫৫ খ্রিঃ) ইত্যাদি ছিল অংশত ধর্মাশ্রিত অভ্যুত্থান।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অগ্রগতির মূলে ছিল ভারতীয় সিপাহীদের সাহস, নৈপুণ্য ও ঐকান্তিক আনুগত্য। একদিন এই সিপাহীরাই স্বদেশ ও স্বধর্মের কথা ভুলে ইংরেজ প্রভুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রথম যুগে ইংরেজ সেনানায়কগণ ভারতীয় সিপাহীদের খুশি রাখার চেষ্টা করত। তাদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব যোগাযোগ রাখত। ক্রমশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ সেনানায়কদের আচার-আচরণের বৈষম্য ও রুক্ষতা সুস্পষ্ট হতে থাকে। এক সময় যে ভারতীয় সিপাহী শ্বেতাঙ্গ প্রভুর জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল তারাই ক্রমে প্রভুর প্রতি রুষ্ট হলো, বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করল। সিপাহীদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের কারণ ছিল নানাবিধ। তবে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ভারতীয় সিপাহীদের বেতন ও ভাতা ছিল নিতান্ত সামান্য। তাদের পদোন্নতির সুযোগ ছিল আরও অনেক বেশি সীমিত। এগুলি ভারতীয় সিপাহীদের অসন্তোষের কারণ ছিল ঠিকই, কিন্তু এসবের জন্যে তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি— ভারতীয় রীতিনীতি, কৃষ্টি-সভ্যতা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ করাতে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। যেমন শ্বেতাঙ্গ সেনানায়করা এদেশের ভাষা জানত না, কিন্তু কতকগুলি বাছা বাছা গালি-গালাজের বুলি তারা শিখেছিল। যেমন "শুয়োর" একটি শব্দ এই শব্দটি উচ্চারণ করে গালি দিলে সিপাহীরা খুব বেশী অপমান বোধ করত। ঊর্ধতর কর্মচারীর নিকট কোনও অভিযোগ পেশ করলে এসব গালিগালাজের কোনও প্রতিকার মিলত না।

(২) ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের অন্তর্গত ভেলোরের সিপাহীদের হুকুম দেওয়া হলো যে তাদের বিশেষ ধরণের পাগড়ি ব্যবহার করতে হবে। দাড়ি রাখা, তিলক কাটা বা ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কিত কোন চিহ্ন (Mark) তারা ব্যবহার করবে না। হুকুম পেয়েই সিপাহীরা বিদ্রোহ করল। কারণ তাদের ধারণা হলো যে, মাথায় বিশেষ ধরণের চামড়ার টুপি পরিয়ে তাদের ধর্মনাশ করাই ইংরেজদের উদ্দেশ্য। সেই বিদ্রোহে দশজন অফিসারসহ একশ তেরজন শ্বেতাঙ্গ সামরিক কর্মচারী ভারতীয় সিপাহীদের হাতে মারা যায়। আর্কট থেকে সৈন্যদল এনে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

(৩) ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নিকট ব্যারাকপুরের ছাউনিতে আর একটি বিদ্রোহ ঘটে। এখানকার সিপাহীদের সমুদ্রপথে রেঙ্গুনে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু "কালাপানি" পার হলে ধর্ম নষ্ট হবে। তাই সিপাহীরা কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে। সিপাহীরা অস্ত্র ত্যাগ করতেও অস্বীকার করে। তখন ইংরেজের পক্ষ থেকে এদের কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

(৪) ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে আফগান যুদ্ধে প্রেরিত হিন্দু সিপাহীরা সিন্ধুনদ পারাপার, নিষিদ্ধ খাদ্য-পানীয়ের ব্যবহার ইত্যাদির জন্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

(৫) ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ক্রিমিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ও সেখানে ভারতীয় সিপাহীদের প্রেরণ করা হয়। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সিপাহী বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৫৭-এর পূর্বে এই ধরণের ঘটনা কয়েকটি ঘটেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কঠোর

হস্তে বিদ্রোহ দমন করা হয়। আর প্রতিটি বিদ্রোহের পশ্চাতে ধর্মনাশের আশঙ্কা ছিল প্রবল।

প্রথম স্তরে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে ইংরেজ প্রতি যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল ১৮৫৭-এর পূর্ব মুহূর্তে তার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। মনরো একবার বলেছিলেন, সিপাহীরা ইয়োরোপীয় চরিত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারালেই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করবে। শ্বেতাঙ্গ সেনানায়কদের অবিচার ও অত্যাচারে ভারতীয় সিপাহীরা সেই শ্রদ্ধা হারাল।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভারতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন লর্ড ক্যানিং। তাঁর সামনে ছিল বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকাণ্ডের চিত্র। কৃষ্ণ সাগর, পারস্য উরসাগরের উপকূলে রুশভীতি, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি নিয়ে ইংরেজ তখন ব্যতিব্যস্ত। ভারতে এসেই লর্ড ক্যানিং হুকুম জারি করলেন, সিপাহীদের যে-কোন যুদ্ধে যোগদান করতে হবে। সিপাহীদের অতীতের পঞ্জীভূত অসন্তোষ যেন স্ফীত হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় এনফিল্ড রাইফেল (Enfield Rifle) নামক নতুন ধরণের অস্ত্রব্যবহারের নির্দেশ এল। গুজব রটল যে ঐ রাইফেলের জন্যে নির্দিষ্ট টোটাগুলি (Cartridges) গরু ও শুকরের চর্বি মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে। রাইফেলে টোটা বা কার্তুজ ভরবার পূর্বে দাঁত দিয়ে তার একটা অংশ কাটতে হয়। চর্বির কথা রটনায় সিপাহীরা ধর্মনাশের ভয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এছাড়া টিকি রাখা, পাগড়ি ব্যবহার, ফোঁট-তিলক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে হুকুম জারি করা হয়েছিল। টোটা সম্পর্কিত রটনাটি পরে সত্য বলেই প্রতিভাত হয়। তখন ভারতীয় সিপাহীদের বিক্ষোভ সশস্ত্র বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করল। প্রথমে সাড়া পড়ে যায় বহরমপুরে। ইংরেজ ঐতিহাসিক জন কে-এর লেখা থেকে জানা যায়, বহরমপুরের নিকটবর্তী মুর্শিদাবাদ থেকে দলে দলে মানুষ সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করে (২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৭ খ্রিঃ)। কিন্তু যার মুখ চেয়ে বিদ্রোহীরা অপেক্ষা করছিল সেই নবাব-বংশধর মনসুর আলী খাঁ এগিয়ে এলেন না। এরপর (২৯শে মার্চ, ১৮৫৭ খ্রিঃ) ব্যারাকপুরের ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে নামক এক সিপাহী প্রথম ক্যাপটেনের আদেশ অমান্য করলেন। পাণ্ডের গুলিতে ইংরেজ "আড্‌জুটাণ্ট" প্রাণ হারালেন। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলপাণ্ডে আর ঈশ্বরী পাণ্ডের প্রাণদণ্ড হলো। তৎক্ষণাৎ সমগ্র রেজিমেন্টটিকে ভেঙে দেওয়া হল। বিদ্রোহের এই সংবাদ গোপন রইল না— ফলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ভারতের অন্যান্য স্থানে সিপাহীরা ধৈর্য হারাল।

বিদ্রোহের বিস্তার ও দমন ঃ বহরমপুর ও ব্যারাকপুরের সংবাদ অবিলম্বে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল। এরপর মাস দুয়েকের মধ্যে মিরাটের কিছু সংখ্যক সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত করে। ১৮৫৭-এর ২৪ শে এপ্রিল কুচকাওয়াজের সময় ৯০ জন সিপাহীদের মধ্যে ৮৫ জন টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। সামরিক আদালতের বিচারে তাদের দশ বছরের জন্যে কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হলো। ১৮৫৭-এর মে মাসে অতিরিক্ত শাস্তির জন্যে তাদের হাতে-পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে কয়েদখানায় রাখা হল। পরের দিন

(১০ মে, ১৮৫৭ খ্রিঃ) বাইরের সিপাহীরা কয়েদখানা ভেঙে দণ্ডিত বন্ধুদের মুক্ত করে আনল। বিদ্রোহীদের শান্ত করার প্রচেষ্টায় রত কর্নেল ফিনিস নিহত হলেন। শুরু হলো ব্রিটিশ বিরোধী চরম অভ্যুত্থান।

মিরাটের কারাগার থেকে মুক্ত সিপাহীরা আওয়াজ তুলল "দিল্লি চলো"। দিল্লি পৌঁছেই সিপাহীরা আরও কয়েকজন সামরিক অফিসারকে হত্যা করল, আর তাদের বাসস্থান পুড়িয়ে দিল। দিল্লির মোগল সম্রাট ছিলেন তখন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। সিপাহীরা তাঁকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করল। এখানকার সম্পত্তিচ্যুত তালুকদার ও কৃষকসহ সাধারণ মানুষ সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করল। এই অঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন ফৈজাবাদের বিখ্যাত মৌলভী আহম্মদ উল্লা শাহ। দ্বিতীয়ত, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানা সাহেব কানপুরে নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন। নানা সাহেবের জন্যে ইংরেজের প্রতিশ্রুত ভাতা বন্ধ করেছিলেন লর্ড ডালহৌসি। ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ, মধ্যভারতের মারাঠা নেতা তাঁতিয়া তোপী, বিহারের কুনওয়ার সিংহ ও অমর সিংহ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। রোহিলাখণ্ডের বিখ্যাত সর্দার হাফিজু রহমৎ খাঁ-এর বংশধর খান বাহাদুর খাঁর বেরিলীতে নিজেকে দিল্লির মোগল বাদশাহের প্রতিনিধি নিসেবে ঘোষণা করলেন। পাটনায় ওয়াহি সম্প্রদায় ইংরেজের চোখের ঘুম কেড়ে নিল। ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের "১৮৫৭" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ইংরেজ-বিরোধী এই সংগ্রাম চলেছিল প্রধানত পশ্চিম বিহার থেকে পাঞ্জাবের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত। অবশ্য বাংলা, আসাম, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশেও চাঞ্চল্যের চিহ্নের অভাব ছিল না।

এরপর একই সঙ্গে চলল বিদ্রোহের বিস্তার ও দমনের পালা। দিল্লিতে প্রকৃতপক্ষে মোগল সম্রাটকে কেন্দ্র করেই বিদ্রোহ সর্বাত্মক হয়ে উঠল (১২ মে, ১৮৫৭ খ্রিঃ)। সম্রাটের নামে জনগণকে আহ্বান জানিয়ে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হল (২৫শে আগস্ট, ১৮৫৭ খ্রিঃ)। এই ঘোষণা সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় স্বনামধন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখলেন যে, এই ঘোষণায় একদিকে যেমন হিন্দুর শাস্ত্র ও মুসলমান শরিয়তের কথা ছিল তেমনি অন্যদিকে সাধারণ রাজনৈতিক বিক্ষোভের কথা উল্লিখিত ছিল। "সমগ্র জাতি যে বিপ্লবের জন্য জাগ্রত ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত"—তা এই ঘোষণা থেকে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। বাহাদুর শাহকে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠিত করে সিপাহীরা এটা বোঝাতে চেয়েছিল যে এটা শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ নয়— এটা বিদেশীর বিরুদ্ধে ভারতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকেই বাদশাহের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। বাদশাহও দেশের সকল রাজা, নবাব, সর্দার প্রমুখের উদ্দেশ্যে ঘোষণাপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম লক্ষ্য দিল্লিতেই নিবদ্ধ হল। অবিলম্বে আম্বালা ছাউনি থেকে ব্রিটিশ বাহিনী দিল্লিতে এলো। পাঞ্জাবের শিখগণ ও কাশ্মীরের গুলাব সিংহের বাহিনী ইংরেজদের সাহায্য করল।

সেনাপতি জন লরেন্সের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী দিল্লির অসংখ্য নির্দোষ নরনারীকে হত্যা করল। বৃদ্ধ ও অসহায় সম্রাট বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের কবরের গর্তে লুকিয়ে পড়লেন। হওসন্ নামক জনৈক ইংরেজ সেনাপতি সম্রাটকে খুঁজে উদ্ধার করে বন্দী করলেন। ধৃত অবস্থায় সম্রাট বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন। তাঁর দুই পুত্র এবং অন্যান্য পরিজনবর্গকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। ১৪ থেকে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিল্লি পুনরায় ব্রিটিশের অধীনে এল।

লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের সিপাহীরা ৩০শে মে, ১৮৫৭ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। লক্ষ্ণৌ-এর বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অযোধ্যার বেগম। এই বেগম সাহেবা তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বিরজিস্ কাদিরকে অযোধ্যার নবাবরূপে ঘোষণা করে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। শুধুমাত্র সিপাহী নয়, অযোধ্যার জমিদার ও কৃষক-প্রজাদের সাহায্যে বিদ্রোহকে সর্বাত্মক করতে সমর্থ হলো এই বেগম। ভয়ে এখানকার চীফ কমিশনার হেনরী লরেন্স ইয়োরোপীয় বন্ধুদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে (Residency) আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশ্য এই সময় বিদ্রোহীদের বিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে হেনরী লরেন্স মারা যান। অন্যান্য শ্বেতাঙ্গরা প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যান। ইতোমধ্যে কলকাতা থেকে আগত ব্রিটিশ বাহিনী এলাহাবাদ অধিকার করল। অবশেষে হ্যাভলক ও উটরামের চেষ্টায় অবরুদ্ধ ইংরেজরা রক্ষা পায় (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ খ্রিঃ) পরের বছর মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌ সম্পূর্ণ ইংরেজ অধিকারে চলে আসে।

রোহিলাখণ্ডের অন্তর্গত বেরিলী ক্যাম্পের সিপাহীরা ৩১ মে, ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহের সূচনা করে। এই রোহিলাখণ্ডের নবাব হাফিজ রহমৎকে হত্যা করে অতীতে ওয়ারেন হেস্টিংস ঐ অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। তাই বেরিলীর সিপাহীরা পূর্ব নবাবের পৌত্র খান বাহাদুর খাঁ কে বেরিলীতে দিল্লির বাদশাহের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করলেন। এটি ছিল রোহিলা জাতির সর্বাত্মক লড়াই। এক বছর যাবৎ লড়াই পরিচালনা করে রোহিলারা পরের বছর কর্ণেল ক্যাম্বেলের নিকট পরাজিত হন।

কানপুরের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিলেন দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেব। তিনি সিপাহীদের সাহায্যে কানপুর থেকে সিপাহীদের বিতাড়িত করে নিজেকে পেশোয়া হিসেবে ঘোষণা করেন। কানপুরের প্রায় হাজার খানেক শ্বেতাঙ্গ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নানা সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নানা সাহেব তাদের এলাহবাদে চলে যাওয়ার সুযোগ দেবেন বলে আশ্বাস দেন। নানা সাহেবের পক্ষে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরই বিশেষ অনুরক্ত ও গেরিলা যুদ্ধকৌশলে দক্ষ তাঁতিয়া তোপী। এছাড়া রাজনৈতিক প্রচারে দক্ষ তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন আজিমুল্লা। এলাহাবাদে পলায়নরত ইংরেজরা নদী পার হওয়ার পূর্বেই অনেকে বিদ্রোহী সিপাহীদের গুলি বর্ষণে নিহত হলো। ইতোমধ্যে উদ্ধারকারী ইংরেজ বাহিনী কানপুরে আসছে শুনে বিদ্রোহীরা প্রায় দু'শ-এর অধিক ইংরেজকে হত্যা করে একটা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে (১৫ জুলাই, ১৮৫৭ খ্রিঃ)।

জুলাই মাসের শেষ দিকে ইংরেজ বাহিনী কানপুরে সিপাহীদের পরাজিত করল। এই সময় নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে পলায়ন করেন ও তাঁতিয়া তোপী তখন ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর সঙ্গে যোগদান করেন।

লর্ড ডালহৌসি তাঁর স্বত্ববিলোপ নীতির অজুহাতে ঝাঁসী রাজ্যটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেছিলেন। নিঃসন্তানা লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসীর সিংহাসনের জন্যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে এই দত্তক থেকে বঞ্চিত করে রাজ্যটিকে কেড়ে নিয়েছিল। তবুও লক্ষ্মীবাঈ প্রথম দিকে নির্বিকার ছিলেন। শেষে যখন সিপাহী বিদ্রোহের উস্‌কানিদাত্রী হিসেবে ইংরেজরা তাঁকে ভয় দেখাতে শুরু করল তখন অনেক ভাবনাচিন্তার পর বাধ্য হয়ে তরুণী রানী লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেন। ঠিক এই সময় তাঁতিয়া তোপী তাঁর সঙ্গে যোগদান করে তাঁকে উৎসাহিত করেন। তিনি ইংরেজের সহযোগী সিন্ধিয়াকে বিতাড়িত করে গোয়ালিয়র অধিকার করলেন এবং নানাসাহেবকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বীর-নারীসুলভ রণনৈপুণ্যে রণদক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর শৌর্য, বীর্য ও সংগ্রামী দক্ষতার কাহিনী পরবর্তীকালে স্বদেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে বহু মহিলা রণক্ষেত্রে নেমে এসেছিলেন। কিন্তু পরের বছর ব্রিটিশ সেনানায়ক হিউরোজের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রাণত্যাগ করলেন (১৭ জুন, ১৮৫৮ খ্রিঃ)।

বিহারের অন্তর্গত জগদীশপুরের ভূতপূর্ব জমিদার কুনওয়ার সিংহ ছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক। অশীতিপর বৃদ্ধ হয়েও তিনি বিহারপ্রান্তে বিদ্রোহ পরিচালনার পর নানা সাহেবের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হন। উত্তর ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সময় তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। জগদীশপুরে তাঁর পৈতৃক বাসভবনে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন (২৭ এপ্রিল, ১৮৫৮ খ্রিঃ)।

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ : ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ অপ্রতিহত গতিতে শুরু হয়েও শেষ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। এর ব্যর্থতার পশ্চাতে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। **প্রথমত,** ইংরেজ অপেক্ষা বিদ্রোহী সিপাহীদের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, এমন কি রণনীতি ছিল নিকৃষ্টতর। সামরিক দক্ষতা ও সংগঠনের দিক থেকে ব্রিটিশ পক্ষ বিদ্রোহীদের চেয়ে ছিল শ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ বিদ্রোহীকেই ঢাল-তলোয়ার আর শড়কি নিয়ে যুদ্ধ করতে হত। ভারতীয়দের শৃঙ্খলাহীন সৈন্য পরিচালনা দেখে অনেকেই মনে করতেন যে এরা যেন একটা দাঙ্গা সৃষ্টিকারী উন্মত্ত জনতা। সাহস আর বীরত্বের অভাব না থাকলেও তাদের শৃঙ্খলা বোধের যথেষ্ট অভাব ছিল।

দ্বিতীয়ত, সিপাহীরা নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেমন— রেল, ডাক, তার, যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে পারে নি। এগুলি ছিল ব্রিটিশ সরকারের আয়ত্তাধীনে। তাই ইংরেজরা দূর দূরান্তের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ নৌ বাহিনীর অবদান ছিল অসামান্য। ইংল্যাণ্ড, পারস্য, সিঙ্গাপুর থেকে ক্রমাগত সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা ও সরবরাহ করাই

ছিল নৌবাহিনীর কাজ। আধুনিক শিল্প বিপ্লবের বিশেষ অবদান হিসেবে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও আনুষঙ্গিক যুদ্ধ উপকরণ ছিল ব্রিটিশের হাতে।

তৃতীয়ত, এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন বা সহযোগিতা ছিল না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা, নবাব, জমিদারগণ এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন নি। বরং অনেকেই ইংরেজদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম সালার জঙ্গ, সিন্ধিয়া, গোয়ালিয়রের দিনকর রাও, কাশ্মীরের গুলাব সিংহ, নেপালের জংবাহাদুর এবং পাঞ্জাবের শিখগণের সক্রিয় সাহায্য পেয়েছিল ইংরেজরা। অল্পদিন আগে পঞ্জাব ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকৃত হলেও শিখরা ইংরেজদেরই অনুগত ছিল। ক্যানিং-এর লেখা থেকে পাওযা যায়, "সিন্ধিয়া যদি বিদ্রোহীপক্ষে যোগদান করেন তো কালই আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে দেশ ছেড়ে যেতে হবে"। কাশ্মীরের মহারাজা গুলাব সিংহ সম্পর্কে লরেন্স লেখেন ঃ "১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে আমাদের অবস্থা যে অনেকটা মহারাজার কৃপার উপর নির্ভর করছিল তা বললে অত্যুক্তি হবে না।" উক্ত উক্তি থেকে অনুমান করা যায়, ইংরেজরা তাদের জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় নরপতিদের উপর কতখানি নির্ভর করত। শিখ, গোর্খা, রাজপুত, মারাঠা ইত্যাদি সামরিক জাতি যদি পাশে না দাঁড়াত তাহলে ইংরেজদের জয়ের সম্ভাবনা নিতান্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ত—এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তাই বিদ্রোহোত্তর কালে লর্ড ক্যানিং পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন, "ঝড়ের মুখে ঝড়ের প্রথম ধাক্কাগুলো এরা ঠেকিয়ে রেখেছিল, তাই এই বিদ্রোহ তার সব শক্তি নিয়ে আমাদের উড়িয়ে ধুলিসাৎ করে দিতে পারেনি। এরা না থাকলে আমরা ভেসে যেতাম।"

চতুর্থত, ভারতের জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যবিত্তরা শিহরণ অনুভব করলেও সরাসরি বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেনি। বিদ্রোহীরা জানত যে পরাজয়ের শাস্তি হলো অমানুষিক যন্ত্রণা ও মৃত্যু। তাই তারা বেপরোয়া হয়ে কোনও কোনও স্থানে নারী, শিশু, বৃদ্ধ সকলকেই হত্যা করেছে। দেশের সাধারণ মানুষ এই ধরণের নিষ্ঠুরতাকে পছন্দ করত না। এর ফলে বিদ্রোহীরা সাধারণ মানুষের সহানুভূতি হারিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে কোনও কোনও অঞ্চলে বিদ্রোহীরা সাহায্য পেলেও শক্তিশালী রাজা, নবাব ও জমিদাররা ব্রিটিশকে সাহায্য করায় বিদ্রোহীরা শক্তিহীন হতে বাধ্য হয়েছে। বিদ্রোহের সময় গ্রামবাসীদের প্রধান লক্ষ্য থাকত সুদখোর, ঘুষখোর মহাজন শ্রেণীর দিকে। বিদ্রোহীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অর্থ যোগানোর জন্যে এদের মজুত অর্থ ও খাদ্য লুট করা হত। ফলে সাধারণ জমিদার থেকে শুরু করে যাবতীয় সুদখোর মহাজনরা বিদ্রোহীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ইংরেজদের সাহায্য করত।

পঞ্চমত, বিদ্রোহীদের কর্মসূচি ও আদর্শের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য ছিল না। বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ব্রিটিশ সেনাপতি উটরাম বলেছিলেন, চর্বি মাখানো কার্তুজের প্রশ্নে সিপাহীরা

বিদ্রোহ করল, কিন্তু বিদ্রোহ করার জন্য কোনও আয়োজন যেমন ছিল না তেমনি কোনও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়নি। কারণ দেখা যাচ্ছে, দিল্লির বিদ্রোহীরা মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন, কানপুরের বিদ্রোহীরা নানা সাহেবের ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। তেমনি আরও অনেকে স্ব-স্ব স্বার্থের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করেছিলেন। বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যদি লক্ষ্য নির্দেশ করে আগে থেকে কর্মপন্থা স্থির করে বিদ্রোহীদের কাজে লাগাতেন তাহলে হয়ত ইংরাজকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে চিন্তার বৈষম্য কর্মে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল।

ষষ্ঠত, সিপাহীদের নায়কের সংখ্যাধিক্য যুদ্ধ পরিচালনায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। বিদ্রোহীদের সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনার কোনও অভাব ছিল না। আবার ছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভিত্তিক শৃঙ্খলার; পক্ষান্তরে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের অভাবে অভ্যুত্থান যে "স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছৃঙ্খলতায়" রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৮৫৭-এর অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড়ো অভাব ছিল সংহতি ও সংগঠনের। আধুনিক কালের 'জাতীয় চেতনা' সে-যুগের ভারতবাসীর মনে জাগ্রত হয়নি। সর্বভারতীয় চেতনা বা সমস্ত ভারতবাসীর স্বার্থ একই—এ ধরণের ভাবনা চিন্তা বা মানসিকতা জেগে ওঠার দিন তখনও আসেনি। বহু নায়কের বহুবিধ লক্ষ্য, স্বার্থ ও কর্মসূচি কখনই কোনও অভ্যুত্থানকে সার্থক করে তুলতে পারে না।

বিদ্রোহের চরিত্র বা প্রকৃতি : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিদ্রোহের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাশ্চাত্য লেখককে বাদ দিলে পশ্চিমী লেখকদের প্রায় সকলেই এটিকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' (Sepoy Mutiny) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা ঘটনাটিকে শুধুমাত্র ফৌজের মধ্যে সীমিত ছিল-—এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। জন কে, রবার্টস, জন লরেন্স প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মতে ১৮৫৭-এর ঘটনাটি ছিল নিছক সামরিক ও স্বার্থান্বেষী মানুষের দ্বারা সংঘটিত বিদ্রোহ। আবার ঐতিহাসিক লর্টন, হোমস্, ডাফ প্রমুখ অনেকেই বলেছেন যে ১৮৫৭-এর ঘটনাটি প্রথমে সিপাহীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেও পরে এটি গণ আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে। আবার জেমস উটরাম (Outram) বলেন—"দেশের আভ্যন্তরীণ নানা অশান্তির সুযোগে মুসলমানরাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের বিষ ছড়িয়েছিল পরে এই ঘটনা গণ আন্দোলনের স্বরূপ ব্যক্ত করে।" বিখ্যাত চিন্তাবিদ রজনীপাম দত্ত এই ঘটনাটিকে রক্ষণশীল ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা সাভারকার ১৮৫৭-এর ঘটনাকে প্রথম স্বাধীনতা সমর আখ্যা দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সমসাময়িক গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ভারত সচিবের নিকট প্রদত্ত এক পত্রে বলেছেন যে এই বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল ব্রাহ্মণদের প্ররোচনা ও অন্যান্যদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি। কিন্তু আধুনিক

ঐতিহাসিকদের অনেকেই বলেন, সিপাহীদের মাধ্যমে ঘটনাটি একটি বিক্ষোভরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৮৫৭-এর ঘটনাবলী সামগ্রিকভাবে একটা জাতীয় অভ্যুত্থাপনের আকার ধারন করেছিল। আধুনিককালে এদেশের দুই প্রধান ঐতিহাসিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাদের দুখানি গ্রন্থে যথাক্রমে (Eighteen Fifty Seven এবং The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857) নতুন তথ্য দিয়ে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁদের উভয়ের মতের মধ্যে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত, সামরিক বাহিনীতে এই অভ্যুত্থানের সূচনা ঘটে। দ্বিতীয়ত, সিপাহীদের সীমা ছড়িয়ে অনেক স্থানে এই অভ্যুত্থান গণ সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু একে জাতীয় বিদ্রোহ বলা সঙ্গত নয়। মোটামুটি এই হলো তাঁদের সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম ডঃ তারাচাঁদ ১৮৫৭-এর ঘটনাটির সঙ্গে 'মিউটিনি' বা বিদ্রোহ শব্দটির ব্যবহার অসঙ্গত (Inappropriate) বলে মনে করেন। তবে বিনায়ক দামোদর সাভারকার তাঁর "ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ" নামক গ্রন্থে ১৮৫৭-এর ঘটনাটিকে "স্বাধীনতা সংগ্রাম" বলে অভিহিত করেছেন।

ঘটনার সূচনা থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৮৫৭-এর ঘটনাটি সিপাহীদের দ্বারাই সূচিত হয়। পরে স্বার্থ-বঞ্চিত রাজন্যবর্গ তাদের অনুরক্তদের নিয়ে এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। দিল্লির শেষ মোগল সম্রাটকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে বিদ্রোহের যে স্বরূপ ব্যক্ত হল তাকে মুঘল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ঠিক বলা চলে না। কারণ, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, আহম্মদউল্লা শাহ, বিহারের জগদীশপুরের জমিদার কুনওয়ার সিংহ প্রমুখ রাজন্যবর্গ স্ব-স্ব অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুতরাং 'মোগল সাম্রাজ্য' শব্দের সঙ্গে মারাঠাতন্ত্র, পোশোয়াতন্ত্র ইত্যাদি কথাগুলিকেও সমান্তরালভাবে উচ্চারণ করতে হয়। এর দ্বারা সর্বভারতীয় জাতীয় চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। আবার এই বিদ্রোহকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দেওয়াও পরিপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ, ১৮৫৭ সালের ঘটনার সঙ্গে ভারতীয় জনগণের যোগ ছিল না। তাছাড়া, দক্ষিণ ভারত তখন সম্পূর্ণ নীরব ছিল। আবার নেপাল, শিখ, রাজপুত, সিন্ধিয়া প্রভৃতি দেশীয় বৃহত্তর শক্তিগুলি ইংরেজের পক্ষে থেকে সক্রিয় সাহায্য দিয়েছিল। অবশেষে বলা চলে, ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ছিলেন ব্যক্তি স্বার্থ থেকে বঞ্চিত, কেউ বা ধর্ম নাশের ভয়ে ভীত, কেহ প্রতিহিংসাপরায়ণ, আবার অনেকে ছিলেন দস্যু-তস্কর, লুণ্ঠনকারী ও অসামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ঘটনার চরিত্রগত পার্থক্য থাকলেও নেতৃত্বের পক্ষ থেকে লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাই ছিল বিশেষ বলবৎ। ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা "সিপাহী বিদ্রোহ" নামে বিবৃত হলেও বাস্তবে সেই বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যে সীমিত ছিল না। হিন্দু-মুসলমান উভয়

সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের পাশে সিপাহী, সামরিক, বেসামরিক কর্মচারী, অনুরক্ত প্রজাবর্গের সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতি ১৮৫৭ সালের ঘটনাকে বিশেষিত করে। স্বয়ং লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন যে অযোধ্যা প্রদেশে প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ এক জাতীয় অভ্যুত্থানের আকার নিয়েছে। ঐতিহাসিক শশিভূষণ চৌধুরী সিপাহী বিদ্রোহ চলাকালীন অনেক বেসামরিক বিদ্রোহের কথা লিখেছেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সম্পর্কে বিরল কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলেও একথা সত্য যে, বিদ্রোহের সর্বস্তরে হিন্দু-মুসলিমের অংশ গ্রহণ বজায় ছিল। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন আরও বলেছেন যে, বিদ্রোহের এলাকা থেকে অনেক দূরে বসবাসকারী পার্সী সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য জনসাধারণের স্তর থেকে বিদ্রোহীরা এসেছিল। তার লেখা থেকে আরও জানা যায় যে, পশ্চিম বিহার থেকে পাঞ্জাবের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলায় এই বিদ্রোহের ছাপ না পড়লেও সর্বস্তরের মানুষ বিদ্রোহের সংবাদ রাখার চেষ্টা করত। আলেকজাণ্ডার ডাফ বলেন, "অনেকেই ইংরেজের অনুগত থাকলেও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি যে তারা অনুরক্ত ছিল এমন ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়।" বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহী ও তাদের সমর্থকদের জাতীয়ভাবে ভাবিত করেছিল— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

পরবর্তীকালে ভারতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনগুলি যেমন 'স্বদেশী আন্দোলন, অগ্নিযুগের বিপ্লব, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ইত্যাদি কোনটিই কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষণে সর্বভারতীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি এবং কোনটিতেই ভারতের সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় সমর্থন ছিল না। অথচ আমারা এগুলিকে 'জাতীয় আন্দোলনের' এক একটি ধাপ হিসেবে আখ্যায়িত করি। সুতরাং 'সিপাহী বিদ্রোহ' কথাটির পরিবর্তে একে 'মহাবিদ্রোহ' বলে যুক্তিযুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। বিদেশী শাসককে বিতাড়িত করার যেটুকু ইচ্ছা বিদ্রোহীদের ছিল তা সত্যই ভারতীয় মনের বহিঃপ্রকাশ। সমসাময়িক কালে (২১শে মে, ১৮৫৭) "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায় স্বনামধন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখলেন, "গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ভারতীয় প্রজাদের মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য নিতান্ত সামান্য। .... আজ শুধু সিপাহীদের নয়। সারা দেশেই যেন বিদ্রোহ ঘটেছে। .... প্রথম থেকেই দেশের সহানুভূতি তারা (বিদ্রোহীরা) আকর্ষণ করতে পেরেছে।" বিদ্রোহীদের পরাজয় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরাট বিপ্লব (Great revolution) কথাটি ব্যবহার করেছেন।

বিদেশী ইংরেজদের কাছে এটি 'মিউটিনি' (Mutiny) হলেও ভারতবাসীর কাছে এটি একটি 'বিপ্লব' (Revolution)। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিপ্লব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে অফুরন্ত প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, সন্দেহ নেই। বহুকাল পরে মুক্তি সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বাহাদুর শাহের সমাধি পার্শ্বে অশ্রু বিসর্জন করেন—একথা

ভারতবাসী ভুলবে না। মীরাটের বিদ্রোহীরা ১৮৫৭ সালে আওয়াজ তুললেন "চলো দিল্লি"। ১৯৪৪-৪৫ সালে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ আওয়াজ তুলল "চলো দিল্লি"। পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামে শুধু নেতাজী নন, প্রত্যেকটি স্বাধীনতা সংগ্রামী ১৮৫৭-এর মহাবিপ্লবের কথা স্মরণ করেছেন। এককথায়, বিদ্রোহের প্রকৃতি বিচার করে একে মহাবিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া সঙ্গত।

১৮৫৭-এর বিদ্রোহের ফলাফল : ১৮৫৭-এর ভারতীয় বিদ্রোহের ফলাফল ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। বিদ্রোহের অবসানে ইংরেজের শাসন আবার ভারতের বুকে পূর্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এই মহাবিদ্রোহ একটা গৌরবময় অধ্যায় যুক্ত করেছে। সাহস ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান বিদ্রোহী সিপাহীরা ইংরেজের কূটনীতিতে বঞ্চিত রাজন্যবর্গের সহায়তায় ভারতকে পরশাসন থেকে মুক্ত করার একটা বেপরোয়া প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। নেতারা যতই সেকেলে হোন, অস্ত্রশস্ত্র যতই অকেজো হোক, তাদের এই সংগ্রামই ছিল ভারতের মুক্তি সংগ্রাম। মোগল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার, মারাঠাতন্ত্র বা পেশোয়াদন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সম্পর্কে যে ক্ষীণ আশা অনেকেরই মনের কোনে উঁকি দিয়েছিল তা বিদ্রোহ দমনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। স্যার লেপেল গ্রীফিনের মতে "The Revolt of 1857 swept the Indian sky clear of many clouds" বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রাচীনতা, সেকেলে ধারণা, মান্ধাতা আমলের অস্ত্রশস্ত্রের অকর্মণ্যতা, বিচ্ছিন্ন আশা-আঙ্খাকার অবসান ঘটল। কিন্তু এতসব ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই মহান অভ্যুত্থান ভারতবাসীর মনে একটা অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছে। তাই ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র তাঁর "Indian struggle for Independence" গ্রন্থে বলেছেন, "কোন ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব যদি তার তাৎক্ষণিক অবদানের মধ্যে সীমিত না থাকে তবে ১৮৫৭-এর ঘটনাকে ঐতিহাসিক বিপর্যয় বলা যায় না। এর ব্যর্থতাও মহান উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে।"[১] ভারতীয় মহাবিদ্রোহের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান হল। আর নব প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ভারতে নবযুগের সূত্রপাত হলো। নবশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রথম এই প্রচেষ্টাই হলো শেষ সার্থক প্রচেষ্টার প্রধান ও মৌলিক প্রেরণা।

প্রথমত, অতীতে চার্টার অ্যাক্ট-এ পরবর্তী কুড়ি বছরের জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর ভারত শাসনের দায়িত্ব প্রদান করা হত। কিন্তু ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট-এ উক্ত কুড়ি বছরের কথা উল্লেখ করা ছিল না। সুতরাং চার্টার অ্যাক্ট-এর শর্ত বজায় রাখার আর কোনও প্রশ্নই উঠল না।

অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নতুন শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থায় বলা হলো যে, ভারতে আর কোম্পানির শাসন থাকবে না। তার পরিবর্তে ইংল্যাণ্ডের মত ভারত ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক শাসিত হবে। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রানীর পক্ষে তাঁর প্রতিনিধি 'ভাইসরয়' উপাধি নিয়ে এদেশে শাসন করবেন। তিনি হবেন ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রতীক। ভারত শাসনের নির্দেশ দেবেন ভারত সচিব বা সেক্রেটারী অফ স্টেট (Secretary of State)। আবার এই ভারত সচিব হলেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন সদস্য। তাঁকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এর আদেশ মেনে চলতে হত বা তাঁকে পার্লামেন্টের নিকট দায়বদ্ধ থাকতে হবে। এই ভারত সচিবকে পরামর্শ দানের জন্যে গঠিত হলো পনেরো জন সদস্য বিশিষ্ট 'কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া' (Council of India) নামক প্রতিষ্ঠান। অবশ্য কাউন্সিলের পরামর্শ যে ভারত সচিবকে মেনেই চলতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবে আর্থিক ব্যাপারে ভারত সচিবকে কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণ করতে হত। এই আইন অনুসারে ইংল্যাণ্ডে মহারাণী ভিক্টোরিয়া হলেন ভারতের সম্রাজ্ঞী (১৮৭৬)।

দ্বিতীয়ত, ভারত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ও নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেই মহারানী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন। ঘোষণার বক্তব্য অনুসারে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং হলেন ভারতের প্রথম ভাইসরয়। বিগত অভ্যুত্থানের কথা চিন্তা করে লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হলো। ইংরেজ সরকার আর ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করবেন না। ভারতীয় দেশীয় রাজাদের সঙ্গে ইতোপূর্বে যেসব সন্ধি করা হয়েছিল সেগুলির শর্ত মেনে চলা হবে; তাঁদের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হবে। জনগণের সুযোগ-সুবিধা ও যোগ্যতা অনুসারে রাজকার্যে নিয়োগ করা হবে এবং জনতার ধর্ম, আচার-আচরণে, রীতিনীতিতে যথাযথ মর্যাদা ও স্বাধীনতা দেওয়া হবে ও যোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। জনগণকে খুশি করার উদ্দেশ্যে ঘোষণায় উল্লেখ করা হলো, "প্রজাদের সমৃদ্ধি হলো আমাদের শক্তি, তাদের সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।" আত্মসমর্পণকারী বিদ্রোহীরা হবেন ক্ষমার্হ ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, মৌখিক বা লিখিত আকারে এত কথা সংযোজিত হলেও ১৮৫৭-এর মহা অভ্যুত্থানে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তা ইংরেজ শাসকরা ভুলতে পারেন নি। তারা ভোলেননি যে সিপাহীদের বিক্ষোভের সূত্র ধরেই সেই মহাবিপ্লব বা মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তাছাড়া ১৮৫৮-এর ভারত শাসন আইনের ধারাগুলি নতুন হলেও কোম্পানি-সরকারের যুগের শাসকরা বহাল তবিয়তে নিজ নিজ বিভাগের শাসকই ছিলেন। তাই তারা নিজেদের নিরাপত্তার উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। ইংরেজ সরকার অবিলম্বে দেশীয় সৈন্য সামন্তের সংখ্যা হ্রাস করে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই প্রেসিডেন্সি আর্মিকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পৃথক করে রাখা হলো। এছাড়া ঠিক হলো, গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের ঢুকতে দেওয়া

হবে না। তাদের সর্বদাই শ্বেতাঙ্গ অফিসারের অধীনে রাখা হবে এবং সুবাদারের চেয়ে উচ্চ কোনও পদে তাদের প্রমোশন দেওয়া অথবা নিয়োগ করা হবে না। ভারতীয়দের ভিতর থেকে ফৌজ সংগ্রহের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈষম্যকে বিবেচনা করা হলো এবং ভারতের কয়েকটি শ্রেণীকে 'সামরিক' বলে কৃত্রিম আখ্যা দিয়ে তাদের ভিতর থেকে সৈনিক সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হলো। এসব পরিবর্তন পরোক্ষভাবে ভারতবাসীকে বহুকাল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখার উপায় মাত্র ছিল—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

অবশেষে বলা চলে, ১৮৫৭-এর ঝড়ের অবসানে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হলো। সেই সুযোগে ভারতের ইতিহাসে এলে নতুন যুগ। এযুগে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মচর্চার সুযোগ সম্প্রসারিত হলো। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাধিক্য ঘটল। তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে নিজেদেরকে চিনে নেওয়ার সুযোগ পেলেন। তারা জানতে পারলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রবাহিত আধুনিকতার পরিবেশ পরিস্থিতি। ডাক, তার, রেল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতের এক প্রান্তের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অন্য প্রান্তের ব্যক্তিদের যোগাযোগ ত্বরান্বিত করল। এ-ব্যাপারে ইংরেজী ভাষা মনের ভাব বিনিময়ে সর্বাধিক সাহায্য দিল। অতীতে ভারতের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের ভাষাই ভাব-বিনিময়ে বাধা সৃষ্টি করত। ইংরেজী ভাষা সেই বাধা অপসারিত করল। এসবের ফলে সর্বত্র জেগে উঠল সংঘচেতনা, জাতীয়তাবোধ, স্বাদেশিকতা, ভারতকেন্দ্রিক চেতনা ইত্যাদি। প্রদেশের শিক্ষিতরা লক্ষ্য করলেন, নতুন যুগের ভাইসরয়গণ মহারাণীর ঘোষণা পত্রের মর্যাদা রাখতে পারছেন না। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র আরও ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। ভারতবাসীকে অস্ত্রহীন করার উদ্দেশ্যে তৈরি হলো অস্ত্রআইন, ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে তৈরি হল ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, এদেশের মানুষ যাতে সরকারি উচ্চপদে আসীন হতে না পারে তার জন্যে সিভিল সার্ভিসের বয়স কমিয়ে ১৯ বৎসর করা হলো ইত্যাদি। ১৮৫৭-এর পর যেমন সামরিক ক্ষেত্রে তেমনি রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে ব্রিটিশ নগ্নভাবেই "সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণের" প্রচেষ্টা শুরু করল। ফলে ভারতবাসী পরাধীনতার ব্যথা গভীরভাবে অনুভব করল। কালের গতিতে এবার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব সম্প্রসারিত হলো। ১৮৫৭-এর বিপ্লব বা মহাবিদ্রোহ পুনরায় ভারতবাসীকে অনৈক্য ভুলে জাতীয় জীবনে সংহতি প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করল।

অধ্যায় ১১

সংস্কার ও পাশ্চাত্যায়ন

Syllabus : Reformism and Westernization.

১। জাগরণের সূচনা ও প্রসার

ভারতের জাগরণের সূচনা ঃ আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, যেমন ঘটে, তেমনি অর্থনৈতিক বা বস্তুগত পটভূমিকারও বদল ঘটে। একদা প্রবল পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্য যখন নানাবিধ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়তে থাকে, তখন বৈদেশিক আক্রমণ সেই ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের কবরে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়। স্পর্ধিত সাম্রাজ্যের রাজদন্ড ছত্রখান হয়ে পড়ার সুযোগেই নানা অঞ্চলে গড়ে ওঠে নানা আঞ্চলিক রাজ্য। আবার ভারতবর্ষের অনৈক্যবোধ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির বিবাদ ও সংঘর্ষের সুযোগে অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবাসীর শিথিল মুষ্টি থেকে রাজদন্ড হস্তগত করে ফেলে। গোড়াতে যা ছিল স্বল্প অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, কোম্পানির আমলে ধীরে ধীরে তা প্রসারিত হয় ভারতের প্রায় সর্বত্র। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি হয়ে ওঠে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'বণিকের মানদন্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদন্ডরূপে।'

রাজদন্ড হাতে নিলেও বিদেশী শাসকবর্গ মানদন্ডের কথা ভোলেনি। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষে গড়ে তোলে নিজস্ব উপনিবেশ। পূর্ববর্তী মোগল শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে গড়ে তোলে এক ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো; গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে সম্পদ লুণ্ঠন। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাব পড়ে কৃষিতে, শিল্পে-বাণিজ্যে এবং জনজীবনে। অনেকদিক থেকেই জাতির জীবনে নেমে আসে অন্ধকার।

ভারতের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী এই রাজনৈতিক ও বস্তুগত পরিবর্তনের পাশাপাশি আঠরো শতকের মধ্যভাগ থেকে সমাজ ও সংস্কৃতির যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তাতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। পশ্চিমদেশ থেকে নবাগত শত্রুদের রুখতে পারে এমন একটা সামাজিক পরিমন্ডল গড়ে তুলতে ভারতীয় নেতৃবর্গ যে ব্যর্থ হয়েছিলেন তার কারণ ভারতীয় সমাজের নিজস্ব অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। মধ্যযুগীয় অন্ধকার ও অন্ধতা সমাজ ও সংস্কৃতিকে ছেয়ে ফেলে ছিল। ভারতে ছিল ধর্মে ধর্মে বিরোধ, একই ধর্মের মধ্যে ধর্মের নামে অধর্ম। আচার সর্বস্বতা, কূপমন্ডুকতা, নানা কুসংস্কার, অমানবিক প্রথার প্রচলন। চিন্তায় ও আচরণে মধ্যযুগীয় এই অবস্থার প্রধান

বৈশিষ্ট্য ছিল— (ক) অন্ধ-গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা, (খ) যুক্তির পরিবর্তে ঐতিহ্যের ও নিয়মকানুনের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, (গ) দেশজ শিক্ষার গুরুতর ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা, (ঘ) সংস্কৃতির অবক্ষয় এবং (ঙ) মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে নানাধরনের বাধা। সমাজ ছিল ধর্ম-শাসিত। ভারতীয় হিন্দু, মুসলিম সমাজে একই ধরনের হতাশার চিত্র দেখা যায়। এককথায় জাতির জীবন ছিল অচল, মানবসমাজ অগ্রগতির উর্মিমালায় স্রোত হারিয়ে ফেলেছিল বলেই সহস্র শৈবালদাম এসে বাসা বেঁধেছিল। আর কে না জানে,

যে জাতি জীবন হারা অচল অসার
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

তবু আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে এই অন্ধকার দূর হয়ে চিন্তার ও আচরণে দেখা যেতে শুরু করে এক জাগরণ। আসে এক নবচেতনা। এই নবচেতনা এবং সেই চেতনার আন্দোলিত অভিঘাতের ফলে যে সাংস্কৃতিক বিবর্তন ঘটেছিল ভারতের ইতিহাসে তাকে '*ভারতের জাগরণ*' (Indian Awakening) বলে।

ইয়োরোপের মধ্যযুগের সুষুপ্তি যখন আত্মা-অবলুপ্তিতে পর্যবসিত হয়েছিল, জাঁকিয়ে বসেছিল ধর্মব্যবসা, যুক্তিবাদের পরিবর্তে অন্ধবিশ্বাসের ছিল প্রাধান্য, তখনই ঘটেছিল এক ব্যাপক পুনর্জন্মের। যাকে ইয়োরোপের ইতিহাসে বলা হয় 'রেনেশাঁস' বা নবজাগরণ। সেই নবজাগরণের অগ্রদূত ছিল ইতালি। ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত ছিল বাংলা। প্রায় শতাধিক বছর ধরে বাংলার মানুষজন পরিবর্তনশীল দুনিয়া সম্পর্কে যে সচেতনতা প্রদর্শন করেছিল ভারতের অন্য কোনও প্রান্তে সেই চেতনা দেখা যায়নি। সেই কারণে ইয়োরোপীয় রেনেশাঁসে ইতালির ভূমিকার সঙ্গে বাংলার ভূমিকাকে তুলনা করেছেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার।[১] '*বেঙ্গল রেনেশাঁস*' বা 'বাংলার নবজাগরণ' কথাটি ঐতিহাসিকদের মান্যতা পেয়েছে। অবশ্য এই রেনেশাঁসের চরিত্র ও প্রভাব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রভূত বিতর্ক বিদ্যমান। যাই হোক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতের জাগরণের সূচনা হয়েছিল বাংলায়।

জাগরণের কারণ ঃ বস্তুতপক্ষে বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রভাব, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ এবং বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া— এই তিনটিই বাংলার মানুষদের সর্বপ্রথম আলোড়িত করেছিল। এই আলোড়নের ফলেই যেহেতু নবজাগরণের সূচনা, তাই ঐগুলিকে নবজাগরণের কারণ বলা যেতে পারে। প্রথম দিকে বৈদেশিক অধিকারের তাৎপর্য এবং তার ধ্বংসাত্মক দিকগুলি সম্পর্কে ভারতবাসী সচেতন ছিল না। কিন্তু ক্রমে ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের দোষত্রুটি সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

অধ্যাপক বিপান চন্দ্রের লেখা থেকে একটি অংশ প্রয়োজনবোধে তুলে দেওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন ঃ

'পাশ্চাত্য দেশের প্রচলিত আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভের পর ভারতে এক নতুন চেতনার উন্মেষ দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য জাতির ভারত বিজয় থেকে ভারতীয় সমাজের দুর্বলতা ও অবক্ষয়ের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ভারতের চিন্তাশীল মনীষীগণ এই সময় তাঁদের নিজস্ব সমাজের দোষত্রুটিগুলি কি তা বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি থেকে পরিত্রাণের উপায়ও খুঁজেছিলেন। এই সময়ে এমন বহু ব্যক্তি দেশে ছিলেন, যাঁরা পাশ্চাত্য ভাবধারা বা জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। এরা ভারতীয় চিন্তাধারা ও ভারতীয় সমাজ ও ধর্মব্যবস্থাকে অনুসরণ করে চলাই শ্রেয় জ্ঞান করেছিলেন। এঁদের পাশাপাশি আর এক দল মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক ভাবধারার সহায়তা নিয়েই সমাজের পুনর্জীবন লাভ করা সম্ভব। এই শেষোক্ত দল আধুনিক বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য চিন্তার যুক্তিবাদ ও উদার মানবিকতা বোধের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এছাড়া এই সময়ে নতুন নতুন সামাজিক স্বার্থ বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এঁরা ছিলেন ধনশালী, শ্রমজীবী ও সদ্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এঁরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের দাবি তুলেছিলেন।'[১]

বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে উনিশ শতকের জাগরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগ থেকে আধুনিকতায় উত্তরণ। এই উত্তরণ একদিনে যেমন ঘটেনি, দীর্ঘকাল লড়াই চলেছিল ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার এবং সেই টানাপোড়েনের মধ্যেই আধুনিকতার যাত্রা শুরু। তেমনি একথাও সত্য যে সমাজের পরিবর্তনকামী ও প্রগতিশীল মানুষজন যেমন এই জাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি রক্ষণশীল ও পরিবর্তন বিরোধীরা এর বিরোধিতা করেছিলেন। দুই পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারার ফসল হলো ভারতের জাগরণ।

এই জাগরণের কারণ বলতে গেলে অবশ্য শুধু পূর্বোক্ত তিনটি কারণ অর্থাৎ বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রভাব, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ এবং বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া বললেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে না। যে দুটি প্রধান শক্তি দেশবাসীর মনের মধ্যে চেতনার রূপান্তর ঘটিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়ক হয়েছিল সেগুলি হলো পাশ্চাত্য তথা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা ও প্রসার এবং দেশজ ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন। নতুন যুগের দাবি মেনে নিয়ে নবজাগরণের নেতৃবৃন্দ নিজেদের নতুন শিক্ষার আলোকে যেমন উদ্দীপ্ত করে, গ্রহণ করে ইয়োরোপের মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ, রাজনৈতিক ও সমাজ প্রগতিমূলক চিন্তাধারা, তেমনি নিজেদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দুর্বলতাগুলি দূর করে সচেতন হয়ে উঠতে চেষ্টা করে। এই সচেতনতার রূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সাধারণভাবে প্রগতিশীল ভারতবাসীরা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করে। এখানে শেষ যে দুটি কথা বলা দরকার

তা হলো এই যে, (ক) 'উনিশ শতকে ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অগ্রগতির সময় ঔপনিবেশিক শাসকরা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু এই জাগরণ তাদের দ্বারা সৃষ্ট নয়।'[১] *এই নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।* ভারতীয়রাই শতাধিক বছর ব্যাপী এই জাগরণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। (খ) এই জাগরণের ফলে প্রথমে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটলেও উত্তরকালে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রতিরোধের মধ্য থেকেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি তৈরিতে সাহায্য করেছিল। ভুললে চলবে না সংস্কারকগণ চিরন্তন ভারতের এক আধুনিক আত্মপ্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের সুষম সামঞ্জস্য বিধান করে।

জাগরণের চরিত্র ঃ বঙ্গীয় তথা ভারতের জাগরণের ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিয়ে, এর চরিত্র ও প্রভাব নিয়ে পণ্ডিতমহলে প্রভূত বিতর্ক হয়েছে।[২] সেই বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে, এই জাগরণের নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়বিধ দিকই ছিল। সেই কারণে বাংলার রেনেশাঁস নিয়ে অকারণ উচ্ছ্বাস এবং ভাবাবেগকে আশ্রয় দেওয়া যেমন অনৈতিকহাসিক তেমনি এই জাগরণকে কুৎসামুলক সমালোচনার দ্বারা অথবা ইংরেজের সহযোগী শ্রেণীর ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রসার বলাও ততোধিক অনৈতিহাসিক। বিশেষত হালের এক শ্রেণীর অতি বিপ্লবী ব্যাখ্যা যেমন এই জাগরণ বুঝতে অক্ষম, তেমনি পাশ্চাত্য থেকে ধারকরা আধুনিকতা হিসেবে একে বর্জন করা তেমনই অযৌক্তিক।

একথা ঠিক যে, এই জাগরণের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। এই জাগরণ ছিল মূলত হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমনকি হিন্দুসমাজ নয়, শহুরে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবজাগরণ ঘটেছিল বা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটেছিল ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে। স্বাভাবিকভাবেই এর বিস্তার ছিল সীমাবদ্ধ। মুসলমান সমাজ নবজাগরণ থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। আবার একথাও সত্য যে, জাগরণের মূল্য কোনও ভাবেই অস্বীকার করা যায় না, তার যত সীমাবদ্ধতাই থাক। এই জাগরণের ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির নানা দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও বিকাশ ঘটেছিল। ভাষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, সংগীত, শিল্প থেকে শুরু করে প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা তার স্বাক্ষর পাই। সমাজ ও ধর্মের কুসংস্কারও বহুল পরিমাণে দূর হয়, শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং সমাজে নারীর স্থান বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

জাগরণের প্রসার ঃ ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদির দ্বারা ভারতের জাগরণ প্রথম শুরু হয়েছিল বাংলায়, পরে ক্রমে ক্রমে তা বোম্বাই, মহারাষ্ট্র

মাদ্রাজ এবং ভারতের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে যেমন বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলার নবজাগরণের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। সর্বত্রই মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন, দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্যের প্রসার, শিক্ষার বিস্তার, ইত্যাদির মধ্যে চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়।

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি তিনটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। মহারাষ্ট্রের প্রথমদিকের কলেজগুলির মধ্যে এলফিনস্টোন কলেজ স্থাপিত হয় বোম্বাইতে (১৮৩৫) এবং পুণা কলেজ পুনা শহরে (১৮৫১)। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি শিক্ষিত কতিপয় মারাঠী যুবক 'সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজ' নামে এক সংগঠন স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে একেশ্বরবাদী, জাতিভেদ বিরোধী 'পরমহংস সমাজ' স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রিঃ স্থাপিত হয় স্টুডেন্টস্ লিটারারি সোসাইটি। জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন, বিধবা বিবাহ প্রচলন, নারীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কাজে জ্যোতিবা ফুলে, বিষ্ণু শাস্ত্রী, কর্সনদাস মূলজী, জগন্নাথ শেঠ, ভাওদাজী এবং গোপালহরি দেশমুখ এর নাম স্মরণযোগ্য। নিম্ন জাতির আন্দোলনে *জ্যোতিবা ফুলে*, বিধবা বিবাহ আন্দোলনে *বিষ্ণু শাস্ত্রী* এবং সার্বিক সমাজ সংস্কারে *গোপাল হরি দেশমুখ, যিনি 'লোকহিতবাদী' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন,* বিশেষ মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। হিন্দু সমাজের মতন পার্শি সমাজসংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দাদাভাই নওরোজী, সোরাবজী এবং নওরোজী ফরদুনজী। মারাঠা সাহিত্যের পথিকৃৎ ছিলেন বাপু ছাত্রে, বালগঙ্গাধর জাম্ভেকর এবং হার কেশবজী। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর আত্মারাম পাণ্ডুরাঙ্গ, র‍্যানাডে, ভান্ডারকর, বেরহামজী মালাবারি প্রমুখ (নেতৃবর্গ সমাজসংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্বে দেন। এ বিষয় অন্য অধ্যায়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।)

জাগরণের বিভিন্ন দিক ঃ বাংলার অভূতপূর্ব জাগরণের সূচনা হওয়ার আগে পর্যন্ত বাঙালি সমাজ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, অচল, অসার। এই অবক্ষয় ও অসারতার মূলে ছিল অশিক্ষা, সমাজপতিদের রক্ষণশীলতা, ধর্মের নামে বিভিন্নরকম অ-শাস্ত্রীয় বিধানের প্রচলন, পুরোহিত ও মোল্লা-শাসিত সমাজ, জনগণের মনের বদ্ধমূল কুসংস্কার এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য। আরও স্মরণ করা যেতে পারে যে, পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দু সমাজ এবং মুসলমান সমাজের মধ্যে কোনও পার্থক্য তেমন ছিল না। উভয়েরই দারিদ্র্য, অশিক্ষা এব্রং নানা কুসংস্কার তথা আধুনিক চেতনার অভাব ছিল স্পষ্ট এবং সেজন্য প্রগতির পথ ছিল রুদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে এবং সংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূচনাকাল ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার সময়। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে

কলকাতা 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন করেন উইলিয়াম জোনস্। ভারত ও এশিয়া মহাদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে 'স্থাপিত' এই বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার (Orientalism) প্রসার ঘটে। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার। বারানসীতে জোনাথান ডানকান ছিলেন ইংরেজ রেসিডেন্ট। তিনি স্থাপন করেন সংস্কৃত কলেজ। একদিকে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদগণ এক নতুন অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানচর্চার সূচনা করেন, যার ফলে বাংলার জাগরণ সম্ভবপর হয়।[১] খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণের মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার কিন্তু বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণে তাদের অগ্রণী ভূমিকাও উল্লেখ করার মতন। বিশেষত কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীগণের অবদান স্মরণীয়।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার আইনে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম ভারতবাসীর শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব স্বীকার করে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন জোরদার হয়। বিশেষত সতীদাহ প্রথা বিরোধী আদোলনে রামমোহনের ভূমিকার ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলেই ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহবিরোধী আইন প্রবর্তন করেছিলেন তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। এর আগেই ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়ার নিষ্ঠুর প্রথা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় *হিন্দু কলেজ*। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ। ঐ বৎসরই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র *'সমাচার দর্পন'* প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জনশিক্ষা সংক্রান্ত সাধারণ কমিটি (General Committee on Public Instruction) স্থাপিত হয়। ততদিনে জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে।[১]

ক্রমে ক্রমে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংগীত, শিল্পকলা থেকে রাজনীতি পর্যন্ত নানা বিষয়ে আন্দোলন ও চর্চা আমাদের দেশে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সাক্ষ্য দেয়। এককথায় আধুনিকতার যাত্রাপথে সমাজ চলতে শুরু করে। এই আধুনিকতার পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

২। ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা

ইংরেজিতে 'ওরিয়েন্টালইজম্'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা। এর অর্থ হলো সেই বিদ্যাচর্চার ধারা যার সাহায্যে প্রাচ্যদেশগুলির প্রাচীন ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাহিনী-জানা যায়। তবে শব্দটি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে তার অর্থ দাঁড়ায় ভারতবিদ্যার (Indology) সমতুল্য। একদা আমাদের দেশে পুরাতত্ত্ব (Antiquity),

দাঁড়ায় ভারতবিদ্যার (Indology) সমতুল্য। একদা আমাদের দেশে পুরাতত্ত্ব (Antiquity), প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology) কিংবা প্রাচীন ভারত ও সংস্কৃতিচর্চা (Studies in Ancient Indian History & Culture) তেমন ছিল না। এগুলির সূত্রপাত আধুনিক যুগে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে। বস্তুত আঠারো শতকের শেষদিকে প্রাচ্যবিদ্যা তথা ভারতবিদ্যার নতুন করে এক আগ্রহের এবং কৌতূহলের সঞ্চার হয়। এই আগ্রহের ফলে একদল অনুসন্ধানী প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় অগ্রগণ্য ভূমিকা নেন, ফলে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নতুনভাবে জানা যায়। এর ফলে উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে জাগরণ ঘটে এবং ভারতচর্চার অধিকতর সমৃদ্ধি হয়। এইভাবে আমাদের দেশে যে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার সূচনা হয়েছিল তার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন একদল ব্রিটিশ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ।

অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু এই প্রাচ্যবিদ্যাচর্চাকে বাংলার নবজাগরণের পটভূমি তৈরির ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, "Among the most significant developments that took place in the last quarter of the early eighteenth century and early nineteenth century, with a direct bearing on the awakening of the country, were revival of Oriental learning, growth of Bengali language and an increasing urge for English education".[১] এই বিকাশ সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের জন্যেই বলে মনে করেন আমেরিকান ঐতিহাসিক ডঃ ডেভিড কফ। আর ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার সূচনা ও বিকাশ হতে পেরেছিল 'ব্রিটিশদের সাংস্কৃতিক নীতি'র জন্য, বিশেষত ওয়ারেন হেস্টিংসের কৃতিত্ব এ ব্যাপারে সমধিক।[২]

যদিও একথা সত্য যে, ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার মূল্য ছিল অপরিসীম এবং তার সূত্রপাত ঘটানোর পিছনে ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকা স্বীকার্য, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় হঠাৎ ব্রিটিশরা উৎসাহী হয়ে উঠলেন, তার প্রধান কারণ তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ। একদিকে যখন তারা গ্রহণ করেছে শাসন, নীতি নিয়েছে সম্প্রসারণের, ভারতীয় রাজন্যবর্গকে অধীনতায় বাধ্য করানো, ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন, রাজস্বের বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদির পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য এদেশের ভাষা, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতি জানার ও প্রয়োজন ছিল। তাই হেস্টিংসের লক্ষ্য ছিল এমন এক শ্রেণী তৈরি করা যারা "an orientalized service elite competent in Indian languages and responsive to Indian tradition." তবু পরোক্ষে এই প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ভারতবাসীর মনে চৈতন্যের উদয় ঘটিয়ে অনুঘটকের কাজ করল।

হেস্টিংস পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালেড এবং চার্লস উইলকিন্সকে। প্রথমজন ইংরেজি ভাষাতে হলেও প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। হ্যালেডের ব্যাকরণ প্রকাশ (১৮৭৮) বাংলায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। চার্লস

উইলকিন্স বাংলায় মুদ্রণযন্ত্র খুলে বিপ্লব ঘটালেন। বিশেষ করে বাংলা মুদ্রণে। একাজে তার সহায়ক ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। হেস্টিংস ১৭৮১-তে 'কলকাতা মাদ্রাসা' স্থাপন করে ফারসি চর্চার সুযোগ বাড়ালেন। তবে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন উইলিয়াম জোনস, কোম্পানির বিচারক হিসেবে যিনি ভারতে এসেছিলেন।

উইলিয়াম জোনস্ ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন করেন। এই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠাকেই ভারতবিদ্যাচর্চার প্রকৃত সূচনা বলা যেতে পারে। ১৭৮৩-তে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন এবং পরের বছরই তাঁর প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতবিদ্যাচর্চার দিগন্ত খুলে দেয়। সোসাইটির 'এশিয়াটিক রিসার্চেস', পত্রিকায় বহু পণ্ডিত ভারতবিদ্যা বিষয়ক রচনা লিখে উত্তরকালের গবেষকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তবে প্রাচীন ভারতকে সুবর্ণ যুগ বলার একটা প্রবণতা ইংরেজদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এর উদেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করা যে প্রাচীন যুগে ভারতীয় হিন্দুরা সমৃদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনে ভারতের অবক্ষয় এবং আবার আধুনিক ইংরেজ এসে নবযুগের সূচনাকারী। জোনস্ সংস্কৃত শেখেন, কালিদাসের শকুন্তলা অনুবাদ করেন এবং ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকেই যে ভাষাগুলির উৎপত্তি তা প্রথম দেখান। জোনসের প্রায় সমসাময়িক আর এক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যার পথিক ছিলেন হেনরি টমাস কোলব্রুক। কোলব্রুক প্রথম বৈদিক যুগের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রাচ্যের কাছে পাশ্চাত্যের ঋণ তিনি স্বীকার করেছিলেন।

এইভাবে হেস্টিংসের আমল থেকে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার যে ধারা শুরু হয়, বহু মানুষের প্রচেষ্টার ফলে তার সমৃদ্ধি ঘটে। এই প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের মধ্যে জেমস্ প্রিন্সেপ কিংবা হোরেস হেম্যান উইলসন খুবই খ্যাতিমান। এছাড়াও এই খ্যাতিমানদের মধ্যে জোনাথান ডানকান, উইলিয়াম কেরী, এনড্রু স্টার্লিং, এস ডেভিডস, এফ গ্ল্যাডউইন, জন ম্যালকম, ই. স্ট্র্যাচি, এফ উইলফোর্ড, সি. ম্যাকেঞ্জি, জে. গিলক্রাইস্ট, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, ব্রায়ান জনসন, টমাস রিবক, জন লিডেন, এম লামসডেন প্রমুখ অনেক নাম করা যায়।

জেমস্ প্রিন্সেপ অশোকের আমলের লিপির মর্মোদ্ধার করে ইতিহাসচর্চায় বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ব্রাহ্মী' লিপি পড়বার ফলে মৌর্যযুগ সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করা সম্ভব হয়। হোরেস হেম্যান উইলসন ভাষাতত্ত্বে ছিলেন সুপণ্ডিত। পুরাণ সমুহের বিশ্লেষণ ও অনুবাদ করেও তিনি খ্যাতি পান। জোনাথান ডানকান বেনারসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) যার সঙ্গে উইলিয়াম কেরী সমেত অনেকেই যুক্ত ছিলেন। ডেভিড কফ উল্লেখ করেছেন যে প্রাচ্যচর্চাবিদগণ পাশ্চাত্যপন্থী ছিলেন না কিন্তু তারা ভারতবিদ্যায় কৌতূহলী হয়ে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও পাশ্চাত্যবিরোধী নন। ঔপনিবেশিকতার সঙ্গেও তাদের বিরোধ ছিল না। তবে প্রাচ্যবিদ্যায় ধর্মিষ্ঠ পণ্ডিতদের দ্বারা বিদ্যাসাগর,

অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং নব্য প্রজন্মের অনেক ভারতীয়ই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি যদিও ১৮২৯ খ্রিঃ পর্যন্ত এর সদস্য হওয়া ভারতীয়দের জন্য বন্ধ রেখেছিল তবু আমাদের দেশে ইতিহাসচর্চায় এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল গৌরবের। শুধু তাই নয়, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ভারতের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইয়োরোপেও প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার সমৃদ্ধি ঘটে, ফলে উত্তরকালে ম্যাক্স মূলারের মতন সুপন্ডিতের আবির্ভাব হয়। তবে হেস্টিংসের পরে ওয়েলেসলি, বেন্টিঙ্ক এবং ডালহৌসি পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলগণের আমলে ভারতচর্চার পাশাপাশি ভারত-শোষণও লক্ষ্য করা যায়। তবে পন্ডিত ও বণিকের কাজ ছিল ভিন্ন।

৩। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার

কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এবং প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা প্রসার, কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন তার প্রতিক্রিয়া এবং বাংলার নানাস্থানে খ্রিস্টানধর্ম যাজক বা পাদ্রীদের ক্রিয়াকলাপ তিনটিই ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা বলতে এখানে ইংরেজি শিক্ষাকেই বোঝানো হচ্ছে। উনিশ শতকে ভারতে যে নতুন চিন্তা, আদর্শ, মূল্যবোধ ও আচরণ মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে আধুনিকতায় রূপান্তর ঘটায় তার অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল ইংরেজি বা আধুনিক শিক্ষার প্রসার। সেই কারণে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার জানা বিশেষ জরুরি। আঠারো শতকের শেষে ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল, তার অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল এবং তা ছিল মামুলি ধরনের, নতুন যুগের ধ্যান-ধারণার বাইরে, জাগরণের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা পূরণের উপযোগী নয়।[১] সেই হিসেবেও পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক শিক্ষার সূচনা ঃ আমরা ভারতীয় শিক্ষার যে আধুনিক রূপ ও সমস্যার সঙ্গে সুপরিচিত তার সূত্রপাত ঘটেছিল ব্রিটিশ ভারতে। আধুনিক শিক্ষার ভিত তৈরি করেছিল কোম্পানির আমলে-পাশ্চাত্য বা ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। আর ব্রিটিশ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আগে ছিল দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশজ শিক্ষায় ছিল দুটি প্রধান ধারা— একটি হলো প্রাথমিক শিক্ষা। এই শিক্ষা দেওয়া হত পাঠশালা ও মক্তবে। অন্যটি ছিল উচ্চ-শিক্ষা। এই শিক্ষা দেওয়া হত টোল, চতুষ্পাঠি ও মাদ্রাসায়। বাদশাহী শাসনের অবক্ষয়ের যুগে সেই দেশজ শিক্ষাব্যবস্থারও অবক্ষয় ঘটেছিল। আধুনিক যুগের পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে এই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবাসীর প্রয়োজন মেটাতে পারত না। কারণ দেশজ শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা ছিল। ষোড়শ শতকের সূচনা থেকে ইয়োরোপীয় বণিকদের সঙ্গে এলো খ্রিস্টান মিশনারীরা। বণিকদের ধর্মীয় মান অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নতুন ভূখণ্ডে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষার প্রসার

ভিন্ন এ কাজ করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই তাদেরই প্রচেষ্টায় ভারতীয় ভূখণ্ডে সূচিত হলো নতুন শিক্ষার পরিবেশ। প্রথম স্তরে মিশনারীরা দেশজ শিক্ষাধারাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেননি। কিন্তু মিশনারীরা নতুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সেখানে প্রগতিশীল এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। তবে মিশনারীদের শিক্ষাব্যবস্থাও ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিল না, যা সরকারি ও বেসরকারি ভারতীয় উদ্যোগে শুরু হয়। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতীয় মনকে আলোড়িত ও বিকশিত করে। শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে সাংস্কৃতিক দৃশ্যও পরিবর্তিত হয়।

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা : কোম্পানির আমলে ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার পর বাংলা তথা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ও প্রসার ঘটার আগে এ দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। মধ্যযুগীয় সেই শিক্ষাব্যবস্থার ধারা বাদশাহী অবক্ষয়ের যুগে এক রক্ষণশীল পরিবেশে টিকে ছিল। এমনকি আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে পাশচাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পরও দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়নি। কোম্পানির শাসকরা ১৭৭২ থেকে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেনি, দায়িত্বও নেয়নি। বরং দেশীয় শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সরকারি দাক্ষিণ্যের অভাব, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি সরকারি আনুকূল্য, চাকুরি পাবার আশা, জ্ঞান-বিজ্ঞান স্পৃহা ইত্যাদি কারণে প্রথাগত দেশজ শিক্ষায় ভাটা পড়ে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ নবীকরণের সময় প্রথম ভারতে শিক্ষার জন্য কোম্পানির তহবিল থেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা খরচ করার সংকল্প গৃহীত হয়। শেষ পর্যন্ত দেশজ, না পাশ্চাত্য কীভাবে এবং কোন শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয় করা হবে তা নিয়ে টালবাহানার পর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলে মত ব্যক্ত করে।

দেশজ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান : হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণতঃ 'টোল' বা 'চতুষ্পাঠী' বলা হয়। কিন্তু পশ্চিম ভারতে টুলোমানের প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'পাঠশালা' বলা হত। অথচ বাংলা-বিহারে 'পাঠশালা' বলতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। সমগ্র ভারতে তখন এই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ছড়িয়েছিল। সে-যুগে নদীয়া, বারানসী ও এলাহাবাদ ছিল হিন্দু উচ্চশিক্ষার সেরা কেন্দ্র। এছাড়া পুনা, আহমেদাবাদ, দক্ষিণ কোঙ্কনের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশের ধনী, জমিদার বা নরপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় টোলের জন্য শিক্ষকরাই তৈরি করে নিতেন মাটির ঘর। প্রতিষ্ঠান ছিল আবাসিক, আর শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। টোল ছিল তিন প্রকারের— (১) প্রথম প্রকার প্রতিষ্ঠানে ব্যাকরণ, ছন্দ ও সাহিত্য, (২) দ্বিতীয় প্রকার প্রতিষ্ঠানে ন্যায়শাস্ত্র ও প্রাচীন কাব্য এবং (৩) তৃতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রধানত তর্কশাস্ত্র পড়ানো হত। টোলের পণ্ডিতরা

ছিলেন সাধারণত ব্রাহ্মণ। এখানকার শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। অব্রাহ্মণ ছাত্ররা সাধারণতঃ টোলে পড়ার সুযোগ পেত না। নারীরাও টোলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল।

মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল মাদ্রাসা। সেযুগে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। তবে আগ্রা, দিল্লি, লাহোর, আজমীর, জৌনপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, এলাহাবাদ, বিজাপুর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসাগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানও ছিল যথেষ্ট উন্নত। উচ্চতম ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই স্ব-স্ব চেষ্টায় মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন। এখানকার শিক্ষার বিষয় ছিল ইসলাম ধর্মের আনুষঙ্গিক বিষয়। শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবি ও ফারসি। সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে টোল অপেক্ষা মাদ্রাসা ছিল নিম্নমানের। সেযুগে মাদ্রাসায় হিন্দু শিক্ষার্থীরাও শিক্ষালাভ করত।

দেশজ প্রাথমিক শিক্ষা ঃ দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি প্রধানত, দু-শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা— (১) ফারসি ভাষার বিদ্যালয় এবং (২) ভারতীয় আধুনিক ভাষার বিদ্যালয়। প্রথম স্তরের বিদ্যালয়গুলি প্রধানত মক্তব নামে পরিচিত ছিল এবং মুসলিম মৌলভীরাই ছিলেন এখানকার শিক্ষক। আর হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত হত আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিদ্যালয়গুলি। এগুলির সাধারণ নাম ছিল 'পাঠশালা'।

মুসলমানদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতো মক্তব। মসজিদগুলি ছিল মক্তবীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। নামাজের মন্ত্র পাঠ ও কোরাণ পাঠ ছিল মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরান আরবি ভাষায় লিখিত। তাই আরবি ভাষা ছিল ধর্মশিক্ষার আবশ্যিক ভাষা। অন্যদিকে রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদির জন্য দরবারী ভাষা হিসেবে ফারসি শিখতে হত। যেসব অঞ্চলে এসব ভাষা শেখানোর সুযোগ ছিল না, সেখানকার মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত পাঠশালায় পড়াশুনা করত। মক্তবের ক্ষেত্রে ধর্মশিক্ষার উপর যত গুরুত্ব দেওয়া হত পাঠশালার ক্ষেত্রে তত গুরুত্ব দেওয়া হত না। তবে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মানোন্নয়নের জন্যে হিতোপদেশ, রামায়ণ-মহাভারত, মনসামঙ্গল ইত্যাদির কাহিনী শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে পাঠশালায় ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল না; যে-কোনও শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। তাই গণশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশজ পাঠশালা ছিল অপরিহার্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গ্রাম ও শহর সর্বত্রই এই মক্তব ও পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল অতি ব্যাপক। পাঠশালায় বেতন দিতে হত। এখানে সামান্য মাতৃভাষা ও অংক শেখানো হত।

দেশজ শিক্ষার সীমাবদ্ধতা ঃ দেশজ শিক্ষার নানাবিধ ত্রুটি থাকার ফলে তা আধুনিক যুগের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। এই সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করা দরকার ঃ (১) দেশজ শিক্ষা মূলত ধর্মনির্ভর ছিল ; উচ্চ শিক্ষা বলতে যা বোঝানো হত তা আসলে হিন্দু ছাত্রদের জন্য হিন্দু শাস্ত্র আর মুসলিম ছাত্রদের জন্য ইসলাম শাস্ত্র পঠন-পাঠন (২) ভাষা শেখানো হত ধ্রুপদী। অর্থাৎ সংস্কৃত, আরবি, ফারসি। (৩) পাঠশালার শিক্ষা ধর্মাশ্রয়ী না হলেও

তা ছিল নিতান্তই বুনিয়াদী ও প্রাথমিক স্তরের। (৪) এখানে পড়ার মূল উদ্দেশ্য চিঠি লেখার জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞান, যাতে রামায়ণ-মহাভারত পড়া যায় সেই জ্ঞান ও জমা-খরচের হিসাব শিক্ষা। (৫) বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই ছিল না। (৬) অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি এবং বিজ্ঞানের নানা শাখা ইত্যাদি আধুনিক বিষয় পড়াবার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। বিশেষত বিজ্ঞানচর্চার অভাবের ফলে মন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। (৭) নারী শিক্ষার আদৌ কোনো সুযোগ ছিল না। 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' ছিল খুব কম অভিজাত গৃহে। (৮) বিদেশের বিদ্যাচর্চার সঙ্গে এর কোনও যোগ ছিল না। তাই ঔপনিবেশিক যুগে কোম্পানির নীতি ও শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশজ শিক্ষা ক্ষীণতর হতে থাকে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার পর্ব ও প্রয়াস ঃ আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার প্রচলন হয় ব্যক্তিগত প্রয়াসে। প্রথমে ইংরেজ কোম্পানির দেশীয় দালাল, এজেন্ট, বণিক-মুৎসুদ্দিরা আদান-প্রদানের প্রয়োজনে অল্প ইংরেজি শিক্ষা করত। কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার (১৭৭২) পর এই আগ্রহ বৃদ্ধি পায় প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্মে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের সুবাদে। বিশেষত ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের পর সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারে ইংরেজির প্রতি আগ্রহ বাড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ও তার বিস্তারের ইতিহাসকে কোম্পানির আমলে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। **প্রথম পর্ব** ১৭৭২ থেকে ১৮১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত যখন কোম্পানি শিক্ষার ব্যাপারে নিজেরা কোনও উদ্যোগ নেয়নি, শিক্ষার প্রসারের দায়িত্বও স্বীকার করেনি। **দ্বিতীয় পর্ব** ১৮১৩ থেকে ১৮৩৫ খ্রিঃ পর্যন্ত যখন কোম্পানি শিক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করলেও, দেশজ, না পাশ্চাত্য— কোন শিক্ষাপদ্ধতিতে অগ্রসর হবে সেই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাখাতে অর্থ পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে ঘোষণা করায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হয়। **তৃতীয় পর্ব** ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমবৃদ্ধি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত এজন্য ভারতের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা বিস্তারের তিনটি কালপর্বের মত শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হলো যথাক্রমে—(১) খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টা, (২) দেশী-বিদেশী বেসরকারি প্রচেষ্টা এবং (৩) সরকারি প্রচেষ্টা। প্রথম কালপর্বে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ আদৌ নেওয়া হয়নি কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারীগণ নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, যেমন ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি, চার্চ মিশনারী সোসাইটি, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি প্রভৃতি শিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হন। বেসরকারি উদ্যোগগুলির মধ্যে ইউরেশিয়ান বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের প্রচেষ্টার ফলে কলকাতা, হুগলি, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শাসনক্ষমতা হাতে নেওয়ার পর কোম্পানির প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল নবজাত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা। সেজন্য

তারা দেশীয় হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং খ্রিস্টান যাজকদের সংযত রাখার দুটি নীতি গ্রহণ করে।

কোম্পানির প্রথম নীতি অনুসারে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ ভারতীয়দের ভাষা ও সাহিত্য জানতে ও শিখতে আগ্রহী হন। দেশজ শিক্ষাকে তারা সাহায্য করেন এবং ফারসি ভাষাকেই সরকারি ভাষা বজায় রাখেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখতে পাই গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন (১৭৮১), বারানসীর ইংরেজ রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকান 'বারানসী সংস্কৃত কলেজ' (১৭৯১) স্থাপন করেছেন এবং কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোনস্, প্রাচ্যের ঐতিহ্যময় শিক্ষা—ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চার উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন এশিয়াটিক সোসাইটি।

এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অনেক প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ। নবাগত ইংরেজ সিভিল সারভেন্টদের এদেশীয় রীতি-নীতি ও ভাষা শিক্ষার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি স্থাপন করলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০)। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মিশনারী কার্যকলাপ যাতে অবাঞ্ছনীয় না হয়, তাঁদের কাজকর্মের জন্য ভারতীয়রা যাতে বিক্ষুব্ধ না হয় সেদিকে কোম্পানির কর্মচারীরা বিশেষ দৃষ্টি রাখলেন।

শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রে কোম্পানির ঔদাসীন্য ও নিরপেক্ষতার নীতির ফলে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের মিশনারী কাজকর্ম একপ্রকার কমে যায়, ফলে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে মিশনারীদের উপর থেকে সমস্ত বাধানিষেধ প্রত্যাহার করা হলো। দ্বিতীয়ত স্বীকার করা হলো যে, "সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন, ভারতে দেশীয় শিক্ষিতদের মনে প্রেরণা সঞ্চার এবং ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নয়নের জন্য রাজস্ব ভাণ্ডার থেকে কমপক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয় করাই হবে সপারিষদ গভর্নর-জেনারেলের আইন সম্মত কাজ।"

ইতোমধ্যে ভারতে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেল। ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুগের এই দাবি এককভাবে পূরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে বেসরকারি প্রয়াস। বেসরকারি উদ্যোগকে মোটামুটি দুটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা— (১) মিশনারী প্রচেষ্টা ও (২) বেসরকারি দেশী ও বিদেশী মনীষীদের প্রচেষ্টা। কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে গড়ে উঠল বহু মিশনারী স্কুল ও কলেজ।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ নবীকরণের পর বেসরকারি দেশীয় ও বিদেশী ব্যক্তিদের শিক্ষা উদ্যোগও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। মূলত তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের পথিক। অপরপক্ষে রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীল। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করেও তারা ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বিদেশী ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে ডেভিড

হেয়ার, হ্যারিংটন, স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমকালীন ভারতের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনুকূল প্রবণতা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন। এঁদেরই উদ্যোগে কলকাতায় স্থাপিত হলো 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭)। হিন্দু কলেজ ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র। ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে অধ্যাপনা করেছেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। বিপ্লবাত্মক স্বাধীন চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে ডিরোজিও ছিলেন অতুলনীয়। তিনি অল্পদিনের মধ্যে ছাত্রদের মনে যে দীপশিখা জ্বেলেছিলেন তার প্রভাব কিছুকাল যুব-বাংলার আন্দোলনকে অক্ষুন্ন রেখে ছিলো। শ্রীরামপুরে মিশনারীগণ শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন করেন (১৮১৮)।

এই যুগে পাঠ্য পুস্তকের অভাব ছিল খুব বেশি। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় স্থাপিত হলো (১৮১৭) ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। দ্বিতীয়ত, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সর্বত্র যাতে স্কুলের অভাব পূরণ করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হলো ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে এই সংস্থা শতাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ও উচ্চস্তরে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। তৃতীয়ত, ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় যে ভারতের পূর্বাঞ্চল শুধু এগিয়ে গেল তা নয়, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং উত্তর ভারতের সংযুক্ত প্রদেশের ক্ষেত্রে একই প্রগতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় হুগলি কলেজ। এইভাবে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বাবধি ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মোহ বৃদ্ধি ও প্রবণতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সরকারি উদ্যোগ (১৮১৩-৫৩) : ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষাসনদ কোম্পানির পরিচালক সভাকে খুশি করতে পারেনি। ফলে পরবর্তী ১০ বছর (১৮১৩-১৮২৩) ইংরেজি শিক্ষার প্রতি সরকারি উদ্যোগ ছিল নিতান্ত নিস্ক্রিয়। কিন্তু যুগের চাহিদা অনুসারে মিশনারী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে আগ্রহী ও অগ্রণী হওয়ায় ইতোমধ্যে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই বেসরকারি শিক্ষা উদ্যোগ লক্ষ্য করে সরকার ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে দশজন সভ্য নিয়ে গঠন করলেন General Committee of Public Instruction (সংক্ষেপে G.C.P.I)। কমিটি প্রথমে সরকারি স্কুল কলেজগুলির উন্নয়নে মনোযোগ দিলেন। যুগের দাবি সঠিক অনুধাবন করেই G.C.P.I ধীরে ধীরে প্রাচ্য শিক্ষার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত তাঁর বিখ্যাত পত্রে এদেশে উদার ও জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা, পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা গড়ে তুলতে অনুরোধ জানান। বিশেষত তিনি গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেন। ইতোমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক মন্ডলী এক নির্দেশনামায় ঘোষণা করেছেন (১৮২৪) যে, এবার থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য সরকারি

বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হবে। ঐ সময় শিক্ষানীতি কী হবে সরকারি-বেসরকারি স্তরে তা নিয়ে এক বিতর্ক দেখা দেয়। একদল প্রাচ্যবাদী (Orientalist) এবং অন্যদল পাশ্চাত্যবাদী (Anglicist)। এই বিতর্ক ১৮৩৫ পর্যন্ত চলে। **দ্বিতীয়ত**, ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, ইংরেজির মাধ্যমে সুদক্ষ কর্মচারী তৈরি করাই হবে সরকারি শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। **তৃতীয়ত**, পরের বছর (১৮২৮) উদারপন্থী লর্ড বেন্টিঙ্ক গভর্নর-জেনারেল হিসেবে ভারতে এসেই ইংরেজিকে সরকারি ভাষারূপে গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর সভায় সেই সুপারিশ স্বীকৃতি পেয়েছে (১৮৩০)। **চতুর্থত**, ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে ঘোষণা করা হয়েছে যে জাতি, ধর্ম ও বর্ণবিশেষে যোগ্য ভারতীয়দের জন্যে সরকারি চাকরির পথ উন্মুক্ত থাকবে, সুতরাং ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার চাহিদা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেল। যুগের এই দাবি লক্ষ্য করে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন-সদস্য টমাস ব্যবিংটন মেকলের নিকট শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থব্যয়ের আইনগত ব্যাখ্যা চাইলেন। লর্ড মেকলে সামগ্রিক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ মতামত ব্যক্ত করলেন। এই মন্তব্যে তিনি ভারতীয় শিক্ষাকে হেয় প্রতিপন্ন করে ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ের পথে যুক্তি দেখালেন। তিনি আরও বললেন, উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের ইংরজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে ক্রমনিম্ন পরিশ্রুতি নীতি (Downward Filtration Theory) অনুসারে সেই শিক্ষার ধারা জনগণের মধ্যে আসবে। এরপর লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮৩৫, ৭ মার্চ) সরকারি শিক্ষানীতি ঘোষণা করলেন। (১) ভারতীয়দের মধ্যে ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন হলো সরকারি উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। (২) সরকারি কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত বর্তমান প্রাচ্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হবে না। তবে এই ধরনের নতুন কোনও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে না। এই ঘোষণার ফলে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জয়যাত্রা ত্বরান্বিত হলো। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে দেশের প্রথম উচ্চতর চিকিৎসা বিদ্যার প্রতিষ্ঠান 'ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৮৩৭ খ্রিঃ থেকে সরকারি কাজকর্মে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি গৃহীত হয়। ১৮৪৪ খ্রিঃ গভর্নর জেনারেল হার্ডিং ঘোষণা করেন যে, ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার পাবে। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের আইন সদস্য ড্রিংকওয়াটার বেথুন কলকাতায় প্রথম সম্ভ্রান্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এরপর মিশনারীরাও বহু স্কুল ও কলেজ স্থাপন করে পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেন।

কোম্পানির শাসনের সর্বশেষ ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিক্ষা দলিল হলো উড সাহেবের শিক্ষা-দলিলটি। কোম্পানির বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চালর্স উড-এর নামে দলিলটি

প্রকাশিত হলো (১৮৫৪)। এই দলিলের উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলি হলো— (১) সরকারি শিক্ষানীতি রূপায়ণ ও পরিচালনার জন্য সরকারি শিক্ষা বিভাগ (Department of Public Instruction) গঠন করা হবে। এটি থাকবে জনশিক্ষা অধিকর্তার (Director of Public Instruction) নিয়ন্ত্রণে। তাঁর অধীনে থাকবেন যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শক (Inspector)। পরিদর্শকগণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান সম্পর্কে অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরামর্শ দেবেন ও শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের নিকট রিপোর্ট করবেন। (২) নবপ্রকল্পের দ্বিতীয় বিষয় হলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান। বলা হলো যে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। (৩) প্রকল্পের তৃতীয় বিষয় ছিল শিক্ষাস্তর। এই শিক্ষাস্তরের সকলের উপর থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরের উচ্চশিক্ষা, তার নিম্নে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সর্বনিম্নে থাকবে প্রাথমিক এবং দেশজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠা। মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি, প্রাথমিক বা নিম্নস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম। এই শিক্ষা দলিলে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে শর্তসাপেক্ষ অনুদান (Grant-in-Aid) প্রথার সুপারিশ করা হলো। শর্তগুলি হলো—(ক) বেসরকারি পরিচালনার স্থায়িত্ব, (খ) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান, (গ) সরকারি পরিদর্শন ব্যবস্থা, (ঘ) সরকারি অনুদান সম্পর্কিত যে-কোনও আইনে সম্মত হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুমোদন দেওয়া হবে। এছাড়া ডেসপ্যাচের আরও কয়েকটি সুপারিশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হলো : (ক) শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা, (খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, (গ) মুসলিম ও নারী-শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ। উড সাহেবের শিক্ষা-দলিলের উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর)

সূচনা : ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ ছিল ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ নবীকরনের বছর। এই সময় কোম্পানির বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড ভারতের শিক্ষা প্রসঙ্গে একখানি দলিল প্রকাশ করেন (১৮৫৪)। এটিই *উডস্ ডেসপ্যাচ বা উডের দলিল* নামে পরিচিত। সমকালীন শিক্ষা-পরিবেশের বিচারে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ডেসপ্যাচ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দলিলে প্রস্তাবিত শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হলো তা ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থপূরণের সহায়ক। মূলত বলা হলো যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাই হবে ভারতীয় নতুন শিক্ষাধারার লক্ষ্য।

ডেসপ্যাচ প্রকাশের পর নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা-উদ্যোগ শুরু হলো। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলো কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৫

খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শিক্ষা-বিভাগ স্থাপন, জনশিক্ষা অধিকারিক নিয়োগ, পরিদর্শন ব্যবস্থা কার্যকর করা হলো। ইতোমধ্যে সরকারি অনুদান প্রদানও সূচিত হলো।

উডের শিক্ষানীতি প্রকাশের পর ভারতে ঘটে গেল মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭)। তাই সমকালীন ভারত সচিব লর্ড স্ট্যানলি নতুন করে একখানি দলিল (Despatch) রচনা করলেন। স্ট্যানলির ডেসপ্যাচের নতুন প্রস্তাবগুলি হলো ঃ (১) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের যোগ্যতার বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। (২) প্রচলিত অনুদান প্রথা ইংরেজি স্কুলগুলির কিছুটা সহায়ক হলেও জনশিক্ষা বিস্তারের সহায়ক নয়। তাই সরকারকেই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে হবে। (৩) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য বাধ্যতামূলক আঞ্চলিক শিক্ষাকর ধার্য করতে হবে।

প্রথম শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) ঃ উডের শিক্ষাদলিল প্রকাশের পর ঔপনিবেশিক শিক্ষার যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটলেও সেগুলি দেশের চাহিদার তুলনায় ছিল যৎসামান্য। এছাড়া বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদির প্রসার প্রসঙ্গে সরকারের পক্ষে পুনরায় ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়ল। তাই উদারনৈতিক শাসক ভাইস্‌রয় লর্ড রিপন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম হান্টারের সভাপতিত্বে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করলেন। এই কমিশনে ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, কে. টি. তেলাং প্রমুখ অনেকেই। কমিশনের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমে নীতি প্রসঙ্গে বলা হলো যে, শিক্ষাবিভাগের কাজ হবে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা। এর জন্যে দুটি নীতি গ্রহণের সুপারিশ করা হলো। **প্রথমত**, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা থেকে সরকারকে ক্রমশ হাত গুটিয়ে নিতে হবে। **দ্বিতীয়ত**, সরকারি অনুদান নীতিকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত, সম্প্রসারিত ও বাস্তবায়িত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হলো যে, সরকার এই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে নেবেন। সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার ভার ও স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারকে ধীরে ধীরে সরে আসতে হবে। এর জন্য উদারভাবে সরকারি অনুদান প্রদান করা প্রয়োজন। উক্ত নীতিগুলিকে পুরোপুরি কার্যকর করার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাহলে তারা স্থানীয় প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে পারবেন। এরপর কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে মূল্যবান নীতি সুপারিশ করলেন।

সমালোচনা ঃ প্রথমত, ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের বিপক্ষে ও পক্ষে বলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিপক্ষে বক্তব্যগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে, উচ্চ শিক্ষার

ক্ষেত্র থেকে ক্রমশ অপসারণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্বায়ত্বশাসন কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করার দ্বারা সরকারি দায়িত্ব সঙ্কোচনের প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে অনুদান ব্যবস্থার সাহায্যে শিক্ষাকে সরকারি ক্ষমতা দ্বারা কুক্ষিগত করার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। **দ্বিতীয়ত**, এযুগের স্বায়ত্বশাসন বিভাগের আর্থিক সামর্থ ছিল সীমিত। তাদের দ্বারা শিক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ মোটেই সম্ভব হয়নি। **তৃতীয়ত**, অনুদান ব্যবস্থায় পরীক্ষার ফলাফলের উপর গুরুত্ব প্রদান করায় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। শিক্ষাজীবনও কর্মমুখী না হয়ে পরীক্ষামুখী হতে শুরু করল। **চতুর্থত**, মুসলিম ও বিশেষ বিশেষ পরিবারের সন্তানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তৈরির সুপারিশগুলি জাতীয় সংহতির পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করল। **অবশেষে** বলা যায়, দেশজ শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কে অনেক কথা বলা সত্ত্বেও বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা হয়নি। উপরন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যম বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করা হয়নি। ফলে মাতৃভাষার উন্নয়ন ব্যাহত হলো।

এত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কমিশন-রিপোর্টের সপক্ষে অনেক কথা বলার আছে। বেসরকারি ভারতীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনানুগ পাঠক্রম প্রণয়ন, মাধ্যমিক স্তরে দ্বিমুখী পাঠক্রম, কলেজ স্তরে বিকল্প পাঠক্রম, আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রভৃতি নিশ্চয়ই অনুকূল সুপারিশ। নারী-শিক্ষা, অনগ্রসরদের শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণের সুপারিশ অবশ্যই প্রশাসনীয় বিষয়। শেষ পর্যন্ত একথা বলা যায়, ভারতীয় বেসরকারি উদ্যমকে স্বীকার করে ও মিশনারী প্রচেষ্টার উগ্রতাকে হ্রাস করে কমিশন ভারতীয় সামর্থ্য সম্পর্কে যেমন আত্মসমীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছেন, তেমনি গণশিক্ষার পথকে সুগম করে দিয়েছিলেন।

কার্জনের শিক্ষানীতি ঃ লর্ড কার্জন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত শিক্ষার উদারনীতির বিরুদ্ধে মত পোষণ করে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের এবং সর্বস্তরের শিক্ষায় সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নত শিক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। দেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে কার্জনের যে বিরোধ ঘটেছিল তার মূলে ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক চেতনা। ১৯০১ খ্রিঃ লর্ড কার্জন সিমলাতে এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। সেই সম্মেলনে ভারতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দুরাবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়। শিক্ষার অসম বন্টন এবং উচ্চ শিক্ষাখাতে অপরিমিত অর্থব্যয় এবং মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাখাতের ব্যয়সঙ্কোচ নীতিকে এই সম্মেলন সমালোচনা করে। সম্মেলনে পরিবেশিত তথ্য ও সমালোচনার ভিত্তিতে কার্জনের শিক্ষানীতিকে বিশেষ বিষয়ে সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন আমরা এবার সেইগুলি উল্লেখ করছি।

(ক) লর্ড কার্জনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার (১৯০৪) ফলে স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হলো। এই আইনে কলেজের অনুমোদন

সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কঠোরতা অবলম্বন করার ফলে কলেজের শিক্ষামানের কিছুটা উন্নতি হয়। (খ) লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় ১৯০৪ খ্রিঃ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারি সাহায্য দেওয়া হতে থাকে এবং ১৯১২ খ্রিঃ থেকে এই সাহায্যের ব্যবস্থা সরকারের একটি বিশেষ দায়িত্বে পরিগণিত হয়। (গ) উচ্চ শিক্ষায় সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি সকল স্তরের শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত পৃথক পৃথক সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থাও লর্ড কার্জন প্রবর্তন করেন। (ঘ) লর্ড কার্জন মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যসূচির সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়ন, মাতৃভাষা অধ্যয়ন, বহুমুখী পাঠ্যসূচি প্রবর্তন, কারিগরী শিক্ষার জন্য 'বি-কোর্সের' ব্যবস্থা প্রভৃতি সংস্কারকার্যে তিনি অগ্রণী হন। (ঙ) উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে কার্জনের প্রচেষ্টা ও নির্দেশে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্র, কারিগরী বিদ্যা, পশুপালন, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও চারুকলা ইত্যাদি বিষয় সংযোজিত হয়। (চ) শিক্ষা প্রশাসনের সুবিধার জন্য লর্ড কার্জন কেন্দ্রীয় প্রশাসনে শিক্ষা-অধিকর্তা (Director) নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। (ছ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাস্তরে লর্ড কার্জন বেসরকারি শিক্ষার উদ্যোগকে গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষার সঙ্কোচন ও নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী হলেও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে তিনি শিক্ষা-প্রসার নীতিকে গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব বলে লর্ড কার্জন স্বীকার করেন। প্রাদেশিক রাজস্ব ও জেলা বোর্ডের আয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করার কথা লর্ড কার্জন সুপারিশ করেন। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলিকে তাদের শিক্ষাব্যয়ের অর্ধেক সরকার থেকে সরাসরি গ্রান্ট হিসেবে দেবার ব্যবস্থা করেন। (জ) প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যসূচিতে গ্রামীণ পরিবেশের সংযোগ সাধন, উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ্যসূচিতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষকের কৃষিশিক্ষাসহ দু'বছরের শিক্ষণ, উপযুক্ত বেতনক্রম প্রভৃতি সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও নীতির কথা ঘোষণা করে লর্ড কার্জন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন।

স্যাডলার কমিশন ঃ লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সংস্কারের পর দশ বছরের মধ্যে পুনরায় প্রচলিত শিক্ষা-কাঠামোর পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন অনুভূত হলো। কারণ, ইতোমধ্যে পরস্পরবিরোধী দুটি উদ্যোগের স্রোত শিক্ষাক্ষেত্রে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে। একদিকে সরকারি উদ্যোগ লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতিকে কার্যকর করার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ শিক্ষা-উদ্যোগ জাতীয় আদর্শে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেছে। এই দুটি উদ্যোগ কখনও দ্বন্দ্ব, কখনও বা সমন্বয়ের ধারায় শিক্ষা-বিস্তার করে চলেছে। এদিকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্বিতীয়বার সংস্কার করা হয়েছে। ফলে এদেশেও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের দাবি উঠল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই দাবি ছিল তীব্র অথচ ভিন্নতর। কারণ, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য নিযুক্ত হয়েই এদেশের শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য দ্বিমুখী লড়াই শুরু করলেন। একদিকে তিনি কার্জনের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন ; অন্যদিকে

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সকল স্তরের উন্নয়ন প্রসঙ্গে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি স্নাতকোত্তর ছাত্রদের পড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর, রিডার এবং লেকচারার নিয়োগ করলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় পঠন-পাঠনের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপকের পদ (chair) সৃষ্টি করলেন। তৃতীয় স্তরে স্নাতকোত্তর গবেষণার পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এসবের ফলে শিক্ষা বিষয়ে নানা সমস্যা দেখা দিল। এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিবেশ অনেকখানি ব্রিটেনের পক্ষে অনুকূল। তাই সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে নতুন একটি কমিশন নিয়োগ করলেন।

নতুন কমিশনের সভাপতিত্ব করেন লিড্স (ইংল্যাণ্ড) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাইকেল স্যাডলার। এইজন্য এই কমিশনকে *'স্যাডলার কমিশন'* ও বলা হয়। ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি ও ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদ। আর অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর গ্রেগরী, স্যার ফিলিপ হার্টগ ও অধ্যাপক রামজে মুর। কমিশন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করে সতেরো মাস পর তেরটি খণ্ডে তাদের বিবরণী পেশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে কমিশন নিয়োগ করা হলেও এই রিপোর্টে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই কমিশনের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

কমিশনের মতে উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। সুতরাং বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল সংস্কার না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার সার্থক সংস্কার সম্ভব নয়। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন ত্রুটি সন্ধান করে তা দূর করার উপায় হিসেবে অনেক অভিমত সুপারিশ করেন।

পর্যালোচনা ঃ স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলি ছিল ভবিষ্যৎ চিন্তা ও শিক্ষা-পরিকল্পনার ইঙ্গিতপূর্ণ। মিঃ মেহিউ-এর কথায় বলা যায়—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবরণী ছিল তথ্য ও পরামর্শের অফুরন্ত ভাণ্ডার। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এর তাৎপর্য অত্যধিক। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে আধুনিক শিক্ষার উত্তরোত্তর প্রসার ঘটে। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের পর লাহোর (১৮৮২) এবং এলাহাবাদ (১৮৮৭) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে বিংশ শতাব্দীতে পাটনা, আগ্রা, দিল্লি, বারানসী, আলিগড়, ঢাকা, নাগপুর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করে প্রাচীন ও নবীনের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটালেন। ১৮৫৭ তে কলেজ ছিল ২৭টি, ১৮৮২ তে সারা ভারতে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭২টি। ১৯২১ এর মধ্যে বহু কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয়, মধ্যবিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ফলে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য সর্বত্র উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি।

নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঃ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। এ সময় কোনও বালিকা বিদ্যালয়ে যেত না। মিশনারীদের প্রচেষ্টাগুলিও ছিল সীমাবদ্ধ। সম্ভ্রান্ত পরিবারে অন্তঃপুরে নারী শিক্ষার সামান্য ব্যবস্থা ছিল। সাধারণের মধ্যে নারীর বিদ্যাশিক্ষার বিরুদ্ধে কুসংস্কার ছিল বদ্ধমূল। ক্রমে শিক্ষিত জনমতের চাপে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৮৪৯-এ বেথুন সাহেব কলকাতায় উচ্চ শ্রেণীর জন্য প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাকে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহায্য করেন। ১৮৫০-এর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বহু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। এ ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারকগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ নারীজাতির উন্নতি কল্পে আত্মনিয়োগ করেন। যদিও পরে এ বিষয়ে তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিবাদ বাধে। উন্নতশীল ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। যার ছাত্রী কাদম্বিনী বসু (পরে গঙ্গোপাধ্যায়) ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিশে যায় এবং ঐ স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলা হয়। ১৮৮২-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রমুখী বসু।

কাদম্বিনী পরে বাংলার প্রথম মহিলা ডাক্তার হন এবং চন্দ্রমুখী প্রথম মহিলা এম. এ. হন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কুমারী মেরী কার্পেন্টার ভারতে এসে নারী শিক্ষার প্রেরণা দেন। এক্ষেত্রে মিশনারীদেরও প্রচেষ্টা ছিল। এসময় খোলা হয় শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণ বিদ্যালয়। ক্রমে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। আর্যসমাজ, প্রার্থনা সমাজ ও অন্যান্য সংস্কারকামী সংগঠনের দ্বারা ভারতের অন্যত্র নারী বিদ্যালয় খোলা হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, বোম্বাইতে, মাদ্রাজে, পাঞ্জাবেও নারী শিক্ষার অগ্রগতি দেখা যায়। মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বেগম সাখাওয়াৎ হোসেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহিলাদের কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ খ্রিঃ ধন্দো কেশব কার্ভে পুনায় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র পড়বারও সুযোগ ঘটে প্রথম মাদ্রাজে ও পরে কলকাতায়। সুতরাং ১৮৫৮ থেকে ১৯১৯ এর মধ্যে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

কারিগরী চিকিৎসা ও আইন শিক্ষার প্রসার ঃ আলোচ্য সময়কালের মধ্যে ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রসার ঘটে। কলকাতা মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫) স্থাপিত হওয়ার পর ক্রমে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও লাহোরে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ— এই তিন প্রেসিডেন্সি শহরে আইন কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সবই সরকারি উদ্যোগে। চার্লস উডের সুপারিশে কারিগরী শিক্ষার কোনও সুপারিশ ছিল না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার দু'একটি বেসরকারি কলেজ-স্কুল স্থাপিত হয়েও সরকারি

ঔদাসীন্যে উঠে যায়। প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয় বিহারের রুড়কীতে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৫৬ খ্রি: কলকাতায় 'বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে (১৮৮০) তা হাওড়ার শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পুনার ওভারসিয়ার স্কুলকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত করে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একই বছরে মাদ্রাজ শিল্পবিদ্যালয়কে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

৪। রামমোহন রায় ও সার্বিক সংস্কার

সূচনা ঃ শিক্ষার প্রসার যদি দেশের জাতীয় জাগরণের পিছনে প্রত্যক্ষ উপাদান বলে ধরা হয় তাহলে, দ্বিতীয় উপাদান ছিল ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন। শিক্ষা যেমন মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে চেতনা আনে, তেমনি সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে ধর্মের নামে ও সমাজের রীতিনীতির নামে যে-সব কুসংস্কার, অন্যায়-অবিচার ও অমানবিক প্রথা চালু ছিল সেগুলি দূর হয়। আধুনিক শিক্ষা যেমন ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে সূচনা ও প্রসার হওয়ার ফলে তার অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল; তেমনি সংস্কারমূলক পরিবর্তন প্রচেষ্টার মধ্যেও প্রভূত সীমাবদ্ধতা ছিল। এতৎসত্ত্বেও সংস্কার আন্দোলনের মূল্য অনস্বীকার্য। বস্তুত এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমাদের দেশে ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ভারতে এই সংস্কার আদোলনের অগ্রদূত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, যাকে নবযুগের প্রবর্তক বলে ধরা হয়। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে নবযুগের যুক্তিবাদ, কুসংস্কারের পরিবর্তে মানবতাবাদ এবং মধ্যযুগের ক্রটি কাটিয়ে আধুনিকযুগের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি সহ জীবনের সব ক্ষেত্রে তিনি সংস্কার ও পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশকে নতুনভাবে গড়তে চেয়েছিলেন বলে তাকে 'আধুনিক ভারতের জনক' বলা হয়। অর্থাৎ দেশবাসী তাকে নবযুগের স্রষ্টা বলে সম্মান জানিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 'ভারত পথিক'।[১] বস্তুত শিক্ষাসংস্কার, ধর্ম সংস্কার, সমাজসংস্কার, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিহাসে রামমোহনের ভূমিকা বিশেষ মূল্যাবন।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের (মতান্তরে ১৭৭৪) ২২ মে রামমোহন হুগলি জেলার (তৎকালে বর্ধমান) খানাকুলের রাধানগর গ্রামে এক প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে নানাবিধ সংস্কার আন্দোলন শুরু করার আগেই তাঁর মানসপ্রকৃতি গঠিত হয়। এর মধ্যে চারটি প্রসঙ্গ বিশেষ উল্লেখ্যঃ (১) বঙ্গদেশে পাঠশালায় বাংলা, পাটনাতে আরবি-ফারসি, বারানসীতে সংস্কৃত এবং পরে ইংরেজি ছাড়াও পালি, হিব্রু, গ্রিক, ল্যাটিন, উর্দু ইত্যাদি দেশী-বিদেশী, ধ্রুপদী ও আধুনিক ভাষায় তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। (২) পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতপথিক রামমোহন রায়।

ফলে তিনি একদিকে হবস্, লক, রুশো, ভলতেয়ার, টমাস পেন, মিল, বেন্থাম, প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন, আবার আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব ও তার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী, জাতীয়তাবাদ, প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হন। (৩) ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ এবং নানা ধর্মাবলম্বী মানুষদের সঙ্গে পরিচয় এবং সেই সঙ্গে হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি নানা ধর্মের মূলশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদির দ্বারা ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে প্রগাঢ় বুৎপত্তি লাভ করেন। (৪) বাল্যকাল থেকেই তিনি নানা দেশজ ধর্মীয় কুসংস্কারের সামাজিক কূপমণ্ডুকতার, রক্ষণশীলতার এবং ধর্মীয় ও সামাজিক ভেদাভেদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। রামমোহনের জীবনী-লেখিকা কলেট তা সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন।[১]

অতঃপর সুপন্ডিত, বহুভাষাবিদ, শাস্ত্রজ্ঞ ও ইয়োরোপীয় দর্শনে প্রভাবিত রামমোহন যুক্তিবাদের আলোকে একেশ্বরবাদী ও অপৌত্তলিক ধর্মের দ্বারা সমাজে ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। ১৮০৩-০৪ খ্রিস্টাব্দে আরবি ভাষার ভূমিকা সমেত ফারসি গ্রন্থ তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওয়াহিদিন প্রকাশ করেন। তাঁর মনে হয়েছিল ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোনও আকার নেই, ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষের ভেদাভেদ নেই এবং সর্বধর্মেই সত্য আছে। এই একেশ্বরবাদী ধর্ম তিনি লাভ করেছিলেন মূলত বেদান্ত বা উপনিষদ থেকে, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম দ্বারা তা পুষ্ট ছিল। পরিণত বয়সে রামমোহন যুক্তি, শাস্ত্র বা ধর্ম এবং সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ দিলীপকুমার বিশ্বাস তা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন।[২]

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পরে ঐ বছরই *"আত্মীয় সভা"* প্রতিষ্ঠা ক'রে নানাবিধ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এই আন্দোলনে তিনি যেমন সক্রিয় ছিলেন, তেমনি ব্যাপৃত ছিলেন গ্রন্থ রচনায়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করেন এবং সেখানেই ব্রিস্টল শহরে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়।

রামমোহনের ধর্মসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্ধ বিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে শাস্ত্র ও যুক্তির আলোয় দেশের মানুষকে মুক্ত করা, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিন্নতা ও বিরোধ থেকে মানবসমাজকে উদ্ধার করে এক একেশ্বরবাদী ও অপৌত্তলিক ধর্মের ভিত্তিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা। এজন্য তিনি অযৌক্তিক অনুষ্ঠান বর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আত্মীয় সভার নানা অধিবেশনে এ বিষয়ে আলোচনা হত। এই কাজের ফলে তাঁকে রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাছাড়া

বিরোধ বেঁধেছিল খ্রিস্টান মিশনারীদের সঙ্গেও। রামমোহন একদিকে বিরোধী পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্কে রত ছিলেন, অন্যদিকে প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ ও গ্রন্থরচনা করেছেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি *ইউনিটোরিয়ান কমিটি* প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর যুক্তিনির্ভর ধর্মবিশ্বাসের পূর্ণ পরিণতি দেখি *১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ* প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সার্বভৌম প্রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং সেই সঙ্গে লোকহিত বা সমাজকল্যাণের আদর্শ তিনি প্রচার করতে চেয়েছিলেন। ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক উভয়বিধ লক্ষ্যই তাঁর ছিল। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের দ্বার পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

সমাজের বদ্ধমূল কুসংস্কার দূর করা এবং সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, বিধবাদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি অ-মানবিক প্রথার বিলোপ সাধন ছিল রামমোহনের সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে শিক্ষার প্রসার বিশেষত নারীশিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহের প্রর্বতন, নারীজাতির সামাজিক অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। আত্মীয় সভার বিভিন্ন অধিবেশন এ-সব বিষয়ে আলোচনা হত। সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বাধিক স্মরণীয় ভূমিকা ছিল পৈশাচিক সতীদাহ অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন্ত স্ত্রীকে সতীর নাম ক'রে পুড়িয়ে মারার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তোলা। সতীদাহের বিরুদ্ধে নানা পুস্তিকা রচনা, জনমত গঠন, বিরুদ্ধবাদীর মতামত খণ্ডন, সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, সতীদাহ অমানবিক ও ধর্মবিহিত। তবে প্রথমে আইন ক'রে এই প্রথা বন্ধ করার তিনি বিরোধী ছিলেন, কারণ ধর্মে হস্তক্ষেপ মনে করে হিন্দুসমাজ ইংরেজ বিরোধী হয়ে উঠতে পারে— এই রকম তাঁর আশংকা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর আইন জারি করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করলে রামমোহন তাকে সমর্থন জানান। এমনকি রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে এই আইনের বিরুদ্ধে আবেদন জানালে রামমোহন এই আইনের পক্ষে জোড়ালো সওয়াল করেন। ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইনটি বহাল থাকে। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নারীজাতির সম্পত্তির অধিকারের পক্ষে পুস্তক প্রকাশ করেন। রামমোহন বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদ প্রথারও বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছিলেন।

রামমোহনের শিক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে দুটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার। তিনি ছিলেন ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। নিমাইসাধন বসু লিখেছেন যে, রামমোহন "was one of the main advocates of English education in India" ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আদি উদ্যোগের পিছনে তিনি জড়িত থাকলেও পরে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় নিজের নাম সরিয়ে নেন। ডেভিড হেয়ার থেকে আলেকজাণ্ডার ডাফ পর্যন্ত অনেককেই পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার তিনি সাহায্য করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অ্যাংলো-

হিন্দু স্কুল (১৮২২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এবং দেশজ শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল আমহার্স্টকে এক পত্র লিখে জানিয়ে দেন যে, প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি নয়, পাশ্চাত্য দর্শন এবং বিজ্ঞান জানাই জরুরি। রামমোহনের চিঠিতে শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে যুক্তিই তুলে ধরা হয়নি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে ভবিষ্যতের দিশারী, তাও বলা হয়। অথচ এই রামমোহনই ১৮২৫ খ্রিঃ 'বেদান্ত কলেজ' স্থাপন করেছিলেন। বস্তুত শিক্ষা সংস্কারক হিসেবে তাঁর মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একাধারে দেশজ ঐতিহ্য ও শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল অথচ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার পক্ষপাতী।

রামমোহন রায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' থেকে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ইত্যাদি অনেক গ্রন্থের কথা জানা যায়। তিনি নিজে 'সম্বাদকৌমুদী' নামে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বাংলা ছাড়া ইংরেজিতেও নানা গ্রন্থ রচনা এবং 'মিরাট উল আখবার' নামে ফারসি সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছেন। আবার ভারতে সাংবিধানিক বিধিসম্মত উপায়ে রাজনৈতিক আন্দোলনেরও তিনি পথিকৃৎ। চিন্তার স্বাধীনতার সপক্ষে এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে এবং ইংল্যাণ্ডে সপারিষদ রাজার কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। এছাড়া বৈষম্যমূলক জুরি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (১৮২৭), নিষ্কর জমিতে কর বসানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদ (১৮৩০), কিংবা কৃষক শ্রেণীর দুরবস্থার বিরুদ্ধে স্মারকলিপি পেশ বা পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্যদান (১৮৩২) তাঁর রাজনৈতিক চেতনার স্বাক্ষর। দেশপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী দ্বারা গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ রামমোহন লিখেছিলেন, 'স্বাধীনতার যারা শত্রু এবং স্বৈরতন্ত্রের যারা মিত্র তারা কোনদিন সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না'।

৫। ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ আন্দোলন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়সাধক রাজা রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় বাংলার যুব আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পীঠস্থান 'হিন্দু কলেজকে' কেন্দ্র করে এই আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এখানকার ছাত্ররা একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির মোহে স্বীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল, অন্যদিকে এই ছাত্রসমাজ সমকালীন ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সমর ও ইংলিশ র‍্যাডিক্যালিজম-এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

বাংলার নবজাগরণ পর্যায়ে এই যুব আন্দোলনের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের ফিরিঙ্গী অধ্যাপক *হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও* (১৮০৯-১৯৩১)। ডিরোজিও ছিলেন

অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি। ধর্মতলা অঞ্চলে একটি প্রাইভেট স্কুলে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ড্রমণ্ড সাহেব ছিলেন কবি, বিদ্বান ও উগ্র স্বাধীনতার পূজারী। ডিরোজিওর উপর তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে ডিরোজিও এলেন হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে। অল্পদিনের মধ্যে উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা তাঁর চতুর্দিকে চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হলো। তাঁর শ্রেণী কক্ষে, বিশ্রাম কক্ষে, বাড়িতে ছাত্ররা অবাধে আলোচনায় লিপ্ত হতে পারত। ডিরোজিও ছাত্রদের মনের মধ্যে প্রজ্বলিত করেছিলেন যুক্তিবাদ, বিচারবোধ, অনুসন্ধিৎসা এবং মুক্তচিন্তা। অধ্যাপক সুশোভন সরকার লিখেছেন, 'In this atmosphere there was surging up a wave of radical sentiment'।[১]

আলোচনার সুবিধার্থে তিনি গড়ে তুললেন অ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন (Academic Association)। এই সংস্থার বৈঠকে আলোচ্য বিষয় ছিল হিন্দু ধর্মের অসারতা, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা ও খ্রিস্টান ধর্মের উদারতা, আধুনিকতা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা। ডিরোজিও ছাত্রদের যে-কোনও প্রকার স্বাধীন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। ছাত্রসমাজ অনেক সময় তারুণ্যের উৎসাহে নিষিদ্ধ পানভোজনেও লিপ্ত হত। প্রকাশিত হলো তাদের মুখপত্র *দ্য পার্থেনন*[২]। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে আলোড়নের সৃষ্টি হলো, বিশেষত ধর্মান্তরের আশঙ্কায় তারা বিচলিত হলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে রামকমল সেন ম্যানেজিং কমিটির সভা ডেকে ১৮৩১ খ্রিঃ ২৫শে এপ্রিল ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করলেন। ঐ বছরেই ডিরোজিও কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কিন্তু তিনি যে ছাত্রদের মনে যুক্তি ও বিতর্কের দীপশিখা জ্বেলে দিয়েছিলেন তার প্রভাব আরও কিছুকাল যুব-বাংলার আন্দোলনকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। তবে এই আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেলেও ক্রমশ তা পরবর্তী যুগে নবরূপে সমন্বয়ী প্রতিক্রিয়ায় সামিল হলো।

ডিরোজিও যে জ্ঞানশিখা জ্বালিয়েছিলেন তা বহুকাল সক্রিয় ছিল। ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ শিষ্য না হওয়া সত্ত্বেও এই ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত সকলকেই বলা হত 'ইয়ংবেঙ্গল' বা 'নব্যবঙ্গ'। এই দলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ। এদের মধ্যে উত্তরকালে অনেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করার পর নব্যবঙ্গ দলের পক্ষ থেকে দু'খানি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়-ইংরেজিতে *The Enquirer* এবং বাংলাভাষায় *'জ্ঞানান্বেষণ'*। অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু লিখেছেন, "The Derozian influence gradually began to spread among students of other institutions, until it pervaded the house of almost every advanced student".[১] উত্তরকালে নব্যবঙ্গ দলের পক্ষ থেকে আরও পত্রিকা বের করা হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে খ্যাত ছিল *'দ্য বেঙ্গল স্পেক্টেটর'*। যে সব সংগঠন স্থাপন করা হয়েছিল, তার মধ্যে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' এবং 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for the Acquisition of General Knowledge) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নব্যবঙ্গ তৎকালীন বাংলা তথা ভারতের সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে বিপ্লবের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। এদের মাত্রাতিরিক্ত পাশ্চাত্য প্রীতির জন্য একদিকে যেমন ইংরেজি শিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি নারী মুক্তি, নারী শিক্ষার বিস্তার ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ-জীবন প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়েছিল। তবে তাদের মধ্যে যুক্তির প্রাবল্য থাকলেও ঐতিহ্যবিরোধিতা ও অস্থিরচিত্ততার, অনুকরণ প্রিয়তার ফলে তাঁরা সমাজে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। তবে যুব আন্দোলনের ক্ষণস্থায়ী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নতুন যুগের আবির্ভাবকে অনেকখানি তরান্বিত করেছিল। রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যবর্তী যুগে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী শিক্ষার প্রসার, বিশেষত যুক্তিবাদ ও মুক্তদৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সমাজচিন্তার এবং সংস্কার কর্মের উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছিলেন। অধ্যাপক সুশোভন সরকার ঠিকই লিখেছেন যে, তাদের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইতিবাচক দিকও স্মরণযোগ্য। তবে নব্যবঙ্গ দলের সামাজিক ভিত্তি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এই গোষ্ঠীতে নানা ধরনের ব্যক্তি ছিলেন। উত্তরকালে তাদের পাশ্চাত্যভাব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অনেক কমে আসে।[২]

৬। বিদ্যাসাগর এবং শিক্ষা ও সমাজসংস্কার

উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে সমাজ সংস্কারের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় এবং এই পর্বের প্রধানতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের গোড়ার যুগ, নব্যবঙ্গ বা ইয়ংবেঙ্গল দলের যুগ ইত্যাদি পর্বে সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার যে উর্মিমালা প্রবাহিত হয় তাতে উত্তরকালে বিশেষ গতিবেগের সঞ্চার করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সাহিত্যচর্চা ও অধ্যাপনা ব্যতীত যে দুটি ক্ষেত্রে তাঁর দান সর্বাধিক তা হলো সমাজসংস্কার এবং শিক্ষার প্রসার।

কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার পর বিদেশী শাসকবর্গ প্রথমদিকে ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে চাইত না। তারা ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো ও অর্থনীতি বজায় রেখে সম্পদ আহরণে আগ্রহী ছিল। ক্রমে ক্রমে খ্রিস্টান মিশনারী ও প্রগতিশীল ভারতীয় জনমতের চাপে তারা নীতি বদলাতে বাধ্য হয়। ভারতীয় সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার ও অমানবিক প্রথা বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করে। উনিশ শতকের সূচনায় ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ওয়েলেসলির আমলে শিশুহত্যা বা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন আইনত নিষিদ্ধ হয়। সংস্কার প্রচেষ্টায় বিশেষ উৎসাহী লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে পাস হয় সতীদাহ বিরোধী আইন (১৮২৯)। আমরা আগেই দেখেছি যে ভারতীয় জনমতের একাংশ সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে ছিল এবং রামমোহন রায় এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাছাড়া বেন্টিঙ্কের আমলেই কর্ণেল স্লিম্যানের সহযোগিতায় ঠগী নামক দস্যু দমন এবং দাসত্ব প্রথারও উচ্ছেদ বিষয়ে আইন পাস হয়। কোম্পানির আনুকূল্যের ফলে সংস্কারপন্থী ও পরিবর্তনকামী প্রগতিশীল ব্যক্তিরা উৎসাহিত হন। রক্ষণশীল সমাজে হৈ হৈ পড়ে যায়।

বস্তুতপক্ষে রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সার্বিক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা, সমাজে তার প্রভাব, ডিরোজিওর ভাবশিষ্যমন্ডলী বা ইয়ংবেঙ্গল দলের ঐতিহ্যবিরোধী ও পাশ্চাত্যপন্থী উগ্র ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রক্ষণশীল ও গোঁড়া নেতৃবর্গ সংস্কার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে শুরু করেন। প্রগতিশীল বনাম রক্ষণশীলদের এই দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল চলেছিল। রামমোহনের সময় যিনি রক্ষণশীল সমাজের নেতা ছিলেন সেই রাধাকান্ত দেব ও তার অনুগামীরা পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টাতেও তীব্র বাধা দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মশাই এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।[১] এই প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখা দরকার—প্রথমত, বিদ্যাসাগরের আগেই সতীদাহ বিরোধক আইন সমেত কিছু সংস্কার সাফল্যলাভ করলেও তখন পর্যন্ত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীণ্য প্রথা, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদি সামাজিক কু-রীতি দেশে প্রচলিত ছিল। প্রয়োজন ছিল বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং নারীশিক্ষা প্রসারের। এই সব কাজেই বিশেষ উদ্যোগ দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসাগর মূলত ছিলেন মানবতাবাদী, পণ্ডিত এবং শিক্ষাব্রতী, সমাজহিতৈষী সংস্কারক। শিক্ষার প্রসারের মতন সমাজের কুসংস্কার দূর করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ধর্মসংস্কারের ব্যাপারে তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না, ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তাকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দেননি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) মেদিনীপুর জেলার (তৎকালে হুগলি) বীরসিংহ গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী

দেবী। দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে মেধাবী ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলার প্রধান পণ্ডিত, পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং শেষে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৫১) হন। নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুরাগী এবং রামমোহনের মতন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়বাদী পথের পথিক। কালক্রমে দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার জন্য তিনি দয়া ও করুণার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন।

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার মূলে ছিল নারীজাতিকে সর্ববিধ দুরবস্থা থেকে মুক্ত করে সমাজে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি নিজেই লিখেছিলেন, 'বিধবা বিবাহ্ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।' বিধবা বিবাহের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয় বাল্য বিবাহের কারণে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত সর্বশুভকরী সভার মুখপত্র 'সর্বশুভকরী পত্রিকার' প্রথম সংখ্যাতেই বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে দু'খানি পুস্তিকা লেখেন। ১৮৫৬ খ্রিঃ পুস্তিকা দুটির ইংরেজি অনুবাদ 'ম্যারেজ অফ হিন্দু উইডোজ' নামে প্রকাশিত হয়। শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখান যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট্' পত্রিকায় মন্তব্য করার ফলে পুস্তিকা দুটি অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর তিনি হিন্দুবিধবাদের বিবাহ আইনসিদ্ধ করবার জন্য একহাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ এক আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠান। এই আবেদনে দেবেন্দ্রনাথ ঠকুর, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের স্বাক্ষর ছিল। রক্ষণশীল হিন্দুরা পাল্টা আবেদন জানানো সত্ত্বেও ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই ভারতীয় আইনসভায় 'বিধবা বিবাহ আইন' পাস হয়ে ডালহৌসির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়। এরপর চব্বিশ পরগণা জেলার খাঁটুয়া গ্রামের শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন), যিনি নিজে ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, তিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করেন। (৭.১২.১৮৫৬)। এর পর বিদ্যাসাগর বহু বিধবাবিবাহে স্বয়ং উদ্যোগ নেন ও অর্থ ব্যয় করেন। বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও দুটি পুস্তক লিখে বিদ্যাসাগর আন্দোলন গড়ে তোলেন। বাংলায় সমাজ সংস্কারে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

বস্তুত সতীদাহ প্রথা বিরোধী আদোলনের সঙ্গে যেমন রাজা রামমোহন রায়ের নাম প্রথমেই মনে আসে, তেমনি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের কথা উঠলেই পুণ্যত্মা বিদ্যাসাগরের নাম মনে আসে। তবে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে শুধুমাত্র বিধবা-বিবাহ্ প্রবর্তন তাঁর একমাত্র সমাজ সংস্কার ছিল না। কৌলীন্যপ্রথা এবং বহুবিবাহ ছিল যেমন সমাজের এক বীভৎস প্রথা, তেমতি বাল্যবিবাহ ছিল এক ঘৃণ্য সামাজিক কু-রীতি। ভুলে গেলে চলবে

না যে এক থেকে দশ বছর বয়সের মধ্যে মেয়েদের যেখানে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিংবা বহুবিবাহের ফলে যেখানে ষাট বছর বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে দশ বছর বয়স্ক মেয়ের বিয়ে হচ্ছে সেই সমাজে বিধবা বিবাহের প্রয়োজন অনেক বেশি। সুতরাং তাৎক্ষণিক ফল যাই হোক না কেন, বিদ্যাসাগরের সংস্কারআন্দোলনের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী এবং গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকপত্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে জমা দেওয়া হয় সরকারের কাছে। এর উদ্দেশ্য ছিল বহুবিবাহ রহিত করা। অনুরূপ বহু আবেদন জমা পড়ে। বিদ্যাসাগর স্বয়ং ১৮৬৬ খ্রিঃ আবার এক স্মারকপত্র দেন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ; ১৮৭১ এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য তিনি দুটি পুস্তিকা রচনা করেন। একইভাবে বাল্যবিবাহ দূর করার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর উদ্যোগী ছিলেন। রামমোহন রায়ের মতনই নারী মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম গৌরবোজ্জ্বল।

সমাজসংস্কারের মতন শিক্ষা সংস্কার এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। শিক্ষার ব্যাপারেও তাঁর কর্ম ছিল বহুবিধ। শুধু গ্রন্থ রচনা বা অধ্যাপনা নয়, নানা সময়ে পাঠ্যসূচি, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি নিয়েও তিনি যেমন ভাবনা চিন্তা করেছেন, সরকারের কাছে মতামত জানিয়েছেন, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে এসেছেন। শিশু পাঠ্য 'বর্ণপরিচয়' রচনা, ব্যাকরণ থেকে অনুবাদ গ্রন্থ ইত্যাদি তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর। সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক হিসেবে সরকারের কাছে পাঠানো সাজেশান, ১৮৫০ খ্রিঃ শিক্ষাবিভাগকে পাঠানো প্রতিবেদন ইত্যাদির মধ্যে শিক্ষা পদ্ধতি বিষেয় তাঁর মতামত জানা যায়। বিদ্যাসাগর যেমন জনশিক্ষা, বাল্যশিক্ষা ইত্যাদির পক্ষপাতী তেমনি বাংলা শিক্ষারও সমর্থক। তবে সবচাইতে স্মরণীয় হলো নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর ভূমিকা। নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বেথুন-প্রতিষ্ঠিত স্কুলের কাজ, মেরী কার্পেন্টার এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তিকে শিক্ষার কাজে সাহায্য ইত্যাদির মধ্যে নারী শিক্ষার জন্য তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা স্মরণীয়।

বস্তুত একজন মানবতাবাদী সংস্কারক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে এক অনন্যচরিত্র। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মন্তব্য করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের ছিল "The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother."

৭। ব্রাহ্ম আন্দোলন

রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায় ১৮০৩-০৪ খ্রিস্টাব্দে ফারসি ভাষায় (আরবি ভূমিকা সমেত) তুহফাৎ উল মুওয়াহিদিন প্রকাশের সময় থেকে, বিশেষত ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করা এবং ঐ

বছরই 'আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করা এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে ঝাপিয়ে পড়ার পর থেকে যে আন্দোলনের সূত্রপাত তা পরিণতি লাভ করেছিল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে। অনেকের ধারণা সেই সময় ব্রাহ্মসমাজ নামটি প্রচলিত ছিল না, ছিল 'ব্রহ্মসভা', কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয়।[১]

তেমনি ব্রাহ্মসমাজ যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল তা নিছক ধর্ম সংস্কার কিংবা সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল বলে ভাবলে ভুল হবে। এটি ছিল মানবজাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য মুক্তি আন্দোলন।[২] অর্থাৎ ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা মূলক, রাজনৈতিক নানাবিধ দিক থেকে ব্রাহ্ম আন্দোলন উনিশ শতক ব্যাপী জাগরণে সক্রিয় ছিল। যোগানন্দ দাস লিখেছেন ঃ "The Brahmo Samaj was founded by Rammohan Roy (1772-1833). Its birth and development is closely correlated with the birth and development of Modern India of which Rammohan is regarded as the 'Father'. The Brahmo Samaj helped to emancipate India from medieval fundalism to national democracy, from blind faith and antisocial customs to knowledge and science , in a threefold emancipation, intellectual and religious, social and moral, and political."[৩]

কোনও নতুন ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা রামমোহনের লক্ষ্য ছিল না। একেশ্বরবাদী, অ-পৌত্তলিক এবং অ-সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সার্বজনীনতা। সেই সঙ্গে সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ, পর্দা প্রথার বিলোপ, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ইত্যাদির পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ দীর্ঘকাল আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে জনমত গঠন এবং জীবনচর্চায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষত নারীমুক্তি আন্দোলনের তারা ছিলেন অগ্রদূত।

রামমোহনের মৃত্যুর পর এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়লেও দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রমুখের চেষ্টায় তা টিকে ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ব্রাহ্ম আন্দোলনকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগঠিত করেন। তিনি ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন এবং দলমত নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবীদের সমবেত করেন। ঐ সভার পক্ষ থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত (১৮৪৩) হতে শুরু করে। প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার

দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং নানাবিধ সংস্কারকর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যগণ সকলেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন না। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, প্রমুখ অনেকের নাম করা যায়। এই সভা খ্রিস্টান মিশনারী কার্যকলাপ প্রতিরোধ ক'রে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে, নানাবিধ সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংস্কার আন্দোলনকে গতিময় করে তোলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী-সভা অবশ্য উঠে যায়।[১]

ধর্ম সংস্কারের দিক থেকেও তত্ত্ববোধিনী পর্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মূল লক্ষ্য ছিল একদিকে সার্বজনীন একেশ্বরবাদ ও অপৌত্তলিক ধর্মের প্রসার অন্যদিকে সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার দূর করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি। পরবর্তী ব্রাহ্মনেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম'-এর বদলে সার্বজনীন আস্তিক্যবাদ গ্রহণ করেন। বেদের অভ্রান্ততা পরিত্যাগ করা হয়। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে দেবেন্দ্রনাথ সহ একুশ জন প্রথম দীক্ষা নেওয়ার ফলে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল। এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল।' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই 'ব্রাহ্মধর্ম' সংকলন গ্রন্থ, ব্রাহ্মধর্মবীজ এবং ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানপদ্ধতি রচনা করেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮ - ৮৪) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার পর ক্রমে ক্রমে তিনি এক নতুন দলের নেতা হন। ব্রাহ্মবন্ধু সভা (১৮৬০), সঙ্গত সভা (১৮৬০, 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা (১৮৬১), 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা (১৮৬৪), বামবোধিনী সভা ও বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩) প্রভৃতির মাধ্যমে তরুণ দলের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্রাহ্ম আন্দোলনে নবযুগ সৃষ্টি করেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দেন (১৮৬২)। কিন্তু ক্রমে আচার্যদের উপবীত ধারণ, খ্রিস্টধর্মের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের মনোভাব, অসবর্ণ বিবাহ, নারী-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে তরুণ দলের মতভেদ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত কেশবচন্দ্র সেন তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বেরিয়ে এসে ক্রমে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৬৬) স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। এভাবে ব্রাহ্ম সমাজে প্রথম ভাঙন ঘটেছিল।

এই ভাঙন অবশ্য ব্রাহ্ম আন্দোলনকে দুর্বল করতে পারেনি। আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাছাড়া ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রমুখ। তাঁরা অ-পৌত্তলিক এবং একেশ্বরবাদী

হলেও হিন্দু ঘেঁষা ছিলেন। এই সমাজের কাজকর্ম ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসামাজের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলন বাংলা ও ভারতের নানা স্থানে প্রসারিত হয়। ক্রমে ধর্মীয় সার্বজনীনতা ছাড়াও জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদির বিপক্ষে এবং নারীশিক্ষা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদির সপক্ষে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষত নারীমুক্তি আন্দোলনে এই সমাজ ছিল অগ্রণী।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব মন্দিরের উদ্বোধন হয়। তখন ব্রাহ্মসমাজের একটি নগর সংকীর্তন বিশেষ জনপ্রিয় ছিল ঃ

নর-নারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাতবিচার।

এই গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে তিনটি সত্য। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করেছিল, যে কোনও ব্যাপারে নর-নারীর সমানাধিকার। তাছাড়া তারা জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী। তবে এই সঙ্গে স্বীকার্য যে ব্রাহ্ম আন্দোলনে তখন ভক্তিভাব এসেছিল শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে, অন্যদিকে পাপবোধ এবং প্রার্থনা দ্বারা মুক্তির বোধ এসেছিল খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে ঘুরে এসে কেশবচন্দ্র সেন নব উদ্যমে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন।[১]

একদিকে 'ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সংস্কার সভা' প্রতিষ্ঠা (১৮৭১), তার মাধ্যমে নানাবিধ সংস্কারমূলক কাজকর্ম ; বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের বিশেষ বিবাহ আইন পাস ; 'সুলভ সমাচার' এবং অন্যান্য পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজ এক নতুন আদর্শ তুলে ধরে।

কিন্তু ১৮৭০ এর দশকেই ক্রমে ক্রমে স্ত্রী-স্বাধীনতা, সমাজের গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, ঈশ্বরের 'প্রত্যাদেশ' বিষয়ে কেশবচন্দ্রের মত, ব্রিটিশ সরকারের এবং খ্রিস্টধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এক তরুণ দলের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীদের তীব্র মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই বিরোধ বাড়তে থাকে এবং অবশেষে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কোচবিহারের রাজপুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয়বার ভাঙন দেখা দেয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে 'উন্নতশীল' দল বেরিয়ে গিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবচন্দ্র দেব, গুরুচরণ মহলানবিশ প্রমুখ।[২]

১৮৮০ খ্রিঃ কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্তন করে ঘোষণা করেন 'নববিধান' (New Dispensation)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের আকাল মৃত্যু এই সমাজকে দুর্বল করে দেয়। নববিধানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশ চন্দ্র সেন, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ।

এইভাবে ব্রাহ্মসমাজের ত্রিধারা সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই ছিল সর্বাপেক্ষা বড়ো এবং ধর্মীয় ঐক্য, মানবতাবাদ, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক সংস্কার, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার বিকাশ, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং সর্বোপরি নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে সংস্কারমূলক আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮। পশ্চিম ও দক্ষিণভারতে সংস্কার আন্দোলন

ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বাংলায়। ফলে সমাজ পরিবর্তনের ধারাও বাংলায় প্রথম দেখা যায়। তাছাড়া সাংস্কৃতিক বিকাশে বাংলা ছিল নেতৃত্বে। এজন্য অনেক সময়ই 'বাংলার জাগরণ' বা কখনও নবজাগরণ (রেনেশাঁস) কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও সঠিক কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে যা নিয়ে বিতর্ক নেই তাহলো সমাজসংস্কার ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও সংস্কার আন্দোলনের প্রসার হয়।

পশ্চিমভারতের বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্র ছিল ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম ক্ষেত্র। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি শিক্ষিত কয়েকজন মারাঠী 'সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজ' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এদের মারাঠী এবং গুজরাটি শাখার প্রধান কাজ ছিল স্ত্রীশিক্ষা প্রচার। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে একটি একেশ্বরবাদী ও জাতিভেদ বিরোধী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার নাম পরমহংস মন্ডলী বা পরমহংস সমাজ। এই সংগঠন মূর্তিপূজারও বিরোধী ছিল। লোকহিতবাদী নামে পরিচিত গোপাল হরি দেশমুখ (১৮২৩-৯২) ছিলেন পশ্চিম ভারতের বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক। তিনি মারাঠী ভাষায় তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে হিন্দু রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রচার করেন, ধর্মীয় ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক দেশমুখ যুক্তি, মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজকে পুনর্গঠিত করার কথা প্রচার করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতি বা গোবিন্দ রাও ফুলে ও তাঁর স্ত্রী পুণায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তারা শুধু নারীশিক্ষা নয়, বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন এবং নিম্ন জাতির উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তারা স্থাপন করেছিলেন 'সত্যসাধক সমাজ'। বিধবা বিবাহ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত ও কর্মনদাস মুলজী। মহারাষ্ট্রের অপর দুই সমাজ সংস্কারক ছিলেন গোপাল গণেশ আগরকর (১৮৫৬-১৮৯৫) এবং হরিনারায়ণ আপটে

(১৮৬৪-১৯১৯)। এছাড়া যে সব লেখক তাদের রচনার মাধ্যমে সংস্কার প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জি. এন. মদগাডকার, বাবা পদ্মজী, কৃষ্ণশাস্ত্রী চিপলঙ্কার, বিষ্ণুবুয়া ব্রহ্মচারী প্রমুখ।

হিন্দু সমাজের মতন মহারাষ্ট্রের পার্শি সমাজের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত পার্শি যুবক বজুমাই মাজদয়েসনাম সভা বা ধর্ম সংস্কার সভা স্থাপন করেন। পার্শিদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং জরথুষ্ট্র প্রচারিত ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে দাদাভাই নওরোজীও উৎসাহী ছিলেন। পার্শি মেয়েরা যাতে আইনের চোখে পুরুষের সমান অধিকার পায়, তাই ছিল তার উদ্দেশ্য। ১৮৫১ খ্রিঃ তিনি মোরারজি চেঙ্গলি এবং নওরোজি ফরদুনজী-র সহায়তায় একটি ধর্ম সংস্কার সমিতি গঠন করেছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কে. আর. কামা ধর্ম বিষয়ক উপদেশ সহজ ভাষায় প্রকাশ করেন। তবে পার্শি সংস্কারকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন বেরহামজি মেরওয়ানজি মালাবারি। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে তাঁর কর্মপন্থা রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষত তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার সহবাস সম্মতি আইন (Age of Consent Act) পাস করে।

প্রার্থনা সমাজ ঃ পশ্চিম ভারতে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল প্রার্থনা সমাজ। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাবে এবং কেশবচন্দ্র সেনের প্রেরণায় প্রার্থনা সমাজ স্থাপন করেন মহাদেব গোবিন্দ র‍্যানাডে এবং আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ। মনে রাখা দরকাব, ১৮৬৪ খ্রিঃ কেশবচন্দ্র বোম্বাইতে প্রচারে গিয়েছিলেন এবং ১৮৬৮ তেও আবার গিয়েছিলেন। এরই মধ্যে ডাঃ পান্ডুরঙ্গ (১৮২৩-১৮৯৮) এবং মহাদেব গোবিন্দ র‍্যানাডে (১৮৪২-১৯০১) এই সমাজ গঠন করেন। বিচারপতি র‍্যানাডে রাজনৈতিক আন্দোলনেও ছিলেন, কারণ পুনা সার্বজনিক সভা (১৮৭০) কিংবা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও তিনি যুক্ত তবে সমাজ সংস্কারক হিসেবে ১৮৬১ খ্রিঃ তিনি বিধবা বিবাহ সমিতি যেমন করেছিলেন, তেমনি তারই উৎসাহে দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সোসাইটি' গঠিত হয়। প্রার্থনা সমাজে পরে রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকর, এন. জি. চন্দ্রভারকর প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা যোগ দিয়েছিলেন। প্রার্থনা সমাজ একেশ্বরবাদপ্রচার, জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন, অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন, স্ত্রীজাতির এবং অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি সাধনে সক্রিয় ছিল।

বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মতন সমাজসংস্কার আন্দোলনের ধারা দক্ষিণ ভারতে ও উত্তর ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে। পাঞ্জাবে ব্রাহ্মসমাজের শাখা 'বেদসমাজ' নামে প্রচলিত ছিল। পরে দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করলে পাঞ্জাবে তার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য শিখ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নয়, হিন্দুদের মধ্যে। অন্ধ্রপ্রদেশে বিখ্যাত তেলেগু সমাজ-

সংস্কারক ছিলেন বীরেশলিঙ্গম পান্তুলু। তারই প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও সংস্কার আন্দোলন প্রসারিত হয়। ক্রমে উড়িষ্যায় জয়মঙ্গল রথ, মাদ্রাজে কুমারমঙ্গলম, পুনায় ভিটলরাম সিন্ধে প্রমুখ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় সংস্কার আন্দোলন অব্যাহত ছিল এবং সমাজে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

৯। আলিগড় আন্দোলন ও মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণ

ভারতীয় মুসলিম সমাজে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা, সংস্কার আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য উদ্যোগ খুব কম দেখা গিয়েছিল উনিশ শতকে। এই ব্যাপারে সৈয়দ আহমদ খান এবং তৎপ্রবর্তিত আলিগড় আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে মুসলমান সমাজে আলিগড় আন্দোলন ছাড়াও বাংলায় আবদুল লতিফ, দেলওয়ার হোসেন, সৈয়দ আমির আলি প্রমুখ শিক্ষা বিস্তারে ও সমাজ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতীয় জাগরণে মুসলমান জনগণ যে অংশ নেয়নি, তার প্রধান কারণ ছিল তারা আধুনিক তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল। অবশ্য বহু পরে সময়ের তাগিদে তাদের এই অনীহা কেটে যায়।

কোম্পানির আমলে ঔপনিবেশিক শাসন, ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ, পাশ্চাত্য শিক্ষার দাপট দেশজ ইসলামীয় শিক্ষা বিপন্ন হওয়া, ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম শাসকবর্গের কর্মচারীদের বেকার হওয়া ইত্যাদির কারণে অভিজাত মুসলমানদের মর্যাদায় আঘাত লাগে। আবার গ্রামের গরিব মুসলমানদের মধ্যে কোম্পানির ভূমিরাজস্বের চাপ ও শোষণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে তাদের মধ্যে এবং শহরে গ্রামীণ অভিজাতদের মধ্যেও ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহ জন্মায়নি। বিপরীতপক্ষে, ধর্মের সংস্কারের পরিবর্তে পুনরুত্থানবাদী (Revivalist) নানা আন্দোলনের শুরু হয় ধর্মের বিশুদ্ধতার নামে। তাছাড়া ওয়াহাবি এবং ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতা সত্ত্বেও আধুনিকতার বদলে ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগও লক্ষ্যণীয়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ভারতীয় মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষা, সমাজসংস্কার, সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বিশেষত বাংলায় আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) এবং আমির আলি (১৮৪৩-১৯২৮) এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রথম বাঙালি মুসলিম গ্র্যাজুয়েট দিলওয়ার হোসেন বা বিশিষ্ট লেখক মীর মোশারেফ হোসেনও সমাজ-উন্নতির ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তবে উনিশ শতকে ভারতে মুসলমান সমাজের জন্য সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন সৈয়দ আহমদ খান।

ভারতে ব্রিটিশযুগের পূর্বে মুসলিম সমাজের নবাব বাদশাহরাই ছিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। সেই অধিকার ক্ষুণ্ন করে ইংরেজরা ভারতে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার

করে। সুলতান, বাদশাহের বংশধর হিসেবে মুসলমানদের একটা গর্ব ছিল। তাই প্রথম থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত মুসলমানরা ব্রিটিশ প্রবর্তিত শাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি পরিহার করে চলতেন। তাই তারা সবদিক থেকে বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ রইলেন। অন্যদিকে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে হিন্দুরাই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। মুসলমানদের এই অবনতি ও পশ্চাৎপদ অবস্থা লক্ষ্য করে উনিশ শতকে যে-সব মুসলমান সংস্কারক তাদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলেন তাদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন অন্যতম ও চিরস্মরণীয়।

সৈয়দ আহমদের (১৮১৭-১৮৯৮) পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন মধ্য এশিয়া থেকে। তাঁর পিতা মহম্মদ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সৈয়দ আহমদ দিল্লিতে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর (১৮৩৬) সৈয়দ আহমদ ব্রিটিশ সরকারের চাকরি গ্রহণ করেন এবং মুন্সেফ হিসেবে দিল্লি ও ফতেপুর সিক্রিতে কর্মরত ছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় সৈয়দ আহমদ ইংরেজ পক্ষ সমর্থন করেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির' সভ্যরূপে নির্বাচিত হন এবং গাজীপুরে একটি 'বিজ্ঞান সংস্থা' স্থাপন করেন। এখানে ইংরেজি থেকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হত। পরে এটি আলিগড়ে স্থানান্তরিত হয়।

কর্মজীবনে সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের পশ্চাৎবর্তিতা লক্ষ্য করে ব্যথিত হন। তিনি জানতেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অর্থ নিজেদের বঞ্চনার সমুদ্রে নিক্ষেপ করা। আরবি, ফারসি ও ঐস্লামিক শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, অবশ্য তিনি ইংরেজি জানতেন সামান্য। তথাপি তিনি ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। গাজীপুরে থাকতেই তিনি একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাকে আলিগড়ে বদলি করা হয়। তিনি মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে বলেন। ১৮৬৬ খ্রিঃ পূর্বোক্ত বিজ্ঞান সমিতি থেকে 'আলিগড় ইনস্টিট্যুট গেজেট' নামে সাপ্তাহিক বের হয়। ঐ পত্রিকায় সামাজিক, শিক্ষামূলক ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ১৮৬৯ খ্রিঃ তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং ১৮৭০-এ দেশে ফিরে 'তাহজিব অল অখলক্' নামে এক উর্দু সংবাদপত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এজন্য তাকে রক্ষণশীলদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁর কাম্য ছিল, তাই তিনি মুসলমানদের ইয়োরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা করেন। ইতিহাসে এই ঘটনা 'আলিগড় আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষার সুবিধার্থে তিনি স্থাপন করলেন 'মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ' (১৮৭৫)। এই প্রতিষ্ঠানটি পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণতি লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের মন থেকে যেমন ব্রিটিশ বিদ্বেষ দূরীভূত করেন, তেমনি

মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের অনুকূল মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই আলিগড়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সর্বভারতীয় মুসলিম সমাজচেতনা।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের সূত্রপাত। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি ভাইস্‌রয় লিটন সৈয়দ আহমদের আমন্ত্রণে কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। সৈয়দ আহমদ পরে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল এডুকেশন কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইটহুড দেয় (১৮৮৮)। আলিগড়ে স্যার সৈয়দের দেহাবসান ঘটে ১৮৯৮-এর ২৭ মার্চ।[১]

স্যার সৈয়দ আহমদ প্রথম দিকে ছিলেন ধর্মান্ধতা, অথচ সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্যে তিনি নানাকথা বলতেন। "আমাদের উন্নতি ও সুস্থিতি সবই নির্ভর করছে আমাদের একতাবোধ, পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রেমের উপর ; আমাদের পারস্পরিক বিরোধ, একগুঁয়েমি, ঝগড়া-বিবাদ বা ঈর্ষাদ্বেষের পরিণাম হবে আমাদের নিশ্চিত সর্বনাশ।" ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় তিনি বলেছিলেন : "হিন্দু ও মুসলমান সুন্দরী ভারতবর্ষের দুই চক্ষুর মতন ; একটিকে আঘাত করলে অপরটি স্বভাবত আহত হবে।"

কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদায় পশ্চাৎপদ মুসলমানরা যাতে হিন্দুর সমকক্ষ হতে পারে অথবা প্রতিযোগিতায় মুসলমানরা যাতে কৃতকার্য হয় তার জন্যে তিনি ইংরেজ সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিলেন। সরকারও সুযোগ বুঝে তাঁকে হিন্দু-বিরোধী এবং কংগ্রেস বিরোধী কাজে লাগালেন। ডঃ বিপান চন্দ্র সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে, সৈয়দ আহমদ খান 'স্বভাবধর্মে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না' এবং 'ধর্মান্ধতাকে তিনি নিন্দা করতেন।' কিন্তু কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পর তিনি মনে করেছিলেন এটি মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার সহায়ক হবে না। ১৮৮৮ খ্রিঃ পূর্বোক্ত এডুকেশানাল কনফারেন্স নাম বদল করে হয় 'ইউনাইটেড পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন'। এরপর তিনি কংগ্রেস বিরোধী ও হিন্দু বিরোধী হয়ে ওঠেন। এই চেতনা তার মনের মধ্যে ঢুকিয়েছিলেন আলিগড় কলেজের প্রথম ইংরেজ অধ্যক্ষ থিয়োডোর বেক (১৮৮৩-৮৯)। চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির প্ররোচনায় তিনি ভুল পথে পা দেন। বিপান চন্দ্রের মতে এটি 'দুঃখজনক' ও 'মতিভ্রম' পদক্ষেপ।[২] ১৮৯৩ খ্রিঃ থিয়োডর বেক 'মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন' গড়লে সৈয়দ আহমদ তার সক্রিয় সভ্য হন।

আলিগড় আন্দোলনের গুরুত্ব ও ফলাফল : সৈয়দ আহমদ খান মুসলিম সমাজে সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগী এবং আধুনিক মনোভাবাপন্ন।

অনগ্রসর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার তাঁর অভীষ্ট ছিল। আলিগড় আন্দোলনের প্রধান ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই যে, এর মধ্য দিয়ে মুসলিম নবজাগরণের সূচনা। কিন্তু এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো—(ক) কংগ্রেস বিরোধিতা এবং (খ) ব্রিটিশ-নির্ভরতা। কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় জোর দেওয়া হয়েছিল যুক্তিবাদ ও আধুনিকতার উপরে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্য নানা সম্প্রদায়ের মানুষ মুক্তহস্তে দান করেন। অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, মীরাট, বুলন্দশহর এলাকার ধনী মুসলিম মহাজন ও জমিদারগণ এর সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের ক্লাসগুলি নিতেন প্রাচীনপন্থী মোল্লাগণ। ফলে তাদের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইন্ধন যোগান সহজ হয় বেক, মরিসন প্রমুখ অধ্যক্ষদের পক্ষে। ফলে হিন্দু-মুসলিম দুই পৃথক সামাজিক গোষ্ঠী, তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ পরস্পর বিরোধী, মুসলমানেরা ইংরেজশাসনের অধীনে অধিক নিরাপদ, কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারি চাকরি বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের বিরোধিতা ইত্যাদি সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা আলিগড় আন্দোলনকে দুর্বল করে। পরিণতিতে হলো স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রসার। এর ফলস্বরূপ উত্তরকালে অনেককে সাম্প্রদায়িকতার পথে নিয়ে যায়। প্রগতিশীল পথে শুরু হয়েও আলিগড় আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা তাই দেখা যায়।

১০। ঐতিহ্য, সংস্কার ও রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া

উনিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা, নানা কুসংস্কার, অ-মানবিক প্রথা ইত্যাদি যেমন তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে, তেমনি হিন্দুধর্ম পর্যন্ত সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই সমালোচনা এসেছে খ্রিস্টান মিশনারী থেকে ভারতীয় সংস্কারক পর্যন্ত নানা শ্রেণীর মানুষদের কাছ থেকে। বলা বাহুল্য, এই সমালোচনা বিশেষত দেশীয় সংস্কারকদের সমালোচনা সর্বদা অযৌক্তিক ছিল না। তাছাড়া সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে গিয়ে গোঁড়া নেতৃত্ব নিজেদের দেশেরই ক্ষতি করেছিলেন। তবে সংস্কারকগণ, বিদেশী শাসকবর্গ, খ্রিস্টান মিশনারীগণ প্রত্যেকেই আধুনিকতার যে প্রচেষ্টা শুরু করেন তার মধ্যে পাশ্চাত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট— তা শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ যাই হোক না কেন। ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার সংঘর্ষ অনেক সময় প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের সমার্থক হয়ে গেছে।

দীর্ঘকাল ধরে এইভাবে কারণে এবং অকারণে সমালোচনার আঘাতের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এক পালটা আঘাত আসে। এই পালটা আঘাত ছিল দু'ধরনের— একদিকে ছিল ঐতিহ্যের ভেতর থেকে সংস্কার করার প্রবণতা, অন্যদিকে ছিল পুরোপুরি মৌলবাদী পুনরুত্থানবাদী প্রচেষ্টা। দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত আর্যসমাজ আন্দোলন, থিয়োসফিকাল সোসাইটির ক্রিয়াকলাপ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নব্যহিন্দু আন্দোলন ইত্যাদি

ছিল প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত। এগুলিতে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও প্রয়োজনমত সমালোচনাও ছিল, যেমন, দয়ানন্দ বিধবা বিবাহে সমর্থন করতেন, স্বামী বিবেকানন্দ জাতিভেদের ঘোর সমালোচক ছিলেন ইত্যাদি উদাহরণ দেওয়া যায়। আবার বঙ্কিমের সমাজ চিন্তার মধ্যে বা পরে শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রমুখের মধ্যে যে পুনরভ্যুত্থানবাদী প্রচেষ্টা তা পশ্চাদপন্থী (Retrograde)। মনে রাখা দরকার, বিবেকানন্দের নব্য হিন্দুধর্ম (Neo Hinduism) থেকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী (Hindu Revivalist) আন্দোলন আলাদা—এই দ্বিতীয় চেতনা থেকেই উত্তরকালে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম।

আর্যসমাজ ঃ পাঞ্জাব তথা উত্তর ভারতে ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল আর্যসমাজ। গুজরাটের এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের পরিবারে জাত মূলশংকর গৃহত্যাগ করে স্বামী দয়ানন্দ (১৮২৪-১৮৮৩) নাম নেন। তিনি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ থেকে এর মূল কেন্দ্র হয় পাঞ্জাবের লাহোরে। ব্রাহ্মসমাজের বা প্রার্থনা সমাজের মতন আর্যসমাজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত কিংবা সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিল না। আর্যসমাজ ছিল হিন্দুধর্ম নির্ভর। হিন্দুধর্ম পুনর্গঠন এবং ভারতে হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যেই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী ছিল। যদিও দয়ানন্দ সমুদ্রযাত্রা, বিধবা-বিবাহ, নারী-পুরুষ সমানাধিকার, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কার-মুক্ত ছিলেন। আর্যসমাজের কার্যকলাপ পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাটে প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষেও এই সমাজ উদ্যোগী ছিল। দয়ানন্দের মত ছিল 'বেদে প্রত্যাবর্তন কর', যদিও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে। তাঁর রচিত 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থে আর্যসমাজের মতবাদ পাওয়া যায়। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য 'শুদ্ধি' আন্দোলন এবং আর্য প্রচারের জন্য হরিদ্বারে গুরুকুল বিদ্যালয় আর ইংরেজি ও দেশীয় শিক্ষা একত্রে পাওয়ার জন্য নানা স্থানে অ্যাংলো বেদিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা আর্য সমাজের কর্মসূচির অন্তর্গত ছিল। দয়ানন্দের মৃত্যুর পর লালা হংসরাজ, পণ্ডিত গুরু দত্ত, লালা লাজপত রাই, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটি ঃ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাদাম ব্লাভাট্স্কি এবং কর্ণেল এইচ. এস. অলকট থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারা ভারতে এসে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে অ্যাডেয়ারে ভারতের থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে অ্যানি বেশান্ত এই সংগঠনে যোগদান করলে সোসাইটি শক্তিশালী হয়। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্য পূর্ণজাগরিত করে ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক পরাধীনতার অবসান ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। অ্যানি বেশান্তের প্রচেষ্টায় থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির শাখা প্রশাখা ভারতে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কাশীতে স্থাপিত হয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (পরে যা মদনমোহন মালব্যের প্রচেষ্টায় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়)। ভারতবাসীর দেশাত্মবোধ, আত্মসম্মান

সেইসঙ্গে স্বাধীনতা চাইতেন অ্যানি বেশান্ত, তবে সোসাইটির মূল আদর্শ ছিল হিন্দু অধ্যাত্মবাদের দ্বারা জাগরিত হওয়া। প্রগতিশীল সামাজিক ভূমিকা তারা নিতে পারেনি।

নব্যহিন্দু আন্দোলন ও রামকৃষ্ণ মিশন ঃ উনিশ শতকের শেষ দিকে রামকৃষ্ণ পরমহংস, তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর মাধ্যমে যে ধর্মান্দোলন ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে নব্যহিন্দু আন্দোলন বলাই সংগত। কেননা মূলত হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যের আশ্রয়ে স্থাপিত হলেও এই আন্দোলন অন্ধ ঐতিহ্যাশ্রয়ী, সাম্প্রদায়িক বা পুনরভ্যুত্থানবাদী ছিল না। তাই 'রিভাইভালিস্ট' না বলে 'নিও হিন্দুমুভমেন্ট' কথাটি যুক্তিগ্রাহ্য। লক্ষ্যণীয় যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আন্দোলন ছিল সমন্বয়বাদী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনপন্থী, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবসেবায় বিশ্বাসী, জাতিভেদ সহ বহু কুসংস্কার বিরোধী। রামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যে যেমন মুখ্য ছিল 'যতমত তত পথ', বিবেকানন্দের মানসচক্ষে চিল 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ' সমন্বিত আধুনিক ভারতগড়ার স্বপ্ন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন (আসল নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়, ১৮৩৬-১৮৮৬) কলকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত কালিমন্দিরের পুরোহিত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও গভীর ধর্মবিশ্বাস, সরল জীবনযাত্রা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ, সাকার-নিরাকার উপাসনায় সমবিশ্বাস, নানা ধর্মীয় সাধনার প্রতি ঔদার্য এবং লৌকিক গল্পগাথার ছলে অমৃত বাণী বিতরণের মধ্য দিয়ে তিনি এক সমন্বয়বাদী আদর্শ প্রচার করেন। যার মূল কথা, সর্ব ধর্মে সত্য আছে। কুসংস্কার ও অপ্রয়োজনীয় আচার সর্বস্বতা থেকে তাঁর হিন্দুধর্ম ছিল আলাদা। তাঁর শিষ্য বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ (আসল নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮৬৩-১৯০২) এই কর্মবীর বিবেকানন্দ নব্যহিন্দু ধর্মের বাণী দেশে-বিদেশে প্রচার করেন। তিনি তদীয় আচার্যদেবের নামে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ধর্মের সংকীর্ণতার উপর জোর না দিয়ে মানবতাবাদী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন 'জীবে দয়া' এবং প্রেমের মধ্যে ঈশ্বর সেবার উপর জোর দেন। মানব সেবাব্রতী বিবেকানন্দ ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, একদা ব্রাহ্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত, বর্ণপ্রথার সমালোচক। তাই বৈদান্তিক হয়েও তিনি সমন্বয়বাদী, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং ভারতের অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মতবাদের মিলনপন্থী। তিনি বলেন, 'যে ধর্ম বিধবার চোখের জল নিবারণ করতে পারে না এবং অনাথের মুখে এক টুকরো রুটি তুলে ধরতে পারে না, আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না।' তাই বিবেকানন্দ দারিদ্র দূরীকরণ, আত্মশক্তি ও সংঘশক্তির উপর জোর দেন,যুক্তি ও বিশ্বাসের মিলন কামনা করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিকাগো ধর্ম-

সম্মেলনে এবং উত্তরকালে পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন শোষণহীন সমাজ। তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা এই কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মান্দোলন ভারতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।[১]

বস্তুত সমাজ পরিবর্তন একদিনে হয় না। পরিবর্তনকামী এবং পরিবর্তন বিরোধীদের এককথায় প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল তকঁমা এঁটে দেওয়া যায় না। কারণ প্রভূত পরিমাণ স্ববিরোধী চিন্তা ও কর্ম সকলের মধ্যে দেখা যায়। একই ব্যক্তির মধ্যেও নানা বিবর্তন ঘটে। তবে উনিশ শতকের জাগরণে ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার মতন সংস্কার বনাম গোঁড়ামির দ্বন্দ্ব সারা শতাব্দী ব্যাপী দেখা যায়। রামমোহনের সতীদাহ নিরোধক আন্দোলন যদিও তার প্রথম প্রয়াস, ব্রাহ্মসভা-ধর্মসভায় দলাদলিতে তার চেহারা যদিও স্পষ্ট, তা হলেও শতকের শেষে সহবাস সম্মতি আইনেও তা স্পষ্ট। আবার একই ব্যক্তির মধ্যে ভিন্নতার উদাহরণও আছে। যেমন গোপালকৃষ্ণ গোখেলে রাজনীতিতে নরমপন্থী হলেও সমাজচিন্তায় গোঁড়া নন, প্রগতিশীল ; আবার বালগঙ্গাধর তিলক রাজনীতিতে চরমপন্থী অথচ সমাজ-ভাবনায় রক্ষণশীল। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মূলত পার্শি সংস্কারক বেরহামজি মালাবারির উদ্যোগে ভারতীয় মেয়েদের নূন্যতম বিবাহের বয়স বিষয়ক সহবাস সম্মতি আইন (Age of Consent Bill) যখন সরকার পাস করে, তখন দীর্ঘ এক বিবাদ শুরু হয়েছিল। সারা ভারতের রক্ষণশীল সমাজ এই আইনের বিপক্ষে ছিল যাতে ভারতীয়দের কপটতার মুখোস খুলে গিয়েছিল। তবে ক্রমে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের প্রবল চাপের কাছে সমাজ সংস্কার হারিয়ে গেলেও, সমাজসংস্কার আন্দোলন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে মূল্যবান, তা অনস্বীকার্য।